'ইনগ্লোরিয়াস এম্পায়ার' বইয়ের অনুবাদ

বাংলা - ভারত - পাক

লুটপাটের ইতিহাস

শশী থারুর



সন্দীপন

সূচিপত্র

আজীব ব্যাপার।
কখনো আমাদের ক্ষতি করার জন্যই অন্ধকারের অপশক্তিরা সত্যিটা জানিয়ে দেয়...

উইলিয়াম শেইকসপিয়ার, ম্যাকবেথ, অঙ্ক ১, দৃশ্য ৩

তব হস্ত, হে মহান শোষক! করে যবনিকাপাত;
জগৎকে ঢেকে দেয় নিকষকালো রাত।

অ্যালেক্সান্ডার পোপ, দ্য ডানসিয়াড

আমাদের জীবনটা ক্ষণিকের ঝলক—
আদিম পৃথিবীর শেষতক এই ঝলকানি বেঁচে থাক!
কিন্তু গতকাল পর্যন্ত পুরোটাই তো আমাদের কাছে আঁধারে ঢাকা।

জোসেফ কনরাড, হার্ট অব ডার্কনেস

ভারত—শতশত ভারত—ফিসফিসিয়ে চলেছে নির্লিপ্ত চাঁদের নিচে,
তবে আপাতত ভারতকে মনে হচ্ছে এক ও আপন,
হারানো গৌরবের মাতম শুনতে শুনতেই তারা তাকে ফিরে পেল আবারও...

ই. এম. ফর্স্টার, আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া

ঘটনাপ্রবাহ

১৬০০	ব্রিটিশ রাজসনদের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই সূত্র ধরে একদিন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে পদানত হবে ভারত।
১৬১৩-১৪	মসুলিপত্তনমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি কারখানা এবং সুরতে উইলিয়াম হকিন্সের তত্ত্বাবধানে একটি বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়। রাজা প্রথম জেইমসের প্রতিনিধি হিসেবে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে উপস্থিত হন স্যার টমাস রো।
১৬১৫-১৮	ব্রিটেনকে বাণিজ্য পরিচালনা ও কারখানা স্থাপনের অধিকার প্রদান করে মুঘল সরকার।
১৭০০	মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে ভারত গোটা বিশ্ব-অর্থনীতির ২৭ শতাংশের মালিক হয়ে ওঠে।
১৭০২	পিট ডায়মন্ডের মালিক হন মাদ্রাজের গভর্নর টমাস পিট। পরে তা রিজেন্ট অব ফ্রান্স, ডিউক ডি'অরলিয়ঁর কাছে ১,৩৫,০০০ পাউন্ডে বিক্রি করা হয়।
১৭৩৯	পারস্যের নাদির শাহ দিল্লি দখল করেন এবং দিল্লির সকল সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যান।

১৭৫১	ফরাসি ও ব্রিটিশরা যখন দক্ষিণ ভারতের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন ছাব্বিশ বছর বয়সি রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-৭৪) আরকাড় দখল করেন।
১৭৫৭	ক্লাইভের অধীনে ব্রিটিশরা নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলার শাসকে পরিণত হয়। বাংলা ছিল তৎকালীন ভারতের সমৃদ্ধতম প্রদেশ।
১৭৬৫	দুর্বল মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম একটি দিওয়ান জারি করেন। এখন থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করবেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাবৃন্দ।
১৭৬৭	প্রথম অ্যাংলো-মাইসুরু যুদ্ধ শুরু। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মারাঠি ও হায়দারাবাদের নিযামের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন মাইসুরুর হায়দার আলি।
১৭৭১	মারাঠিরা পুনরায় দিল্লি দখল করে।
১৭৭২	রামমোহন রায়ের (মৃ. ১৮৩৩) জন্ম। কলকাতায় ব্রিটিশদের রাজধানী স্থাপন।
১৭৭৩	বাংলায় আফিমের উৎপাদন ও বিক্রয়ে একচেটিয়া দখল লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পার্লামেন্টে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান ওয়ারেন হেস্টিংস।
১৭৮১	হায়দার আলির ছেলে টিপু সুলতানের হাতে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয়।
১৭৮৪	পিট দ্য ইয়াংগার ভারত আইন পাশ করান। এর মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পার্লামেন্টের অধীনে নিয়ে আসা হয়। বিচারক ও ভাষাবিদ স্যার উইলিয়াম জোনসের হাতে কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৭৮৭-৯৫	অসদাচরণের কারণে বাংলার গভর্নর জেনারেল পদ (১৭৭৪-৮৫) থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিশংসনের মুখোমুখি করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট।

১৭৯৩	লর্ড কর্নওয়ালিসের অধীনে ব্রিটিশরা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামক ভূমি রাজস্বব্যবস্থা প্রণয়ন করে।
১৭৯৯	৫ হাজার ব্রিটিশ সৈনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন টিপু সুলতান। সৈনিকরা তার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনমে ঢুকে তা তছনছ করে ফেলে।
১৮০৩	দ্বিতীয় অ্যাংলো-মারাঠা যুদ্ধের ফলস্বরূপ ব্রিটিশরা দিল্লি ও ভারতের বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয়।
১৮০৬	ভেলুর বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করা হয়।
১৮২৫	ভারতীয় শ্রমিকরা প্রথমবারের মতো গণহারে মাদ্রাজ থেকে রিইউনিয়ন ও মরিশাসে স্থানান্তরিত হয়।
১৮২৮	রামমোহন রায় কলকাতায় আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারের পথে এটি প্রথম আন্দোলন। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মে প্রভাবিত হয়ে তিনি বহুদেবতাবাদ ও মূর্তিপূজা-সহ নানা বিষয় প্রত্যাখ্যান করেন।
১৮৩৫	ম্যাকাউলির মিনিট-এর মাধ্যমে ভারতে পশ্চিমা শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। ইংরেজিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি ও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
১৮৩৫	ভারত থেকে মরিশাসে গমন করে ১৯,০০০ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। মরিশাসে শ্রমিক-স্থানান্তর অব্যাহত থাকে ১৯২২ পর্যন্ত।
১৮৩৭	ব্রিটিশরা কালীপূজারি ঠগিদের দমন করে।
১৮৩৯	ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম হাউইট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তুমুল সমালোচনা করেন।
১৮৪৩	ব্রিটিশরা সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তান) জয় করে। 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রচার করে ব্রিটিশরা। অর্থাৎ, উত্তরসূরি ব্যতিরেকে কোনো শাসকের মৃত্যু হলে এই নীতি অনুযায়ী ব্রিটিশরা ওই রাষ্ট্র দখল করে নেবে।
১৮৫৩	মুম্বাই ও থানের মাঝে প্রথমবারের মতো রেলপথ নির্মিত হয়।

১৮৫৭	ভারতের প্রথম বড়সড় বিদ্রোহ, ব্রিটিশরা যাকে সিপাহি বিদ্রোহ বা গ্রেট ইন্ডিয়ান মিউটিনি নামে চেনে। দিল্লি ও লখনৌর পতনের মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায়।
১৮৫৮	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারত সরকারের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন রানি ভিক্টোরিয়া। ভারতীয়রা এখন থেকে ভারতের লোকপ্রশাসনের চাকরিতে প্রবেশ করতে পারবে।
১৮৫৮	ভারতে প্রথমবারের মতো ২০০ মাইল রেলপথ নির্মাণ সম্পন্ন হয়।
১৮৬০	চিনির প্ল্যান্টেশানে কাজ করানোর জন্য প্রথমবারের মতো (মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান বন্দরে ভেড়ে দুটি জাহাজ এসএস ট্রুরো এবং এসএস বেলভেডিয়ার।
১৮৬১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (মৃ. ১৯৪১)।
১৮৬৩	স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম (মৃ. ১৯০২)।
১৮৬৬	উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মারা যায় কমপক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষ।
১৮৬৯-১৯৪৮	ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক কর্মী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জীবনকাল। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা, যার ফলে ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে বাধ্য হয় (১৯৪৭)।
১৮৭২	ভারতে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।
১৮৭৬	রানি ভিক্টোরিয়াকে (১৮১৯-১৯০১) ভারতের সম্রাজ্ঞী (১৮৭৬-১৯০১) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ভাইসরয় লর্ড লিটন ১৮৭৬-৭৭ সালের দুর্ভিক্ষ সামাল দিতে ব্যর্থ হন।
১৮৭৯	ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য উপনিবেশে ইতোমধ্যে কাজ করছিল প্রায় ৩,৪০,০০০ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এবার লিওনিডাস জাহাজে করে ফিজিতে আরও ৪৯৮ জন ভারতীয় শ্রমিক অবতরণ করে।

১৮৮৫	ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয় জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এটি প্রতিষ্ঠা করেন একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, যাদের কয়েকজন ছিল ব্রিটিশ।
১৮৮৯	জওহরলাল নেহরুর জন্ম (মৃ. ১৯৬৪)।
১৮৯১	বি.আর. আম্বেদকরের জন্ম (মৃ. ১৯৫৬)।
১৮৯৩	শিকাগোর পার্লামেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড'স রিলিজিয়ানস-এ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। সাড়া জাগানো বক্তব্যের মাধ্যমে দারুণ সাফল্য অর্জন করেন তিনি।
১৮৯৬	ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে গণেশ বিসর্জন ও শিবাজি উৎসবের প্রচলন ঘটান জাতীয়তাবাদী নেতা ও মারাঠি বিশেষজ্ঞ বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০)। তিনিই প্রথমবারের মতো ব্রিটেনের কাছ থেকে 'পূর্ণ স্বরাজে'র দাবি তোলেন।
১৮৯৭	ব্রিটিশ ভারতে আরও একটি দুর্ভিক্ষ চলাকালে রানি ভিক্টোরিয়ার ৬০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপিত হয়।
১৯০০	ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানিকৃত চায়ের মূল্যমান দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড।
১৯০১	হার্বার্ট রিজলি ভারতের প্রথম নৃতাত্ত্বিক জনশুমারি পরিচালনা করেন।
১৯০৩	লর্ড কার্জন মহাসমারোহে দিল্লি দরবার আয়োজন করেন।
১৯০৫	বঙ্গভঙ্গের ফলে তুমুল বিরোধিতার জন্ম হয়। স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয় এবং ব্রিটিশদের পণ্য বর্জন করা হতে থাকে। ভারতের একজন উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন পদত্যাগ করেন।
১৯০৬	ব্রিটিশদের ইন্ধনে ভারতে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, যার নাম মুসলিম লীগ।

১৯০৯	মিন্টো-মর্লি সংস্কার ঘোষিত হয়।
১৯১১	দিল্লিতে সর্বশেষ রাজদরবার আয়োজন। কলকাতার বদলে ভারতের নতুন রাজধানী হয় দিল্লি। বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন।
১৯১৪	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করার জন্য ফ্রান্স ও মেসোপটেমিয়ায় ধেয়ে যায় ভারতীয় সেনাবাহিনী।
১৯১৫	দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন মহাত্মা গান্ধি।
১৯১৬	কোমাগাতা মারু ঘটনা: কানাডীয় সরকার ভারতীয় অভিবাসীদের নিষিদ্ধ করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মাঝে সম্পাদিত হয় লখনৌ চুক্তি।
১৯১৭	ফিজি ও ত্রিনিদাদের ব্রিটিশ উপনিবেশে গমন করে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের সর্বশেষ দলটি।
১৯১৮	স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে ভারতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং বিশ্বব্যাপী ২ কোটি ১৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।
১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি।
১৯১৯	জালিয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যা সংঘটিত হয়। অমৃতসরে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর জন্য গুর্খা সেনাদের আদেশ দেন জেনারেল ডায়ার। এতে মারা যায় কমপক্ষে ৩৭৯ জন। গণহত্যার ফলে গান্ধি উপলব্ধি করেন যে, অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ঘোষিত হয়। রাউলাট আইন পাশ।
১৯২০	গান্ধি সত্যাগ্রহ পদ্ধতিতে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। খিলাফত আন্দোলনের সূচনা।
১৯২২	চৌরিচৌরা সহিংসতার প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার।

১৯২৭ ও ১৯৩৪	ভারতীয়রা নির্ণায়ক ও কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে বসার অনুমতি লাভ করে।
১৯৩০	জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস পার্টির নেতা হিসেবে মনোনীত হন। লাহোরে পাশ হয় পূর্ণ স্বরাজ আইন। উইল ডুরান্ট ভারতে আসেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বাস্তবতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। মহাত্মা গান্ধির লবণ সত্যাগ্রহ।
১৯৩৫	ভারত সরকার আইন।
১৯৩৭	১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন। ৮টিতে কংগ্রেস বিজয়ী হয়।
১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকেই ভাইসরয় ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন। প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।
১৯৪০	মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির আহ্বান জানায়।
১৯৪২	ক্রিপস মিশন। ভারত ছাড় আন্দোলন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারাবন্দি হন। ব্রিটিশদের মোকাবিলা করার জন্য সুভাষ চন্দ্র বসুর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৪৫	কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি। লর্ড ওয়াভেলের অধীনে শিমলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৪৬	রয়াল ইন্ডিয়ান নেভি বিদ্রোহ। দেশব্যাপী নির্বাচন। বেশিরভাগ মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের বিজয়। কেবিনেট মিশন। জওহরলাল নেহরুর অধীনে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন। জিন্নাহর ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে ঘোষণা। কলকাতায় সহিংসতা শুরু।
১৯৪৭	১৫ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত। গণহত্যা ও বাস্তুচ্যুতির মধ্য দিয়ে দেশভাগ হয়। ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করে চলে যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কতজন মানুষ যে আমাকে এই বইটির ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই চমৎকার মানুষগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা যাবে না। সবার আগে আমার বন্ধু ও প্রকাশক ডেভিড দাবিদারের কথা বলতে হয়। তিনিই আমাকে ফুসলিয়ে এই প্রকল্পে জড়িত করেছেন। সিদ্ধান্তটা আমি একরকম দায়সারাভাবেই নিয়ে নিয়েছিলাম। বুঝতেই পারিনি কতটা খাটাখাটনি করতে হবে এর জন্য। আপনার সামনে যে বইটি এখন উপস্থিত, তার পথপ্রদর্শক ছিলেন ডেভিড। তার সহকর্মী সিমার পুনীত বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। সম্পাদনার পুরো প্রক্রিয়াটাজুড়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও শ্রমসাধ্য সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। হার্স্ট সংস্করণটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মাইকেল ডোয়াইয়ার যেসব সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলোর জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ইনগ্লোরিয়াস এম্পায়ার লেখার জন্য অকল্পনীয় পরিমাণের গবেষণা ও পড়াশোনা (আমার ক্ষেত্রে অবশ্য পুনঃপাঠ) করতে হয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ রাজ-সম্পর্কিত যত তথ্যের উৎস রয়েছে, চষে বেড়াতে হয়েছে তার সবকিছু। এই কাজে অমূল্য সহায়তা দিয়েছেন অধ্যাপক শীবা থাত্তিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর নথিপত্র, লেখালেখি ও বইপত্রের ডিজিটাইজড সংস্করণ খুঁড়ে বের করেছেন তিনি। ঘেঁটে এনেছেন আরও সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়ে লিখিত অ্যাকাডেমিক বই ও প্রবন্ধ। দুজন অক্লান্ত গবেষক অভিমন্যু দাদু এবং বেন ল্যাংলি আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তথ্যের ভেতর লুকিয়ে থাকা মূল্যবান সব তত্ত্ব। এই ভারের সিংহভাগ বহন করেছেন প্রথমজন। পাণ্ডুলিপি তৈরি এবং অসংখ্য তথ্যসূত্র যাচাই করে দেখার কাজেও অভিমন্যু সাথে ছিলেন। ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।

কয়েকজন বন্ধু পাণ্ডুলিপি পড়ে দরকারি সব মন্তব্য পেশ করেছেন : আমার ছেলে কণিষ্ক থারুর, যে তার পিতার চেয়ে দক্ষ ইতিহাসবিদ ও লেখক; ঘনিষ্ঠ সহযোগী মনু পিল্লাই, যিনি নিজেও এই যুগটির ওপর এক দুর্দান্ত ইতিহাস বইয়ের লেখক; বন্ধু এবং কিছুক্ষেত্রে সহকর্মী, লেখক ও বহুবিদ্যাধর কীর্তিক শশীধরন; এবং আমার বোনের মতো বোন, ইতিহাসবিদ নন্দিতা কৃষ্ণ। আমার স্কুলের দোস্ত এবং বর্তমানে সংসদীয় সহকর্মী, প্রখ্যাত হার্ভার্ড ইতিহাসবিদ প্রফেসর সুগত বসু এই বইটির একটি পাণ্ডুলিপি পড়ে দিয়েছেন। তার জ্ঞান থেকে খুবই উপকৃত হয়েছি আমি। এই বইয়ের পেছনে তারা সবাই চিন্তা ও ধারণা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু এতে থাকা সব অক্ষর ও উপসংহারের দায়ভার আমার একার।

সর্বোপরি অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই ভুটানের রাজা মহামান্য জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের প্রতি। তার অতি উদার আতিথেয়তা ও সহায়তা না পেলে আমি এই বইটি সময়মতো শেষ করা তো দূরের কথা, শুরুই করতে পারতাম না। তার বদান্যতা ও মহানুভবতায় আমি ওই অনিন্দ্যসুন্দর দেশটির পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পেরেছি। নির্ঝঞ্ঝাটে ও দ্রুতগতিতে শেষ করেছি লেখার কাজ। কোনো অতিথি এসে হাঁকডাক করতে পারেনি। আরও ধন্যবাদ দিচ্ছি মহারাজার গৃহাধ্যক্ষ দাশো যিম্পোন উগিয়েন নামগিয়েল, ক্যাপ্টেন জাত্তু ৎশেরিং ও ৎসেদন দর্জিকে। তারা অভাবনীয় সৌজন্য ও সহযোগিতা দেখিয়েছেন আমার জন্য।

আমার কর্মচারীরা শত-সহস্র উপায়ে এই বইয়ের লেখনীতে সহযোগী হয়েছেন। এর মাঝে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন নারায়ণ সিংহ, যার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আরেকজন বিশেষ বন্ধু আছেন, যিনি আমাকে বই লিখতে একাকিত্বও দিয়েছেন, আবার সঙ্গ ও উৎসাহও দিয়েছেন। তার জন্য কোনো শব্দ ব্যয় করার দরকারও নেই; আবার যত শব্দই ব্যয় করি না কেন, তা যথেষ্টও হবে না।

শশী থারুর
পারো, ভুটান
আগস্ট ২০১৬

শুরুর কথা

বিষয়টা অদ্ভুত লাগতে পারে। এই বইয়ের শুরুটা হয়েছিল একটা বক্তৃতা আকারে।

সময়টা ২০১৫ সালের মে মাসের শেষ দিক। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের একটি বিতর্কে অংশ নিতে আমাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রস্তাবিত বিষয় 'ব্রিটেনের কাছে তার সাবেক উপনিবেশগুলোর ক্ষতিপূরণ পাওনা রয়েছে'। ওই সপ্তাহে এমনিতেও আমার হে ফেস্টিভ্যাল অব লিটরেচারে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কথা। তাই ভাবলাম, পথে অক্সফোর্ড হয়েই যাই। গিয়ে আরও একবার বিতর্ক করি সেখানে (এক দশক আগে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে প্রথমবার এই কাজ করেছিলাম)। ইউনিয়নের চোখ-জুড়ানো মঞ্চটি কাঠের প্যানেলে তৈরি। সেই ১৮৭৯ সালে নির্মিত হয়েছে। সেখানে সফল এক অনুষ্ঠান শেষে খুশিমনে বেরিয়ে আসি আমি। যা বলেছি, তা নিয়ে দ্বিতীয়বার আর কিছু ভাবিনি।

কিন্তু জুলাইয়ের শুরুতে ইউনিয়ন এই বিতর্কটি ইন্টারনেটে প্রকাশ করে। আমার বক্তব্যের একটি ভিডিও কপি পাঠায় আমাকে। সাথে সাথে আমার টুইটারে সেটার লিংক দিই। হতবাক হয়ে দেখলাম, জিনিসটা একদম ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটা বারেবারে ডাউনলোড হয়ে শতশত ওয়েবসাইটে পুনঃপ্রচারিত হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে গেছে, ই-মেইল আকারে চালাচালি হচ্ছে। একটা সাইটে দেখলাম ভিউ এসেছে ত্রিশ লাখের বেশি। বাকিগুলো ওভাবে হিসেব না রাখলেও রেকর্ড-সংখ্যক হিট পাচ্ছিল। ডানপন্থি সমালোচকরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাকে 'ট্রোলিং' করা বন্ধ রেখে বক্তৃতাটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ভারতীয় লোকসভার নিম্নকক্ষের স্পিকার এক অনুষ্ঠানে আমার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এই প্রশংসা শুনে আমাকে অভিনন্দন জানান 'সঠিক জায়গায় সঠিক কথা' বলার জন্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের এই বক্তৃতা শোনানো হতে থাকে। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব জম্মু আয়োজন করে এক দিনব্যাপী সম্মেলনের। জ্ঞানীগুণী বিশেষজ্ঞরা সেখানে আমার বক্তব্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা তুলে ধরেন। পক্ষে ও বিপক্ষে লেখা হয় শতশত প্রবন্ধ। কয়েক মাস যাবৎ অপরিচিত মানুষেরা এসে জনসমক্ষে আমার সাথে মোলাকাত করে চলেন, প্রশংসা করেন আমার 'অক্সফোর্ড বক্তৃতা'র।

আনন্দে অভিভূত তো হয়েছিই, তবে একটু স্তম্ভিত না হয়েও পারিনি। এটা ঠিক যে, বক্তৃতাটা যথেষ্ট ভালো ছিল। দুই-তৃতীয়াংশ শ্রোতার সমর্থনে আমার পক্ষ জয়ী হয়েছে বটে; কিন্তু আমি জানি, জীবনে আমি এরচেয়েও ভালো অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। এটার এক-দশমাংশ প্রশংসাও পায়নি সেগুলো। আরেকটা ব্যাপার, আমি যে খুব যুগান্তকারী নতুন কোনো কথা বলে দিয়ে এসেছি, তাও কিন্তু নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অনাচার নিয়ে ছোটকাল থেকে যা-কিছু পড়ে এসেছি, ওসবই বিশ্লেষণ করেছি কেবল। ভেবেছিলাম, আমার যুক্তিতর্কগুলো এতই সাধারণ যে, আমেরিকানদের কাছে সেটাকে মনে হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অআকখ—একেবারেই মৌলিক ও প্রাথমিক কিছু আলাপ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এবং ভারতের সংগ্রামের পক্ষে এই কথাগুলো অহরহই বলা হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃগণ, বিংশ শতকের জওহরলাল নেহরু প্রমুখ মোটামুটি এসব কথাই বলে গেছেন।

অথচ আমার বক্তৃতার পর অসংখ্য শ্রোতার কর্ণকুহরে জোরেশোরে অনুরণন সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, আমার কাছে যা নিতান্ত সাধারণ কথাবার্তা, সেগুলোই বহু (অথবা হয়তো বেশিরভাগ) শিক্ষিত ভারতীয়ের কাছে একেবারেই অজানা। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হলো, আমি যেন তাদের চেনা-জানা কথার পুনরাবৃত্তি করিনি, বরং রীতিমতো তাদের চোখ খুলে দিয়েছি।

এজন্যই ডেভিড দাবিদার আমাকে চাপাচাপি করতে থাকেন বক্তৃতাটিকে একটি সংক্ষিপ্ত বইয়ে রূপ দেওয়ার জন্য। এমন এক বই—যা সাধারণ পাঠকও সহজে হজম করতে পারবে, আবার জ্ঞানপিপাসুরাও তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ব্যাপারে যারা মৌলিক সত্যগুলো জানতে চায়, তারা এখান থেকে উপকৃত হবে। পাশাপাশি একটা নৈতিক দাবি তো আছেই। উপনিবেশবাদ কেন একটা রাক্ষসে রূপ নিল, সেটা

জানাতে হবে আজকের ভারতীয়দের—এবং সেইসাথে ব্রিটেনদেরও।

বেশকিছু দিক দিয়ে বইটি ওই বক্তৃতা থেকে আলাদা। প্রথম কথা, এখানে ক্ষতিপূরণ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করা হয়নি। বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গ এসেছিল, কারণ অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ওভাবেই বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত করেছে। আমি যে ক্ষতিপূরণের জন্য খুব লালায়িত, তা নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার ঔপনিবেশিক প্রজাদের ওপর যেসব অনাচার করেছে, সেগুলোর ফিরিস্তি দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু বক্তব্যের শেষে বলেছি যে, ভারতের উচিত প্রতীকী ক্ষতিপূরণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা। প্রতিবছর এক পাউন্ড করে ২০০ বছরে ২০০ পাউন্ড নেওয়া যেতে পারে। তাহলে তা ২০০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আসলে নগদ অর্থের চেয়ে এখানে মনের অনুশোচনাটাই বড় কথা। একবার শুধু 'সরি' বললে তা-ই সই। সত্যি বলতে, জনৈক ভারতীয় বিশ্লেষক মিনহাজ মার্চেন্ট একবার এই ক্ষতিপূরণের আসল পরিমাণটা হিসাব করার চেষ্টা করেছিলেন।[১] তাতে যে মহাজাগতিক অঙ্ক বেরিয়ে এসেছে—এখনকার হিসাবে ৩ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার—তা পরিশোধ করা জীবনেও সম্ভব নয়। (অঙ্কটা ব্রিটেনের ২০১৫ সালের গোটা জিডিপির চেয়েও বড়।)

বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ নিয়েও আলোচনা করা হয়নি এই বইয়ে। এখানে শুধু ভারতের অভিজ্ঞতাটুকু তুলে ধরা হয়েছে। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বক্তারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পুরো ইতিহাসই আলোচনায় এনেছেন; কিন্তু বইয়ে অতকিছু জায়গা দিতে গেলে এর কলেবর হয়ে যাবে বেঢপ। এটা একটা কারণ। তবে আরেকটা কারণ হলো, ওই ব্যাপারে আমার নিজের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। পক্ষান্তরে, ভারতের ইতিহাস আমার পড়াশোনার মূল বিষয়বস্তু। আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ যে বিভীষিকা নিয়ে এসেছিল, যেভাবে রমরমা দাসব্যাবসা করে আসছিল, সেসব অস্বীকার করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করাটাও শতভাগ যৌক্তিক। (আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার পর ব্রিটিশ সরকার জরিমানা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা দাসেরা পায়নি, পেয়েছে সাবেক মালিকেরা। কারণ, তারা নাকি নিজেদের 'সম্পত্তি' খুইয়ে বসেছে!) এসব বিষয়ে আলোচনা করার মতো আরও যোগ্য মানুষেরা আছেন। আমি শুধু আমার আলোচনার বিষয়টির ওপর

---

[১] মিনহাজ মার্চেন্ট, "হোয়াই শশী থারুর ইজ রাইট অন ব্রিটেন'স কলোনিয়াল ডেট টু ইন্ডিয়া", www.dailyo.in, ২৩ জুলাই ২০১৫। http://www.dailyo.in/politics/minhaz-merchant-shashi-tharoor-oxford-union-address-congress-britain-colonialism-monsoon-session-parliament/

সুবিচার করার চেষ্টা করেছি। তা হলো ভারতে ব্রিটিশ শাসন।[২]

বই ও বক্তৃতার মাঝে তৃতীয় পার্থক্যটি হলো প্রতিপক্ষের যুক্তিখণ্ডন। অক্সফোর্ডে আমি ছিলাম এক পক্ষের বিতার্কিক। খুঁটিনাটি ও প্রতিযুক্তিকে বিবেচনায় নেওয়ার মতো সুযোগ সেখানে কমই ছিল। কিন্তু এই বই পুরোটাই 'সাম্রাজ্যের শয়তানি' নিয়ে। তাই ব্রিটিশ রাজের পক্ষের যুক্তিগুলো তুলে ধরাও আমার দায়িত্ব। এই কাজ আমি প্রতিটি অধ্যায়েই করেছি, বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অবশিষ্ট বেশিরভাগ শক্ত যুক্তি আমি তৃতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ ও খণ্ডন করেছি। এ উদ্দেশ্যে আগেকার ও এখনকার পড়াশোনা মিলিয়ে ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা করেছি আমি। ঔপনিবেশিক যুগের লেখালেখি যেমন পড়েছি, তেমনই পড়েছি সাম্প্রতিক সময়ের বিশেষজ্ঞদের কাজও। সবকিছুই বইয়ের শেষে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আশা করি, আমার যুক্তিগুলোর পেছনে পর্যাপ্ত গবেষণাভিত্তিক সমর্থন রয়েছে। যারা আমার সাথে দ্বিমত করেন, তারাও নিরাশ হবেন না।

পরিশেষে, বইটি কোনো গল্প নয়, বরং তর্ক। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে পাবেন না। বইয়ের শুরুতে ঘটনাপ্রবাহের রূপরেখাটি শুধু তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মূল বইয়ের উদ্দেশ্য হলো ব্রিটিশ রাজের ভূমিকাকে নিরীক্ষা করা, এর কথিত সুফলের দাবিগুলো পর্যালোচনা করে দেখা, এবং এর বিরুদ্ধে প্রমাণ ও যুক্তি তুলে ধরা।

আমার বক্তৃতা যে সর্বমহলেই প্রশংসিত হয়েছে, তা নয়। এর একটা কারণ হলো, ব্রিটিশ শাসনের অনেক ব্যাপারই বেশ জটিল ও দ্ব্যর্থক প্রকৃতির। হয় ভালো, না হয় খারাপ—এরকম মানদণ্ডে সেগুলোর আলোচনা করা সমীচীন নয়; অথচ বিতর্কের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমাকে সেগুলোর অতিসরলীকরণ করতে হয়েছে। তবে এই বই স্বীকার করে যে, আলোচনার অনেক বিষয়ই বহুমাত্রিক। বিতর্কের কক্ষে যে বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব, এখানে তা সম্ভব। তা ছাড়া, আমার বক্তৃতার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে বেশ কিছু যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে। সেগুলো যদিও বইটির কোনো নির্দিষ্ট অধ্যায়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয় না, তবুও আমি সেগুলো যথাস্থানে উল্লেখ করব।

সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পালটা যুক্তি হলো উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের বিভিন্ন ব্যর্থতা। আমি ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুরতার ওপর যেসব

---

[২] তাড়াহুড়ায় যখন এই বাক্যটি টাইপ করছিলাম, আমার স্পেলচেকার তখন 'ব্রিটিশ'-এর জায়গায় 'Brutish' (পাশবিক) শব্দটি প্রস্তাব করে বসে।

আক্রমণ করেছি, সেগুলো নাকি এসব ব্যর্থতার ফলে নাকচ হয়ে গেছে। টাইম ম্যাগাজিনের জনৈক কলামিস্ট লিখেছেন, 'থারুর হয়তো বিতর্কে জয়ী, কিন্তু নৈতিক বিজয় ভারতের হাতছাড়া।'[৩] তার দাবি, স্বাধীনতার পর থেকে নিয়ে ভারতীয় সরকারের যে আমলনামা, তাতে করে ক্ষতিপূরণের টাকা সঠিক খাতে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। এর সাথে আরেকটি তথ্য যোগ করেন জনৈক ব্লগার।[৪] সরকারি গুদাম থেকে ২০১০ সালে লক্ষ লক্ষ টন পচা খাদ্যশস্য উদ্ধার হয়েছিল। ব্লগারের মতে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সরকারের ঘৃণ্য চরিত্র বোঝার জন্য এই একটা ঘটনাই যথেষ্ট। ভাবখানা এমন, যেন স্বাধীনতা-উত্তর অকর্মণ্যতার ফলে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষগুলো জায়িয হয়ে গেছে।

আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টির একজন সাংসদ। স্বাধীনতার ৬৮ বছরের মধ্যে ৫২ বছরই ভারত শাসন করেছে এই দলটি (আমি অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পর্যন্ত)। এতে করে আমার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ খাড়া করা একদমই সহজ হয়ে গেছে। বিশ্লেষক জোনাথন ফোরম্যান সেটা একদম চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছেন।[৫] অনেকটা রেগেমেগেই তিনি বলেন, 'কংগ্রেস পার্টি ছয় দশকের বেশি সময় ধরে দুঃশাসন চালিয়েছে। প্রতিবার হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে বেশি দাম্ভিক ও দুর্নীতিবাজ। তাদের পূর্বসূরি ব্রিটিশরা যেরকম জনবিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের অবস্থাও প্রায় সেরকমই। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারতের দুঃখজনক "হিন্দু জনসংখ্যার হার" বৃদ্ধির জন্য দায়ী। অভিজাত শাসকশ্রেণি জনগণের মৌলিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার ব্যাপারে উদাসীন, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ঘোরে আচ্ছন্ন, "লাইসেন্স রাজ"-এর মদদদাতা, মুষ্টিমেয় কিছু একচেটিয়া ব্যবসায়ী পরিবারের সাথে অসাধু লেনদেনে লিপ্ত। এজন্যই তো দক্ষিণ কোরিয়া এমনকি মেক্সিকোর মতো দেশের মাথাপিছু জিডিপিও ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে।'

কিছু সমালোচনা যৌক্তিক। আমি নিজেই আমার লেখা বইপত্রে কোনো-না-কোনোভাবে সেগুলো উত্থাপিত করেছি, যদিও টেনেহিঁচড়ে অত চরম ও

---

[৩] শিখা ডালমিয়া, 'পারহাপস ইন্ডিয়া শুডন'ট গেট টু এক্সাইটেড অ্যাবাউট রিপেয়ারেশানস', টাইম, ৩ আগস্ট ২০১৫।

[৪] সিফার একেএস, 'ডিয়ার শশী, ইওর অ্যাক্সেন্ট কুড নট মাস্ক দ্য হোলস ইন ইওর স্পিচ', www.akkarbakkar.com. https://www.akkarbakkar.com/dear-shashi-tharoor-your-accent-could-not-mask-the-holes-in-your-speech.

[৫] জোনাথন ফোরম্যান, 'রিপেয়ারেশানস ফর দ্য রাজ? ইউ মাস্ট বি জোকিং!', www.politico.eu, ৩ আগস্ট ২০১৫। http://www.politico.eu/article/british-reparations-for-india-for-the-raj-oxford

তীব্র পর্যায়ে নিয়ে যাইনি। তবে একটা ব্যর্থতা আরেক ব্যর্থতার অজুহাত নয়। বিশ দশকের ঔপনিবেশিক নিপীড়নও ছয় দশকের দেশীয় দুঃশাসনের ফলে নাকচ হয়ে যায় না। ভারতীয় তথা কংগ্রেস সরকারের রেকর্ড তাদের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী পূর্বসূরিদের চাইতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক অনেক ভালো। বিশেষ করে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, সাক্ষরতা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গড় আয়ু, এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের মতো সূচকগুলোর ক্ষেত্রে। ইতিহাস মানে কেবল বিভিন্ন যুগের ব্যর্থতার মাঝে তুলনা করার কোনো খেলা নয়। প্রতিটি যুগকে তার নিজের জায়গায়, তার নিজের সাফল্য ও সীমালঙ্ঘনের জন্য বিচার করতে হবে।

যেহেতু অক্সফোর্ড বিতর্কের মূল কথাই ছিল ক্ষতিপূরণ, সেহেতু আমার সমালোচকগণ আগুনে আরও ঘি পেয়েছেন। জনৈক ভারতীয় বিশ্লেষক বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণের দাবির মাধ্যমে আসলে ভারতের মানসিক অনিরাপত্তাবোধ ও আত্মসম্মানের অভাবই ফুটে উঠেছে।[৬] ভারতীয়রা যেন নিজেদের পরবর্তী ব্যর্থতার সব দায় স্থানান্তর করতে চাইছে পূর্বেকার ব্রিটিশদের ঘাড়ে। আরও কয়েকজনের মতে, এসব ক্ষতিপূরণের সত্যিকারের প্রাপক আসলে কারা, সেটা নির্ণয় করা অসম্ভব।

কেউ আবার জোর দিয়ে বলেছেন, ব্রিটেন আসলে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেও। বছরের পর বছর ধরে ত্রাণ সহযোগিতা পাঠিয়েছে ভারতে। অবশ্যই সেটা দোষ স্বীকার করার কারণে নয়, বরং সাবেক ঔপনিবেশিক প্রজাদের প্রতি ব্রিটিশদের স্বভাবগত মহানুভবতার বশে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারতে যত একমুখী উপকার গেছে, তা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। সেটাও আবার শুধু ত্রাণ সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অক্সফোর্ডে আমার প্রতিপক্ষের একজন সদস্য ছিলেন ইতিহাসবিদ জন ম্যাকেঞ্জি। তার মতে, ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো 'ভারতের আউটসোর্সিং বিস্ফোরণে অবদান রেখেছে বলা চলে। এটাকেও ক্ষতিপূরণ বলে ধরা যায়।' আরেক বিতার্কিক সাংসদ স্যার রিচার্ড অটাওয়ের যুক্তি, ধনী দেশগুলো দরিদ্রতর দেশকে এমনিতেই স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে থাকে। 'এরপরও আরও চেয়ে হাত পেতে রাখা মানে নিজেদেরই ছোট করে রাখা।'

বলাবাহুল্য, আমি কিন্তু আরও চাইনি, বরং চেয়েছি আরও কমিয়ে দেওয়া হোক—বছরে প্রতীকী এক পাউন্ড। তবে সেটাও মূল কথা নয়। অক্সফোর্ডের ঠিক-করে-দেওয়া শব্দ মেনে আমি ক্ষতিপূরণ কথাটি বলেছি ঠিকই, আসলে

[৬] গৌরি দাঙ্গে, 'ফর আ ফিউ ক্ল্যাপস মোর', পুনে মিরোর, ২৯ জুলাই ২০১৫।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো সাবেক উপনিবেশগুলোর প্রতি ব্রিটেনের নৈতিক ঋণের কথা তুলে ধরা, আর্থিক ঋণ নয়। ত্রাণ সহযোগিতার কথা যদি বলি, তাহলে ব্রিটিশদের পাঠানো মোট সহযোগিতা ভারতের জিডিপির ০.০২ শতাংশের চেয়েও কম। ভারতীয় সরকার সারের ভরতুকি হিসেবেও এরচেয়ে বেশি খরচ করে। ত্রাণ সহযোগিতার যুক্তিকে খণ্ডন করতে সারের চেয়ে ভালো উপমা আর হয় না।

অনেকেই দেখিয়েছেন যে, আজকের ব্রিটিশরা তাদের পূর্বপুরুষের কোনো দায়ভারের অংশীদার নয়। তাই বাপ-দাদার যে পাপে তারা কোনো ভূমিকা রাখেনি, সেটার ক্ষতিপূরণের বোঝা তারা বইতে পারে না। সে হিসেবে আজকের ভারতীয়রাও তাদের পূর্বপুরুষের দুঃখকষ্টের জরিমানা পাওয়ার যোগ্য নয়। জরিমানা নাতিরা নাতিদের দেবে না, বরং নিপীড়করা নিপীড়িতদের দেবে।

যথার্থ বলেছেন। কিন্তু এতে করে জাতীয় পরিচয় ও দায়িত্বের ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হলো; অথচ আজকের বেশিরভাগ দেশ এই পরিচয়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। উইলি ব্র্যান্ট জার্মানির চ্যান্সেলর থাকাকালে ওয়ার-স গেটোতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলেন। সেটা ১৯৭০ সালের ঘটনা। তিনি পোলিশ ইহুদিদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন হলোকস্টের জন্য, অথচ পোল্যান্ডে তখন আর কোনো ইহুদি ছিল না বললেই চলে। আর ব্র্যান্ট নিজে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক, যিনি নাৎসিদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হলোকস্টের কোনো দায় তো তার ওপর বর্তানোর কথাই না। কিন্তু এই ঐতিহাসিক নতজানুতার মাধ্যমে তিনি জার্মান জনগণের নৈতিক দায়ভারকে স্বীকার করেছেন। কারণ, তিনি এই জনগণেরই নেতৃত্ব হাতে নিয়েছেন চ্যান্সেলর হিসেবে। ঠিক এ কারণেই আমি অর্থনৈতিক সহযোগিতার বদলে নৈতিক অনুশোচনার আহ্বান জানিয়েছি।

অবশ্য অনুশোচনা যে ভারতের প্রাপ্য, এ ব্যাপারেও সবাই একমত নন। ইতিহাসবিদ জন কেই সবচেয়ে ভালোভাবে এটা তুলে ধরেছেন: 'ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রের কাজকেও বিচার করতে হবে ওই যুগের মানদণ্ডে। আজকের মানদণ্ডে অতীতকে দেখলে হবে না। না হলে খ্রিষ্টানদের সিংহের খাবারে পরিণত করার কারণে আমরা আজ সবাই মিলে ইটালিকে চেপে ধরতাম।'[৭] চটকদার হলেও অসার যুক্তি। ব্রিটিশ রাজ মোটেও প্রাচীন ইতিহাস নয়, বরং আজও যারা বেঁচে আছে, তাদের স্মৃতির অংশ। জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক জনসংখ্যা প্রতিবেদনের মতে[৮], ভারতে অশীতিপর মানুষের সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

---

[৭] জন কেই, 'টেল ইট টু দ্য ড্রিমিং স্পায়ারস', আউটলুক, ১৫ আগস্ট ২০১৫।

[৮] 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশান এইজিং ১৯৫০–২০৫০' প্রতিবেদন, জাতিসংঘ, www.un.org/esa/population/publications/worldageing১৯৫০২০৫০/pdf/৯০chapteriv.pdf

ব্রিটিশ শাসন তাদের শৈশবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবার ধরুন ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সিদের কথা। আপন পিতামাতার মুখে তারা ব্রিটিশ শাসনের গল্প শুনেছেন। তাই ওই যুগের কথা যাদের স্মৃতিতে ভালো করে গেঁথে আছে, সেই ভারতীয়দের সংখ্যা ১০ কোটির বেশি।

অনুশোচনার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, তবে শেষ হয়ে যায়নি। অন্তত আমি মনেপ্রাণে আশা করি যে, ২০১৯ সালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জালিয়ানওয়ালা বাগে এসে হাঁটু গেড়ে বসার মতো সাহসী হবেন। এক শতক আগে ওই জায়গায় যে অমার্জনীয় গণহত্যা হয়েছে, তার জন্য ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাইবেন নিজ জাতির পক্ষ থেকে। ডেভিড ক্যামেরন অনেকটা আমতা আমতা করে ২০১৩ সালে এই গণহত্যাকে বলেছেন 'অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা'। আমার দৃষ্টিতে এটা ঠিক ক্ষমাপ্রার্থনা হলো না।

রানি এলিজাবেথ এবং ডিউক অব এডিনবরা ১৯৭৭ সালে নিয়মরক্ষার মতো করে জায়গাটি ঘুরে গেছেন। পর্যটকের খাতায় স্রেফ সই করে গেছেন তারা। দায় স্বীকারমূলক একটা কথাও তারা বলেননি। ওই বর্বর কাজটা সংঘটিত হওয়ার সময় যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আজ শতবর্ষ পূর্তিতে তার বেঁচে থাকার কথা না। আর ২০১৯ সালের ব্রিটিশ সরকারও ওই ঘটনার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। কিন্তু যে জাতিটা একসময় এই গণহত্যা সংঘটিত হতে দিয়েছে, তাদের প্রতিনিধি হিসেবেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেই পাপের অনুশোচনা দেখাতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ঠিক এই কাজটিই করেছেন ২০১৬ সালে। এক শতক আগে কোমাগাতামারুতে করে-আসা ভারতীয় অভিবাসীদের ভ্যাঙ্কুভারে নামতে দেওয়া হয়নি। অনেকের মৃত্যুও হয় এর ফলে। ক্যানাডা সরকারের ওই কাজের জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। জার্মানির উইলি ব্র্যান্টের অনুকরণে ক্যানাডার ট্রুডো যা করেছেন, সেটার একটা ব্রিটিশ সংস্করণ এখন সময়ের দাবি।

সর্বোত্তম অনুশোচনা কেমন হতে পারে, সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন। তা হলো, ব্রিটিশ স্কুলগুলোতে অকপটে ঔপনিবেশিক ইতিহাস পড়ানো।[৯] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাস্তবতার ব্যাপারে ব্রিটিশ জনগণের অজ্ঞতা দুঃখজনক। সাম্রাজ্যের প্রজাদের দুঃসহ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। আজকাল ইংল্যান্ডে ওই সাম্রাজ্যবাদী অতীতে ফিরে যাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষার জন্ম হচ্ছে। ইতঃপূর্বে সেই স্মৃতিকাতরতাকে উপজীব্য

[৯] স্টিভেন সুইনফোর্ড এবং ক্রিস্টোফার হোপ, 'চিলড্রেন শুড বি টট অ্যাবাউট সাফারিং আন্ডার দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, জেরেমি করবিন সেজ', দ্য টেলিগ্রাফ, ২৭ জুলাই ২০১৫।

করে রচিত ও নির্মিত হয়েছিল উপন্যাস ও চলচ্চিত্র দ্য ফার প্যাভিলিয়নস ও দ্য জ্যুওল ইন দ্য ক্রাউন। ইদানীং প্রচুর সাফল্য পেয়েছে ধারাবাহিক নাটক ইন্ডিয়ান সামারস। ব্রিটেন-নিবাসী ওলন্দাজ লেখক ইয়ান বুরুমার মতে, এগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'ইংরেজপনার ব্যাপারে তাদের সামষ্টিক স্বপ্নকে। আজকের ছোট্ট, জবুথবু ইংল্যান্ডের তুলনায় সেই স্বপ্ন কত যে গৌরবময়, কত না তীব্র, কতই অম্লমধুর।'[১০] ব্রিটিশ স্কুলশিশুদের এখন শেখা চাই, ইংরেজদের ওই স্বপ্ন কীভাবে তাদের প্রজাদের জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তাহলেই তৈরি হবে সত্যিকারের অনুশোচনা, যা সম্পূর্ণই নৈতিক এক উপলব্ধি। তাতে শুধু দোষ স্বীকার করা নয়, বরং থাকবে ঐতিহাসিক দায়ভারকে যথাযথভাবে বোঝার তাড়না।

বুরুমা যা বলেছেন, তা অবশ্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদিরই প্রতিধ্বনি। কয়েক বছর আগে রুশদি বলেছেন: 'থ্যাচারীয় ব্রিটেনের ক্রমাগত অবক্ষয়, বাড়তে-থাকা দারিদ্র্য ও চেতনার দুর্ভিক্ষের ফলে বহু ব্রিটিশ আজ স্মৃতিকাতর হয়ে হারানো অতীতের দিকে ফিরে তাকায়। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার পুনর্জন্ম এবং ঔপনিবেশিক গল্প-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সেই কথাই বলে। কাটা অঙ্গের মতো মনে মনে তড়পাতে থাকে তারা... মুকুটে আজকাল নকল শিরোমণি বসিয়ে রাখা হয়।'[১১]

ব্রিটেন এখন আর 'থ্যাচারীয়' নেই। অবশ্য 'ব্রেক্সিটে'র ফলে তার অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে যেতে পারে। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক স্মৃতিকাতরতাকে উত্তর-ঔপনিবেশিক দায়ভার দিয়ে ঠান্ডা করে দেওয়ার এখনই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয় রাজাকারগিরির প্রসঙ্গ তো এখনো তুললামই না। ভারতীয় কলামিস্ট আকর পাতিল বলেছেন, ব্রিটিশদের ভারত 'দখলকে সাহায্য ও উৎসাহ জুগিয়েছে ভারতীয়রাই'[১২] এবং আমরা এখনো এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে অপ্রস্তুত। হ্যাঁ, আমি এই বইয়ে যত অনাচারের কথা তুলে ধরব, তার বেশিরভাগে না হলেও অনেকগুলোতেই ভারতীয়রা সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। ভারতীয় রাজকুমারদের ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ব্রিটিশরা যখন ভারতের ক্ষমতা দখল করে ফেলে, এই রাজকুমাররা

---

[১০] ইয়ান বুরুমা, প্লেয়িং দ্য গেইম, নিউ ইয়র্ক: ফারার, স্ট্রস অ্যান্ড জাইরুক্স, ১৯৯১, পৃ. ২৫৮।

[১১] সালমান রুশদি, 'আউটসাইড দ্য হোয়েইল', গ্র্যান্টা, ১৯৮৪, পুনরুদ্ধৃত করেছে ইম্যাজিনারি হোমল্যান্ডস, নয়াদিল্লি: ভাইকিং, ১৯৯৩।

[১২] আকর পাতিল, 'ডিয়ার শশী, দ্য ফল্ট ওয়াজ নট ইন দ্য রাজ, বাট ইন আওয়ারসেলভস', টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৬ জুলাই ২০১৫।

শয়তান-পূজারির মতো একটা চুক্তি করে নেন। ব্রিটিশদের কাছে নিজেদের চিরস্থায়ী নাজাত বিক্রি করার মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী সম্পদ ও আরাম-আয়েশ ক্রয় করেন তারা। এই নামমাত্র 'শাসকরা' জানপ্রাণ দিয়ে ব্রিটিশ রাজার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বেড়াতেন। তাই দেশে যখন অসহনীয় খরা চমলান, ক্রিকেটার-রাজকুমার রঞ্জিতসিংহজি তখন তার প্রজাদের ধরে ব্রিটিশদের বস্তায় ভরে দেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করার জন্য। তার রাষ্ট্র যখন দুর্ভিক্ষের থাবায় দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে, তখন তিনি সফররত ভাইসরয়কে স্বাগত জানাতে এক মাসের রাজস্ব উড়িয়ে দিয়েছেন বাজি আর পটকার পেছনে। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণির একাংশ যেভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের পা চেটেছে, তাতে এরকম উদাহরণ ভূরিভূরি পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরও অনেক বিখ্যাত ভারতীয় সমর্থক আছেন। এদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও অকুণ্ঠ ইংরেজপ্রেমী নীরদ সি. চৌধুরী। ধারাবাহিক বই লিখে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ফযীলত বর্ণনা এবং এর পতনে হা-হুতাশ করেছেন। (এই বইয়ে আমরা তার কিছু সুনির্দিষ্ট উদাহরণ আলোচনা করব পরে।) অনেক সাধারণ ভারতীয়ও মানিয়ে নিয়েছে ব্রিটিশদের সাথে। অনেকেই নিজেদের ভেবেছিল নিরুপায়। কিন্তু একজন ডাকাত যখন আপনার ঘর ধ্বংস করে দেয়, আপনার টাকাপয়সা আর গয়নাগাটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন দোষটা ডাকাতেরই। যে কাজের লোকটি ভয়ের চোটে, ভালোবাসার আতিশয্যে বা অজ্ঞতার বশে ডাকাতকে দরজা খুলে দিয়েছে, তার দোষ এখানে গৌণ।

ব্রিটিশদের অতীত কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে গিয়ে কি আমরা আমাদের আজকের অবস্থার পেছনে নিজেদের দায়ভার অস্বীকার করছি? আমরা কি বলতে চাইছি যে, আমাদের আজকের সকল দুরবস্থার পেছনে একা ব্রিটিশরাই দায়ী? অবশ্যই না। কিছু লেখক দেখিয়েছেন যে, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য চাই সুস্থ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং যথোচিত ম্যাক্রো-একোনমিক নীতিমালা। খালি অতীতের অবিচারের ফিরিস্তি বর্ণনা করলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে না। জোর দিয়ে বলছি আমি একমত। আমাদের দেশকে আজ যেসব সঠিক কাজ করতে হবে, সেগুলো থেকে তাকে দায়মুক্ত করার জন্য আমি গতকালের ইতিহাস আওড়াই না, বরং আমি গতকালের ভুলত্রুটিগুলো বুঝতে চাই। এর মাধ্যমে বর্তমান বাস্তবতার পেছনের কারণগুলো যেমন ধরার চেষ্টা করি, তেমনই স্বয়ং অতীতকেও বোঝার চেষ্টা করি। অতীত হয়তো সব ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের পথ দেখানোর সিঁড়ি নয়, কিন্তু বর্তমানের ব্যাখ্যা আংশিকভাবে হলেও বোঝা যায় অতীতের মাধ্যমে। আমি আরেক জায়গায় লিখেছি, ইতিহাসের ওপর

প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। ইতিহাস নিজেই নিজের প্রতিশোধ।

বইটির ব্যাপারে শেষ আরেকটি সতর্কতা। আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসন নিয়ে লিখছি ঠিকই, কিন্তু সেই 'ভারতে'র যে এখন আর অস্তিত্ব নেই, তা যে এখন তিনটি আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে—সেই বাস্তবতা সম্পর্কে আমি ভালো করেই ওয়াকিফহাল। কিন্তু যা বলেছি, তার বেশিরভাগ কথাই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্বয়ের ক্ষেত্রেও খাটে। কোনো অনিচ্ছুক বিদেশিকে আমি ধরেবেঁধে নিজের সাথে একমত করাতে চাই না। শুধু বলতে চাইছি যে, ইচ্ছে করলে তারা আমার সাথে গলা মেলাতেই পারেন। তারপরও আমি ২০১৬ সালের একজন ভারতীয় হিসেবে দুই শতাব্দী আগের ভারত নিয়ে লিখছি। নৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে আমি সেই ভূমিরই অংশ, যা একসময় ব্রিটিশ রাজের হাতে এমন হৃদয়বিদারক অত্যাচারের শিকার হয়েছে। ভারত আমার দেশ, এই অর্থে আমার আক্রোশটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আমি ইতিহাসের কাছে তার নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই চাই না।

এই বইয়ের লেখক সবজান্তা হওয়া তো দূরের কথা, ভুলেরই ঊর্ধ্বে নয়। হয়তো আমার জানার বাইরে অনেক তথ্য থাকতে পারে, যেগুলোকে আমি নিজের যুক্তিতর্কে তুলে আনতে পারিনি। তারপরও আপনার সামনে থাকা বইটি আমার দেশের নিকট-অতীতের ব্যাপারে আমার নিজস্ব বোঝাপড়ার ফল। ভারত আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের সত্তরতম বর্ষপূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই ১৯৪৭ সালে কোন জিনিসগুলো আমাদের এক নতুন যুগের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল, সেগুলোকে নিরীক্ষা করার এখনই উপযুক্ত সময়। যে ভারতকে আমরা পুনরায় গড়ে তুলতে চাইছি, তার পেছনের ইতিহাসকেও বুঝতে হবে। আমার মতে, এগুলোই এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতীয় ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষের সি অব পপিজ-এ এক ব্রিটিশ নাবিক বলেন, 'আমরা যখন মানুষ মারি, তখন ভান করি যেন এর পেছনে মহৎ কোনো উদ্দেশ্য আছে। লিখে রাখো, এই ভালোমানুষির অভিনয়টাকেই ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না।'[১৩] আমি ইতিহাসের মুখপাত্র নই, কিন্তু ভারতীয় হিসেবে এতটুকু বলতে পারি, ভুলে যাওয়ার চাইতে বরং ক্ষমা করাটাই আমার কাছে বেশি সহজ লাগে।

---

[১৩] অমিতাভ ঘোষ, সি অব পপিজ, নিউ ইয়র্ক: ফারার, স্ট্রস অ্যান্ড জাইরুক্স, ২০১১, পৃ. ২৪২।

১



ভারত লুটপাট

তরুণ আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক উইল ডুরান্ট ১৯৩০ সালে প্রথমবারের মতো ভারতের উপকূলে পা রাখেন। বিশ্ব ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন ১১ খণ্ডের চমৎকার এক রচনা দ্য স্টোরি অব সিভিলাইজেশান। কিন্তু ভারতে এসে তার সম্পূর্ণই ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা হয়। তার নিজের ভাষ্যে বললে, ব্রিটেন 'জেনেবুঝে ও স্বেচ্ছায় যেভাবে ভারতকে রক্তাক্ত করেছে' তা চাক্ষুস দেখেছেন তিনি। পড়েছেন

এ-সংক্রান্ত লেখালেখি। তিনি 'বিস্ময় ও অপমানে এতই নুয়ে' পড়েন যে, গবেষণার কাজ মুলতুবি রেখে দেন। তার বদলে লিখে ফেলেন 'ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে'র এক দুর্দান্ত সমালোচনা। তার লেখা দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া কলেবরে ছোট, কিন্তু কালজয়ী এক কর্ম। গভীর সমবেদনা এবং প্রচণ্ড আক্রোশে ভরা এই লেখার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশদের সব অজুহাতকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছেন। নিজেদের ভারতলিপ্সার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে নির্লজ্জের মতো এসব অজুহাত খাড়া করে রেখেছিল ব্রিটিশরা। ডুরান্ট লিখেছেন :

> ব্রিটিশরা ভারতবিজয় করেনি, বরং এক উচ্চমার্গীয় সভ্যতাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে দিয়েছে নিতান্ত একটা বাণিজ্যিক কোম্পানি [ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি]। এরা না নীতি-নৈতিকতার ধার ধেরেছে, না শিল্পকে কোনো সম্মান দিয়েছে। এরা বোঝে খালি লোভ আর লোভ। সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খল ও অসহায় হয়ে-পড়া একটা দেশকে আগুন আর তরবারি দিয়ে ধসিয়ে দিয়েছে তারা। ঘুস দিয়েছে আর খুন করেছে, দখল করেছে আর চুরি করেছে। অবৈধ ও 'বৈধ' লুটতরাজের এই ধারার বয়স এখন [১৯৩০ সাল] পর্যন্ত ১৭৩ বছর।[১৪]

এক কর্পোরেশনের হাতে ভারত দখল অষ্টাদশ শতকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। মাথা তুলে দাঁড়ায় পৃথক কয়েকটি শাসনকেন্দ্র, যারা আবার ক্ষমতার জন্য নিজেদের মাঝে যুদ্ধরত। এর ফায়দা লুটেছে ব্রিটিশরা। নিজেদের গোলন্দাজি শক্তি আর ফটকাবাজি কুটিলতার জোরে তারা বিপুল পরিমাণ ভূমি দখল করে। প্রচুর টাকা ছিটিয়ে তারা নবাব ও মহারাজাদের উৎখাত করিয়েছে, নিজেদের মনোমতো তাদের ধনভান্ডার লুট করেছে, নানান পদ্ধতিতে তাদের রাষ্ট্রগুলো দখল করে নিয়েছে (১৮৪০-এর দশক থেকে চলে-আসা এরকম একটি কুটিল পদ্ধতি 'ডকট্রিন অব ল্যাপ্স'। উত্তরসূরি ব্যতীত কোনো শাসকের মৃত্যু হলে তার রাষ্ট্র আপনাতেই চলে যায় ব্রিটিশদের মালিকানায়)। কৃষকদের কাছ থেকে জমির মালিকানা ছিনিয়ে নিয়েছে, যেগুলো তারা বাপ-দাদা চৌদ্দ গুষ্টির আমল থেকে চাষবাস করে আসছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি একের পর এক রাষ্ট্রকে শুষে নিতে থাকে। কোম্পানির কর্মকর্তা জন সুলিভান (যিনি উটির 'হিল-স্টেশানে'র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই বেশি পরিচিত) ১৮৪০-এর দশকে এসবের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : 'ছোট্ট রাজদরবার অদৃশ্য হয়ে যায়—ব্যাবসা-বাণিজ্য ঝিমিয়ে পড়ে—গরীব হয়ে যায় জনগণ—ইংরেজ ফোলে আর ফাঁপে, স্পঞ্জের মতো গঙ্গার পাড় থেকে সম্পদ শুষে নেয়, তারপর

[১৪] উইল ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, ১৯৩০, পৃ. ৭।

চিপে সেগুলো ফেলে দিয়ে আসে টেমসের পাড়ে।'[১৫]

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে ভারতকে জয় করেছিল, তা কোনো আদিম বা ঊষর ভূমি ছিল না, বরং তা ছিল মধ্যযুগীয় বিশ্বের চকমকে রত্নপাথর। তাতে ছিল 'বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় সব শিল্পখাত থেকে আসা সম্পদের সমাহার।' ভারতের অর্জন ও সমৃদ্ধির ফিরিস্তি অল্প কথায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ইয়োর্কশায়ার-বংশোদ্ভূত আমেরিকান ইউনিটারিয়ান মন্ত্রী জে.টি. সান্ডারল্যান্ড:

সভ্য বিশ্ব যত ধরনের পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে জানে, তার প্রায় প্রতিটিই বহুকাল ধরে ভারতে উৎপাদিত হয়ে আসছিল। মানুষের মগজ ও হাত দিয়ে উপকারী বা সুন্দর যা-কিছু সৃষ্টি হয়েছে, যেখানেই হয়েছে, তার প্রায় সবই ছিল ভারতে। ইউরোপ বা এশিয়ার অন্য যে-কোনো জাতির তুলনায় ভারত ছিল বহুগুণে উন্নত শিল্পোৎপাদক জাতি। তার তৈরি পোশাকগুলো—সুতি, উল, লিনেন আর রেশম দিয়ে তার চরকায় যা-কিছু সেলাই হয়েছে, সেগুলো গোটা সভ্য বিশ্বে সমাদৃত। তার দুর্লভ সব মণিরত্ন আর নানা আকৃতিতে কাটা দামি পাথরগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। তার নানা ধরনের, নানা মানের, রঙের এবং নজরকাড়া আকৃতির মৃৎপাত্র, চীনামাটি আর সিরামিকের ক্ষেত্রেও একই কথা। তার লোহা, ইস্পাত, রুপা ও সোনা-সহ নানা ধাতুর কাজের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তার ছিল অসাধারণ স্থাপত্যকলা—সারা বিশ্বে এর জুড়ি মেলা ভার। ছিল অসাধারণ সব প্রকৌশলকর্ম। তার ছিল বড় বড় বণিক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও অর্থবিশেষজ্ঞ। জাহাজ-নির্মাণশিল্পে তো সে এমনিতেও বিশ্বসেরা, তার ওপর পরিচিত সভ্য বিশ্বের প্রতিটি দেশের সাথে জল ও স্থল পথে তার ব্যাবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত। ব্রিটিশরা এসে যে ভারতকে দেখেছে, এই ছিল তার চেহারা।[১৬]

ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ আঙ্গাস ম্যাডিসন দেখিয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্ব অর্থনীতির ২৩ শতাংশই ছিল ভারতের দখলে। পুরো ইউরোপ মিলে এর সমান। (১৭০০ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৭ শতাংশ। তখন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কোষাগারে শুধু রাজস্বই জমা পড়ত ১০ কোটি পাউন্ড।) ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে যাচ্ছে, ততদিনে তা ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। কারণটা সরল: ভারতকে শাসন করা হতো ব্রিটেনের স্বার্থে। ব্রিটেন যে ২০০ বছর ধরে ক্রমেই উন্নত হয়েছে, তার খরচ জুগিয়েছে ভারত।[১৭]

---

[১৫] জন সুলিভান, আ প্লি ফর দ্য প্রিন্সেস অব ইন্ডিয়া, লন্ডন: ই. উইলসন, ১৮৫৩, পৃ. ৬৭।

[১৬] জেবেয টি. সান্ডারল্যান্ড, ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ: হার রাইট টু ফ্রিডম অ্যান্ড আ প্লেইস অ্যামাং দ্য গ্রেট নেশানস, নিউ ইয়র্ক: লুইস কোপল্যান্ড, ১৯২৯, পৃ. ৩৬৭।

[১৭] আঙ্গাস ম্যাডিসন, দ্য ওয়ার্ল্ড একোনমি, ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার অব দি অর্গ্যানাইজেশান ফর

ঘটনার শুরু ১৬০০ সালে। মহারানি প্রথম এলিজাবেথের রয়াল চার্টারের মাধ্যমে ভারতে ব্যাবসা করার অনুমোদন পায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রেশম ও মশলা-সহ আরও যত লাভজনক ভারতীয় দ্রব্য আছে, সেগুলোর ব্যাবসা করতে পারবে তারা। কোম্পানি তার বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতের উপকূল ধরে বিভিন্ন ঘাঁটি তথা 'ফ্যাক্ট্রি' নির্মাণ করতে থাকে, বিশেষ করে কলকাতা, মাদ্রাজ ও মুম্বাইতে। নিজেদের স্থাপনা, লোকজন ও ব্যাবসার নিরাপত্তার ছুতোয় তারা সামরিক মাধ্যম ব্যবহার করতে শুরু করে। দেশটি আগে থেকেই নানান দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এরকম পরিস্থিতিতে সেখানে সৈনিক জোগাড় ও নিয়োগ করতে শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (চার্টার তাদের এই অনুমতিও দিয়ে রেখেছে যে, লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা 'যুদ্ধ ঘোষণা'ও করতে পারবে)। বাণিজ্যের বদলে দেশ বিজয় করাটাই হয়ে গেল তাদের কাজ। ব্যাবসায়িক ঘাঁটি হয়ে গেল দুর্গ, বণিকদের সহযোগী হলো সেনাবাহিনী।

প্রথম ব্রিটিশ 'ফ্যাক্টর' উইলিয়াম হকিন্স এসে তেমন একটা সম্মান পাননি। তার দেশের রাজার নামে টিটকারি শুনলেন মুখ বুজে। তার ধনসম্পদ নিয়েও চলতে লাগল তিরস্কার। প্রথম ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার টমাস রো ১৬১৫ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে হাজিরা দিয়ে নিজের পরিচয় জানান। এই ইংরেজ তখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী শাসকের পায়ে ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে। সেসময় মুঘল সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল থেকে বাংলার একদম পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর উত্তর-দক্ষিণে তার বিস্তৃতি কাশ্মীর থেকে কর্নাটক পর্যন্ত। এই ঘটনার পর দেড় শতাব্দীও পেরোয়নি, মুঘল সাম্রাজ্য একদম টালমাটাল হয়ে পড়ে। পারস্যের দুর্ধর্ষ নাদির শাহ দিল্লি দখল করেন ১৭৩৯ সালে। লুট করে নিয়ে যান এর সকল ধনভান্ডার।

মুঘল রাজধানীতে দীর্ঘ আট সপ্তাহ যাবৎ ধ্বংসযজ্ঞ আর জ্বালাও-পোড়াও চলে। পঞ্চাশ কোটি রুপির চেয়েও বেশি মূল্যমানের সোনা, রুপা, মণি আর জহরত লুণ্ঠিত হয়। কাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাজকোষাগার। সম্রাটের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন আর হাতি-ঘোড়া তুলে নিয়ে যায় হানাদাররা। রাস্তায় পড়ে থাকে ৫০,০০০-এর বেশি লাশ। কথিত আছে, নাদির শাহ যখন তার লোকলস্কর নিয়ে দেশে ফিরে যান, তার পরের তিন বছর পারস্যের সব খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হয়েছিল। এত বিপুল সম্পদ তিনি লুটে নিয়েছিলেন ভারত থেকে।

এই নৈরাজ্যের সুযোগ নিতে থাকে বিভিন্ন পক্ষ। অধস্তন প্রাদেশিক

একোনমিক কো-অপারেশান অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট, ২০০৬।

শাসকেরা নিজ নিজ এলাকায় সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। কেন্দ্রীয় শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাথা তোলে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরা (বিশেষ করে মারাঠা এবং পরবর্তীকালে পেশওয়া রাজবংশ)। অনেকেই দিল্লির মুঘল সম্রাটের প্রতি নামমাত্র অনুগত থাকলেও নিজেদের বলতেন মহারাজা বা নবাব। এরপর ১৭৫৭ সালে বিখ্যাত পলাশির যুদ্ধে কোম্পানিকে জয় এনে দেন রবার্ট ক্লাইভ (পরে যিনি লর্ড খেতাব পান)। শক্তিশালী কামান এবং তারচেয়েও শক্তিশালী ষড়যন্ত্রের জাল দিয়ে তারা পরাস্ত করেন বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে। নবাবের সাথে বেঈমানি করেন তার অতিঘনিষ্ঠ সভাসদ মীর জাফর। কোম্পানি তাকে যথাযথ প্রতিদান দেয় মসনদে বসানোর মাধ্যমে। কিন্তু বাংলার আসল ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। ক্লাইভ অচিরেই ইংল্যান্ডে কোম্পানির বাক্সে জমা দেন ২৫ লক্ষ পাউন্ডের এক রাজকীয় অঙ্ক। (এখনকার হিসেবে তা আড়াই কোটি পাউন্ড, অর্থাৎ নবাবের গোটা কোষাগার)। এই হলো তার পলাশির যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

সিংহাসনে বসেছেন তরুণ ও দুর্বল মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। ব্রিটিশদের চোখরাঙানির ভয়ে তিনি একটি রাজফরমান জারি করেন ১৭৬৫ সালের আগস্ট মাসে। ফরমানের আদেশমতে, মুঘল কর্মকর্তারা এখন আর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা আদায় করবেন না। সেই অধিকার এখন থেকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের। এতদিন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন, যাদের রয়েছে নিজস্ব বেসরকারি সেনাবাহিনী। ভারতের শাসকরা তাদের প্রতি অনুগত। এবার কোম্পানিটি রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্তৃপক্ষে পরিণত হয়। ভারত আর আগের মতো রইবে না।

পলাশি যুদ্ধের পর ১০০ বছরের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বেশিরভাগ অংশে আধিপত্য কায়েম করে। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে তাদের সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় ২,৬০,০০০। ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্ট তাদের পৃষ্ঠপোষক (পার্লামেন্টের অনেক সদস্য তাদের ব্যাবসার অংশীদারও বটেন।) কোম্পানি অনেকগুলো স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রকে বিজিত ও দখল করে নেয়। লন্ডন থেকে একের পর এক উচ্চবংশীয় গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের মাধ্যমে শাসকের দায়িত্ব পালন করতে থাকে এসব অঞ্চলে। তারা এই দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্তা। জনগণের ওপর খাজনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রের ওপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। কোম্পানির সেনাবাহিনী ১৮০৩ সালে দিল্লি আক্রমণ করে। বৃদ্ধ ও ভীত মুঘল রাজা তার রাজকীয় আলখাল্লার নিচে থরথর করে কাঁপতে থাকেন তাদের সামনে। পরবর্তী কয়েক দশকে কোম্পানির দখলে আসে বেশ কয়েকটি ভারতীয়

শাসনাঞ্চল। লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৭ সালে কোম্পানির গভর্নর-জেনারেল হন। দায়িত্ব গ্রহণের আট বছরের মধ্যে তিনি ভারতীয় শাসকদের কাছ থেকে হাত করে নেন ২.৫ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা।

কোম্পানির বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে একটি খোলাখুলি বিপ্লব হয়, ব্রিটিশদের মুখে যার নাম 'ইন্ডিয়ান মিউটিনি' (সিপাহি বিদ্রোহ)। এরই সূত্র ধরে পরের বছর ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর শাসনভার গ্রহণ করেন ব্রিটিশ রাজ-কর্তৃপক্ষ। তার আগ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২০ কোটিরও বেশি মানুষের ভাগ্যের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে চলে; ঠিক করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গতিপথ; নিজেদের মতো করে গড়ে তোলে এ দেশের সমাজ ও শিক্ষাকে; তৈরি করে রেলপথ। ভারত থেকে অর্জিত অর্থে ব্রিটেনে সূচিত হয় শিল্পবিপ্লব। মার্ক্সবাদীরা ১৯৭০-এর দশকে এক দুঃখজনক পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : পৃথিবী একসময় শাসিত হবে কোনো এক বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে ও স্বার্থে। ভারতে কোম্পানির শাসন যেন সেটারই এক অবাক-করা ও জুড়িহীন দৃষ্টান্ত।

মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের বলা হতো 'মহান ও শক্তিশালী, মহৎদের মাঝে মহত্তম, প্রসিদ্ধ যোদ্ধাদের নেতা, আমাদের বিশ্বস্ত সেবক ও আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী, আমাদের রাজকীয় অনুগ্রহের যোগ্য দাবিদার, ইংলিশ কোম্পানি'। কিন্তু কাগজে সরলরেখার ওপরে স্বাক্ষর করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাজকীয় অনুগ্রহই তাদের প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় শাহ আলম ও তার উত্তরসূরিগণ কোম্পানিকে সহ্য করে টিকে থাকেন। কাগজে-কলমে সম্রাট হলেও বাস্তবে তারা ছিলেন কোম্পানির কয়েদি ও অবসরভাতা-ভোগী। ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পলের কলমে উঠে এসেছে নারায়ণ সিংহ নামক জনৈক মুঘল কর্মকর্তার হাহাকার, যিনি ১৭৬৫ সালের পরের অবস্থা দেখে বলেছেন, 'এখনো শৌচকর্মও করতে শেখেনি, এমন কিছু মুষ্টিমেয় বণিকেরা আমাদের আদেশ করে। এরপর আমাদের মান-সম্মান আর রইল কোথায়?'[১৮] কিন্তু সম্রাটের 'বিশ্বস্ত সেবক ও আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী'দের কাছে মান-সম্মান কোনো মাথা ঘামানোর বিষয়ই না। কোম্পানি ইন্ডিয়াকে চালায়। আর অন্য যে-কোনো কোম্পানির মতোই তাদেরও একটাই উদ্দেশ্য : মুনাফা। লন্ডনবাসী তাদের পুঁজিপতি প্রভুরাও এটাই চান।

---

[১৮] উইলিয়াম ডালরিম্পল, 'দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি: দি ওরিজিনাল কর্পোরেট রেইডার্স', দ্য গার্ডিয়ান, ৪ মার্চ ২০১৫।

ভারতের বিশিল্পায়ন: করারোপ, দুর্নীতি এবং 'নাবোব'

ব্রিটিশ সরকার সামরিক ও নৌ সহায়তা দিয়ে কোম্পানির উত্থানকে সহযোগিতা করেছে, দিয়েছে প্রয়োজনীয় আইনি সাহায্য (অনেক ক্ষেত্রেই সেসব আইন পাশ করাতে ইন্ধন দিয়েছেন কোম্পানির অংশীদার সাংসদেরা)। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড থেকে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এমন অনুকূল পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে দিয়েছে, যাতে স্থানীয় বিরোধিতাও রোধ করা যায়, আবার ফরাসি ও ওলন্দাজদের মতো বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও টেক্কা মারা যায়। তবে যত যা-ই হোক, কোম্পানির মূল প্রেরণা ছিল অর্থনৈতিক। তাই তার শাসনের প্রধান পরিণতিগুলোও ওই প্রকৃতির। সেটা ভারতের জন্য যেমন, তেমনই স্বয়ং ব্রিটেনের জন্যও।

ভারতের সমৃদ্ধিশালী উৎপাদন শিল্পকে ধ্বংস করে গড়ে উঠেছে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব। এর এক আদর্শ উদাহরণ তৈরি পোশাক শিল্প। ব্রিটিশরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভারতের তৈরি পোশাক উৎপাদন ও আমদানিকে ধ্বংস করেছে। সে জায়গায় নিয়ে এসেছে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত ব্রিটিশ তৈরি পোশাক। পরিহাসটা হলো, ব্রিটিশরা এই কাজে ভারতীয় কাঁচামাল ব্যবহার করেছে। পোশাক উৎপাদন শেষে সেটাকে রপ্তানি করেছে এই ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার এক শৈল্পিক পদ্ধতি।

ব্রিটিশদের হাতে ভারতের পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা হলো আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশিল্পায়ন। ভারতীয় তাঁতের কাপড়ের প্রচুর চাহিদা ছিল ইংল্যান্ডে। দক্ষিণের বন্দরনগরী মসুলিপত্তনম তার কালামকারি ছাপার কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। কোম্পানি যে ১৬১৩ সালে তাদের প্রথম 'ফ্যাক্ট্রি' সেই জায়গাতেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা কোনো কাকতাল নয়। কয়েক শতাব্দী যাবৎ বাংলার তাঁতিরা বিশ্বের সবচেয়ে স্বনামধন্য সব কাপড় উৎপাদন করেছে। বিশেষ করে মসলিনের কথা তো না বললেই নয়—এতই মিহি, যেন 'সেলাইকৃত বাতাস'। ইউরোপীয় পোশাক-নির্মাতারা লালায়িত ছিল এর জন্য। এই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতেও বাংলার পোশাক দেশে দেশে রপ্তানি হয়েছে,[১৯] তাও আবার বিখ্যাত সব বাণিজ্যপথ ধরে—পশ্চিমে মিশর, তুর্কিয়ে ও পারস্যে। আর পূর্বদিকে জাভা, চীন ও জাপানে, আর ইউরোপ তো

[১৯] এসব তথ্যের বেশিরভাগের উৎস কে.এন. চৌধুরী, দ্য ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া অ্যান্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি: ১৬০০–১৭৬০, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬ এবং সুশীল চৌধুরী, দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার: প্লাসি রেভোলিউশান অব ১৭৫৭, নয়াদিল্লি: মনোহর পাবলিশার্স, ২০০০।

আছেই।

ধারণা করা হয়, ১৭৫০-এর দশকে একা বাংলা থেকেই রপ্তানিকৃত পোশাকের মোট মূল্যমান ছিল প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ রুপি। এর মধ্যে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লাখ রুপির কাপড় রপ্তানি করত ভারতের ইউরোপীয় বণিকরা। (ওই সময়কার দামের হিসেবে এই অঙ্কটা প্রায় ২০ লাখ পাউন্ডের সমান। ওই যুগে কিন্তু সপ্তাহে এক পাউন্ড আয় করতে পারা মানেই বড়লোক।) তা ছাড়া, ১৭৫৩ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে আরও ৬৫ লক্ষ রুপি মূল্যের সিল্ক রপ্তানি হতো। এর পরে তা কমে প্রায় ৫০ লক্ষ রুপিতে আসে। ইংরেজরা ১৭৫৭ সালের আগের ১০০ বছর স্রেফ বণিক ছিল, শাসক না। এই সময়টাতেই তাদের মাঝে বাংলার তৈরি পোশাক ও সিল্কের এত চাহিদা ছিল যে, এগুলোর উৎপাদন ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। ভারতীয় পোশাক শিল্প হয়ে ওঠে আরও সৃজনশীল, অভিনব ও উৎপাদনশীল। রপ্তানির রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু ব্রিটিশ বণিকরা যেদিন থেকে ক্ষমতা হাতে নেয়, সেদিন থেকে বদলে যায় সবকিছু।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে ব্রিটিশরা হয়ে ওঠে এককথায় নিষ্ঠুর। ব্রিটেন থেকে আনা পাউন্ড দিয়ে তারা আর পোশাক ও সিল্কের দাম চোকায় না, বরং বাংলা থেকে শুষে নেওয়া রাজস্ব দিয়েই মূল্য পরিশোধ করে চলে। কমিয়ে দিতে থাকে এগুলোর দাম। অন্য বিদেশি ক্রেতাদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় তারা। শুরু করে নিজেদের একচেটিয়া কারবার। তারা ভারতীয় তৈরি পোশাকের রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এতদিন যেসব বাণিজ্যপথ ছিল স্বাধীন ও অবাধ, সেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তারা। ব্রিটিশ পণ্যের উৎপাদন যত বেড়ে চলে, ততই তাদের বাড় বাড়ে। ভারতীয় তৈরি পোশাক ছিল অকল্পনীয় মাত্রায় সস্তা। এতই সস্তা যে, ব্রিটিশ উৎপাদকরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারত না। তাই তারা এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করে। তাদের আদেশ মান্য করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকেরা।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারা কিছু বাঙালি তাঁতির তাঁতযন্ত্র ভেঙে ফেলে। অন্তত একটি সামসময়িক উৎসে বলা হয়েছে যে, তাদের বুড়ো আঙুলও ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা আর এই কাজ করতেই না পারে। (লিখিত বর্ণনা একটি হলেও জনগণের দাবিমতে এমন ঘটনা অসংখ্য, তা সেই দাবি যতই অপ্রামাণ্য হোক না কেন।)[২০]

---

[২০] উইলিয়াম বোল্টস, কনসিডারেশানস অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স: পার্টিকুলারলি রেস্পেক্টিং দ্য প্রেজেন্ট স্টেইট অব বেঙ্গল অ্যান্ড ইটস ডিপেন্ডেন্সিজ, লন্ডন: জে. অ্যালমোন, প. এম্মস্লি, এবং ব্রাদার্টন অ্যান্ড সিউয়েল, ১৭৭২, পৃ. ৬।

তবে খোলাখুলি আক্রমণই একমাত্র পন্থা ছিল না। আরও সূক্ষ্ম ও আধুনিক কৌশলও ব্যবহার করেছে ব্রিটিশরা। ভারতীয় তৈরি পোশাক আর যে কটাও-বা টিকে ছিল, সেগুলোর ওপর শুল্ক ও ট্যারিফ আরোপ করা হয় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। ব্রিটেনে সেগুলোর রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় কাপড় আর সস্তা রইল না। ওদিকে ব্রিটেনের নতুন বাষ্পচালিত কারখানায় মারাত্মক সস্তা কাপড় উৎপাদিত হতে থাকে। এতই সস্তা যে, নিম্ন আয়ের বাঙালি কারিগররা পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি কামায়। বস্তায় বস্তায় সেসব সস্তা কাপড় এসে ভাসিয়ে দেয় ভারতের বাজারকে। ব্রিটিশ পণ্যের ওপর পালটা ট্যারিফ আরোপের ক্ষমতা ভারতীয়দের নেই। কারণ, বন্দর আর সরকার ব্রিটিশদেরই নিয়ন্ত্রণে। ব্যাবসার শর্তাবলি তারা নিজেদের সুবিধামতো তৈরি করে নেয়।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বিশ্বের তৈরি পোশাক বাণিজ্যের ২৫ শতাংশই ছিল ভারতের দখলে।[২১] কিন্তু ক্রমে সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কোম্পানির ঠোঁটকাটা প্রশাসক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক লিখেছেন, 'সুতা কারিগরদের হাড়গোড় দিয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছিল ভারতের ভূমি।'

ভারতে তবুও তুলা উৎপাদিত হতো, কিন্তু মূলত ব্রিটেনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে। দেশে আর সেগুলো তেমন একটা সেলাই বা কাটা হতো না। দক্ষ কারিগররা হয়ে গেলেন পথের ফকির। এই ধ্বংসযজ্ঞের এক করুণ চিত্র দেখা গেছে ঢাকায়। শহরটি একসময় মসলিন উৎপাদনের বিশাল কেন্দ্র ছিল। সেখানকার জনসংখ্যা ১৭৬০ সালে ছিল কয়েক লাখ। তারপর ১৮২০-এর দশকে তা পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছিতে নেমে আসে। (বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এখন যথার্থই আবারও হয়ে উঠেছে তৈরি পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধ সূতিকাগার।)

ওদিকে ভারতে ব্রিটিশ তৈরি পোশাকের রপ্তানি হুহু করে বেড়ে যায়। ফলে ১৮৩০ সালের মধ্যে বছরে ৬ কোটি গজ সুতি পণ্য আমদানি হতে থাকে ভারতে। আর ১৮৫৮ সালে সেই পাহাড় পরিমাণ অঙ্কটা দাঁড়ায় ৯৬ কোটি ৮০ লক্ষ গজে। ১০০ কোটির সীমারেখা পার হয় ১৮৭০ সালে। একেকজন ভারতীয় পুরুষ, নারী বা শিশুর বিপরীতে আমদানি করা হতো তিন গজেরও বেশি পোশাক।[২২]

---

[২১] পি. বাইরক এবং এম. লেভি-লেবোয়ার, (সম্পা.), 'দ্য মেইন ট্রেন্ডস ইন ন্যাশনাল একোনমিক ডিসপেয়ারিটিজ সিন্স দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশান' থেকে, ডিস্পেয়ারিটিজ ইন একোনমিক ডেভেলাপমেন্ট সিন্স দি ইডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশান, নিউ ইয়র্ক: ম্যাকমিলান, ১৯৮১।

[২২] জিন উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যার্ড: ব্রিটেন'স রাজ অ্যান্ড দ্য কেওস অব এম্পায়ার, লন্ডন: সায়মন অ্যান্ড শুস্টার, ২০১৬, পৃ. ৩২১।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতির ফলে কারিগরি শিল্প তো ধ্বংস হলোই, কিন্তু এর প্রভাব শুধু কারিগরদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি। শিল্পোৎপাদনে ব্রিটিশদের একচেটিয়া আধিপত্যের ফলে চাপ বাড়ে ভারতের কৃষিজমির ওপর। এত বেশিসংখ্যক ভারতীয় মানুষ কৃষিকাজে যোগ দেয়, যা এ দেশের কৃষিজমির ধারণক্ষমতার বাইরে। যে কৃষকরা আগে থেকেই এ পেশায় ছিল, তারা হয় ভুক্তভোগী। সাবেক কারিগররা হয়ে যায় কৃষক। মজুর বেড়ে যাওয়ায় কমে যায় মজুরির পরিমাণ। গ্রাম্য পরিবারগুলোয় নারীরা সেলাই ও চরকা কাটত। আর পুরুষেরা কাজ করত খেতে-খামারে। আচমকা দুজনের ওপরই আঘাত এসে পড়ে। যদি আবহাওয়া বা খরার কারণে কৃষিকাজে প্রভাব পড়ে, তাহলে এখন আর পোশাক সেলাই থেকে আপৎকালীন জীবিকা আসার সম্ভাবনা নেই। গ্রামাঞ্চলের এই দারিদ্র্যের দায় সরাসরি ব্রিটিশদের।

সাম্রাজ্যবাদীদের দাবি, ব্রিটিশদের নীতিমালা এখানে দায়ী নয়। ভারতীয় তাঁতশিল্পের পরাজয় ঘটেছে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব আর যন্ত্রপাতির কাছে। ঠিক একইভাবে ইউরোপ এবং বাকি বিশ্ব থেকেও হারিয়ে গেছে হাতে-বোনা পোশাক। ব্রিটিশদের কাছে যদি ভারত ক্ষমতা না হারাত, তাহলেও পঞ্চাশ বছর পর এমনিতেই ভারতের তাঁতিরা হারিয়ে যেত। তাদের জায়গা দখল করে নিত ভারতেরই পোশাক শিল্পকারখানা। তাই ভারতীয় তাঁতিরা আসলে প্রযুক্তিগত উন্নতির বলি হয়েছে।[২৩]

এটা মানা যায় যে, সময়ের পরিক্রমায় হাতে-চালানো তাঁতযন্ত্র আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারত না। মেশিন দিয়ে ব্যাপক হারে উৎপাদিত পোশাকের কাছে পরাজিত হতো তারা। তারপরও একটা সুনির্দিষ্ট বাজার তাদের দখলে থাকতই, যেমনটা আজও ভারতে রয়েছে। তা না হলেও অন্তত এই প্রক্রিয়াটা ঘটত স্বাভাবিক পন্থায়, ক্রমান্বয়ে এবং স্বাধীন ভারতে। হয়তো ব্রিটিশ পোশাক আমদানির ওপর আরোপিত থাকত বড় অঙ্কের ট্যারিফ। এতে করে আরও সুরক্ষা পেত ভারতের তাঁত। আর তখন বহু ভারতীয় উৎপাদক নিজেরাই আমদানি করে আনত সেই প্রযুক্তি। এতে করে তাদের পোশাক উৎপাদনের হারও বাড়ত। ওদিকে ভারতীয় শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও কম। এতে করে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে একটা দিক দিয়ে সুবিধা বেশি পেত তারা। খেলার মাঠ হতো সমানে সমান। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে সেই সাম্য বজায় থাকেনি। তাই তো ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারতীয় তৈরি

[২৩] এই যুক্তিটি দিয়েছেন বি. আর. টমলিনসন, দি একোনমি অব মডার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৭০–১৯৭০, দ্য নিউ ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, খণ্ড ৩, ৩, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬, পৃ. ১৫।

পোশাক হারিয়ে যাওয়ার করুণ গল্প শোনা যায়। তার জায়গা দখল করে নেয় ব্রিটিশ কাপড়।

তারপরও যেমনটা হওয়ারই কথা, ভারতীয় উদ্যোক্তারা নিজস্ব আধুনিক পোশাক কারখানা নির্মাণ করতে শুরু করে ১৮৫০ সালের পর। এমন পোশাক উৎপাদন করে, যেগুলো আমদানিকৃত ব্রিটিশ কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার ফলে নিউ ওয়ার্ল্ড (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ) থেকে তুলার জোগান আসা বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে অল্প সময়ের জন্য তুঙ্গে উঠে যায় ভারতীয় তুলা। কিন্তু আমেরিকান জোগান আবারও আসতে থাকে ১৮৬৫ সাল থেকে। তখন পুনরায় বিপদে পড়ে ভারত; এমনকি ১৮৯৬ সালে এসেও ভারতে পোশাকের মোট চাহিদার মাত্র ৮ শতাংশ উৎপাদিত হতো ভারতীয় কারখানায়। পরে ১৯১৩ সালে তা বেড়ে ২০ শতাংশ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হলে ভারতীয় পোশাক উৎপাদকরা ধীরে ধীরে দেশীয় বাজার পুনরায় দখল করতে শুরু করে। ১৯৩৬ সালে ভারতে বিক্রীত পোশাকের ৬২ শতাংশ উৎপাদন করত ভারতীয়রা। ব্রিটিশরা যতদিনে দেশ ছেড়ে যায়, ততদিনে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশ (১৯৪৫ সালে)।[২৪]

কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের অধিকাংশ সময়জুড়ে ভারতীয় উৎপাদনের গল্পটা ছিল বঞ্চনা, উৎখাত ও পরাজয়ের। ভারতীয় তৈরি পোশাকের সাথে যা ঘটে, তারই প্রতিফলন ঘটে চলে অন্যান্য খাতেও। সান্ডারল্যান্ড যে ভারতকে বলেছিলেন সুবিশাল উৎপাদক দেশ, সেই ভারতই একসময় হয়ে পড়ে নিতান্ত কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক। যেমন—কাঁচা তুলা, পাট, সিল্ক, কয়লা, আফিম, ধান, মশলা আর চা। ভারত এখন আর উৎপাদনও করে না, রপ্তানির তালিকায়ও তার উৎপাদিত পণ্যগুলো নেই। ফলে বৈশ্বিক রপ্তানিতে ভারতের দখল ২৭ শতাংশ থেকে নেমে আসে ২ শতাংশে। এই হলো ব্রিটিশ শাসনের ফল। কিন্তু ব্রিটেন থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ হয়ে যায় বেঢপ। কারণ, ভারতের ব্যাবসার পাল্লা ঘুরে গেছে। বিশ্বের প্রধান এক রপ্তানিকারক দেশ হয়ে গেছে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানিকারক। বিনা শুল্কে সেগুলো ঠেসে দেওয়া হচ্ছিল ভারতীয় বাজারের ওপর। গুণেমানে বা দামে যেসব ভারতীয় পণ্যের সাথে তারা ন্যায্য প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না, সেসবের গলা চেপে ধরে ব্রিটিশ আইন ও নীতিমালা।

---

[২৪] গুরচরণ দাস, ইন্ডিয়া আনবাউন্ড: ফ্রম ইন্ডিপেন্ডেন্স টু দ্য গ্লোবাল ইনফরমেশান এইজ, নিউ ইয়র্ক: আলফ্রেড এ. নপফ, ২০০১।

ভারতের বিশিল্পায়ন শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। আর পুরোদমে সম্পন্ন হয় ঊনবিংশ শতকে। বিংশ শতকে সেটাকে অল্প একটু ঘুরিয়ে দেওয়া গেছে শুধু। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯১৩ সালে ভারতের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল মাত্র ৩.৮ শতাংশ। তা সর্বোচ্চ ৭.৫ শতাংশে উঠে আসে ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে চলে যাওয়ার সময়। একইভাবে, ভারতের তৈরি পণ্যের রপ্তানিও হাঁচড়েপাঁচড়ে ৩০ শতাংশে উঠে আসে ১৯৪৭ সালে। ব্রিটিশ শাসন যখন শেষ হয়, তখন ভারতের ৩৫ কোটি মানুষের মাঝে মাত্র ২৫ লাখের রুটি-রুজি আসত আধুনিক শিল্পখাত থেকে।[২৫]

শোষণ, করারোপ ও হীরা

ব্রিটিশ শাসনের কুফল কিন্তু ওখানেই শেষ হয়ে যায়নি। শোষণের জন্য ব্রিটিশদের একটি প্রিয় কাজ হয়ে যায় করারোপ (আর করারোপের নাম করে চুরিচামারি)। ভারতের সাথে দুধেল গাভির মতো আচরণ করা হতো। ভারত থেকে লন্ডনের কোষাগারে যে পরিমাণ অর্থ বয়ে যেত, আর্ল অব চ্যাথাম সেটাকে বলেছেন 'এই জাতির নাজাত... যেন আসমান থেকে আসা নিয়ামত'।[২৬] ব্রিটিশরা ১৭৬৫ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে প্রতিবছর প্রায় ১,৮০,০০,০০০ পাউন্ড শোষণ করে নিয়েছে। লন্ডনে ফরাসি প্রতিনিধি কোমতে দ্য শেতলে লিখেছেন, 'ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের চেয়ে বড়লোক রাজা গোটা ইউরোপে আর নেই বললেই চলে।'[২৭]

কোম্পানির আরোপকৃত করের হার ছিল আয়ের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ। এটা এতই কষ্টকর যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ নিজেদের জমি ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। ডুরান্ট লিখেছেন, '[কর] খেলাপিদের খাঁচায় বন্দি করে রাখা হতো, গনগনে রোদে ফেলে রাখা হতো। পিতা সন্তানকে বিক্রি করে দিত করের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য'।[২৮] কর বকেয়া থাকা মানেই পরিশোধের জন্য মারধরের শিকার হওয়া, অভাগা ভুক্তভোগীর জমি ব্রিটিশদের হাতে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের

---

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

[২৬] ওউয়েন জোনস, 'উইলিয়াম হেইগ ইজ রং... উই মাস্ট ঔন আপ টু আওয়ার ব্রুটাল কলোনিয়াল পাস্ট', দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

[২৭] ডিউক অব শযুলের প্রতি চিঠি, তারিখ লন্ডন, ২৭ ফেব্রু. ১৭৬৮। এ.ই./সি.পি., অ্যাংলারেট, খণ্ড ৪৭৭, ১৭৬৮; উদ্ধৃত করেছেন সুদীপ্ত দাস, 'ব্রিটিশ রিয়্যাকশানস টু দ্য ফ্রেঞ্চ বাগবেয়ার ইন ইন্ডিয়া, ১৭৬৩–৮৩', ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি কোয়ার্টারলি, ২২ (১), ১৯৯২, পৃ. ৩৯–৬৫।

[২৮] ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জমিহীন কৃষক সৃষ্টি করে; জীবিকার চিরন্তন উৎস থেকে বঞ্চিত করে তাদের।

পরিহাসের ব্যাপার, অতীতের ভারতীয় শাসকরা কিন্তু কৃষকের কর দিয়ে সরকারি খরচ মেটাতেন না, বরং সেই আয় তারা আনতেন স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে। কোম্পানি তার লালসার বশে সেই রীতি থেকে নিদারুণভাবে সরে আসে।

দুর্নীতি যদিও ভারতে অপরিচিত কিছু ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ আমলে তা এক অতল গহ্বর সৃষ্টি করে ফেলে। ব্রিটিশরা যেহেতু ভারতীয়দের কাছ থেকে তাদের সাধ্যাতীত মূল্য দাবি করত, সেহেতু বাকিটুকু আদায় করা লাগত ঘুস, ডাকাতি এমনকি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার ১৯২৩ সালের সংস্করণে বলা হয়েছে, সবকিছু আর সবাই ছিল বিক্রয়যোগ্য।

রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক পলাশি যুদ্ধের বিজেতা, যিনি চূড়ান্তভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ঘটান বলে মনে করা হয়। তার মতো ঔপনিবেশিকরা যেন নিজেদের এহেন অর্থলোলুপতা ও দুর্নীতির ব্যাপারে একটুও লজ্জিত নন। প্রথমবার ইংল্যান্ডে ফেরত যাওয়ার সময় ক্লাইভ সাথে করে নিয়ে যান ২,৩৪,০০০ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় লুটের মাল (আজকের হিসেবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড, যার ফলে তিনি হয়ে যেতেন ইউরোপের অন্যতম ধনী ব্যক্তি)। 'Loot' একটি হিন্দুস্তানি শব্দ, যা ব্রিটিশরা তাদের অভ্যাসের পাশাপাশি ইংরেজি অভিধানেও আত্তীকরণ করেছে, অথচ নিজেদের প্রতি প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকত যে, আত্মসংযমের কারণে তারা এরচেয়ে বেশি চুরি করে আনেনি।

ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে আবার ভারতে আসেন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যান দুই বছর পরে। তখন তার সাথে ছিল আনুমানিক ৪০,০০০ পাউন্ড সম্পদ (বর্তমানের হিসেবে ৪ কোটি পাউন্ড)। 'উপহার' হিসেবে তিনি লক্ষ লক্ষ পাউন্ড গ্রহণ করেছেন। জনে জনে আরোপ করেছেন বার্ষিক প্রদেয় কর। পরাজিতদের কোষাগারের কোনো ঝকমকে রত্ন তার নজড় কেড়ে থাকলে সেটা হাতিয়ে নিয়েছেন। এসব করার পর ক্লাইভ ঘোষণা করেছেন: 'এক ঐশ্বর্যশালী নগরী আমার দয়ার ভিখারি। এর ধনিকতম ব্যাংকাররা আমার সন্তুষ্টি আদায়ের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে যায়। এমনসব ভল্টের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছি, যেগুলো হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছিল শুধু আমার জন্য। তাদের হাত ছিল স্বর্ণ আর রত্নের স্তূপে চড়া... যখনই ওই দেশটির বিস্ময়কর সম্পদভাণ্ডার নিয়ে ভাবি, সে তুলনায় আমি যে কত অল্প পরিমাণ

নিয়ে এসেছি, তাতে নিজের সংযম দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই।' ব্রিটিশদের এমনই কলিজা, তারা তাকে ডাকে 'ক্লাইভ অব ইন্ডিয়া', যেন তিনি এ দেশেরই কেউ, অথচ তিনিই উলটো এই দেশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে নিজের করে নিয়ে গেছেন।

ব্রিটিশরা ভারত থেকে কী পরিমাণ চুরিচামারি করেছে, সেটা পরিমাপ করার একটা সহজ মানদণ্ড আছে—ভারত থেকে অর্জিত সম্পদের প্রভাব স্বয়ং ইংল্যান্ডের ওপর কীভাবে পড়েছে, সেটা দেখলেই হবে। এ প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতকের রাজনীতি ও ইতিহাসবিদ লর্ড টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকাউলির নাম চলে আসে। ক্লাইভের জীবনী নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। সেখানে তিনি শুধু ক্লাইভের জীবন-মৃত্যুতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তার সাফল্যের কারণে আরও যেসব বড় পরিণতির দুয়ার খুলে গেছে, সেগুলোকেও সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করেছেন। (ম্যাকাউলি কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধী নন। বিভিন্ন পদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করেছেন তিনি। তার ভাষ্যমতে এটি 'বিশ্বের সবচেয়ে সেরা কর্পোরেশান'।) তার বাক্যবাণের মূল লক্ষ্য ছিলেন 'নাবোবগণ'। এই শব্দটি দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এমনসব চাকুরেকে বোঝায়, যাদের ভারতে এসে কপাল খুলে গিয়েছিল। সাত রাজার ধন নিয়ে তারা ফিয়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ডে।

তাদেরকে এই নামটা দিয়েছেন এডমান্ড বার্ক। কোম্পানির গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি। ফলে পার্লামেন্ট ১৭৮৮ সালে হেস্টিংসকে ব্যাপক দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে অভিশংসন মামলার মুখোমুখি করে। তো ম্যাকাউলি জানতেন যে, এই 'নাবোব' শব্দটি ভারতের রাকজীয় উপাধি 'নবাব'-এর ভুল উচ্চারণ। এই আসল নবাবদের সাথে কথিত 'নাবোব'দের পার্থক্যটা একদম উৎকট। নবাবরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের এবং মান্যগণ্য লোক, অথচ ইংল্যান্ডের এই নাবোবরা 'ভূঁইফোড় অবস্থা থেকে উঠে এসে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন...অসভ্যের মতো সেগুলো দেখিয়ে বেড়িয়েছেন... অপব্যয় করে সব উড়িয়েছেন'। 'আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াদের মধ্যে যেরকম ছ্যাবলামো ও জবরজং অবস্থা দেখা যায়', সেরকম আচরণ করেছেন। তারা 'তাজা ডিম থেকে পচা সবজি পর্যন্ত সবকিছুর দাম বাড়িয়ে ছেড়েছেন... তাদের জীবনযাত্রা ডিউকদের চেয়েও বেশি জাঁকালো... লর্ড মেয়রের চেয়েও উন্নত তাদের বাহন... তাদের আলিশান ও ব্যয়বহুল ঘরবাড়ি দেখে দেশের অর্ধেক মানুষ দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে গেছে... কিন্তু তাদের আস্তাবলে যতই ঘোড়া থাকুক, ঘরে যতই ভৃত্যের দল থাকুক, যতই চিনামাটির থালাবাসন থাকুক, হরিণের মাংস

আর বাগাড়ি মন্দ থাকুক, তবুও তারা ইতরের জাত'।[২৯]

ভারতবাসী ব্রিটিশদের জন্য টাকার পাহাড় গড়া কোনো ব্যাপারই ছিল না। কোম্পানির কর্মকর্তা রিচার্ড বারওয়েল ১৭৬৫ সালে বুক চাপড়ে তার বাবাকে বলেছেন, 'ভারত হলো [উন্নতির] এক নিশ্চিত মাধ্যম। খালি একটু মনোযোগ দিতে হবে, আর আপনি বোকার হদ্দ না হলেই হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অঢেল সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য এতটুকু যোগ্যতাই যথেষ্ট।'[৩০] এই নাবোবদের অনেকেই কোম্পানির কর্মকর্তা। কোম্পানির হয়ে কাজ করার পাশাপাশি তারা ব্যক্তিগত ব্যাবসায়ও জড়িত। এই ব্যাপারটা অসাধারণ লোভনীয় ছিল। ওই এলাকায় যদি কোম্পানির একচেটিয়া ব্যাবসা থেকে থাকে, তাহলেই হলো। কেউ যদি ২৫ শতাংশ মুনাফা কামাই করে থাকে, তাহলে সে গড়পড়তা ব্যবসায়ী। সাধারণত সবার আয় ছিল এরচেয়ে অনেক অনেক বেশি।

ভারতে পুত্রধনের কর্মজীবন মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন ক্লাইভের পিতা। তার পরিবারের কপাল যে ভারত-লুটের ওপর নির্ভরশীল, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। ছেলের উদ্দেশে ১৭৫২ সালে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'তোমার কাজকর্ম ও সাহসিকতার আলাপ এখন মানুষের মুখে মুখে। এখনই সময় তোমার ধনসম্পদ বাড়িয়ে নেওয়ার। দেশটি ছেড়ে আসার আগে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নাও।'[৩১] ছেলে তা করেছেনও বটে। পিতার ও নিজের জন্য পার্লামেন্টে আসন পর্যন্ত কিনে নিয়েছেন, অর্জন করেছেন জমিদারি (সেটা ছিল আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি ক্লেয়ারে। নিজের জমির নাম তিনি দেন 'প্লাসি' [পলাশি]।)

হুইগ রাজনীতিবিদ ও লেখক হোরেল ওয়ালপোল লিখেছেন: 'এখানে ছিল লর্ড ক্লাইভের হীরের তৈরি বাড়ি। এই হলো লেডেনহল স্ট্রিট। এই যে ভাঙা স্তম্ভটা দেখছেন, এটা এক ব্যবসায়ী কোম্পানির প্রাসাদের অংশ ছিল। সেই ব্যবসায়ীরা ছিলেন বাংলার শাসক! তারা একচেটিয়া ব্যাবসা ও

[২৯] হিস্ট্রোরিক্যাল এসেজ অব ম্যাকাউলি: উইলিয়াম পিট, আর্ল অব চ্যাথাম, লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যামুয়েল থার্বার (সম্পা.), বোস্টন: অ্যালিন অ্যান্ড বেকন, ১৮৯৪। এর পরের পাঁচ অনুচ্ছেদের তথ্যসূত্র টিলম্যান ডাব্লিও. নেখটম্যান, 'আ জ্যুওল ইন দ্য ক্রাউন? ইন্ডিয়ান ওয়েল্‌থ ইন ডমেস্টিক ব্রিটেন ইন দ্য লেইট এইটিন্থ সেঞ্চুরি', এইটিন্থ-সেঞ্চুরি স্টাডিজ, ২০০৭, খণ্ড ৪১ (১), পৃ. ৭১-৮৬।

[৩০] জেইমস হোল্‌যম্যান, দ্য নাবোবস ইন ইংল্যান্ড: আ স্টাডি অব দ্য রিটার্ন্ড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ১৭৬০-১৭৮৫, নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৬, পৃ. ২৭-২৮, উদ্ধৃত করেছেন নেখটম্যান, ২০০৭।

[৩১] রবার্ট ক্লাইভের প্রতি রিচার্ড ক্লাইভের চিঠি, ১৫ ডিসেম্বর ১৭৫২; ওআইওসি এমএসএস ইউরোপ জি৩৭/৩ উদ্ধৃত করেছেন নেখটম্যান, ২০০৭।

লুটপাটের মাধ্যমে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে মেরেছেন। নিজেদের জাঁকজমক আর বিলাসিতার ঠ্যালায় দেশেও একটা দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন প্রায়। তাদের সেই বিলাসিতার কারণে সবকিছুর দাম এমনভাবে বেড়ে যায় যে, গরীবরা একটা রুটি পর্যন্ত কিনতে পারত না!'[৩২]

ককরেল ভ্রাতৃদ্বয় জন ও চার্লস দুজনেই চাকরি করেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে।[৩৩] সেটা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কথা। কটসওয়াল্ডসের প্রাণকেন্দ্রে তারা ভারতীয় ঢঙে এক চোখজুড়ানো প্রাসাদ গড়ে তোলেন। তাতে ছিল পেঁয়াজ-আকৃতির সবুজ গম্বুজ, বিশাল বিশাল ছাতা, ছাদ থেকে ঝুলে থাকা ছাঁইচা[৩৪], মুঘল আমলের মতো বাগান, সর্পিল ঝরনা, একটা সূর্যমন্দির ও শিবলিঙ্গ। আর পুরো জমিকে পাহারা দিচ্ছে শিবের বাহন নন্দী ষাঁড়েরা। এদেরই তৃতীয় আরেক ভাই স্যামুয়েল পেপিস ককরেল একজন স্থাপত্যবিদ (ইনি কিন্তু ভাইদের মতো কখনো ভারতে যাননি)। তার নকশা-করা অট্টালিকা সেযিনকোট আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নাবোবদের লুটের মালের সাক্ষ্য হয়ে থাকা এক উৎকট স্মৃতিসৌধ যেন।

তবে ব্রিটিশ জনগণের কাছে তাদের সাম্রাজ্যের আসল প্রমাণ ছিল ভারতীয় হীরা। নাবোবরা নিজেদের সাথে করে ব্রিটেনে নিয়ে গেছেন সেগুলো। এগুলো ছিল নতুন ধরনের অর্থের নিশান। ব্রিটেন যে নিতান্ত একটা দেশ থেকে সাম্রাজ্যে পরিণত হচ্ছে, তার পরিচায়ক। কিন্তু পুরোনো টাকারা এই নতুন টাকাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। অনেক কর্তাব্যক্তিই চান না, ভদ্র ইংরেজদের হাত এই হীরে দিয়ে ময়লা হোক। হোরেস ওয়ালপোল নাক সিটকে ১৭৯০ সালে বলেছেন : 'ইংল্যান্ডের অবস্থাটা দেখেছেন? এটা এখন স্রেফ ভারতীয় সম্পদের নালা।' ওয়ালপোল চান, তার জাতির মানুষেরা 'আরও সদ্‌ভাবে' কাজ করার চেষ্টা করুক। 'বাংলার হীরে' দেশে নিয়ে এসে নাবোবরা যা করেছেন, তেমনটা না হোক। লিখেছেন, 'লর্ড ক্লাইভের সব হীরা' পেয়ে গেলেও তিনি ওরকম আচরণ করতে নারাজ।

বিখ্যাত কোহিনূর হীরা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর মুকুটকে আলোকিত করেছে। সাম্রাজ্যের অমূল্য নিশান হিসেবে ধন্য ধন্য করা হয়েছে একে।

---

[৩২] ম্যানের উদ্দেশে ওয়ালপোলের চিঠি, ৯ এপ্রিল ১৭৭২, উদ্ধৃত করেছেন হেনরি বি. হুইটলি, লন্ডন পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট: ইটস হিস্ট্রি, অ্যাসোসিয়েশানস, অ্যান্ড ট্র্যাডিশানস, লন্ডন: জন মারে, ১৮৯১, পৃ. ২।

[৩৩] www.sezincote.co.uk.

[৩৪] রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে জানালা ও দেয়ালকে বাঁচাতে ছাদের যে অতিরিক্ত অংশ দেয়ালের বাইরে বের করে রাখা হয়। কার্নিশ।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নাবোবদের হীরার পরিচয় শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এগুলোকে হিংসে আর আক্রমণ করা হতো। এগুলো এমনসব আমদানিকৃত বিদেশি জিনিস, যা দেশীয় ব্রিটিশদের বটুয়ায় চিমটি কাটতে শুরু করেছে—ব্রিটিশ রাজনীতিকে গোড়া থেকে পালটে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে তারা।

কোম্পানির যে চাকুরে প্রথমবারের মতো ভারতীয় হীরাকে সংবাদ শিরোনামে পরিণত করেছেন, তিনি সম্ভবত মাদ্রাজের গভর্নর টমাস পিট (এরই সাথে সাম্রাজ্যের পবিত্র নিশান হিসেবে ভারতীয় হীরার আসন পাকাপোক্ত হয়)। পিট ১৭০২ সালে একটি হীরার মালিক হন। (কথিত আছে, এজন্য তিনি মূল্য দিয়েছেন ২৪,০০০ পাউন্ড। এ এমন এক অঙ্ক, যা ৯৯ শতাংশ ইংরেজের নাগালের বাইরে।) এই হীরাকে বলা হয় 'সারা বিশ্বের অন্যতম চমৎকার রত্ন'। পিট এই ৪০০-ক্যারাটের জহরতটি জাহাজে করে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেন। নিজের লেখা চিঠিতে একে আখ্যায়িত করেন 'আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু' এবং 'আমার সর্বস্ব' হিসেবে।

হীরাটি সহিসালামতে ব্রিটেনে এসে ভেড়ার পরপরই পিট তার গভর্নরগিরি ছেড়ে দেন। কিনে নেন বিশাল এক জমি। পার্লামেন্টে একটা আসন বাগিয়ে নেন মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জন কেই আমাদের জানাচ্ছেন, 'মারাত্মক সব গুজব' ছড়িয়ে পড়ে পিটের হীরাকে ঘিরে। কখনো শোনা যায়, হীরাটি 'এক হিন্দু দেবমূর্তির চোখ থেকে খুলে আনা হয়েছে'। কেউ-বা বলে, 'একজন দাস এটি খনি থেকে চুরি করে নিজের ঊরুতে ক্ষত সৃষ্টি করে। তারপর সেই ক্ষতের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল হীরাটি। তার কাছ থেকেই এটি ছিনিয়ে আনা।' উইলকি কলিনস ১৮৬৮ সালে একটি উপন্যাস বের করেন, নাম দ্য মুনস্টোন। সেখানে চুরি-যাওয়া এক রত্নের কাহিনি আছে। পিটের হীরাও হয়ে ওঠে সেরকমই এক কিংবদন্তি। এটি ভারতের সুবিশাল সম্পদভান্ডারের প্রতিনিধি, ব্রিটেনের সম্পদ চষে বের করার ক্ষমতার প্রতীক, ভারতের ক্ষমতার সাথে করে আসা বিলাসিতার প্রতিচ্ছবি—বিশেষত সেই ক্ষমতার মালিক যদি হয় ব্রিটিশ।

এতদিন ধরে ব্রিটিশরা বিশ্বাস করে এসেছে যে, সম্পদ মানে জমির মালিকানা। জমি মানেই পৃথিবীতে একধরনের স্থিতিশীলতা, দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে থাকা। আর জমি যেহেতু দীর্ঘকাল মালিকের অধিকারে থাকে, সেহেতু মর্যাদার উঁচু-নিচুও নির্ধারিত হয় জমির ভিত্তিতে। সর্বোপরি, এখানে একটা স্থায়িত্বের অনুভূতি আছে। বণিক শ্রেণির উত্থানের ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। কিন্তু পিটের হীরা যেন এক নাটকীয় বিকল্প এনে

হাজির করে। নতুন ধাঁচের এই ধনাঢ্যতার মাধ্যমটাও খুবই রোমাঞ্চকর—ঔপনিবেশিক অত্যাচার না ঠিক, ঔপনিবেশিক অভিযান। এসব হীরার মালিকেরা গৎবাঁধা সম্পত্তির শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে। তারা এখন আর ধরাবাঁধা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে নয়, বরং ঔপনিবেশিক তৎপরতার জোরে সম্পদ হাসিল করে। ভারত থেকে হীরাটি নিয়ে আসার ১৫ বছর পর টমাস পিট সেটি রিজেন্ট অব ফ্রান্স, ডিউক ডি'অরলিয়ঁর কাছে বেচে দেন। লাভ করেন ১,৩৫,০০০ পাউন্ডের এক রাজকীয় অঙ্ক। যে দামে কিনেছিলেন, তার প্রায় ছয় গুণ। এই মহাজাগতিক রোজগারের (বর্তমানের হিসাবে কয়েক কোটি) বদৌলতে ইংরেজ সমাজে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায় পিটের পরিবার। এভাবে ভারতীয় হীরার ঘাড়ে লাফাতে লাফাতে জন্ম নেয় এক ব্রিটিশ রাজবংশ। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই সেখান থেকে উঠে আসবেন দুজন প্রধানমন্ত্রী—তার নাতি উইলিয়াম পিট, প্রথম আর্ল অব চ্যাথাম, এবং চ্যাথামের ছেলে, উইলিয়াম পিট 'দ্য ইয়াংগার'।

মোটকথা, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃত হচ্ছে, নাবোবদের টাকা তখন পালটে দিচ্ছে ব্রিটিশ রাজনীতিকে। দ্য জেন্টলম্যান'স ম্যাগাজিন-এর ১৭৮৬ সালের এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'কোম্পানি দৈবভাবে প্রতিবছর দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক নতুন ধাঁচের জেন্টলমেনকে নিয়ে আসে। তাদের থাকে নতুন ধাঁচের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ। তারা পুরাতন গ্রাম্য জেন্টলমেনদের জায়গায় আসীন হন।'[৩৫] বিপদটা হলো, এই নতুন লোকগুলো ব্রিটেনকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুলছেন। 'আমাদের সংবিধান পুরোদমে না হলেও যে ভীষণভাবে পালটে যাচ্ছে, তা একদম স্পষ্ট।' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ততদিনে স্রেফ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নেই। জন্মলগ্নের চার্টারের শর্তাবলি থেকে বেশ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে তারা। ব্রিটেনের কেউ কেউ এতে চিন্তিত ও সতর্ক হয়ে ওঠেন : তারা ক্লাইভকে পার্লামেন্টে হাজিরা দিতে বলেন, ভারতে তার কর্মকাণ্ড ও তার গড়ে-তোলা সম্পদভান্ডারের ব্যাপারে জবাবদিহিতা চায় তার কাছে। হেস্টিংসকে অভিশংসন করতে গিয়ে বার্ক কড়া ভাষায় বলেছেন : 'আজ গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ পরিষদ ভারতের আসামিদের বিচার করছে। আগামীকাল হয়তো ভারতের এই আসামিরাই গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ পরিষদ হয়ে যাবে।'[৩৬]

পিটের বংশধর আর্ল অব চ্যাথামের সরকার ১৭৬৬ সালে কোম্পানির ওপর

---

[৩৫] দ্য জেন্টলম্যান'স ম্যাগাজিন, খণ্ড ৫৬, ভাগ ২, লন্ডন: এ. ডড এবং এ. স্মিথ, ১৭৮৬, পৃ. ৭৫০।

[৩৬] ডালরিম্পল, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'।

সংসদীয় খবরদারি ফলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একদিকে তিনি নিজে ছিলেন অসুস্থ, আরেকদিকে বহু এমপি নিজেরাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার। তাই এই চেষ্টা খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখেনি, বরং ১৭৭৩ সালে যখন লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয়, তখন গিয়ে ভারতে কোম্পানির কর্মকাণ্ডের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ লাভ করে পার্লামেন্ট। কিন্তু তখনো বেশিরভাগ এমপি কোম্পানির মধু খেয়ে যাচ্ছেন। তারা এমনসব আইন পাশ করান, যেগুলো লাগাম টেনে ধরার বদলে উলটো আরও সুযোগ দেয়। উইলিয়াম পিট দ্য ইয়াংগার অবশেষে ১৭৮৪ সালে ভারত আইন পাশ করেন। প্রতিষ্ঠিত করেন একটি বোর্ড অব কন্ট্রোল। এই বোর্ডটি কোম্পানিকে আদেশ-নিষেধ করার ক্ষমতা রাখে। যেসব কাজ করে তার নিজের পূর্বপুরুষ বড়লোক হয়েছেন, সেগুলোর রাশ টেনে ধরার একটা ব্যবস্থা করলেন তিনি। কিন্তু সংস্কার নিয়ে যত কথাই হোক না কেন, কাজের কাজ হয়েছে কম। কেননা, ১৭৮৪ সালে লন্ডন ক্রনিকল এমন ২৯ জন সাংসদের নাম উল্লেখ করে, যারা সরাসরি ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কোম্পানির অংশীদারের সংখ্যা ছিল তারচেয়েও বেশি।

নাট্যকার রিচার্ড শেরিডান চাঁছাছোলা ভাষায় কোম্পানিকে ধুয়েছেন এই বলে যে, তাদের কর্মকাণ্ড হলো 'ফেরিওয়ালার নীচতা আর জলদস্যুর লাম্পট্যের সমন্বয়... ব্যাপারীর ছোট্ট হিসাবঘরে বসে ভাব ধরে যেন তারা রাজা-বাদশাহ। এক হাতে নকল রক্তাক্ত রাজদণ্ড ঘোরায়, আরেক হাতে পকেটমারি করে বেড়ায়।'[৩৭]

কোম্পানি কর্মকর্তারাও কিন্তু নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলাফল সম্পর্কে ভালোই ওয়াকিফহাল ছিলেন। জন শোর ওরফে ব্যারোন টিনমুথ ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন ১৭৯৩-৯৭ সাল পর্যন্ত। তিনি সেই ১৭৮৯ সালেই বলে গেছেন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে একইসাথে ব্যবসায়ী ও শাসক। 'প্রথম ভূমিকায় তারা ভারতের ব্যাবসা-বাণিজ্য দখল করে, আর দ্বিতীয় ভূমিকায় ভারতের রাজস্ব চুষে নেয়'।[৩৮] টিনমুথ দেখিয়েছেন কোম্পানির শোষণনীতি কতটা বৈষম্যপূর্ণ, কীভাবে দেশটির মুদ্রা (রুপা) আর সম্পদ চলে যাচ্ছে ইউরোপে, এর ফলে কীভাবে ধসে পড়ছে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অথচ কোম্পানি লুটপাট শুরু করার আগে সেটা কতই-না

---

[৩৭] আর. বি. শেরিডান, 'স্পিচ অন দ্য বেগামস অব ঔড, ফেব্রুয়ারি ৭, ১৭৮৭', উদ্ধৃত করেছে ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া: কন্ডেমড বাই দ্য ব্রিটিশ দেমসেল্ভস, প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি, লন্ডন, ১৯১৫, পৃ. ১৫।

[৩৮] ১৮ জুন, ১৭৮৯-এর সারমর্ম, উদ্ধৃত করেছে ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া: কন্ডেমড বাই দ্য ব্রিটিশ দেমসেল্ভস, প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি, লন্ডন, ১৯১৫, পৃ. ১৭।

সমৃদ্ধ ছিল।

কোম্পানি ভারতের বহু রাষ্ট্রনায়কের সম্পদ শুষে খেয়েছে। তারপর তাদের উৎখাত করে দিয়েছে তাদেরই নিজস্ব ভূমি থেকে। এইসব বেঈমানি, বিশ্বাসঘাতকতা আর লালসার অসংখ্য ঘটনা সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সবাই জানে। এজন্যই তো তখন ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিশংসিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। তিনি ছিলেন কোম্পানির দুর্নীতিবাজ গভর্নর-জেনারেলদের শিরোমণি। তাই সেসব গল্প আবারও এখানে উগরে দিতে গেলে বিরক্তিই বাড়বে শুধু। তবুও দুখানা উদাহরণ না দিলে না-ই হয়। প্রথমত, হেস্টিংস এক শাসকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুস নিয়ে পরে সেই ঘুসদাতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন (ভেবেই পাই না, তাকে ঘৃণা করব না প্রশংসা। কারণ, তিনি পয়সা নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বিকিয়ে যাননি)। দ্বিতীয়ত, হেস্টিংস ঔধের বিধবা বেগমদের নির্যাতন করতে করতে তাদের ধনভান্ডারের শেষ ফুটো পয়সাটা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছেন। তারপর কাউন্সিলকে অবগত করেন যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তিনি 'উপহার' হিসেবে পেয়েছেন ১০ লাখ রুপি (১,০০,০০০ পাউন্ড, যা তখনকার হিসেবে বেশ বড় মাপের সম্পদ)।[৩১] ওই উপহারটুকু নিজের জন্য রেখে দেওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা করেন তিনি। কাউন্সিল তো জানেই যে, কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে এরচেয়েও বড় অঙ্ক ঢুকতে চলেছে। তাই তারাও ত্বরিত অনুমতি দিতে একটুও কার্পণ্য করেনি।

হেস্টিংসের অভিশংসনে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখার সময় বার্কও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন যে, তাদের 'নির্মমতা অশ্রুতপূর্ব। এমনসব ধ্বংসযজ্ঞ তারা চালিয়েছে, যার জন্য নতুন নাম আবিষ্কার করতে হবে... এমনসব অপরাধ, যেখান থেকে লোভ-লাসলা, উচ্ছৃঙ্খলতা, দম্ভ, নির্মমতা, বিদ্বেষ, অহংকার ও অহমিকার মতো কোনো পাপই বাদ যায়নি'। ব্রিটিশদের নিয়োগকৃত খাজনা-সংগ্রাহকরা কীভাবে বাংলার নারীদের সম্ভ্রমহানি করেছে, বার্ক সেটার বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত মর্মভেদী ভাষায়—'তাদের টেনেহিঁচড়ে বাইরে আনা হয়েছে, জনসমক্ষে নগ্ন করে দেওয়া হয়েছে, চাবকানো হয়েছে সবার সামনে... তারা নারীদের স্তনবৃন্তে চোখা বাঁশের আগা গেঁথে দেয়, তারপর টান দিয়ে তা শরীর থেকে

[৩১] দ্রষ্টব্য বিচারকার্যের শুনানিতে ভয়াবহ বর্ণনা, নিকোলাস বি. ডার্কস, দ্য স্ক্যান্ডাল অব এম্পায়ার: ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশান অব ইম্পেরিয়াল ব্রিটেন, ক্যামব্রিজ, এমএ: বেলন্যাপ প্রেস/ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬; এবং পিটার জে. মার্শাল, দি ইম্পিচমেন্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫।

ছিন্ন করে আনে'।[৪০] শেরিডানের স্ত্রী এই বর্ণনা শুনে আতঙ্কে পার্লামেন্টের ভেতরেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। ধরাধরি করে বের করে নিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। শেরিডান ও চার্লস জেইমস ফক্সের শ্রুতিমধুর ও গমগমে কণ্ঠ থেকে তারপর বেরিয়ে এসেছে এরকম আরও অনেক অভিযোগ। কিন্তু শেষমেশ হেস্টিংসকে খালাস দেওয়া হয়। ব্রিটিশ জনগণের চোখে উঁচু করে তুলে ধরা হয় সাম্রাজ্যবাদকে। অজুহাত খাড়া করানো হয় আরও ১৫০ বছর যাবৎ এসব ডাকাতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু সমস্যা শুধু হেস্টিংসেই সীমাবদ্ধ না। সেটার পরিধি আরও অনেক দূর বিস্তৃত। ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম হাউইট ১৮৩৯ সালে (কোম্পানি তখনো ক্ষমতায়) আফসোস করে বলেছেন, 'গোটা ভারতের সব মানুষের ওপর আমাদের হাত দিয়ে যত শোষণ ও লুটপাট হয়েছে, তা মানব-ইতিহাসের জঘন্যতম এক ঘটনা... সেখানে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, একটাই স্বার্থ সে দেশে অবস্থান করার। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের একচ্ছত্র লুটতরাজের পবিত্র ভূমি বানিয়ে নেওয়া হয়েছে একে। সর্বনাশ করে ছাড়া হয়েছে তাকে। সরকারে যার পদ যত বড়, তার দুর্নীতি তত ভয়ানক। তাই যারা নিচের পদে আছে, তাদের লাগাম টেনে ধরার জন্যও কেউ নেই... কী প্রশাসনিক, কী সামরিক, কী বাণিজ্যিক, প্রতিটি বিভাগের প্রতিটা মানুষ এসব চোখধাঁধানো উপহারের কোনো-না-কোনো অংশ পাচ্ছে।'[৪১]

এমনকি লর্ড ম্যাকাউলি (যিনি কোম্পানির ব্যাপারে খুবই উঁচু ধারণা রাখতেন বলে আমরা জেনেছি, এমনকি কয়েক বছর কোম্পানির কর্মীও ছিলেন) পর্যন্ত মর্মাহত হয়ে লিখেছেন, 'ইংরেজদের অপশাসন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যার অধীনে কোনো মানবসমাজ টিকে থাকতে পারে না... কোম্পানির কর্মীরা ভারতীয়দের বাধ্য করে বেশি দামে কেনা এবং কম দামে বেচার জন্য... কলকাতায় তাই অল্প সময়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে, বিপরীতে তিন কোটি মানবপ্রাণী চলে যায় বঞ্চনার চরম প্রান্তে। এরকম স্বৈরাচারী শাসনে বাস করার মতো কোনো অপরাধই তারা করেনি...।'[৪২] ম্যাকাউলি আরও বলেছেন, মাজলুম জনগণ জালিম শাসনযন্ত্রকে উৎখাত করার অধিকার রাখলেও ইংরেজদের অত সহজে টলানো যায়নি। যিনি এই কথাগুলো বলছেন,

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] উইলিয়াম হাউইট, দি ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন: লংম্যান, ওর্ম, ব্রাউন, গ্রিন, অ্যান্ড লংম্যানস, ১৮৩৯, পৃ. ৪২–৪৩।

[৪২] টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকাউলি, এসেজ: ক্রিটিকাল অ্যান্ড মিসেলানিয়াস, লন্ডন: ক্যারি অ্যান্ড হার্ট, ১৮৪৪।

তিনি একজন উদারপন্থি ইংরেজ, নিজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন কারিগর। সামনেই তিনি আমাদের আরও দুঃখ দিতে চলেছেন, অথচ তার কাছ থেকেই যখন এহেন সমালোচনা ছুটে আসে, সেটাকে অস্বীকার করা অসম্ভব।

রাজস্ব সংগ্রহ ও সম্পদ পাচার

ব্রিটেনে একই সময়ে দুটো বিপরীতমুখী ঘটনা ঘটে চলছিল। একদিকে হাউজ অব কমন্সে ভারত নিয়ে যত বিতর্ক হতো, তার প্রায় পুরোটা জুড়ে থাকত ভারত-থেকে-আসা খাজনার পরিমাণ।[৪৩] ওটাই অনেকের কাছে অজুহাত হিসেবে যথেষ্ট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যত ধরনের অনাচার করছে, সব নাকি তাতে জায়িয হয়ে যায়। আরেক দিকে সামসময়িক পর্যবেক্ষকরা ভয়ে কেঁপে উঠছেন এই দেখে যে, তাদের দেশের নামে কীসব অত্যাচার-অবিচার চলছে। এই দুই বিপরীত ঘটনা থেকে অনেককিছু বোঝার আছে।

মাননীয় বিশোপ রেজিনাল্ড হেবার (যিনি মূর্তিপূজার প্রতি এতই বিতৃষ্ণা পোষণ করতেন যে, এক বিখ্যাত কবিতায় শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে লিখেছেন 'যেথায় সব জিনিসই মনকাড়া/শুধু মানুষেরাই নীচ') ১৮২৬ সালে লিখেছেন, 'কোম্পানির শাসনাধীন প্রদেশগুলোর কৃষকদের অবস্থা মানবেতর, দারিদ্র্য ও হতাশায় ক্লিষ্ট। দেশীয় শাসকদের প্রজারা সে তুলনায় সার্বিকভাবে ভালো আছে।'[৪৪] বাংলার এক ব্রিটিশ প্রশাসক ছিলেন এফ.জে. শোর। তিনি ১৮৫৭ সালে হাউজ অব কমন্সের কাছে এক অনন্য স্বীকারোক্তি পেশ করেন। 'ইংরেজদের মূলনীতি হলো নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ে গোটা ভারতীয় জাতিকে পরাধীন করে রাখা। সর্বোচ্চ যে পরিমাণ খাজনা আদায় করা সম্ভব, ততটুকুই আদায় করা হচ্ছে তাদের থেকে। যতগুলো প্রদেশ আমাদের হাতে এসেছে, সবগুলোকেই শোষণের ময়দানে পরিণত করা হয়েছে। একটার চেয়ে আরেকটা বেশি। দেশীয় শাসকদের তুলনায় আমরা খাজনার পরিমাণ কত বাড়াতে পেরেছি, তা নিয়ে রীতিমতো গর্ব করে বেড়াই আমরা।'[৪৫]nav

---

[৪৩] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই ১৮০৬-তে ভারতের বাজেট নিয়ে কমিটি অব দ্য হাউজ অব কমন্সে স্যার আর্থার ওয়েলসলির প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ, ব্রিস্টোল সিলেক্টেড প্যামফ্লেটস, ১৮০৬, ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টোল লাইব্রেরি।

[৪৪] কর্নাটক থেকে মাননীয় চার্লস ডাব্লিও. উইনের কাছে বিশোপ হার্বারের লিখিত চিঠি, মার্চ ১৮২৬, উদ্ধৃত করেছে ব্রিটিশ রুল কনডেমড বাই দ্য ব্রিটিশ, পৃ. ২৪।

[৪৫] মাননীয় এফ. জে. শোর, নোটস অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স, খণ্ড ২, লন্ডন ১৮৩৭, পৃ. ৫১৬, উদ্ধৃত করেছেন রমেশ চন্দ্র দত্ত, দি একোনমিক হিস্ট্রি ইন্ডিয়া আন্ডার আর্লি ব্রিটিশ রুল: ফ্রম দ্য রাইজ

ওসব 'দেশীয় শাসকে'র অনেকেই আজকের জাতিসংঘ সুশাসন পদক লাভের যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু কোম্পানির শাসন ছিল এরচেয়েও জঘন্য, যেটা শোর নিজেই স্বীকার করছেন। ব্রিটিশরা যেসব জায়গা সরাসরি শাসন করত না, সেখানে বসাত নিজেদের অনুগত ও বাধ্য শাসক। ওসব রাষ্ট্রকে বলা হতো 'প্রিন্সলি স্টেইট'। এসব শাসককে সিংহাসনে বসানো এবং শত্রুরাষ্ট্র থেকে নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে তাদের থেকে অঢেল পরিমাণ 'পারিশ্রমিক' আদায় করা হতো। মাফিয়ারা যেভাবে 'প্রোটেকশান মানি' আদায় করত, সেটারই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যীয় সংস্করণ। (ব্রিটিশরা অবশ্য সেটাকে আরও গালভরা নাম দিয়ে ডাকে 'মৈত্রী ভরতুকি'।) এই শাসকরা ছিলেন কোম্পানির মিত্র। নিরাপত্তার জন্য তাদের রাজ্যে যে ব্রিটিশ সেনাদের নিয়োগ করা হতো, তাদের জন্য দু-হাত খুলে খরচ করতেন শাসকেরা। যদি না দেন, তাহলে কিন্তু এই সেনারাই তাদের কাল হয়ে দাঁড়াবে।

যেমন—ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের হায়দ্রাবাদ। তৎকালীন ক্ষমতাসীন নিযামকে ব্রিটিশদের খবরদারি মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। জোর করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয় তাকে দিয়ে। সেটার খরচের বেঢপ আকৃতিও নির্ধারিত করে দেয় কোম্পানি নিজে (যেমন: কমান্ডার একাই পেতেন মাসে ৫,০০০ পাউন্ডের মতো মোটা অঙ্ক)। ব্রিটিশদের পাওনা সকল বেতন-ভাতা তার কোষাগার থেকে কাটা হতো। পরে সেই টাকাই ঋণ হিসেবে দেওয়া হতো ২৪ শতাংশ সুদে। তাও আবার এমন এক ব্যাংক থেকে, যেটার প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর-জেনারেলের এক সহযোগী। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ সালে। কোন ফাঁকে দিয়ে যে ব্যাংকের কাছে তার কোটি টাকা ঋণ হয়ে গেল, নিযাম সেটা টেরই পেলেন না। এখান থেকেই প্রবাদ চালু হয়ে যায়, 'সবার খরচ বেচারা নিযির ঘাড়ে'।[৪৬] আরও দক্ষিণ দিকের এলাকা আরকাদু। সেখানে একই রকম নিয়ম করে নবাবকে একদম পায়ে পিষে ফেলা হয়েছে। কোম্পানির কাছে 'ঋণ' তার সাধ্যের এতই বাইরে চলে যায় যে, জরিমানা হিসেবে নিজের বেশিরভাগ এলাকা ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেন তিনি।

কোম্পানির খবরদারিতে খাজনা সংগ্রহ করার অধিকার তো আগেই আদায় করা হয়ে গেছে। এবার ব্রিটিশরা ভারতীয় কৃষকদের নিংড়ে সব রস বের করে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। একদিকে গ্রামাঞ্চল থেকে খাজনা সংগ্রহের জন্য তাদের হাতে লোকবল খুবই কম, আরেক দিকে তারা এই প্রতিনিধিদের ওপর পুরোপুরি

অব ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ১৭৫৭ টু দি অ্যাসেশান অব কুইন ভিক্টোরিয়া ইন ১৮৩৭, লন্ডন: কে. পল, ট্রেঞ্চ, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং লি:, ১৯২০।

[৪৬] দ্রষ্টব্য জন যুবরচিকি, দ্য লাস্ট নিযাম, নয়াদিল্লি: পিকাডোর ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃ. ৩৪।

বিশ্বাসও করে না। তাই খাজনা সংগ্রহের জন্য কঠিন কঠিন লিখিত নিয়ম তৈরি হতে থাকে। স্থানীয় নেতারা স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। খরা বা ফলন হ্রাস হয়ে থাকলে সেগুলোর জন্য যথাযথ ছাড় দিতেন তারা। এমনকি কৃষকদের পারিবারিক সংকটের কথাও বিবেচনায় নেওয়া হতো, যেমন কোনো সদস্যের মৃত্যু বা বিয়ে। কিন্তু এখন ব্রিটিশ খাজনা-সংগ্রাহকরা চলে বইয়ের নিয়মে। স্থানীয় সমস্যাগুলো নিয়ে দরকষাকষি বা বোঝাপড়া করা তো দূরের কথা, একটু দম ফেলার সুযোগটা পর্যন্ত নেই। 'নতুন এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো ভারতের স্থানীয় অভিজাতদের সাথে সমঝোতা না করেই কোম্পানির খাজনা সংগ্রহ নিশ্চিত করা...। মুখোমুখি আলাপের জায়গা দখল করে নেয় লিখিত নিয়মকানুন। এসব নিয়মের দাবি হলো, জমিদাররা প্রতিমাসে একদম ঠিকঠিক সময়মতো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবেন, কোনো ঝামেলা পাকাবেন না...। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের রাজনীতিতে এই মুখোমুখি আলাপ ও সমঝোতার বিষয়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটাকে পাত্তাই দেওয়া হয়নি। ফলে যে অঞ্চলটি একসময় ছিল সম্পদে পরিপূর্ণ, সেটি দারিদ্র্য ও ধ্বংসের শিকার হয়।'

ব্রিটিশরা তিন রকমের খাজনাপদ্ধতি চালু রাখে: পূর্ব ভারত ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এক-তৃতীয়াংশে ছিল জমিদারি; দক্ষিণের বেশিরভাগ ও উত্তরের কিছু অংশে রায়াতওয়ারি; আর পশ্চিম ভারতে মহলওয়ারি। জমিদারি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন করে ব্রিটিশরা। আগে ভারতীয় চাষিরা উৎপাদিত ফসলের ভিত্তিতে একটা অংশ খাজনা দিত। কিন্তু নতুন এই ব্যবস্থায় খাজনা দিতে হবে ওই জমির জন্য প্রদেয় ভাড়ার হিসেবে। তার মানে, ফলন যদি নাও হয়, তাহলেও খাজনা মাফ নেই। মাঝে মাঝে ব্রিটিশরা জমির আসল দামের ভিত্তিতে না, সম্ভাব্য দামের ভিত্তিতে খাজনা নির্ধারণ করত। ফলে জমির মোট উৎপাদনের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যেত সেটা। রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি অঞ্চলগুলোয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়নি, বরং নিয়মিতভাবে সংশোধন ও বৃদ্ধি করা হতে থাকে খাজনার পরিমাণ। সেটার ফলাফল হয় আরও গুরুতর। বিষয়টাকে আরও জটিল করে তোলে খাজনা পরিশোধের পদ্ধতি।

সবখানেই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের হাতে খাজনা তুলে দিতে হতো নগদ অর্থ আকারে (কৃষক নিজে গিয়ে দিক অথবা জমিদারের মাধ্যমে পাঠাক)।[৪৭] শস্যের মাধ্যমে দেওয়া যাবে না। তার ওপর ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত সবখানেই

[৪৭] দ্রষ্টব্য সুগত বসু, পিজ্যান্ট লেবার অ্যান্ড কলোনিয়াল ক্যাপিটাল, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩।

রাজস্ব বা ভাড়ার নিয়ম জারি ছিল। এরপর থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত ঋণের নাম করে আরও বেশি পরিমাণ আদায় করা হতো কৃষকদের কাছ থেকে। উইলিয়াম ডিগবির হিসাবমতে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরের জেলাগুলোর রায়তরা [কৃষকরা] বর্তমানে বছরে যতটুকু খেতে পায়, সেটা তাদের দাদাদের প্রজন্মের তুলনায় অর্ধেক। আর প্রপিতামহের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ। তা সত্ত্বেও একদম জোরাজুরি করে ভূমিকর আদায় করে ছাড়া হয়। শস্য গোলায় ওঠার আগেই সরকারের হাতে কর দিয়ে আসতে হয় মুদ্রা আকারে!'[৪৮]

বিশোপ হেবার ১৮২৬ সালে স্বীকার করেছেন, 'আমরা যে পরিমাণ ভাড়া দাবি করি, কোনো দেশীয় শাসক অতটা করেন না।' অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে একদম শুরুর দিকের এক কণ্ঠস্বর ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত। অতীতের কিছু মুসলিম শাসকও যে প্রকাণ্ড খাজনা দাবি করতেন, সেটা স্বীকার করে নিয়েই তিনি দেখিয়েছেন 'পার্থক্যটা হলো, মোহাম্মদীয় শাসকেরা যে পরিমাণ দাবি করতেন, সে পরিমাণ কখনোই পুরোপুরি আদায় করতে পারেননি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা যা দাবি করেন, সেটা জযবা-সহকারে আদায় করে ছাড়েন।'[৪৯] ভারতে আরোপিত ভূমিকরের পরিমাণ ছিল ভাড়ার তুলনায় গড়ে ৮০-৯০ শতাংশ। ত্রিশ বছরের মধ্যে শুধু বাংলার ভূমিরাজস্বের পরিমাণই ৮,১৭,৫৫৩ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬,৮০,০০০ পাউন্ড।

খাজনা যদি সরকারি পণ্য বা সেবা আকারে কৃষকদের কাছেই আবার ফেরত যায়, সেক্ষেত্রে কিছু অংশ মওকুফ করা হতো বটে। কিন্তু এমনিতে খাজনা পাঠিয়ে দেওয়া হতো লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের কাছে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ভারতীয় অর্থনীতিকে পিষে মারতে থাকে। ধ্বংস করে দেয় ভারতের কৃষিকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে করের বোঝা আর জীবনযাত্রার অবস্থা এতই দুঃসহ ছিল যে, মানুষ যেভাবে পারছিল বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, আশ্রয় নিচ্ছিল কোম্পানি শাসনের বাইরের কোনো এলাকায়। পক্ষান্তরে 'স্বদেশি রাষ্ট্র' থেকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ভারতীয়দের স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা তেমন একটা পাওয়াই যায় না ঊনবিংশ শতকে।

ভারতীয়রাও একে অপরের ওপর নানা ধরনের কুসংস্কার ও সামাজিক

---

[৪৮] এইচ. এম. হাইন্ডম্যান, দ্য রুইন অব ইন্ডিয়া বাই ব্রিটিশ রুল: বিয়িং দ্য রিপোর্ট অব দ্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশান টু দি ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেজ অ্যাট স্টুটগার্ট, লন্ডন: টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি প্রেস, ১৯০৪, উদ্ধৃত করেছে হিস্টোইরি দ্য লা আইল ইন্টারন্যাশনালি, খণ্ড ১৬, জেনেভা: মিনকফ রিপ্রিন্টি, ১৯৭৮, পৃ. ৫১৩–৩৩।

[৪৯] চন্দ্র দত্ত, দি একোনমিক হিস্ট্রি, পৃ. ১১–১২।

নিপীড়নের চর্চা করত। কিন্তু যতক্ষণ তারা খাজনা দিচ্ছে, ততক্ষণ সেসবের দিকে ভ্রূক্ষেপও করত না কোম্পানি। এসব খাজনা আরোপ করার কারণ হিসেবে বলা হতো শহরের উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, খাল খনন, জলাধার ও দুর্গ তৈরির কথা। কিন্তু (পার্লামেন্টে বার্ক যেমনটি বলেছেন) সেসব কাজ কিছুদিন পরেই বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যেত। ওদিকে খাজনা আরোপ চলতে থাকত আগের মতোই। হাউজ অব কমন্সের একটি কমিটি ঘোষণা করেছে, 'গোটা রাজস্বব্যবস্থা সরকারি কর্মকর্তাদের পকেট ভারি করতে থাকে শোষণ ও অনাচারের মাধ্যমে।' পক্ষান্তরে 'রায়তদের ঝুলিতে অতটুকুই বাকি থাকত, যতটুকু তারা কোনোরকমে সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে।'[৫০]

রায়তওয়ারি আর মহলওয়ারি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়। তা হলো সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বাতিলকরণ। সেটা ধনাঢ্যদের ওপর যেমন প্রযোজ্য, তেমনই কৃষক শ্রেণির ওপরও। শত শত বছর ধরে ভূমির সাথে মানুষের যে বন্ধন ছিল, সেই ঐতিহ্য এবার ধূলিসাৎ হয়ে যায়।[৫১] আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, পিটের ভারত আইন পাশ হয় ১৭৮৪ সালে। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারত থেকে রাজস্ব সংগ্রহের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়। বাংলার জমিদাররা বংশানুক্রমে জমির মালিক ছিলেন। ব্রিটিশরা সেটাকে উপেক্ষা করে নিলামের মাধ্যমে সেসব জমি বিক্রি করতে শুরু করে, যাতে কোম্পানির আয় বাড়ানো যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যতদিন ক্ষমতায় ছিল, ততদিন তাদের মুনাফা আকাশসম হয়ে যেতে থাকে। তার অংশীদাররা মুনাফা পেত ঐতিহাসিক পরিমাণে। পুঁজিবাজারে কোম্পানির অংশীদারি পাওয়াটা পরম আরাধ্য হয়ে ওঠে ব্রিটিশ বিনিয়োগকর্তাদের কাছে। এসব অব্যবস্থাপনা ও অত্যাচারের চূড়ান্ত ফল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। বহু ভারতীয় ইতিহাসবিদ একে প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেন, কিন্তু ব্রিটিশরা একে খাটো করার জন্য নাম দিয়েছে 'সিপাহি বিদ্রোহ'। তখন ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষ ভারতের প্রশাসনকে নিজ হাতে তুলে নেয়, যে ভারত ছিল মহামান্য ব্রিটানিক রানির বিশাল সাম্রাজ্যের 'মুকুট শিরোমণি'। তবে সেজন্য কোম্পানিকে যথাযথ ক্রয়মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই দামটা আবার যোগ করে দেওয়া হয়েছে ভারতের সরকারি ঋণের ভেতরে। এবার সেই জরিমানা পরিশোধ করার দায়িত্ব স্বয়ং ভুক্তভোগী ভারতীয় জনতার ঘাড়ে এসে পড়ে (এতে আসল

[৫০] উদ্ধৃত করেছেন হাউইট, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ১০৩।

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিশাল সুদের হার)।

লক্ষ্য কিন্তু একই আছে—ব্রিটেনের বৃহত্তর কল্যাণ। ভারত থেকে সম্পদ শোষণ করাটা খোলাখুলিভাবেই ব্রিটিশ নীতিমালার অংশ হয়ে থাকে। মারকুইস অব স্যালিসবারি ১৮৬০ থেকে ৭০-এর দশক পর্যন্ত ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেইট হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি দারুণ এক রূপকের মাধ্যমে বলেছেন : 'ভারতকে রক্তাক্ত করার সময় এমনসব অঙ্গে চাকু চালাতে হবে, যেখানে রক্ত বেশি... [সেসব জায়গায় না] যেগুলো রক্তস্বল্পতায় ধুঁকছে।'[৫২] 'রক্ত' মানে অবশ্যই টাকা। রক্তে টইটম্বুর এলাকাগুলো যত রাজস্ব উৎপাদন করতে পারবে, ধুঁকতে-থাকা এলাকা অতটা পারবে না। (স্যালিসবারি পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।)

সেসিল রোডস প্রকাশ্যে বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের বেকার শ্রমিক শ্রেণির ক্ষুধা নিবারণের আসল সমাধান হলো সাম্রাজ্যবাদ। কারণ, বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য জমির ব্যবস্থা করা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনায়কদের দায়িত্ব। ব্রিটিশ কারখানায় যেসব পণ্য উৎপন্ন হয়, সেগুলোর বাজার তৈরি করাও তাদেরই কাজ।[৫৩] ভারতীয় ধর্মগুরু, সংস্কারক ও চিন্তাবিদ স্বামী বিবেকানন্দের চোখে ব্রিটিশরা বৈশ্যদের মতো। ব্যাবসায়িক হিসাবনিকাশ আর অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে আর কিছু বোঝেই না তারা। তারা ভারতে-পাওয়া সবকিছুর দাম বোঝে, কিন্তু কোনোকিছুর মূল্য বোঝে না। বাঙালি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজদের ব্যাপারে লিখেছেন 'যারা নিজেদের লোভ সম্বরণ করতে জানে না' এবং যাদের শব্দভান্ডার থেকে 'নৈতিকতা শব্দটি উধাও হয়ে গেছে'।[৫৪]

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে হতে ভারত হয়ে ওঠে ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ আয়ের উৎস। ব্রিটিশ রপ্তানিপণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতাও ভারত। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী ও সৈনিকদের সবচেয়ে ভালো চাকরির বাজারও ভারত। তাও আবার সবই ভারতের নিজস্ব খরচে। ভারতীয়রা আক্ষরিক অর্থেই অত্যাচারিত হওয়ার বিনিময়ে পয়সা দিচ্ছিল।

খাজনার ব্যবস্থা অসহনীয়ই রয়ে যায়। কৃষিজ খাজনার পরিমাণ মোট উৎপাদনের কমপক্ষে অর্ধেক। নিজের ও পরিবারের ক্ষুধা নিবারণে কৃষকের যতটুকু শস্য দরকার, ততটুকু তার কাছে থাকে না। অ-ব্রিটিশ শাসনের

---

[৫২] ব্রিটিশ রুল কনডেমড, পৃ. ৬–৭।

[৫৩] ন্যারেটিভস অব এম্পায়ার: দ্য ফিকশানস অব রুডইয়ার্ড কিপলিং, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ৭।

[৫৪] তপন রায়চৌধুরী, ইউরোপ রিকনসিডার্ড: পারসেপশানস অব দ্য ওয়েস্ট ইন ১৯থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৫।

তুলনায় এখন দ্বিগুণ বা তিনগুণ খাজনা দেয় তারা। পৃথিবীর আর কোনো দেশই হয়তো এত বেশি খাজনা দেয় না। আর এসব হিসাব জানিয়েছে স্বয়ং ব্রিটিশরাই। প্রতিটি ব্রিটিশ 'প্রেসিডেন্সি' বিপুল অঙ্কের 'সঞ্চয়' প্রেরণ করে ইংল্যান্ডে। ইংরেজ সরকারি কর্মচারী, বণিক ও সৈনিকদের ভারতে কর্মসংস্থান তো আছেই। (একেকজন ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীকে দায়িত্ব পালন করতে হয় মোটে ২৪ বছর। এর মধ্যে আবার মাঝখানে মাঝখানে মোট চার বছরের লম্বা লম্বা 'হোম লিভ' রয়েছে। তারপর সে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যায় ভারতীয় করদাতাদের টাকায় বিশাল অবসরভাতা নিয়ে। র‍্যামজে ম্যাকডনাল্ড ১৯২০-এর দশকে হিসাব করে দেখিয়েছেন, প্রায় ৭,৫০০ ইংরেজ মিলে ভারত থেকে বার্ষিক প্রায় ২ কোটি পাউন্ড অবসরভাতা পাচ্ছে।)

একদিকে যখন ব্রিটিশ উপার্জন ফুলে ফেঁপে উঠছে, আরেক দিকে তখন গুণোত্তর হারে বাড়ছে ভারতের জাতীয় ঋণ। ভারতের অর্ধেক রাজস্ব ভারতের বাইরে চলে যায়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। আপাতদৃষ্টে ভারতের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি। তাদের খরচাপাতি তো ভারতীয় কর থেকে মেটানো হতোই, এর বাইরেও ছিল আরও নানান কিসিমের বৈদেশিক ঔপনিবেশিক অভিযান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধির জন্য বার্মা থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত সেসব যুদ্ধ পরিচালিত হতো। যেমন: ১৯২২ সালে ভারত সরকারের মোট রাজস্বের ৬৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে বিদেশে+ নিয়োজিত ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পেছনে। ডুরান্টের পর্যবেক্ষণমতে, পৃথিবীর আর কোনো সেনাবাহিনী সরকারি রাজস্বের এত বিশাল অংশ খেয়ে শেষ করে না।[৫৫]

এমন নির্লজ্জ তরিকায় ভারতের সম্পদ পাচার করা হতো, যাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। এমনকি হিসাব-ছকেও কথা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে লেখা হতো, যাতে শোষণের বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়া যায়। ব্যাবসায়িক হিসাব থেকে দেখা যেত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ উদ্‌বৃত্ত আছে। তারপরও 'দেশীয় খরচ' ও 'অন্যান্য অদৃশ্য ব্যয়ে'র নাম করে বিশাল ঘাটতি টুকে দেওয়া হতো ভারতের নামে। পল ব্যারান হিসাব দেখিয়েছেন, ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদের ৮ শতাংশ প্রতিবছর ব্রিটেনে স্থানান্তরিত হয়।[৫৬]

এজন্যই তো এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকাশিত হিসাবখাতা থেকেও শোষণের প্রমাণ দেখিয়েছেন দাদাভাই নওরোজি। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। এখান থেকে তিনি নিজের 'শোষণ তত্ত্ব'কে

---

[৫৫] এই অনর্থের উত্তরাধিকারী হয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তারা বর্তমানে পৃথিবীর যে-কোনো সেনাবাহিনীর তুলনায় বেশি জাতীয় সম্পদ ভোগ করে।

[৫৬] পল ব্যারান, দ্য পলিটিক্যাল একোনমি অব গ্রোথ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭, পৃ. ১৪৮।

প্রমাণ করেন। বৃদ্ধি করে এসব কাজের নাম দেন 'অ-ব্রিটিশসুলভ' আচরণ। ভারতে দারিদ্র্য সৃষ্টি করার দায়ে অভিযুক্ত করেন উপনিবেশবাদীদের। নওরোজির দাবি, ১৮৩৫ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ভারত থেকে ব্রিটেনে ১,৩০,০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে কোনো টাকাই আসেনি ভারতে, বরং ব্রিটেনে বসবাসরত লোকদের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে বছরে উলটো ৩ কোটি পাউন্ড লোকসান গুনতে হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে কোম্পানির অংশীদারদের মুনাফা, রেলওয়ে বিনিয়োগকর্তাদের লভ্যাংশ আর অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের অবসরভাতা। ব্রিটেন থেকে সামান্য যা-কিছু বিনিয়োগ আসত, তা ব্যয় হতো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায়। সম্পদ এভাবে শুষে নেওয়ার ফলে ভারত 'ক্ষয়ে যায়', 'নিঃশেষ হয়ে যায়' এবং 'রক্তাক্ত' হতে থাকে। দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও দুর্দশা।[৫৭] ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম ডিগবির দেওয়া বিস্তারিত হিসাবে উঠে এসেছে কীভাবে ভারতের প্রাচুর্য ধ্বংসের সাথে সাথে বেড়েছে ব্রিটেনে ভারতের সম্পদ পাচার। এর মধ্যে সবচেয়ে অবাক-করা একটি ব্যাপার হলো, ১৯০১ সালে ভারতে নিযুক্ত সেক্রেটারি অব স্টেইটের বেতন গড়পড়তা ৯০,০০০ ভারতীয়ের বার্ষিক আয়ের সমান। সেই বেতনও আবার দেওয়া হতো ভারতীয় কর থেকেই।[৫৮]

অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসন স্পষ্ট করে বলেছেন, '১৯০ বছর ধরে যে বিশাল পরিমাণ সম্পদ বেরিয়ে গেছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এসব অর্থ যদি ভারতে বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে বহুল পরিমাণে বেড়ে যেত তাদের উপার্জনের ক্ষমতা।'[৫৯] ভারতীয় আয় থেকে যুক্তরাজ্যে সম্পদের স্থানান্তর সরকারিভাবে যেমন হতো, তেমনই হতো ব্যক্তিগতভাবেও। ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ কর্মকর্তারা অতিরিক্ত উচ্চ বেতন পেতেন। কিন্তু তাতে ভারতের কোনো উপকার হয় না। কারণ, ব্রিটিশ রাজ ছিল প্রবাসীদের নিয়ে-গড়া সরকার। তাদের আর্থিক স্বার্থ এখানে না, ইংল্যান্ডে।

অতীতে সরকারি সেবা থেকে আসা উপার্জন দেশেই সঞ্চিত হতো, দেশেই ব্যয় করা হতো। ভারতীয় প্রশাসন ক্ষমতায় থাকলে ব্রিটিশ আমলেও সেরকমই থাকত পরিস্থিতি। কিন্তু এর বদলে সবকিছু চলে যায় বিদেশিদের পকেটে। সেই

---

[৫৭] দাদাভাই নওরোজি, পোভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন: সোয়ান সনেনশাইন, ১৯০১।

[৫৮] উইলিয়াম ডিগবি, 'প্রসপারাস' ব্রিটিশ ইন্ডিয়া: আ রিভিলেশান ফ্রম অফিশিয়াল রেকর্ডস, লন্ডন: টি. ফিশার আনউইন, ১৯০১।

[৫৯] অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসন, ক্লাস স্ট্রাকচার অ্যান্ড একোনমিক গ্রোথ: ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান সিন্স দা মোগুলস, নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ, ২০১৩, পৃ. ৬৩।

বিদেশিরা আবার সব টাকা পাঠিয়ে দেয় বিদেশে, যেখানে তাদের আসল স্বার্থ নিহিত। বেশিরভাগ সমাজে প্রভুরা যা উপার্জন করে, তা সামাজিক উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কারণ, এর মাধ্যমে এমনসব লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, যারা সেই অর্থ ব্যয় করে স্থানীয় জনকল্যাণে। পরোক্ষভাবে এতে স্থানীয় শিল্পের উন্নতি ঘটে। কিন্তু ভারত সরকারের যে কর্মীদের এত উদার হস্তে বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছিল, তাদের শেকড়ের টান ইংল্যান্ডে।

তাদের রুচি আর চাহিদাও ভারতে-থাকা বিদেশি পণ্যের প্রতি। এতে করে ব্রিটিশ ভোগ্যপণ্যের আমদানি বাড়ে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্থানীয় শিল্প। বিলাসী পণ্যনির্মাতা, হস্তশিল্পের কারিগর, মিহি রেশম ও মসলিনের তাঁতিরা অতীতে ভারতীয় অভিজাতদের সেবা দিত। কিন্তু সাদা বড় সাহেবদের কাছে তাদের এসব কাজকর্মের কোনো আবেদন নেই (টুকটুকে ইংরেজ মেমসাহেবদের কাছেও না)।

উইলিয়াম ডিগবি ১৯০১ সালে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতকে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে মোট ৪১৮,৭৯,২২,৭৩২ পাউন্ডের সম্পদ পাচার করা হয়েছে।[৬০] তার এই হিসাব একদম নিখুঁত ও যথাযথ (তাই যথারীতি, তিক্ত বিরোধিতার শিকার)। মিনহাজ মার্চেন্ট আজকের টাকার অঙ্কে যে হিসাব দেখিয়েছেন, এটা তার নয় ভাগের এক ভাগমাত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিসাব। বিংশ শতকে আরও খারাপ হতে চলেছে অবস্থা।

***

এখানে ছোট করে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ আসবে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের পেছনে ভারত যে কী পরিমাণ অবদান রেখেছে, তা একদম স্পষ্ট। বারেবারে এমনসব যুদ্ধের জন্য বিদেশে সেনাদল পাঠানো হয়েছে, যেগুলোর সাথে ভারতের কোনো লেনাদেনাই নেই। সেসব যুদ্ধ হয়েছে কেবলই ব্রিটিশ স্বার্থের সংরক্ষণ আর নয়তো সম্প্রসারণের জন্য। আর এই সবই হয়েছে ভারতের টাকায়, বিশেষত ভূমিরাজস্বের টাকায়, যেগুলো ছিনিয়ে আনা হয়েছে অভাগা কৃষকদের থেকে, আর নয়তো 'মৈত্রী ভরতুকি'র নাম করে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রিন্সলি স্টেইট থেকে।

ব্রিটিশরা ঊনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যতবার বিদেশে ইন্ডিয়ান আর্মিকে পাঠিয়েছে, তার তালিকাটা[৬১] দেখা যাক: চীন

[৬০] দ্রষ্টব্য উইলিয়াম ডিগবি, দ্য প্রবলেমস ফর ইংলিশ কনসিডারেশান, লন্ডন: ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশান, ১৮৮১ এবং 'প্রসপারাস' ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৯০১।

[৬১] এইচ. এস. ভাটিয়া (সম্পা.), মিলিট্রি হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৬০৭–১৯৪৭, নয়াদিল্লি:

(১৮৬০, ১৯০০-০১), ইথিওপিয়া (১৮৬৭-৬৮), মালয় (১৮৭৫), মাল্টা (১৮৭৮), মিশর (১৮৮২), সুদান (১৮৮৫-৮৬, ১৮৯৬), বার্মা (১৮৮৫), পূর্ব আফ্রিকা (১৮৯৬, ১৮৯৭, ১৮৯৮), সোমালিল্যাড (১৮৯০, ১৯০৩-০৪), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮৯৯, কিন্তু শুধু শ্বেতাঙ্গ সেনাদল) এবং তিব্বত (১৯০৩)। সংখ্যার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ হলো : ১৮৫৬-৫৭ সালের চীন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে ৫,৭৮৭ জন ভারতীয় সেনা, যা তিয়েন্তসিন চুক্তি (১৮৫৭) ও ক্যান্টন অধিকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয়; ১৮৬০ সালে চীনে পাঠানো হয়েছে ১১,০০০ সেনা, যাদের অভিযান শেষ হয় পিকিং দখল করার মাধ্যমে; আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) থেকে ব্রিটিশ বন্দিদের মুক্ত করতে পাঠানো হয়েছে ১২,০০০ সেনা; মিশরে ১৮৮২ ও ১৮৯৬ সালে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়েছে ৯,৪৪৪ জন সেনা এবং খরচ হয়েছে ১৪,৭৯,০০০ রুপিরও বেশি অর্থ; আর পূর্ব আফ্রিকায় সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়েছে ১,২১৯ জন সেনা। ব্রিটেন সিলোনে (শ্রীলংকায়) ১৮১৮ সালের ক্যান্ডিয়ান যুদ্ধে এবং ১৮২৪-২৬ সালের বার্মিজ যুদ্ধে তার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিকে ব্যবহার করেছে। এ দুটি যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটেনের ভারতীয় উপমহাদেশ বিজয় সম্পূর্ণ হয়। বার্মিজ যুদ্ধে প্রতি সাতজনের মধ্যে ছয়জন সেনা হয় যুদ্ধের ময়দানে, আর নয়তো অসুস্থতার কারণে মারা গেছে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ছিল ভারতীয়দের অবদান। ব্যাটল অব ব্রিটেনে যে কয়েকজন হাতেগোনা সেনা বুক চিতিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে রক্ষা করেছে, তারা ছিল ভারতীয় ফাইটার পাইলট। এদের মাঝে ছিলেন এক দুর্ধর্ষ শিখ, যিনি তার হারিকেন ফাইটার বিমানের নাম দিয়েছিলেন 'অমৃতসর'।[৬২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশদের স্থায়ী সেনার সংখ্যা ছিল ৩,২৫,০০০। এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের খরচ জোগানো হতো ভারতীয় খাজনার টাকায়। ভারতে নিযুক্ত প্রতিটি ব্রিটিশ সেনার বেতন, সরঞ্জাম, খাবার এবং পরবর্তীকালে অবসরভাতা ব্রিটেন দিত না, দিত ভারত সরকার।[৬৩] ইউরোপীয় ও ভারতীয় সেনাদের মাঝে পদ, পারিশ্রমিক, পদোন্নতি, অবসরভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও রসদের মাঝে বিস্তর ফারাক ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ বিস্কুট, চাল, ময়দা, কিশমিশ, ওয়াইন, শূকর ও গরুর

দীপ অ্যান্ড দীপ পাবলিকেশানস, ১৯৭৭।

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

[৬৩] বিল নেসন, ব্রিটানিয়া'স এম্পায়ার: মেকিং আ ব্রিটিশ ওয়ার্ল্ড, স্ট্রাউড, গ্লুসেস্টারশায়ার: টেম্পাস, ২০০৪।

মাংস আসত ভারতের উৎপাদ থেকে।[৬৪]

সৈনিকদের কথা তো বলা হলোই। এমনকি ভারতের শ্রম ও বাণিজ্যিক দক্ষতাও বাইরের বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে সাম্রাজ্যের হাতকে শক্তিশালী করেছে। মালয়, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় প্ল্যান্টেশান কৃষির উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়েছে ভারতের শ্রমিকদের। তাদেরই পরিশ্রমে উগান্ডায় গড়ে উঠেছে রেলপথ, বার্মা হয়ে উঠেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাতের গামলা। ভারতীয় খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের দিয়ে বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি করাতে যে পরিমাণ উপরি খরচ হতো, সেটা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের চেয়ে কম। চীন ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করত ভারতীয়রা, তবে নিচু পদে অবশ্যই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের অনেককে আসামি বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে দূরদূরান্তের ব্রিটিশ উপনিবেশে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনা করব।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কোনো সুফল ভারতকে ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। ভারতীয় সেনারা ব্রিটিশ স্বার্থ উদ্ধারে যে পরিমাণ আত্মত্যাগ করেছে, এর ফলাফল আজও টিকে আছে, অথচ সেসব সেনা বা তাদের ফেলে-আসা পরিবার কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। কোনো স্বীকৃতিই পায়নি তাদের এসব অবদান; অথবা ভারতের অবস্থাতেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি আসেনি। (ভারত ও ভারতীয় সেনাবাহিনী দুটি বিশ্বযুদ্ধে যে বিশাল অবদান রেখেছে, তা তো গোনায়ই ধরা হয় না। পরে আমি এ বিষয়টি আলোচনা করব।)[৬৫]

কোম্পানি শাসনের জামানায় ব্রিটিশদের চুক্তিভঙ্গ, কথা দিয়ে কথা ভাঙার ব্যাপারটা কিংবদন্তি পর্যায়ে চলে যায়। এমনকি শান্তিপ্রস্তাবের বিনিময়ে টাকা পর্যন্ত দাবি করত তারা। হায়দার আলি ছিলেন এক যোদ্ধা-শাসক, যাকে

---

[৬৪] ভাটিয়া, মিলিট্রি হিস্ট্রি, পৃ. ১৫২।

[৬৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অপরিসীম অবদান দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিসাবটাও অনেককিছু বলে যায়। যুদ্ধের শুরুতে (১৯৩৯) ইন্ডিয়ান আর্মির লোকবল ছিল ১,৯৪,৩৭৩। পরে ১৯৪৫-এর মধ্যে তা ২০,৬৫,৫৫৪-তে উন্নীত হয়। এরা ভারতে কাজ করেছে, বিদেশেও করেছে। বিমানবাহিনীতে ছিল আরও ২৯,২০১ জন সৈনিক এবং রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিতে ৩০,৪৭৮ জন। (ভাটিয়া, ১৯৭৭, পৃ. ২৩৪–২৩৫।) যুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির হতাহতের সংখ্যা ছিল বিশাল। পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এর মধ্যে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৪৯,২২৫। সাজসরঞ্জাম দিয়েও ব্যাপক সাহায্য করেছে ভারত। একটা উদাহরণ বড়ই পরিহাসের। ব্রিটেন যেখানে ভারতের ইস্পাত শিল্পকে গলা টিপে মারতে চাইছিল, ভারত সেখানে যুক্তরাজ্যে জাহাজযোগে ৭,০০০ ইস্পাতের পাত প্রেরণ করে। কারণ, ব্রিটিশদের ইস্পাতবাহী জাহাজ সাগরে হারিয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশরা বিনা উসকানিতে আক্রমণ করেছিল। তিনি ব্রিটিশদের বলতেন 'মানবজাতির সবচেয়ে বেঈমান ও বরখেলাপি সদস্য'। উইলিয়াম হাউইট ঘৃণাভরে বলেছেন, 'এক পাল্লায় যদি রাজত্ব ও সম্পদের প্রতি আমাদের লোভকে রাখি, তাহলে বিপরীত পাল্লায় মানবকল্যাণের পরিমাণ কতই-না কম। আজও পর্যন্ত পালটায়নি এই বাস্তবতা। বাংলায় প্রথমবার আক্রমণ করা থেকে শুরু করে নেপাল আর বার্মায় আমরা যেসব হামলা করেছি, সেইসব ভয়াল ও সহিংস কাহিনির কিছুই আমাদের শোনানো হয় না। খালি সাম্রাজ্যের স্তবগান শুনিয়ে বলা হয়, "দেখো দেখো! কী ঝলমলে এক সাম্রাজ্য দখল করেছি আমরা!"'[৬৬]

ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষ যখন দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়, তখনো অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেবল নতুন আরেক ভাষায় উপনিবেশবাদকে জায়িয করা হতে থাকে। ভান করা হয়, যেন ব্রিটেন এখন থেকে ভারতীয় জনগণের কল্যাণের জন্য শাসন করবে। জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন, ইংরেজ যখন কোনোকিছুর দখল নিতে চায়, তখন সে সেটা প্রকাশ্যে স্বীকার করে না, বরং 'তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি যার মালিকানায় আছে, তার কাছ থেকে সেটা উদ্ধার করে নেওয়াকে নিজের পরম নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব বলে খুব জোরেশোরে বিশ্বাস করে'। উইল ডুরান্ট এই অভিনয়ের ধারালো সমালোচনা করে বলেছেন, 'পাশবিকতার সাথে যোগ হয় ভণ্ডামি, ওদিকে চলতে থাকে ডাকাতি।'

আসলেই চলতে থাকে। ব্রিটিশরা ঠাট্টাচ্ছলে প্রায়ই বলে, তারা নাকি ভারতীয় সাম্রাজ্যকে অনেকটা 'আনমনেই' জয় করে ফেলেছে। খালি পড়ে ছিল জায়গাটা। আচমকাই তাদের চোখে পড়ে যায়। বিষয়টাকে এভাবেই বলেছেন ক্যামব্রিজের ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ জন সিলি। (সিলি তার এক্সপ্যানশান অব ইংল্যান্ড বইয়ে কপট ভঙ্গিতে বলেছেন, 'ভারত বিজয়টা আসলে সত্যিকার অর্থে কোনো বিজয়ই ছিল না।')[৬৭] কিন্তু বাস্তবতা ছিল আরও কঠিন ও অপ্রীতিকর: বিশাল মাত্রায় অর্থনৈতিক শোষণ দৈবক্রমে হয়ে যায়নি, বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ছত্রছায়ায় তা সম্ভব হয়েছে। শুরু থেকেই যে একটা সাম্রাজ্যবাদী মহাপরিকল্পনা তৈরি করে রাখা হয়েছিল, এমনও নয়। হয়তো ঘটনাপ্রবাহ আপন গতিতেই চলছিল। সেখানে শ্যেনদৃষ্টিতে নজর রেখে চলছিলেন কোম্পানির কর্মকর্তারা। এগুলোর প্রতিক্রিয়ায় তারা একের পর এক তাৎক্ষণিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

---

[৬৬] হাউইট, পৃ. ৪০–৪১।

[৬৭] জন আর. সিলি, দি এক্সপ্যানশান অব ইংল্যান্ড: টু কোর্সেস অব লেকচারস, লন্ডন: ম্যাকমিলান, ১৮৮৩, পৃ. ২৪৩।

হাতের কাছে-চলে-আসা সুযোগগুলো কাজে লাগিয়েছেন সময়মতো। তাতেই সম্ভব হয়েছে কোম্পানির শাসনবিস্তার।

কিন্তু এসব কাজের পেছনে কোনো অনুশোচনা থাকত না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে সাফাই গেয়ে ক্লাইভ যেমন বলেছেন, 'থামলেই বিপদ; পিছু হটলেই সর্বনাশ।' একের পর এক রাজ্যকে খেয়ে ফেলা হয়েছে স্রেফ সেখানকার শাসকের সামনে দুটো বিকল্প পেশ করার মাধ্যমে : হয় যুদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, আর নয়তো পরাধীনতা মেনে নিয়ে আরামে জীবনযাপন করা। যুদ্ধ যখন হয়েছে, তার খরচ জোগানো হয়েছে ভারতীয়দের কাছ থেকে আদায় করা খাজনা ও কর থেকে। আরেকভাবে বললে, টাকা দিয়ে ব্রিটিশদের হাতে পরাধীনতা কিনেছে ভারতীয়রা। তিতিবিরক্ত উইলিয়াম হাউইট ১৮৩৯ সালে লিখেছেন,

> 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে তরিকায় হিন্দুস্তানকে অধিকার করেছে, এরচেয়ে বড় গুনাহের ও অখ্রিষ্টানসুলভ কাজ আর হতেই পারে না... এক শতাব্দীরও বেশি সময়জুড়ে দেশীয় শাসকদের শাসনাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাও আবার অধিকার ও কল্যাণের পবিত্র শপথের আড়ালে। যে পদ্ধতিতে এসব কাজ করা হয়েছে, এরচেয়ে নিকৃষ্ট অনাচার আর কোনোকালে কোনো স্বৈরাচারী রাজা করেননি, কোনো কপট যাজকও করেননি।'[৬৮]

ফার্ডিন্যান্ড মাউন্ট নিজেও কোম্পানির একজন বিখ্যাত জেনারেলের বংশধর। তিনি সম্প্রতি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই সবকিছুর পেছনে সরল যুক্তিটা ছিল পুঁজিবাদ। 'ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল বণিকদের সৃষ্টি। বাইরে যা-ই হোক, মূলের গভীরে সেটা একটা বাণিজ্যিক প্রকল্পই। মুনাফা ছিল এর মূল চাবিকাঠি। বাজারের ওঠানামার সাথে তাল মিলিয়ে তাকে কাজ করতে হতো। গভর্নমেন্ট হাউজে কর্মকর্তাদের স্কন্ধনিশান, ঘোড়ার জিনের টুংটাং, অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আর বলনৃত্যের পেছনে লুকিয়ে আছে লন্ডন শহরের কাঠখোট্টা গাণিতিক হিসাবনিকাশ।'[৬৯]

দাদাভাই নওরোজি ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সের প্রথম ভারতীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। 'সব সংসদের জননী'তে দাঁড়িয়ে ভারতের হয়ে কথা বলেন তিনি (একইসাথে সমর্থন জানান আইরিশ স্বায়ত্তশাসনকেও)। তার লেখা পোভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়াতে তিনি ইংরেজদের বিবেকের প্রতি নিষ্ফল আবেদন জানিয়ে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলো তুলে

---

[৬৮] হাউইট, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৯।

[৬৯] ফার্ডিন্যান্ড মাউন্ট, দ্য টিয়ারস অব দ্য রাজাস: মিউটিনি, মানি অ্যান্ড ম্যারেজ ইন ইন্ডিয়া ১৮০৫–১৯০৫, লন্ডন: সায়মন অ্যান্ড শুস্টার, ২০১৫, পৃ. ৭৭৩।

ধরেন। স্বয়ং ব্রিটিশদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই দাঁড় করানো হয়েছে এই পুরো অভিযোগনামা :

জনাব মন্টগোমারি মার্টিন বাংলা ও বিহারের কিছু প্রদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন... তারপর ১৮৩৫ সালে তার রচিত ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে বলেন, 'দুটি অদ্ভুত বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। প্রথমত, দেশটির প্রাচুর্য; দ্বিতীয়ত, দেশটির অধিবাসীদের দারিদ্র্য... ব্রিটিশ ভারত থেকে বছরে ৩০,০০,০০০ পাউন্ড করে বেরিয়ে যেতে থাকে। ৩০ বছরে চক্রবৃদ্ধি সুদ-সহ সেটা ৭২,৩৯,০০,০০০ পাউন্ডের ঢাউস অঙ্কে পরিণত হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকেও যদি নিয়মিত হারে এবং এত বেশি পরিমাণে টাকা বেরিয়ে যেত, তাহলে ইংল্যান্ডও দরিদ্র হয়ে যেত। সেখানে ভারতের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য, যেখানে কিনা একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি দুই কি তিন পেন্স... মিলের হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (খণ্ড ৬, পৃ. ৬৭১, 'ইন্ডিয়া রিফর্ম ট্র্যাক্ট' ২, পৃ. ৩) বলে : 'দেশটির সম্পদ চুষে তাকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলা হয়, অথচ সেটার কোনো বিনিময় প্রদান করা হয় না; জাতীয় শিল্পখাতের রগ থেকে রক্ত বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।' স্যার জর্জ উইঙ্গেইট বলেছেন (১৮৫৯) : 'দেশ থেকে খাজনা নিয়ে দেশেই খরচ করা এক ব্যাপার, আর এক দেশ থেকে খাজনা তুলে অন্য দেশে খরচ করা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। প্রথম ক্ষেত্রে জনগণের থেকে সংগৃহীত খাজনা... আবার শ্রমিক শ্রেণির কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়... কিন্তু দেশের খাজনা দেশে খরচ না করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা... খাজনাদাতা দেশটার জন্য এটা পুরোটাই লোকসান।

উত্তোলিত পুরো অর্থ তার কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে... [এই টাকা] নিয়ে সাগরে ফেলে দিলেও কথা একই হতো। ভারত থেকে আমরা এত দীর্ঘকাল যাবৎ যে কর আদায় করেছি, সেটা এই প্রকৃতিরই।' লর্ড লরেন্স, লর্ড ক্রোমার, স্যার অকল্যান্ড কলভিন, স্যার ডেভিড বারবুর প্রমুখ ভারতের চরম দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলেছেন... জনাব এফ. জে. শোরের মত : 'ভারতের শান্তির দিন শেষ। একসময় সে যে বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিল, তা তার কাছ থেকে শুষে নেওয়া হয়েছে। এক অসহ্য অপশাসনব্যবস্থা তার শক্তি সংকুচিত করে দিয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মুনাফার জন্য বলি দেওয়া হয়েছে কোটি মানুষের স্বার্থকে... ব্রিটিশ সরকার যে শাসনপদ্ধতি চালু করেছে, এর অধীনে সৃষ্ট ধারাবাহিক দারিদ্র্য সেই দেশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।'[৭০]

[৭০] দাদাভাই নওরোজি, পোভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন: সোয়ান সনেনশাইন, ১৯০১।

জাহাজ পরিবহণ ও নির্মাণ শিল্প ধ্বংস

এতই খোলাখুলি চুরিচামারি করা হয়েছে যে, সেসময়কার ইংরেজরাও স্বীকার করেছেন সে কথা। এরচেয়েও খারাপ ব্যাপার ছিল ভারতের জাহাজ-পরিবহণ ও জাহাজনির্মাণ শিল্প ও ব্যাবসা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের আগে বাংলা, মসুলিপত্তনম, সুরত এবং কালিকট ও কুইলনের মালাবার বন্দরগুলো ছিল জাহাজনির্মাণ শিল্পের রমরমা ক্ষেত্র। পণ্যবাহী ভারতীয় জাহাজ চষে বেড়িয়েছে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে। মারাঠিদের তো ষোড়শ শতকেও বলার মতো নৌবহর ছিল। শিবাজি ভোঁসলের নৌবাহিনী পর্তুগিজ আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিম উপকূলকে সফলভাবে প্রতিরক্ষা করেছে। আরও দক্ষিণ দিকে সাগরের বুকে বীরত্ব দেখিয়েছে মুসলিম কুঞ্জলি মারাইকারগণ। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কালিকটের শাসক সামুদিরি আইন জারি করেন যে, রাজ্যের প্রত্যেক জেলে পরিবারের একজন পুত্রসন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করতে হবে, যাতে মুসলিম নৌবাহিনীর জন্য যথেষ্ট লোকবল পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাংলার নৌবহরে ছিল ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ জাহাজ। প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৪০০ থেকে ৫০০ টন। এগুলো তৈরিও হতো বাংলায়, চলাচলও করত বাংলায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে চলে। কারণ, তাদের বাহিত পণ্যদ্রব্যগুলোর চাহিদা ছিল ব্যাপক। ব্রিটিশরা এসে জাহাজ-পরিবহণ ও জাহাজ-নির্মাণের এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে মারাত্মকভাবে খর্ব করে দেয়।

প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য ১৭৫৭ সালের পর কোম্পানিকে এবং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্রিটিশ জাহাজগুলোকে বাণিজ্যপথের একচেটিয়া অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় বণিকগণ ইতঃপূর্বে যেসব পথ ব্যবহার করতেন, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরের মধ্যে চলাচলকারী ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজের ওপরও শুল্ক আরোপ করা হয়, শুধু বিদেশিগুলোর ওপর না। এতে করে দেশীয় জাহাজ শিল্পের গলায় এত জোরে চাপ পড়ে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তারা। কিছু অগুরুত্বপূর্ণ উপকূলে স্থানীয় ভোক্তাদের কাছে কমদামি 'দেশীয়' পণ্য সরবরাহের মাঝেই তারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ জাহাজ-পরিবহণ নীতির স্বার্থান্বেষী চরিত্রটি প্রকট হয়ে ওঠে নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের সময়। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জলযানের মারাত্মক সংকট দেখা দেয় তখন। (১৮০৩ সালের যুদ্ধে ১,৭৩,০০০ টন ব্রিটিশ জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে লন্ডন সরকার ব্রিটিশ বাণিজ্য পরিচালনার জন্য

১,১২,৮৯০ টন বিদেশি জলযান ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।) কথা নেই, বার্তা নেই, ভারতীয় জাহাজগুলো এবার হয়ে গেল ব্রিটিশ। ভারতীয় নাবিকদের নাম লেখানো হয় ব্রিটিশ নাবিক হিসেবে। ন্যাভিগেশান অ্যাক্টসের অধীনে তাদের ব্রিটিশ বাণিজ্যপথে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু যে না নেপোলীয়নীয় যুদ্ধ শেষ হলো, অমনি নতুন সংশোধনী আনা হয় ন্যাভিগেশান অ্যাক্টসে। ভারতীয় জাহাজের প্রবেশাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আবারও অবনতি হয় জাহাজ-পরিবহণ শিল্পের।

একই গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভি. ও. চিদাম্বরম পিল্লাইকে মাদ্রাজে একটি জাহাজ-পরিবহণ কোম্পানি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তার সাফল্যে ইংরেজদের বিপদঘণ্টা বেজে ওঠে। শুধু নিয়মকানুন করে যখন তার ব্যাবসাকে ধ্বংস করা গেল না, তখন তার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তড়িঘড়ি কারাবন্দি করা হয় তাকে। এতে তার উদ্যম যেমন ভেঙে যায়, তেমনই ভেঙে যায় তার ব্যাবসার মেরুদণ্ড। অঙ্কুরে থাকতে থাকতেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয় ভারতীয় এই বাণিজ্যকে। ভারতীয় জাহাজ-পরিবহণ শিল্পের কাহিনি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ব্রিটিশরা কী রকম ক্রূর এবং ইচ্ছেকৃতভাবে ভারতীয় শিল্পকে নিজেদের দরকারের সময় ব্যবহার করত এবং বেদরকারের সময় দমিয়ে দিত।

এই তো গেল জাহাজ-পরিবহণ শিল্পের কথা। ভারতীয় জাহাজনির্মাণ শিল্পের গল্প আরও জটিল, তবে একই রকমের করুণ।[৭১] (সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকারী হিসেবে স্বভাবতই এ দেশে শিল্পটির রমরমা অবস্থা ছিল।) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতায় আসার পর শুরুতে এই শিল্প কিছুকাল স্থবিরতা ও অবনতির শিকার হয়; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে বাংলায় পুনরায় জেগে ওঠে ভারতীয় জাহাজনির্মাণ শিল্প। এর কৃতিত্ব ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের। কলকাতাতেই ভারতীয় শ্রমিকদের ব্যবহার করে জলযান নির্মাণ করানোর সুবিধাটা টের পেয়েছিলেন তারা। ১৮০০ সালের মধ্যে গভর্নর-জেনারেল ওয়েলসলি প্রতিবেদন পেশ করেন যে, কলকাতার ব্রিটিশ ভারতীয় বন্দরে ভারতে নির্মিত ১০,০০০ টন মালবাহী জাহাজ রয়েছে। বাংলায় আরও ৩২৭টি জাহাজ নির্মিত হয় ১৮০১ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যে, যার সবগুলোর মালিকানা ব্রিটিশদের।

ভারতে এই ব্রিটিশ-নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কারণটাও একদমই ব্যাবসায়িক। পাই পাই করে অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশ করে তবেই এই উদ্যোগ

---

[৭১] এই পরিচ্ছেদটির তথ্যের অন্যতম উৎস ইন্দ্রজিৎ রায়, ১৯৯৫, 'শিপবিল্ডিং ইন বেঙ্গল আন্ডার কলোনিয়াল রুল: আ কেইস অব "ডি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান", দ্য জার্নাল অব ট্রান্সপোর্ট হিস্ট্রি, ১৬ (১), পৃ. ৭৭৬–৭৭।

নেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় শ্রমিকদের মুনশিয়ানা এবং দেশটির জাহাজশিল্পের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের খুবই কদর করতেন ব্রিটিশ জাহাজ-কারবারিগণ। নিজেদের জলযান তৈরি করতেও তারা নানা রকম ভারতীয় কলাকৌশল ব্যবহার করেছেন। সামসময়িক এক ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক লিখেছেন, ভারতীয় জলযানগুলো 'যেমন নজরকাড়া, তেমনই দারুণ কাজের জিনিস। এগুলো নির্মাণশ্রমিকদের ধৈর্য ও দক্ষতার অনুপম দৃষ্টান্ত।' জাহাজ তৈরির যত রকমের উপাদান আছে, ভারতীয় শ্রমিকরা তার সবকটাতেই দক্ষ—কাঠ, লোহা ও পিতল (কাঠের জাহাজ নির্মাণে অধিক স্থিতিস্থাপক পিতল ছিল অপরিহার্য। কারণ, জাহাজের ফিটিং, পানির পাম্প, শ্যাফ্ট লাইনার, এমনকি পেরেক তৈরিতেও দরকার হতো পিতল)। আর তাদের কাজগুলো ছিল অসাধারণ টেকসই: বাংলায় নির্মিত জাহাজগুলোর গড়পড়তা আয়ু ছিল ২০ বছরেরও বেশি, অথচ ইংরেজদের বানানো জাহাজ ১১-১২ বছরের বেশি টিকত না, আর প্রায়ই সেগুলোকে ভারতীয় বন্দরে পুনর্নির্মাণ বা মেরামতও করানো লাগত। (এর একটা কারণ সম্ভবত জাহাজনির্মাণে ব্যবহৃত কাঠের প্রকৃতি। ভারতীয় শ্রমিকরা প্রধানত ব্যবহার করত সেগুন ও শাল কাঠ, যেখানে ব্রিটিশরা করত ওক ও পাইন।)

ফলে একদিকে ব্রিটেনের চেয়ে ভারতে জলযান তৈরির খরচ কম, আরেক দিকে ক্ষয়রোধী হওয়ার কারণে ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের কাছে আরও বেড়ে যায় এগুলোর চাহিদা। খরচ যেহেতু কম, সেহেতু পরিবহণের ভাড়াও কমিয়ে ধরা যায়। ইংল্যান্ডের জাহাজ কোম্পানিগুলো সেটা পারে না। ভারতে জাহাজ বানানোটা ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের মাঝে এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাদের নিজেদের দেশে বেকারত্ব বেড়ে যেতে শুরু করে। তাই ১৮২০-এর দশকের মধ্যে বেকার হয়ে যায় লন্ডনের শত শত জাহাজনির্মাতা, মেরামতকারী, করাতি ও ছুতার।

ব্রিটেন-ভিত্তিক ব্যাবসাগুলো প্রতিযোগিতায় স্রেফ মার খেতে থাকে। তাই তারা পার্লামেন্টে দাবি তোলে, যেন ভারতীয় জাহাজনির্মাণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের পক্ষে প্রথম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৮১৩ সালে। যেসব জাহাজ ৩৫০ টনের কম, ভারতীয় উপনিবেশ থেকে যুক্তরাজ্যে সেগুলোর চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তাতেই লোভনীয় ভারত-ইংল্যান্ড বাণিজ্য থেকে ছিটকে পড়ে বাংলায় নির্মিত প্রায় ৪০ শতাংশ জাহাজ। পরের বছর প্রণীত হয় আরও একটি আইন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ মহাদেশের সাথে ব্যাবসা করার ক্ষেত্রে ভারতে নির্মিত জাহাজগুলোও 'ব্রিটিশ-নিবন্ধিত জলযানে'র মর্যাদা পেত। নতুন এই আইনে সেই মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়। কাগজে-কলমে সেগুলো

তখনো চীনের সাথে ব্যাবসা করতে সক্ষম। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার ফলে পুরো খাতটাই অলাভজনক হয়ে যায়। কারণ, এতদিন পর্যন্ত কলকাতা থেকে ভারতীয় পণ্য বোঝাই করে জাহাজগুলো চীনে যেত। তারপর সেখান থেকে চা নিয়ে যেত লন্ডনে। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে আসত ব্রিটিশ পণ্য-সহ। এবার ব্রিটিশ অংশটায় যেহেতু নিষেধাজ্ঞা পড়ে গেল, সেহেতু এখন শুধু কলকাতা থেকে চীনে গিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হবে। কিন্তু ভারতে চীনা পণ্যের কোনো চাহিদা নেই (ভারতীয়রা তখনো চা-পায়ী হয়ে ওঠেনি)। জাহাজ যেহেতু লন্ডনে যেতে পারবে না, তাই প্রায়ই তারা চীন থেকে ফিরে আসত খালি অবস্থায়।

একই কারণে ভারতীয় নাবিকরাও এখন থেকে অ-ব্রিটিশ। ইংল্যান্ড-যাত্রায় তাদের চাকরি দিতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে কোম্পানিগুলো। কারণ, তখন ইংরেজরা তাদের প্রতি অপমানজনক আচরণ প্রদর্শন করতে পারে। ফলে 'ইউরোপীয় পরিচয়ের কারণে তারা ভারতে যে সম্মান ও সমীহ পেত, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে'। (নগ্ন ব্যাবসায়িক স্বার্থকে ঢাকার জন্য প্রায়ই এভাবে নৈতিকতা ও বর্ণবাদের চাদর ব্যবহার করা হতো।) অবশ্য ভারতীয় বন্দরে পর্যাপ্ত ব্রিটিশ নাবিক ছিল না। তাই বড় জলযান পরিচালনার জন্য ভারতীয় নাবিকদের সুযোগ দেওয়া হতো এই শর্তে যে, গভর্নরের কাছ থেকে একটি অনুমোদনপত্র নিতে হবে। তাতে উল্লেখ থাকবে, ব্রিটিশ লোকবল পাওয়া যায়নি। আইন অনুযায়ী, ইংল্যান্ড থেকে ফিরতি যাত্রায় সেসব ভারতীয়ের বদলি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে ব্রিটিশ নাবিকদের। এতে করে অনেক বেড়ে যায় যাত্রার খরচ। একে তো মালিককে দুজন কর্মচারীর খরচ জোগাতে হচ্ছে, তার ওপর ব্রিটিশ নাবিকদের মজুরি ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশি।

ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো এতদিন ভারতে জাহাজ নির্মাণ ও পরিচালনার মাধ্যমে যেসব সুবিধা পেয়ে আসছিল, ইচ্ছাকৃত আইনি বৈষম্যের কারণে সেগুলো এখন বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের এককালের রমরমা জাহাজনির্মাণ শিল্প ধসে পড়ে। আর একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় ১৮৫০ সালের মধ্যে।[৭২] কারও কারও দাবি, এটা নাকি প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফল। ভারতীয়রা এর সাথে তাল মেলাতে পারেনি। বিষয়টা মোটেও এমন নয়। পালতোলা জাহাজের জায়গায় বাষ্পচালিত জাহাজ আসার অনেক আগে থেকেই এই পতন শুরু হয়েছিল। বাষ্পচালিত জলযান তৈরির সামর্থ্যও বাংলার ছিল। কিন্তু নতুন আইনের ফলে চলাচল কমে যাওয়ায় অলাভজনক হয়ে পড়ে সেই উদ্যোগ। উইলিয়াম

[৭২] প্রাগুক্ত।

ডিগবি যেমনটা বলেছেন, পাশ্চাত্যের সাগররানি প্রাচ্যের সাগররানিকে মেরে ফেলেছে।

অন্যান্য ব্যাবসায়িক খাতেও চলতে থাকে একই রকমের বৈষম্য। এসব ঔপনিবেশিক বৈষম্যের একটা পদ্ধতি ছিল প্রায় সর্বত্র বিরাজমান এবং অত্যন্ত কার্যকর। তা হলো, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য আলাদা আলাদা মুদ্রার ব্যবহার, আর দুয়ের অধিকারকে অসম করে দেওয়া। লন্ডন থেকে কার্যরত কোম্পানিগুলোর মুদ্রা ছিল 'স্টার্লিং', আর ভারত থেকে কার্যরত কোম্পানিসমূহের মুদ্রা ছিল 'রুপি'। এই বিভেদের ফলে এমন এক বাণিজ্যিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যা সহজে দূর করা অসম্ভব। স্টার্লিং কোম্পানিতে শুধু ব্রিটিশরা বিনিয়োগ করতে পারবে। আর রুপি কোম্পানিগুলো ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় প্রকার বিনিয়োগের জন্যই উন্মুক্ত। স্টার্লিং কোম্পানিগুলোর মূল মনোযোগ ছিল ব্যবহার্য পণ্য, চা ও পাটের ওপর। তার মানে, ভারতীয়রা এই বাজারে ঢুকতে চাইলে ভালো রকম বাধার সম্মুখীন হবে। এসব শুধু নিজেদের জন্যই রেখে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তার ওপর, প্রত্যেক স্টার্লিং কোম্পানিতে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করে ব্রিটিশ ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক ছিল। তবেই তাদের হাতে পুঁজি তুলে দেবে লন্ডনভিত্তিক বিনিয়োগকারীরা। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের স্রেফ দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ফলে এই ১৯১৪ সালে এসেও ভারতের চা-শিল্পে যে ৩৮৫টি যৌথপুঁজির কোম্পানি ছিল, তার মধ্যে ৩৭৬টিই ছিল কলকাতাভিত্তিক। আর এই সবগুলোর মালিকই ব্রিটিশরা। বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, ১৯১৫ সালে ভারতের ১০০ শতাংশ পাটকল ছিল ব্রিটিশদের হাতে; ১৯২৯ সালের মধ্যে তা ৭৮ শতাংশে নেমে আসে বটে, কিন্তু তারপরও তাতে ছিল ব্রিটিশ আধিপত্য।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের অবস্থান ছিল অনন্য। ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ১৯১০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ধারাবাহিক কিছু পরীক্ষা চালানো হয়। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল অর্থব্যবস্থা ও বিনিময়ের হারের ব্যাপারে। যেমন—স্বর্ণের বদলে স্টার্লিংকে বিনিময়ের মাধ্যম বানানো; ইচ্ছাকৃতভাবে রুপির দাম কমানোর উদ্দেশ্যে বিনিময়ের হার নির্ধারিত করে দেওয়ার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ; দুর্বল আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটানো; এবং সবশেষে, সীমিত কার্যক্ষমতা-সহকারে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা (১৯৩৪/৩৫)। চাহিদা ও জোগানের হাতে ঝাঁকুনি খেতে থাকে ভারত। ফলে প্রতিবছর দর ওঠানামা করতে থাকে ২০-৩০ শতাংশ হারে। ব্রিটিশরা তাদের নির্ধারিত বিনিময় হারের নিয়মকে ব্যবহার করতে থাকে নিজেদের সুবিধামতো। মূলত এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ চলতি-হিসাবের

ঘাটতি সামাল দেওয়া এবং অন্যান্য দেশীয় চাহিদা মেটানো। ভারতীয় প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধার কোনো তোয়াক্কাই করেনি তারা। এ ধরনের নীতিমালার ফলে ভারতের আর্থিক অস্থিতিশীলতা আরও বাজে হয়ে পড়ে। ব্রিটিশরাজের অধীনে আরও বাড়ে ভারতীয়দের দুর্দশা।

মুদ্রা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করাটা ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এটি নিকৃষ্টতম চেহারা ধারণ করে ১৯২৯-৩০ সালের মহামন্দার সময়। তখন ভারতীয় কৃষকরা (উত্তর আমেরিকার চারণভূমির চাষিদের মতোই) শস্য উৎপাদন করে টরে দেখে যে, সেগুলো কেনার মতো সামর্থ্যবান কেউ নেই। কৃষিজ পণ্যের মূল্য ধসে পড়ে; অথচ ব্রিটিশদের খাজনার আবদার এতটুকু কমেনি। তার ওপর ব্রিটিশরা নিষ্ঠুরভাবে ভারতের অর্থের জোগান আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়। তাদের মনে ভয়, ভারতীয় মুদ্রার দরপতনের ফলে ব্রিটিশদেরও ক্ষতি হবে। কারণ, তখন ভারতে থাকা তাদের সম্পত্তির স্টার্লিং মূল্যও কমে যাবে আনুপাতিক হারে। তাই ব্রিটিশরা গোঁ ধরে থাকে যে, ভারতীয় রুপির মূল্য ১ শিলিং ছয় পেন্সেই অপরিবর্তিত থাকা চাই। ভারতীয় সরকারকে বাধ্য করে বাজার থেকে নোট ও কয়েন সরিয়ে নেওয়ার জন্য, যাতে করে বিনিময়ের হার উচ্চ থাকে। ভারতের অর্থনীতিতে ১৯২৯ সালে ৫০০ কোটি রুপি নগদ অর্থ চলমান ছিল। সেটা ১৯৩০ সালে ৪০০ কোটিতে এবং ১৯৩৮ সালে ৩০০ কোটিতে নেমে আসে।[৭৩] ভারতীয়রা না খেয়ে মরতে থাকে, কিন্তু তাদের মুদ্রার দাম থাকে টনটনে। ফলে সুরক্ষিত থাকে ভারতে ব্রিটিশদের সম্পত্তির মূল্য।

কখনো-বা ব্রিটিশ নীতিমালার মাধ্যমে ইচ্ছে করে ক্রমাগত রুপির দরপতন ঘটানো হয়। ফলে শক্তিশালী হয় পাউন্ড স্টার্লিং-এর ক্রয়ক্ষমতা। বিপরীতে যারা শুধু স্থানীয় মুদ্রায় আয় করে, তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হয়ে যায় দুর্বল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যেটা ছিল পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী মুদ্রা, ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে হতে সেটা রীতিমতো ধুঁকতে শুরু করে। এমনকি অস্কার ওয়াইল্ডের ১৮৯৫ সালের নাটক দি ইম্পর্টেন্স অব বিয়িং আর্নেস্ট-এর চরিত্র মিস প্রিজমও সেটা খেয়াল করতে ভোলেনি। বোকাসোকা চাকর সিসিলিকে পরামর্শ দেয়, 'আমি না থাকাকালে তোমার ওই পলিটিক্যাল একোনমিখানা পড়ে নিয়ো। ফল অব দ্য রুপি অধ্যায়টা বাদ দিতে পারো অবশ্য। এটা একটু বেশি আবেগঘন। ওসব টাকাপয়সার সমস্যারও দেখি একটা নাটকীয় দিক থাকে।'[৭৪]

---

[৭৩] ইন্ডিয়া কনকোয়ারড, পৃ. ৪৩৩।

[৭৪] অস্কার ওয়াইল্ড, দি ইম্পর্টেন্স অব বিয়িং আর্নেস্ট, অঙ্ক ২, লন্ডন: লিওনার্ড স্মিদার্স অ্যান্ড

ভারতীয় ইস্পাতের কান্না

সাম্রাজ্যবাদের সাফাই-গায়করা মাঝে মাঝে দাবি করেন, ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের যুগটা তুলনামূলক আলোকিত এক অধ্যায়। ভারতীয় ইস্পাতশিল্পের গল্পটা শুনলেই বোঝা যাবে সেই দাবির সত্যতা কতটুকু। তখন আসলে নিপীড়ন ও বৈষম্য করা হতো আরও বুঝেশুনে, সূক্ষ্ম উপায়ে।

ভারতের নিজস্ব ইস্পাতশিল্প গড়ে উঠবে—এই ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারত না ব্রিটিশরা। ভারত অবশ্যই ইস্পাতের এক পথিকৃৎ। সেই ষষ্ঠ শতাব্দীতেই এই দেশে তৈরি হয়েছে ধাতুগলানো ইস্পাত, যা 'উট্জ' নামে পরিচিতি লাভ করে (কনাড়া ভাষার শব্দ 'উক্কু'-এর বিকৃতি। প্রথমে একে ইংরেজিতে ভুলভাবে প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে 'wook', তারপর সেখান থেকেও পালটে বানানো হয়েছে 'wootz')। বিশ্বসেরা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে ভারতীয় ইস্পাত। (ভারতীয় চর্চার ওপর ভিত্তি করে দ্বাদশ শতকে আরবরা যখন ইস্পাতশিল্প প্রতিষ্ঠা করে, তখন থেকে বিশ্ববিখ্যাত দামেশক ইস্পাতের উদ্ভব।) ভারতে-তৈরি তরবারি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ তখন মাত্র শুরু হচ্ছে। ভারতীয় তরবারি তখন ইউরোপীয়গুলোর চেয়ে খুবই উন্নত। তাই ইংরেজ সেনারা প্রায়ই বাহন থেকে নেমে এসে পরাজিত শত্রুর সাথে তলোয়ার অদল-বদল করে নিত।[৭৫] ব্রিটিশরা এই প্রযুক্তি সম্পর্কে যথাসম্ভব ভালো করে শিখে নেয়। তারপর অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বন্ধ করে দেয় ভারতের ধাতব শিল্পগুলো। সেগুলো পুনরায় চালু করার চেষ্টা করলে প্রথমে প্রতিরোধ এবং পরে বর্ণবাদী গালাগালির শিকার হতে হয়।

নতুন শতাব্দী আগমনের সাথে সাথে জামসেতজি টাটা ভারতের প্রথম আধুনিক ইস্পাত কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তা করতে গিয়ে ব্রিটিশদের নির্মম বিরোধিতার কবলে পড়েন তিনি (ব্রিটিশদের কাছে তিনি অনুমোদনের আবেদন জানিয়েছিলেন ১৮৮৩ সালে, তারপর টাকা তোলেন ভারতীয় বিনিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে; বারংবার প্রত্যাখ্যান ও বিলম্বের পর অবশেষে ১৯১২ সালে উৎপাদন শুরু হয় তার ছেলে দোরাবজির তত্ত্বাবধানে)। ব্রিটিশদের এক বড় কর্মকর্তা তখন তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, ভারতীয়রা যত আউন্স ইস্পাত উৎপাদন করতে সক্ষম, সব তিনি এক লোকমায় খেয়ে

কোম্পানি, ১৮৯৯।

[৭৫] ফিলিপ ম্যাসন, আ ম্যাটার অব অনার: অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দি ইন্ডিয়ান আর্মি, ইটস অফিসারস অ্যান্ড মেন, লন্ডন: পেঙ্গুইন, ১৯৭৪, পৃ. ৩৯।

ফেলতে পারবেন। বেচারা বেঁচে থাকলে দেখে যেতে পারতেন যে, জামসেতজি টাটার বংশধররাই উলটো ব্রিটিশ স্টিল কোম্পানির অবশিষ্ট অংশটুকু খেয়ে ফেলেছেন। টাটা কোম্পানি ২০০৬ সালে কোরাসের মালিকানা অর্জন করে নেয়। ওই পরিমাণ ইস্পাত গলাধঃকরণ করতে গিয়ে হয়তো বদহজম হয়ে যেত বেচারার।

এত বিরোধিতা সত্ত্বেও টাটা গং এগিয়ে চলে এবং উৎসাহ জোগায় অন্য ভারতীয়দের। ব্রিটিশরা তখন তাদের প্রবৃদ্ধি খর্ব করার কার্যকর উপায় খুঁজতে থাকে। ভারতে ইস্পাতের সবচেয়ে বড় দুই ভোক্তা হলো সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ (দুটোই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে)। উভয়ে চাপাচাপি করে যে, ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশান স্টিল (বিএসএসএস) উৎপাদন করতে হবে। বাকি বিশ্বের বেশিরভাগ অংশেই তখন ব্যবহৃত হতো নর্থ-ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশান স্টিল (এনবিএসএসএস)। এর তুলনায় বিএসএসএস-এর মান অনেক ওপরে। ভারতীয় বাজার থেকে তখন তুলনামূলক সস্তায় অ-ব্রিটিশ ইউরোপীয় ইস্পাত আসত। সেগুলোকে দূরে রাখার জন্যই মূলত বিএসএসএস প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে এর আরেকটা সুফল ছিল ভারতীয় ইস্পাতনির্মাতাদের অগ্রগতি রোধ করা। ভারতে টাটার মতো যেসব দেশীয় ইস্পাত উৎপাদক কোম্পানি ছিল, তারা উচ্চতর গুণগত মান নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়। অন্যথায় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি করতে পারবে না তারা।

আইন মেনে বিএসএসএস-এর পেছনে খাটাখাটনি করতে গিয়ে ভারতীয় কোম্পানিগুলো একইসাথে এনবিএসএসএস উৎপন্ন করতে পারত না; অথচ অ-ব্রিটিশ বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে এই ইস্পাতই ব্যবহৃত হয়। বিএসএসএস উৎপাদন করতে গিয়ে বেড়ে যায় ভারতীয় দেশীয় উৎপাদকদের খরচ। তাই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে না ভারতীয় ইস্পাত। মহামন্দার সময়ও যেমন পারেনি, তেমনই ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে মন্দা কেটে যাওয়ার পরও পারেনি। ত্রিশের দশকে আরও যেসব উন্নয়নশীল দেশের অবস্থা ভারতের মতো ছিল, তারা বড়সড় কোনো সমস্যা ছাড়াই এনবিএসএসএস ব্যবহার করে তাদের ইস্পাত শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

অবশ্য ব্রিটেনে বিএসএসএস ইস্পাত রপ্তানি করার সুযোগ ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ ইস্পাত শিল্প সেটাকে স্বাগত জানাবে না। তাই ভারতীয় ইস্পাত আমদানির ওপর বিধিনিষেধ জারি করে ব্রিটেন। ব্রিটিশরা দারুণভাবে দেখিয়ে দিলো যে, আক্ষরিক অর্থেই তারা ইস্পাতের সাপ মেরে ফেলছে, কিন্তু নিজেদের লাঠি ভাঙছে না।

আরেকভাবে বললে, ভারত তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ইস্পাত তৈরি ও ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। একে তো বিদেশে সে ক্রেতা খুঁজে নিতে পারছে না, তার ওপর ব্যাবসা সম্প্রসারণের চেষ্টাটাকেই চেপে আটকে রাখা হয়েছে। তাই ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে থেকে বেড়ে ওঠার কোনো সুযোগ পাচ্ছিল না টাটা স্টিলের মতো ভারতীয় কোম্পানিগুলো।

ব্রিটিশ শাসনের সাফাই-গায়কগণ বলেন যে, ভারতের শিল্পখাত ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধ্বংস করার দায়ে ব্রিটেনকে অভিযুক্ত করাটা অসমীচীন। তাদের দাবি, ব্রিটেন ভারতের বিশিল্পায়ন ঘটায়নি, বরং ভারতই শিল্পায়নের 'বাস মিস' করেছে। যেসব প্রযুক্তিগত নতুনত্ব পশ্চিমা বিশ্বকে পালটে দিয়েছে, সেগুলোর সাথে তাল মেলাতে পারেনি ভারত।[৭৬] তাই বৈশ্বিক জিডিপিতে কমে গেছে তাদের ভাগ। বিশ্ব যখন ব্যাপক মাত্রায় কৃষিভিত্তিক ছিল, তখন বৈশ্বিক জিডিপিতে ভারতের অংশীদারত্ব ছিল বিশাল। বিশ্ব যখন পালটাতে থাকে, তখন অন্যান্য দেশ ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। কারণ, এই ব্যক্তিদের মতে, ভারত ছিল বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত অগ্রগতি সাধনে অক্ষম।

এই প্রস্তাবনা একদমই প্রশ্নবিদ্ধ। আমি ইতোমধ্যে দেখিয়েছি যে, বিশিল্পায়ন ছিল ইচ্ছাকৃত ব্রিটিশ নীতির ফল, কোনো দুর্ঘটনা নয়। ব্রিটিশ শিল্প সমৃদ্ধ হলেও ভারতীয় শিল্প তেমনটা হয়নি নিয়মতান্ত্রিক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে। ট্যারিফ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে পাশার দান ঘুরিয়ে দেওয়া হতে থাকে ব্রিটিশ শিল্পের পক্ষে। তারাই ভারতীয় বাজারকে জয় করে নেয়, উলটোটা আর সম্ভব হয়নি। ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করাটা ছিল ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ডিগবি যে শত কোটি পাউন্ডের অঙ্ক অনুমান করেছেন, ভারত থেকে ইংল্যান্ডে প্রবাহিত রাজস্ব ও লুটের মালের আসল পরিমাণ তারচেয়ে কিছুটা কম। তারপরও এই বিপুল পরিমাণ পুঁজি ব্রিটিশ শিল্পকে পরিপুষ্ট করে তোলে। এই অর্থায়নের ফলেই শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়।

ভারতকে যদি নিজের মতো করে ছেড়ে দেওয়া হতো, তাহলে কি সে নিজের শিল্পখাতের আধুনিকায়ন করে নিত না? উপনিবেশের থাবা থেকে মুক্ত অন্য দেশগুলো তো তা-ই করেছে। দেশটা অন্য সকল যুগেই নতুন আবিষ্কার

---

[৭৬] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, অখিলেশ পিল্লালমাররি, 'সরি, দ্য ইউনাইটেড কিংডম ডাজ নট ও ইন্ডিয়া রিপেয়ারেশানস', দ্য ডিপ্লোম্যাট, ২৪ জুলাই ২০১৫; রাহীন কাসাম, 'রিপেয়ারেশানস ফর কলোনিয়াল ইন্ডিয়া? হাউ অ্যাবাউট রেইলওয়েজ, রোডস, ইরিগেশান, অ্যান্ড দ্য স্পেইস প্রোগ্রাম উই স্টিল পে ফর', ২২ জুলাই ২০১৫, www.breitbart.com; এবং ফোরম্যান, 'রিপেয়ারেশানস ফর দ্য রাজ?'

ও শিল্পখাতের অগ্রগতিতে প্রথম সারিতে ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে কেন তারা হঠাৎ করেই কোনো কারণ ছাড়া সেই সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে? যারা ভারতের প্রযুক্তিগত নতুনত্বের অভাবকে দায়ী করেন, তাদের কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আমি ভারতীয় ইস্পাতশিল্পী ও জাহাজনির্মাতাদের দক্ষতার ওপর কিছুটা আলোকপাত করেছি। অন্যান্য শাসনামলে যখন নতুন আবিষ্কারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো, তখন ভারতীয়রা গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, খনিজ উত্তোলন, ধাতব শিল্প, এমনকি ক্ষেপণাস্ত্র বিদ্যায়ও (টিপু সুলতান ও হায়দার আলির অধীনে) তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নতুনত্ব আসত, যদি কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয় শাসক সেই দায়িত্ব হাতে নিতেন। তিনি দেশকে এমনসব শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দিতেন, যেখানে এ-সকল গবেষণা হতো। কিন্তু ব্রিটিশরা সেরকম প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জামসেতজি টাটার বদান্যতায়। ঔপনিবেশিক সরকার তো দূরের কথা, ব্রিটিশ মানবদরদিরা পর্যন্ত এর পেছনে কোনো ভূমিকা রাখেননি। শিল্পায়নরত ইউরোপের সাথে প্রতিযোগিতা করার চ্যালেঞ্জটা ভালো করেই সামাল দিতে পারত স্বাধীন ভারত। তখন নিজেদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নানান পদক্ষেপ নিতে পারত ভারত সরকার, নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে ট্যারিফ আরোপ করত, ভরতুকি প্রদান করত যেখানে প্রয়োজন সেখানে, বিকাশ ঘটাত নিজেদের বিদ্যমান বৈশ্বিক বাজারের।

পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শিল্পায়ন ঘটাতে না পারাকে ভারতেরই ব্যর্থতা বলে দাবি করাটা ডাহা মিথ্যে। এটা কোনো দেশীয় অক্ষমতার ফল নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিকল্পিত নীতিমালার পরিণাম। ইচ্ছা করে এই কাজ করেছে ভারতের শাসকরা, তথা ব্রিটিশরা। ভারত শিল্পায়নের 'বাস মিস' করার কারণেই যদি তার জিডিপি কমে গিয়ে থাকে, তবে সেটার কারণ হলো, ব্রিটিশরাই ভারতীয়দের ধাক্কা মেরে চাকার তলে পিষ্ট করেছে।

স্কটিশ জাতীয়তাবাদ আজকাল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলছে তুমুল জল্পনাকল্পনা। তাই ব্রিটেনের হাতে ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের আরেকটি পরিহাস সামনে চলে আসে। ইউনিয়নের এই ঐক্য আদতে কীভাবে সম্ভব হয়েছে, সেটাই অনেকে ভুলে যায়। এই স্কটরাও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ঔপনিবেশিক শোষণে অংশ নিয়েছে; পেয়েছে কিছু রুটির টুকরা আর মাছের কাঁটা। ইংল্যান্ডের সাথে ইউনিয়ন গড়ার আগে

স্কটল্যান্ড একা একাই উপনিবেশায়নের কিছু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, প্রধানত মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে।

ইউনিয়ন যখন গড়ে ওঠে, তখনই স্কটদের হাতে আসে ভারত, সাথে করে নিয়ে আসে অপরিসীম সুযোগের হাতছানি। ঔপনিবেশিক কার্যক্রমে চাকুরিরত স্কটদের সংখ্যাটাও ছিল বিশাল। সৈনিক, নাবিক, বণিক, প্রতিনিধি ও কর্মচারীর মতো নানান ভূমিকায় কাজ করেছে তারা। ব্রিটেনের জনসংখ্যায় স্কটদের ভাগ মোটে ৯ শতাংশ, অথচ ব্রিটিশদের হাতে ভারতে চাকরি পাওয়াদের মাঝে ২৫ শতাংশই স্কট। ভারতে তারা যে পয়সা কামিয়েছে, তা স্কটল্যান্ডকে দারিদ্র্যের গর্ত থেকে টেনে তুলে আনে। দেশটিকে করে তোলে সমৃদ্ধ। এখন ডান্ডিতে গুনগুন করে কত কারখানা। রমরমা অবস্থায় আছে তাদের সব শিপইয়ার্ড। ভারতে কর্মরত স্কটরা দেশে পাঠিয়েছে মোটা অঙ্কের রেমিট্যান্স।[৭৭] এই সবগুলো ঘটনা স্কটল্যান্ডে ভারতের অবদানের সাক্ষী হয়ে আছে। স্যার ওয়াল্টার স্কট ভারতকে আখ্যায়িত করেছেন 'স্কটল্যান্ডের জন্য ভুট্টার সিন্দুক' হিসেবে। এখন যেহেতু ভারত আর হাতে নেই, সেহেতু স্বভাবতই ইংল্যান্ডের সাথে বন্ধন হালকা হয়ে আসছে স্কটিশদের...।

[৭৭] দ্রষ্টব্য স্কটল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, জন এম. ম্যাকেঞ্জি এবং টি. এম. ডিভাইন (সম্পা.), অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২। আরও দ্রষ্টব্য মার্থা ম্যাকলারেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ব্রিটিশ স্কটল্যান্ড ১৭৮০–১৮৩০, অ্যাকরন, ওহায়ো: অ্যাকরন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২।

০২

ব্রিটিশরা কি ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা দান করেছে?

নিজেদের বেকসুর খালাস ঘোষণা করার জন্য ব্রিটিশরা একটা দাবি করতে খুবই ভালোবাসে। ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা দান করার জন্য নাকি তারা কৃতিত্বের দাবিদার। একক সত্তা হিসেবে 'ভারতে'র ধারণাটাই ব্রিটিশদের সৃষ্ট (এখন যদিও তিনটি রাষ্ট্র, তবে ব্রিটিশ আমলে পুরোটা মিলে একটাই রাষ্ট্র ছিল)। অথচ অতীতে ভারত ছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাষ্ট্রে বিভক্ত, যারা আবার নিজেদের মাঝে ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত। ব্রিটিশ শাসনের এই অবদানকে চ্যালেঞ্জ করার তো কোনো সুযোগই নেই, তাই না?

এই প্রস্তাবনাকে অন্য কোনোভাবে খণ্ডন করা কঠিন। শুধু একটি প্রমাণযোগ্য তত্ত্ব রয়েছে আমাদের হাতে: উপমহাদেশের পুরো ইতিহাসজুড়ে অখণ্ডতা অর্জনের একটি চেতনা চিরকালই বিরাজমান ছিল। ভারতীয় ইতিহাসের বেশ কয়েকটি সাম্রাজ্য এর উদাহরণ। তারা গোটা উপমহাদেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তৃত করতে চেয়েছিল: মৌর্য সাম্রাজ্য (৩২২-১৮৫ খ্রিষ্টপূর্ব), গুপ্ত সাম্রাজ্য (সর্বাধিক বিস্তৃত অবস্থায়, ৩২০-৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ), এবং মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)। কিছুটা সীমিত পরিসরে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্য (সর্বোচ্চ অবস্থায় ছিল ১১৩৬-১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) এবং মারাঠা ঐক্যজোটও (১৬৭৪-১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ) এসব উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ইতিহাসে যতবারই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, প্রতিবার এর পরপরই এসেছে কেন্দ্রীভূত হওয়ার এক তাড়না। ব্রিটিশরা প্রথমবারের মতো ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নেয় উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র-সহকারে। তা না হলে এমনটা খুবই সম্ভব ছিল যে, কোনো ভারতীয় শাসকই হয়তো ব্রিটিশদের কাজটা নিজে করে ফেলতেন। নিজের আধিপত্য বিস্তৃত করতেন উপমহাদেশের বেশিরভাগ অংশজুড়ে।

ভারতীয়রা তাদের জাতিসত্তার ব্যাপারে যেরকম দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, তাতেও একই চেতনা দৃশ্যমান। প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ-এ এই বিষয়টির দেখা মেলে। সেখানে 'ভারতের ধারণা'টা এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেটাকে বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদীরা খুব ভালো করেই চিনতে পারবেন। এসব মহাকাব্য ভারতীয় সংস্কৃতির খুবই মজবুত অথচ সূক্ষ্ম সুতো হিসেবে কাজ করেছে। সারা উপমহাদেশের অসংখ্য গোত্র, ভাষা ও জাতিকে গেঁথে রেখেছে একই সূত্রে। সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ স্বরে স্তুতি গেয়েছে একই মহামানব ও মানবীদের নিয়ে। তাদের গল্পগুলো বিধৃত ও অনূদিত হয়েছে নানা ভাষায়, নানা সংস্করণে। কিন্তু তাতে চেতনা ও অর্থ ছিল একই। মহাভারত-এ (আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত) পাণ্ডবরা যে ভূমিরূপ দেখেছেন, তা এক সর্বভারতীয় ভূমি। তাদের পুরো ভ্রমণজুড়ে এবং সকল কাহিনি মিলিয়ে দেখা গেছে, ভারতীয়রা শত শত ভাষায় এবং হাজারো আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলে। মহাকাব্যে যতগুলো স্থানের নাম বলা হয়েছে, সকলে মিলে একই ঐক্যবদ্ধ সভ্যতার সদস্য। ভারতজুড়ে প্রভু রামের যাত্রা এবং লঙ্কার রাক্ষসরাজার বিরুদ্ধে তার মহাকাব্যিক যুদ্ধে প্রতিফলিত হয় একই জাতীয়তাবাদী ধারণা।

যুগ যুগ ধরে ভারত সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার অধিকারী ছিল, অন্তত তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের আমল থেকে এর সূচনা। ভারতীয় অখণ্ডতাকে দৃশ্যমান করে তুলেছেন হিন্দু মনীষী আদি শংকর। তিনি সর্বদক্ষিণে কেরালা থেকে সর্ব-উত্তরে কাশ্মীর, এবং পশ্চিমে দ্বারকা থেকে পূর্বে পুরী পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন সেই সপ্তম খ্রিষ্টীয় শতকেই। এই প্রতিটি স্থানে মন্দির স্থাপন করেছেন, যেগুলো আজও পর্যন্ত টিকে রয়েছে। ভারতের 'পবিত্র ভূগোল' নিয়ে লেখালেখি করেছেন ডায়ানা এক্। তাতে তিনি সবিস্তারে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়রা ধর্মীয় পবিত্রতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক অখণ্ডতার ধারণা লালন করত। এক্ লিখেছেন, 'সুদীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা ছিল মোটে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ; কিন্তু জাতি হিসেবে ভারতের অখণ্ডতা তার পবিত্র ভৌগোলিক গঠনের মাঝে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ভারতীয়দের কাছে এই ভূখণ্ড ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী : এর পাহাড়, বন, নদী, পর্বতচূড়ার মন্দির—সবই তীর্থযাত্রীদের গমনপথ।'[৭৮]

এই অখণ্ডতা হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার নয়। বাকি বিশ্বও ভারতকে একক সত্তা হিসেবে দেখত। যেমন : আরবরা পুরো উপমহাদেশকে 'আল-

---

[৭৮] ডায়ানা এক্, ইন্ডিয়া: আ সেকরেড জিওগ্রাফি, নিউ ইয়র্ক: হারমোনি বুকস। আরও দ্রষ্টব্য বইটির ব্যাপারে উইলিয়াম ডালরিম্পলের পর্যালোচনা, দ্য গার্ডিয়ান, ২৭ জুলাই ২০১২।

হিন্দ' হিসেবে আখ্যায়িত করত। সকল ভারতীয়কে বলত 'হিন্দি', চাই সে পাঞ্জাবের হোক, বাংলার হোক বা কেরালার। মহান জাতীয়তাবাদী নেতা মাওলানা আযাদ দেখিয়েছেন যে, হজের সময় সকল ভারতীয়কেই একই ভূমি থেকে আগত হিসেবে ধরা হয়। তারা নিজেরাও নিজেদের তেমনটাই মনে করে। দূর অতীতে এই চেতনার ধারক ছিলেন সম্রাট ও সাধুসন্তগণ। এখন আমাদের আছে আধুনিক যানবাহন, যোগাযোগব্যবস্থা ও দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক অখণ্ডতার সেই একই ধারণা কি তাদের মাধ্যমেই পূর্ণতা পেতে পারে না?

এসব তথ্য একদমই বিতর্কের উর্ধ্বে। এগুলোকে ভিত্তি ধরে আমরা একটা বিকল্প বাস্তবতার চিত্র দাঁড় করাতে পারি। ব্রিটিশ উপনিবেশ যদি না থাকত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই বিকল্প চিত্রের আবির্ভাব খুবই সম্ভব ছিল। মারাঠিরা তখন সারা দেশেই নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত করতে পারত। রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে একজন নামেমাত্র মুঘল সম্রাটকে ওপরে ওপরে রাখত। বাস্তবেও সেই প্রক্রিয়ার সূচনাটা ঘটেই গিয়েছিল। (নামমাত্র মুঘল সম্রাটের আড়ালে দেশ শাসনের এই কাজটা ব্রিটিশরাও কিছুকাল করেছে।) সর্বাধিনায়ক হিসেবে একজন মুঘল সম্রাট, তার মাধ্যমে দেশ চালাচ্ছে মারাঠিরা—এমতাবস্থায় অবশ্যই দেশের শাসনব্যবস্থা পালটে হয়ে যেত সাংবিধানিক শাসন, ঠিক যেমনটা ঘটেছে ইংল্যান্ডে। পূর্ণাঙ্গ রাজশাসন থেকে সাংবিধানিক রাজশাসনে রূপান্তরিত হয়েছিল, তারাও (প্রথমে সপ্তদশ শতাব্দীর গ্লোরিয়াস রেভোলিউশান এবং পরে হাউজ অব কমন্সের শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে।) উপনিবেশে পরিণত হয়নি, এমন অনেক দেশেই তখন এই ঘটনা ঘটেছিল। গোটা ইউরোপ তো আছেই, সাথে এই তালিকায় আরও আছে কয়েকটি এশীয় দেশও, বিশেষ করে চীন, জাপান ও থাইল্যান্ড।

একদম নির্ঝঞ্ঝাটে সবকিছু হয়ে যেত না অবশ্য। সেখানেও হতো বিপ্লব ও সামরিক সংগ্রাম, হতো বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত। কিন্তু ভারতের সম্পদ ভারতেই থাকত। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতো তার নিজের মানুষদের হাতে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের আগমন সেই স্বাভাবিক বিবর্তন-প্রক্রিয়া এবং এর বিকাশকে ব্যাহত করে। ব্রিটিশরা না এলে ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা সম্ভবই হতো না—এই দাবি বড় বিদঘুটে ও প্রমাণবিরোধী।

প্রতিবাস্তবতাকে প্রমাণ করা অসম্ভব বটে। যে জিনিস আদৌ কখনো ঘটেনি, সেটার সম্ভাব্যতা কিছুতেই নিশ্চিতভাবে দাবি করা যায় না। ব্রিটিশরা না থাকলে ভারতকে একীভূত করতেন কোন সে নেতা, কে হতেন ভারতের বিসমার্ক, মাৎসিনি, আতাতুর্ক বা গ্যারিবাল্ডি—সেটা কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ তার নিজস্ব নাটকীয় ব্যক্তিত্বকে খুঁজে নেয়। সবখানে যা ঘটেছে, তা ভারতেও না ঘটার কোনো কারণই ছিল না। প্রাথমিকভাবে সংকর জাতের এক ব্যবস্থা থেকেই উঠে আসতে পারত আধুনিক সাংবিধানিক রাজশাসন। এমন এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা মুঘলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্মিত এবং মারাঠিদের হাতে সংস্কারকৃত। তবে এ সবই কাল্পনিক প্রস্তাবনা। বাস্তবে ব্রিটিশদের আগমন ঘটেছে, ফলে তৈরি হয়নি এমন কোনো অনৌপনিবেশিক ভারত।

প্রতিবাস্তবতা কাল্পনিক, কিন্তু বাস্তব তথ্য নিজ গুণে সত্য। বাস্তব তথ্য স্পষ্ট করে বলে যে, ব্রিটিশরা ভারতের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, উসকে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক বৈষম্য। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের আধিপত্যকে অক্ষুণ্ণ ও বর্ধনশীল রাখা।

ব্রিটিশরা যখন অবশেষে ১৯৪৭ সালে চলে যায়, তখন তারা ভারতকে একটি কর্মক্ষম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে রেখে গিয়েছিল। বহু ব্রিটিশ এ নিয়ে গর্বিত যে, তারা তাদের ভারতীয় প্রজাদের মাঝে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের চেতনা প্রোথিত করে দিতে পেরেছে, যদিও ব্রিটিশরা তার সারনির্যাস থেকে ঠিকই বঞ্চিত রেখেছে ভারতীয়দের। তাদের এই কৃতিত্বের দাবিকে গভীরভাবে যাচাই করে দেখা চাই।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস

অন্য ঔপনিবেশিকদের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বেশ উন্নত ছিল—এটা মানা যায়। সম্প্রতি দারুণ সন্তোষজনক পরিসংখ্যান-সহকারে এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন কিছু বিশেষজ্ঞ। (একটা দেশকে কারা কতকাল যাবৎ শাসন করেছে, এর সামষ্টিক হিসাবকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এই পরিসংখ্যান।) দেখা গেছে যে, অনেকগুলো সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র; বরং যেসব রাষ্ট্র এককালে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, সেগুলোরই বর্তমানে গণতান্ত্রিক হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।[৭৯] মাইরন ওয়েইনার দেখিয়েছেন, দুই আমেরিকা মহাদেশের কথা বাদ দিলে 'কমপক্ষে ১০ লাখ জনসংখ্যাবিশিষ্ট যেসব দেশ অতীতে উপনিবেশ ছিল এবং পরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পেয়েছে, তার সবগুলোই

[৭৯] সিমুর মার্টিন লিপসেট, কিয়োং-রায়াং সিওং এবং জন চার্লস টোরেস, 'আ কম্প্যারাটিভ অ্যানালিসিস অব দ্য সোশ্যাল রিকুইজিটস অব ডেমোক্রেসি', ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সায়েন্স জার্নাল, ১৯৯৩, ৪৫, পৃ. ১৫৫–৭৫।

ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। (এরচেয়ে কম জনসংখ্যার বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।)[৮০] (অবশ্য এরকম সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশও রয়েছে, যারা নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র পায়নি। সময়ে সময়ে তাতে ছেদ ফেলেছে সামরিক শাসন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়ই এই দলে পড়ে।) হতে পারে ব্রিটিশরা নিজেরা নিজেদের ধ্যানধারণার প্রতি সৎ থাকেনি। হতে পারে তারা 'ইংরেজদের প্রাপ্য অধিকার' থেকে ভারতীয়দের নিদারুণভাবে বঞ্চিত করেছে, যেমনটা আমেরিকানদের ক্ষেত্রেও করেছে ১৭৭৬ সালের আগ পর্যন্ত। তবুও বলা চলে, ব্রিটিশরা তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোকে আসলেই পর্যাপ্ত মাত্রায় গণতন্ত্রের চেতনা সেবন করিয়ে গিয়েছে। ফলে ব্রিটিশদের খবরদারি সরে যাওয়ার পরও গণতান্ত্রিক থেকেছে সেসব রাষ্ট্র।

কিন্তু স্বয়ং ব্রিটিশ শাসনের যে ইতিহাস, তাতে তাদের নীতিমালায় বা কাজেকর্মে এই গণতান্ত্রিকতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

ব্রিটিশরা ১৭৫৭ সালের পর থেকে নিয়ে ভারতীয় শাসকদের মাঝে চাতুর্যের সাথে বিভেদ সৃষ্টি করে গিয়েছে। ধীরেসুস্থে নিজেদের কর্তৃত্বকে সুসংহত করেছে 'বিভেদসৃষ্টি ও শাসন' নীতির মাধ্যমে (যা ১৮৫৮ সালের পর 'divide et impera' নামে পরিচিতি লাভ করে)। এই সময়ে এটা ছিল সম্পূর্ণই রাজনৈতিক চাল। কোম্পানি যে ধরনের বিভেদকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করত, সেগুলো কিন্তু মোটেও ধর্মীয় বা সামাজিক গোষ্ঠীভিত্তিক ছিল না, বরং সেগুলোর ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত লোভ-লালসা। কোম্পানির সমর্থন পাওয়ার জন্য এক অভিজাত ব্যক্তি উঠেপড়ে লাগত তারই কোনো জ্ঞাতিভাইয়ের বিরুদ্ধে। প্রায়শ আসল বিবেচ্যটা ছিল ব্রিটিশদের কে কত বেশি টাকা খাওয়াতে পারে। আনুগত্য ছিল ক্রয়যোগ্য পণ্য।

কখনো ব্রিটিশরা প্রথমে একজনের আনুগত্য করেছে, পরে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আরও বেশি টাকা খেয়ে দল পালটে ফেলেছে। তাই আমরা দেখতে পাই, ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ বাংলার মসনদে মীর জাফরকে বসান মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। এটা পলাশিতে সাবেক নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেঈমানি করার পুরস্কার। ক্লাইভের উত্তরসূরিরা মীর জাফরকে উৎখাত করে মীর কাসিমকে তার জায়গায় বসান, বিনিময়ে গ্রহণ করেন কিছুটা কম (কারণ, সেই টাকা তাদের হাতে গেছে, ক্লাইভের কাছে না)। তিন বছর পর তারা আবার মীর জাফরের দিকে সুদৃষ্টি দেয়। কারণ, তিনি মীর কাসিমের চেয়ে

---

[৮০] মাইরন ওয়েইনার, 'এম্পিরিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক থিওরি', ই. ওযবাডান এবং এম. ওয়েইনার (সম্পা.), কম্পিটিটিভ ইলেকশানস ইন ডেভেলাপিং কান্ট্রিজ, ডারহ্যাম, এনসি: ডিউক ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৭, পৃ. ৩–৩৪।

আড়াই গুণ বেশি টাকা দিয়েছেন এবার। দুই বছর পর ইংরেজরা নাজিমুদ্দৌলার টাকা খেয়ে আরও একবার উৎখাত করে মীর জাফরকে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যে স্থূল উদ্দেশ্যে কাজ করত, তার সাথে এই 'ঘুসগ্রহণ ও শাসন' নীতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এখান থেকেই কালক্রমে জন্ম নেবে বিভেদসৃষ্টি ও শাসনের কুটিলতর নীতি। সেটা হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এতে এক ভারতীয়ের বিরুদ্ধে আরেক ভারতীয়কে লাগিয়ে দেওয়া হবে এমন এক বিভেদের ভিত্তিতে, যার ক্ষতিকর প্রভাব আরও অনেক দীর্ঘস্থায়ী।

এভাবে শুরু থেকেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছু নামমাত্র শাসকের আড়ালে নিজেরা ভারত শাসন করেছে। যখন ইচ্ছে মসনদে বসিয়েছে, যখন ইচ্ছে ছুড়ে ফেলেছে জানালা দিয়ে। তার মানে, ভারতের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মোটেও সম্মান দেখায়নি তারা। নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এর উন্নয়ন ঘটানো তো বহু দূর কি বাত। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার প্রক্রিয়া এতটুকুতেই শেষ হয়ে যায়নি। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র অংশ হিসেবে ইংরেজরা গ্রাম কর্তৃপক্ষকেও পঙ্গু করে দেয়। কারণ, খাজনার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য তারা সরাসরি চুক্তি করে নেয় স্থানীয় হর্তাকর্তাদের সাথে। বিচারিক ও নির্বাহী ক্ষমতাকেও কেন্দ্রীভূত করে ফেলে তারা। অথচ আগে এসব কাজ গ্রাম কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ইখতিয়ারে ছিল। কোম্পানির পর্যবেক্ষকরা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছেন, এ-সকল গ্রাম্য সমাজ ছিল স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মতো; অর্থনৈতিক একক হিসেবেও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাক-ঔপনিবেশিক বিশ্ববাজারের সাথে তাদের ছিল সরাসরি সংযোগ। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় নানান পালাবদল হয়েছে, কিন্তু নিজেদের জায়গায় অটল থেকেছে গ্রাম কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ শাসনাধীনে এই বাস্তবতা বদলে যায়।

একটা ব্যাপার এখানে মাথায় রাখা জরুরি। এই গ্রামগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ও আদিম কৃষিজীবী মানবগোষ্ঠী ছিল না, বরং এগুলো ছিল সক্রিয় ও কর্মক্ষম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা। জনৈক খ্যাতিমান ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তা লিখেছেন, 'ভারতে এত এত নৈরাজ্য ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ সত্ত্বেও যে একটি সত্তা দীর্ঘকাল যাবৎ টিকে ছিল, তা ছিল গ্রামব্যবস্থা। আমরা যখন ভারত জয় করি, তখনো এটি ছিল পুরোদমে সচল। আগ্রহী পাঠকরা স্যার হেনরি সামনার মেইনের লেখা ইন্ডিয়ান ভিলেইজ কমিউনিটিজ পড়ে দেখতে পারেন।'[৮১] ব্রিটিশদের যদি সদিচ্ছা থাকতই, তাহলে তারা গ্রাম পর্যায় থেকে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করে চলত। কোম্পানি তো সেটা

[৮১] এইচ. ফিল্ডিং-হল, পাসিং অব দি এম্পায়ার, লন্ডন: হার্স্ট অ্যান্ড ব্ল্যাকেট, ১৯১৩, পৃ. ১৩৪।

করেইনি, উলটো যা ছিল সেটাও ধ্বংস করে দিয়েছে। ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষ যখন অবশেষে ভারতের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়, তখন ছিটেফোঁটা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে তারা, উচ্চপর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে। আদতে সেগুলো ছিল অনির্বাচিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় 'আইনি' পরিষদ। এগুলোর সদস্যরা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি। জনগণের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। অর্থপূর্ণ কোনো আইনও প্রণয়ন করেনি তারা। সত্যিকার অর্থে কোনো ক্ষমতাই ছিল না তাদের হাতে। সরকার কিছু একটা করার আগে তাদের সাথে আলোচনায় বসত, এই নিয়েই তারা খুশি থাকতেন, অথচ আসল সিদ্ধান্তে তাদের কোনো ভূমিকাই নেই।

ভারতীয় সামাজিক কাঠামোটাই ব্রিটিশদের কাছে ছিল অপরিচিত। এটা সমস্যার একটা কারণ। তাদের নিজেদের গ্রামব্যবস্থা ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক। ভূস্বামীরা ছিলেন গ্রামের অধিপতি। ব্রিটিশরা যেসব উপনিবেশকে জয় করেছে, সেখানে নিজেদের সামাজিক কাঠামো চাপিয়ে দিয়েছে তারা। ইংল্যান্ডের সমাজ তখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অসম ও শ্রেণিবিভেদে জর্জরিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তারা যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছে, সেগুলো মূলত ইংরেজ সমাজেরই প্রতিবিম্ব। সাম্রাজ্যের কারিগররা যা জানত, তারই ভিত্তিতে অজানাকে গড়তে চেয়েছে। টরি ইংল্যান্ডের গ্রামীণ কাঠামোকে এনে বসাতে চেয়েছে নিজেদের উপনিবেশগুলোতে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে তাদের স্থানীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল সমাজের উঁচু লোকেরা। শাসকরা ছিলেন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণি। ব্রিটিশরা ভারতে যে গ্রাম সরকারব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছে, সেটা ছিল স্বায়ত্তশাসিত।

পক্ষান্তরে ইংরেজ গ্রামগুলো পরম্পরাসূত্রে ভূস্বামীদের হাতে থাকত। তাদের সাথে-থাকা অভিজাতরা গ্রামের কর্তাব্যক্তি। উপনিবেশের সমাজ-কাঠামোয় ওই ছাঁচটাই খুঁজে ফেরে ব্রিটিশরা। যখন তা পায় না, তখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তেমনটা বানানোর চেষ্টা করে। এভাবেই গড়ে ওঠে 'পরোক্ষ শাসনে'র সরকারি ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশেরই বৈশিষ্ট্য ছিল এরকম। সেখানে ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশ-আদলে বানানো 'ভদ্রলোক'দের মাঝে, যারা মর্যাদার দিক দিয়ে কেউ বড় আর কেউ ছোট। অনেককেই দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশদের-আবিষ্কৃত বিভিন্ন খেতাব, যেমন 'রায় বাহাদুর'। কাউকে কাউকে তো নাইটও বানানো হয়েছে কষ্টের প্রতিদান হিসেবে। এতে দুই দিক দিয়ে লাভ হয় ব্রিটিশদের। একে তো এতে সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার হ্রাস পায়, তার ওপর দেশীয় ইংরেজ ব্যবস্থার মতোই এখানে সরকার চালানো হচ্ছে অদক্ষ অনুগতদের দিয়ে। তাই ভারতীয়দের একটা দক্ষ শ্রেণিকে গড়ে তোলার

কোনো প্রয়োজনীয়তাই থাকল না, যারা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চর্চা করতে পারত।

ব্রিটিশদের এই ব্যবস্থা ভারতের মাটিতে সম্পূর্ণই নতুন, তার ক্ষতিকর প্রভাব ছিল দীর্ঘমেয়াদি। ইতিহাসবিদ জন উইলসন বলেছেন, ভারতে একটা গতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ছিল। 'ছোট ছোট সমাজ নিয়ে গড়া একটা সমাজ।'[৮২] শাসক ও শাসিতের মাঝে নিয়মিত বোঝাপড়া ছিল সেখানকার রীতি। ভারতের গ্রামগুলো নিরিবিলি একাকী বসবাসরত স্বনির্ভর প্রজাতন্ত্র ছিল না, বরং তারা ছিল পরস্পরের সাথে জালের মতো সংযুক্ত। ভারতের শিল্পখাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলেই মানুষ কৃষিকাজে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এর ফলে একদিকে যেমন সমাজ হয়ে পড়ে আরও বেশি কৃষিনির্ভর, তেমনই কৃষক শ্রেণি হতে থাকে নিঃস্ব। ভারত একসময় ছিল কারিগর, বণিক, যোদ্ধা ও ব্যবসায়ীদের এক ভূমি। সমৃদ্ধ ও জটিল এক বাণিজ্যিক জালিকার ভেতরে সচল থাকত এটি। কিন্তু ১৮০০-এর দশকেই তা কৃষক ও ঋণদাতাদের এক কৃষিজীবী সমাজে পরিণত হয়।

বিশেষজ্ঞদের বহু গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ব্রিটিশরা কীভাবে ভূমিহীনতা সৃষ্টি করেছে। স্বনির্ভর চাষিদের তারা বানিয়ে দিয়েছে ভাড়াটে, চাকুরে ও চুক্তিবদ্ধ। বদলে দিয়েছে সামাজিক সম্পর্ক। ফলে কমে গেছে কৃষির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন। এই নীতিমালার পরিণাম আজও পর্যন্ত দৃশ্যমান। ভারতের বিবর্তনকে বিকৃত করে দিয়েছে এটি। ব্যানার্জি এবং ইয়ের দেখিয়েছেন, কীভাবে ঔপনিবেশিক নীতিমালার ফলে স্থায়ী অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে: 'কিছু জায়গায় ভূমি-মালিকানার অধিকার প্রদান করা হতো ভূস্বামীদের, আর কিছু জায়গায় চাষিদের। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে দেখা গেছে, ভূস্বামীদের এলাকাগুলোয় কৃষি বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম।'[৮৩] উপনিবেশ আমলে যত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতেই কেউ-না-কেউ ভুক্তভোগী হয়েছে: ব্রিটিশরা যা-কিছু করেছে, সবকিছুর ফলাফল এত যুগ পরে এসেও ভোগ করতে হচ্ছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পেছনে কাজ করেছে একগুচ্ছ প্রেরণা। সেইসাথে ছিল ভারতের ব্যাপারে কিছু ভিত্তিহীন অনুমান। স্থূল বাণিজ্যিক লোভ-লালসা তো আছেই। মুনাফা ঠিক রাখার জন্যই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে

---

[৮২] ইন্ডিয়া কনকয়্যারড, পৃ. ১৪।

[৮৩] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, অভিজিৎ ব্যানার্জি এবং লক্ষ্মী ইয়ের, 'হিস্ট্রি, ইন্সটিটিউশানস, অ্যান্ড একোনমিক পারফরম্যান্স: দ্য লেগ্যাসি অব কলোনিয়াল ল্যান্ড টিন্যুর সিস্টেমস ইন ইন্ডিয়া', দি অ্যামেরিকান একোনমিক রিভিউ, খণ্ড ৯৫, সংখ্যা ৪, ২০০৭, পৃ. ১১৯০–১২১৩।

সুসংহত করা জরুরি ছিল। কিন্তু ইউরোপীয়দের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে ভূমিকা রেখেছে। তাদের চোখে 'বিধর্মী' ভারতীয়রা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ারই অযোগ্য। বিজাতীয়দের ব্যাপারে তাদের এহেন চিন্তাধারার সবচেয়ে উৎকট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দুই আমেরিকা মহাদেশে ইবেরীয় যুদ্ধের সময়। সেখানকার মানুষেরা ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি শত্রুতা করেছে এবং খ্রিষ্টের বাণী মানতে চায়নি। এগুলোই নাকি তাদের বিরুদ্ধে 'ন্যায়সংগত' যুদ্ধ শুরু করার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। অঞ্চল জয় করে দাস বানিয়ে ফেলা হয়েছে পরাজিতদের। ভারতে এসব কথাবার্তা খোলাখুলি বলা হয়নি বটে, কিন্তু ইউরোপীয় স্বজাতিরা পশ্চিমে যা করেছে, ভারতের ব্যাপারেও মোটাদাগে একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করত ব্রিটিশরা।

সিংহাসনের খেলা শুরু হয় এক ঘর দূর থেকে। আনুষ্ঠানিক শাসক হিসেবে তখন পুতুল নবাবদের বসিয়ে রাখত কোম্পানি। কারণ, ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানির আনুষ্ঠানিক পদবি ছিল রাজস্ব ব্যবস্থাপক। পূর্ব ভারতে মুঘলদের তিনটি বড় প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ করত তারা। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, হাঁটু-কম্পমান মুঘল সম্রাটকে চোখরাঙানি দিয়ে এ-বিষয়ক ফরমান আদায় করে নিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের কাছে একটি চিঠি লেখেন ১৭৬৪ সালের ২৭ জানুয়ারি। সেখানে নিজের ভূমিকা এভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি : 'আমরা হলাম নাবোবের ছায়ার নিচে লুকিয়ে থাকা শক্তির মতো। বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমরাই গোপনে গোপনে চালিয়ে থাকি। মূল সংবিধানেরও কোনো লঙ্ঘন হয় না এর ফলে। নাবোবের অধিকারে কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমাদের ক্ষমতা বাড়ছে এবং তারটা কমছে। বরাবরের মতোই নাবোবের হাতে রয়েছে গোটা বেসামরিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ, দপ্তর বণ্টনের দায়িত্ব এবং তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য সার্বভৌম অধিকার। তাকে ব্যবহার করেই আমরা অন্যান্য ইউরোপীয় বসতির হিংসুটে দৃষ্টি থেকে আরামসে সুরক্ষিত আছি।'[৮৪]

তবে ভারতের ওপর ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্ব ততদিনে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। কারণ, ভারতীয় শাসকদের ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অসংখ্য সামরিক বিজয় লাভ করেছে। অসম চুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পদানত করে রেখেছে তাদের। উইলিয়াম বোল্টস একজন ওলন্দাজ ব্যবসায়ী, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে অল্প কয়েক বছর চাকরি করেছেন। তিনি ১৭৭২ সালে লিখেছেন, কোম্পানি আসলে বণিকদের নিয়ে-গড়া এক স্বৈরাচারী

[৮৪] ফরেস্ট, ১৯১৮, পৃ. ২৯৬।

শাসকশ্রেণি। সার্বভৌম শাসকের ভূমিকায় চেপে বসে আছে তারা। বাংলার নবাব আদতে 'বেতনভোগী চাকুরে'র চেয়ে বেশি কিছু নন। আর মুঘল সম্রাট এক অর্থে অবসরেই চলে গেছেন। কোম্পানির কাছ থেকে অবসরভাতা পেয়ে 'তাদের ক্ষমতার ক্রীড়নক' হিসেবে কাজ করে চলেছেন। বোল্টসের মতে, রাজস্ব প্রশাসনের ব্যাপারটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। 'কোম্পানি ও তার কর্মীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য' তারা যেসব ভূমি দখল করেছে, সেটাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্যই এই 'গল্পে'র অবতারণা করা হয়েছে।[৮৫] লর্ড লেইক ১৮১৯ সালে মারাঠিদের পরাজিত করেন। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড টমসন বলেছেন, তখন থেকেই 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কোনো [ভারতীয়] শাসককে তার সমকক্ষ মনে করাটা হয় বোকামি, নয়তো ভণ্ডামি আর নয়তো অতিভদ্র শব্দচয়নের ফল'।

এই পুরো ব্যবস্থার ওপর সর্বেসর্বা ছিলেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল। এমনিতে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত একজন নির্বাহীমাত্র। কিন্তু বাস্তবে তার সমীক্ষাধীন এলাকার পুরোদস্তুর রাজা। এক সামসময়িক পর্যবেক্ষকের কথা উদ্ধৃত করেছেন উইলিয়াম ডালরিম্পল :

> 'ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেলের অবস্থানটা গোটা মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত এবং একইসাথে সবচেয়ে ধোঁয়াশাপূর্ণ। তিনি একজন বেসরকারি ইংরেজ ভদ্রলোক এবং একটি সমন্বিত পুঁজি কোম্পানির চাকুরে। সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যটির ভারপ্রাপ্ত সার্বভৌম প্রভু, ১০ কোটি মানুষের শাসক। অধীন রাজা ও রাজকুমাররা অক্ষম সমীহ ও বশ্যতাসহকারে তার প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে দেন। ইতিহাসে এরকম পদ আর দ্বিতীয়টি নেই...।'[৮৬]

তাই ব্রিটিশদের বানানো প্রশাসনটা ছিল অস্থায়ী ধাঁচের। ফলে তা ভারতের সরকারব্যবস্থাকেও ভেঙে দিতে থাকে। কোম্পানি ১৭৪৬ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে তিনটি 'কর্নাটক যুদ্ধ' করেছে। এটি একদিকে যেমন ভারতের ভূমি দখলের অভিযান, তেমনই ফরাসিদের টেক্কা দেওয়ার খেলা। ইউরোপেও তখন ব্রিটেন-ফ্রান্স যুদ্ধ চলছে। ভারতের মাটিতে তাদের ঠোকাঠুকি সেটারই প্রতিফলন। এরকম অনেক যুদ্ধে ও অভিযানে কোম্পানি নিঃসংকোচে তার সামরিক দায়িত্বগুলো অর্পণ করেছে ভাড়াটে সৈনিক এবং নানা রকম সশস্ত্র দলের হাতে। বিশেষজ্ঞদের চোখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি সামরিক পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র। বিভিন্ন বাউন্ডুলে যোদ্ধাদলকে দিয়ে তারা কাজ আদায়

---

[৮৫] বোল্টস, ১৭৭২, পৃ. ৬।
[৮৬] ডালরিম্পল, 'দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'।

করিয়ে নেয়—কোনো আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ধার ধারে না। কোম্পানি টাকার বিনিময়ে সৈনিকদের দিয়ে যুদ্ধ করায়। অন্যান্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও তা-ই করে। নানা রকম সুবিধা প্রদান করে সমর্থন আদায় করে বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকে। আধুনিক ভাষায় বললে, সহিংসতার দায়িত্বটা চুক্তি আকারে অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষদের কাঁধে দিয়ে দেওয়া হতো। এভাবেই ব্রিটিশরা অনানুষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ভারতকে জয় করতে থাকে। ফলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশ থমকে যায়।

বাঁধনহীন ভাড়াটে যোদ্ধাদের শরণাপন্ন হয়ে ভারতের সর্বনাশ করে ব্রিটিশরা। যেমন—লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে এই অনিয়মিত সেনাদলকে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত রসদ ছিল না, তাই তিনি তাদের নিজ দায়িত্বে নিজেদের খানাপিনা সংগ্রহ করে নেওয়ার আদেশ দেন। ফলে যুদ্ধের যত অগ্রগতি হয়, ততই বাড়ে লুটতরাজ ও অত্যাচার। ততই বাড়ে স্থানীয় জনগণের দুর্দশা ও বঞ্চনা। কিন্তু অঞ্চল জয় করার পরও কোম্পানি সেখানকার অধিবাসীদের কল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। যেসব ছুটা যোদ্ধা ও ভাড়াটে সৈনিক কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট, তাদের ইচ্ছেমতো লুটপাট করার লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের সুশাসনে এই ছিল ব্রিটিশদের অবদান।

অবশ্য বেশিদিন এভাবে অঞ্চল জয় করতে হয়নি। এর কারণ কোম্পানির প্রশ্নাতীত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষত ক্লাইভ যে 'অন্যান্য ইউরোপীয় বসতি'র কথা বলেছিলেন, সেই সবগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়। কোম্পানি কিন্তু তখনো একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখন থেকে সরাসরি দেশীয় শাসকদের উৎখাত করা এবং তাদের রাজ্য দখল করে ফেলার ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। রানি ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণার মাধ্যমে শাসনভার হাতে নেয় ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষ। তখন তারা ভারতীয় শাসকদের মোটাদাগে স্ব স্ব স্থানে বহাল রাখে। তবে তাদের অবস্থান ব্রিটিশদের অধীনে। (ব্রিটিশরা তাদের ক্ষমতার চর্চা করত শাসকের দরবারে নিয়োগকৃত একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে। এই কর্মকর্তার পদের নামটি খুবই ভদ্রস্থ, 'দ্য রেসিডেন্ট'। কিন্তু এই বিনয় শুধু নামেই। বাস্তবে তিনিই পুরো ক্ষমতার মালিক। ব্রিটিশরা কীভাবে নরম কথার আড়ালে নিজেদের পাশবিক ক্ষমতাকে ঢেকে রাখে, তারই আরেক উদাহরণ।)

ধাপে ধাপে ভারত জয় করার সময় ব্রিটিশরা কিছু ক্ষেত্রে পরাজিত শাসকের অঞ্চল সরাসরি দখল করে নেয়নি। সেসব ক্ষেত্রে তারা ওই শাসকের ওপর অসম চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এই পুরো অধ্যায়জুড়ে আমি দেখিয়েছি, কীভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে ভারতকে শাসন করেছে ব্রিটিশরা। ভারতের

রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লেশমাত্র সদিচ্ছা নেই এগুলোর কোনোটাতে। অথবা যে নামেমাত্র শাসকদের নাম ব্যবহার করে ক্ষমতার চর্চা করা হয়েছে, তাদের প্রতিও কোনো সম্মান দেখানো হয়নি।

আরেকটা গপ্প ফাঁদা হয় যে, ব্রিটিশদের হাতে উৎখাত হওয়া শাসকরা সবাই ছিলেন মারাত্মক লোভী। কোম্পানির যত ত্রুটিই থাকুক, ওই শাসকদের তুলনায় তারা খারাপ ছিল না।[৮৭] এটা নির্জলা মিথ্যে। ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালের আগে যেসব দেশীয় শাসককে হারিয়েছে এবং এলাকা দখল করেছে, তাদের বেশিরভাগই হয়তো দয়ালু আর নয়তো অত্যাচারের অভিযোগমুক্ত। তিনটেমাত্র উদাহরণ হলেন মারাঠি পেশওয়াগণ, মাইসুরুর শাসকবৃন্দ এবং ঔধের দাবাড়ু নবাব। অপশাসনের কোনো অভিযোগ ছিল না তাদের নামে। কেউ ছিলেন এতই ক্ষমতাশালী যে, তা ঔপনিবেশিক শক্তির অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; আর নয়তো এতই ধনাঢ্য যে, ব্রিটিশদের লালা ঝরা থামছিল না। (সময়ে সময়ে ভারতে সুশাসনের অসাধারণ সব উদাহরণও দেখা গেছে, বিশেষ করে ত্রাভাঙ্কোর রাজ্য। তারাই বিশ্বের প্রথম সরকার, যারা ১৮১৯ সালে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও বিনা মূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার আইন জারি করে।) উৎখাতকৃত শাসকদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের আনীত অভিযোগগুলো অধিকাংশই কাল্পনিক।

১৯০৭ সালের এক গবেষণা বলে, 'অতীত শাসকদের ব্যাপারে এইসব নৈরাশ্যবাদী অভিযোগের তেমন কোনো ভিত্তিই নেই। আসল কারণ ছিল ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা, তা সে যতই অসাধু উপায়ে হোক না কেন।' যেসব শাসকের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগের কিছুমাত্র ভিত্তি ছিল, তারা মূলত দুই ধরনের। এক দলকে কোম্পানি নিজেরাই ক্ষমতায় বসিয়েছে, আরেক দলকে বিংশ শতাব্দীতে তাদের স্বদেশি সংস্কৃতি থেকে উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইটোন ও হ্যারোতে তাদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে ফেরত আনা হয় দেশে। ফলে নিজ ভূমিতেই তারা হয়ে পড়ে বিদেশি।

এর মানে এই নয় যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে সর্বদা সর্বত্র সুশাসন ছিল। তখন ভাঙনের একটি পর্যায় অতিক্রম করছিল দেশটি। মুঘল শাসনের অবক্ষয় ঘটছিল। অনেক জায়গার অবস্থাই ছিল নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ এটা দেখানো যে, ব্রিটিশ দখলদারিকে তখনকার ভারতীয়রা মোটেও অবস্থার উন্নয়ন হিসেবে দেখেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের বেশিরভাগ সময়জুড়েই ভারতের এমনসব সরকারকে হটানো হয়েছে, যারা

[৮৭] হাইন্ডম্যান: রিপোর্ট অন ইন্ডিয়া, ১৯০৭, রুইন অব ইন্ডিয়া বাই ব্রিটিশ, পৃ. ৫১৩–৫৩৩।

ছিল মোটামুটি ন্যায়পরায়ণ এবং জনগণের কাছে মোটাদাগে গ্রহণযোগ্য। সে জায়গায় যেসব ব্রিটিশ শাসককে বসানো হয়েছে, তাদের সার্বিক উদ্দেশ্য ও শাসনপদ্ধতি ছিল উৎখাত-হওয়া শাসকদের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

রত্ন এবার রাজমুকুটে

ভারতে কোম্পানির শাসন যে অপশাসন ছিল, এই দাবি অকাট্য। স্বয়ং ব্রিটিশরাই এর একাধিক প্রমাণ রেখে গেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিখ্যাত অভিশংসনে সেসব কথা বলেছেন এডমান্ড বার্ক। নাবোবদের লোভ-লালসার সমালোচনা করতে গিয়ে একই কথা তুলে ধরেছেন ম্যাকাউলি। ক্লাইভও তা প্রমাণ করেছেন আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের জীবন সাঙ্গ করে। এরপর ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষ তার সাম্রাজ্যের 'রত্ন'টিকে শাসন করার দায়িত্ব হাতে নেয়। এবারে যুক্তিতর্ক কিছুটা পালটে যায়। রানি ভিক্টোরিয়া যখন ১৮৫৮ সালের ঘোষণাটি দেন, তখন ভারতশাসনের জন্য ভিন্নতর এক বয়ান হাজির করে ব্রিটিশরা। তারা নাকি শাসন করবে 'সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি[র উদ্দেশ্যে], যা নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুশাসনের বিকল্প নেই...।' মহারানি বলেন, '[আমরা] মনেপ্রাণে চাই ভারতের শিল্পখাতে শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হোক, জনগণের উপকার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলুক, এবং সেখানে বসবাসরত আমাদের সকল প্রজার কল্যাণ হোক। এ উদ্দেশ্যে আমরা সরকার পরিচালনা করব। তাদের সমৃদ্ধিই আমাদের শক্তি, তাদের সন্তুষ্টিই আমাদের নিরাপত্তা, আর তাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের সর্বোত্তম পুরস্কার।'

এটা হলো 'তোমাদের ভালোর জন্যই আমরা শাসন করছি' ঘরানার এক জ্বালাময়ী ইশতিহার। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নগ্ন লালসাকে অন্তত মৌখিকভাবে জোরেশোরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এখানে। বেঞ্জামিন ডিজরায়েলি দেখিয়েছেন, ১৮৭৭ সালের অভিষেকের পর ব্রিটিশ রাজশক্তি হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যশক্তি—রানি হয়েছেন সম্রাজ্ঞী, ভারত তার নবীনতম এবং সবচেয়ে চকমকে সম্পত্তি, আর বিশ্বজুড়ে তার আধিপত্যের বিস্তৃতি ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল আড়ম্বরের আধিক্য। ভারতে ব্রিটিশরা জাঁকজমকের পেছনে প্রচুর খরচ করেছে। কিন্তু এই চাকচিক্যের পেছনে একটা সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যও ছিল। জ্যান মরিস বলেন, ব্রিটিশরা এর মাধ্যমে 'স্থানীয় জনতার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছে, নিজেদেরও সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। রাজরাজড়াদের দেশ ভারতে ইচ্ছে করেই এসব রাজকীয়তার ভেলকি দেখিয়েছে তারা, যাতে শাসনকাজ

সহজ হয়।'[৮৮]

এই 'চমকে-ভড়কে দেওয়া' নীতির অংশ হিসেবেই তিনটি প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন করা হয়। সাম্রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় এসব দরবার। ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবে রানি ভিক্টোরিয়ার মুকুটলাভকে স্মরণীয় করে রাখতে ভাইসরয় লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে এক জমকালো দরবার বসে ১৮৮৭ সালে। সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষ্যে লর্ড কার্জন আরও বড় করে দরবার আয়োজন করেন ১৯০৩ সালের নিউ ইয়ার'স ডে-তে। আর সর্বশেষ দরবারটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালে, নতুন রাজধানী দিল্লিতে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানি ম্যারিকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে।

জৌলুসের চূড়ায় থাকাকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে এক নতুন রাজধানীর পরিকল্পনা করে। বিশাল ও দারুণ নজরকাড়া রাজধানী গড়ে তোলা হয় নয়াদিল্লিতে। ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক জর্জ ক্লেমেন্সু এ ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি। তার দৃষ্টিতে এটি সাম্রাজ্যবাদী ত্রুটির লম্বা তালিকায় সর্বশেষ সংযোজনমাত্র। কথিত আছে, ১৯২০ সালে অর্ধনির্মিত নয়াদিল্লিকে দেখে হেসে উঠেছিলেন তিনি। চারপাশে ছিল অতীতের সাতটি শহরের ধ্বংসস্তূপ। সেগুলোও এই একই জায়গাতেই অবস্থিত ছিল। ক্লেমেন্সু বলেছেন, 'Ca sera la plus mangnifique de toutes ces ruines.' (এটাই হতে চলেছে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ধ্বংসস্তূপ।) বহু বছর পর ব্যবস্থাপনা তত্ত্ববিদ সি. নর্থকোট পারকিনসন কিছু সূত্র প্রদান করেন। দ্বিতীয় সূত্রটি হলো, যে-কোনো শাসনব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারানোর ঠিক আগে সবচেয়ে জমকালো সৌধগুলো নির্মাণ করতে শুরু করে। এর একটি উদাহরণ হিসেবে নয়াদিল্লির কথা তুলে ধরেন তিনি।[৮৯]

দিল্লিতে লর্ড কার্জন যে বিলাসবহুল দরবারের আয়োজন করেছিলেন, তা ধরে ধরে বর্ণনা করেছেন মরিস। হাতি আর ট্রাম্পেট দিয়ে সজ্জিত করা হয় চারিদিক। রত্নখচিত মহারাজাগণ সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। উপমহাদেশের প্রতিটি কোনা থেকে লোকজন এসে জড়ো হয় এই রাজকীয় প্রদর্শনী দেখার জন্য, 'মঞ্চের আড়ম্বর বাস্তবে'। কার্জন যথার্থই দরবারের চলচ্চিত্র ধারণ করিয়ে রাখেন, সে যুগের হিসেবে যেটা আনকোরা নতুন এক প্রযুক্তি। (মহাত্মা গান্ধি অবশ্য তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, বহু মহারাজা

---

[৮৮] জ্যান মরিস, ফেয়ারওয়েল দ্য ট্রাম্পেটস: অ্যান ইম্পেরিয়াল রিট্রিট, লন্ডন: ফেবার অ্যান্ড ফেবার, ১৯৭৮।

[৮৯] সি. নর্থকোট পারকিনসন, পারকিনসন'স ল: দ্য পারস্যুট অব প্রোগ্রেস, লন্ডন: জন মারে, ১৯৫৮।

পেছনে পেছনে এসব ঝামেলাকে বড়ই ঘৃণা করতেন। এসবের জন্য তাদের পরিধান করতে হতো জবরজং পোশাক আর ভারিক্কি সব অলংকার। না হলে যে ব্রিটিশদের মন ভরবে না, তাদেরকে সিংহাসনে থাকতেও দেবে না।)[৯০]

তিনটি দরবারের মধ্যে কার্জনেরটাই ছিল সবচেয়ে জাঁকজমক। তিনি এটার আয়োজন করেছেন এক বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের মাত্র দুই বছর পর। ভাইসরয় থাকাকালে এই লোকটা রাজকীয় আড়ম্বরের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। জ্যান মরিস এটাকে বলতেন কার্জনের 'প্রভুত্ব ফলানোর রুচি' এবং নায়াল ফার্গুসনের ভাষ্যে এসব তার 'টোরিয়েন্টালিজম'। এসব ছিল কার্জনের ভাইসরয়গিরির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এতই সতর্কতার সাথে তিনি এসব করতেন, যা কোনো প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের ব্রিটিশ ভদ্রলোকের সাথেই মানানসই (তার পরিবার নর্ম্যান জাতির বংশধর)। অক্সফোর্ডের ছাত্র থাকাকালে তাকে পচিয়ে চার ছত্রের একটা Balliol ছড়া বলা হতো, যেটা কার্জনকে জীবনভর তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। যখনই তিনি নতুন কোনো পদে নিয়োগ পেতেন, গণমাধ্যম এই ছড়াটার উদ্ধৃতি দিতে ভুলত না: 'My name is George Nathaniel Curzon /I am a most superior person /My hair is black, my face is sleek /I dine at Blenheim every week.'[৯১] স্নাতক বয়সের এই কৌতুকের মাধ্যমে যেমন তিনি অমর হয়েছেন, তেমনই হয়েছেন ভাইসরয়গিরি করেও। এটি তার চূড়ান্ত ব্যর্থ রাজনৈতিক জীবনের অন্য সব অর্জনকে ছাপিয়ে গেছে। ছোটকাল থেকেই ভাইসরয় হওয়ার বাসনা লালন করে আসছিলেন কার্জন। কাজে ও সাজে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এখানে একটা রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে আসতে চেয়েছেন।

কার্জন যে ধরনের বাড়াবাড়ি সাজসজ্জা করতেন, ব্রিটিশ লেখক ডেভিড ক্যানাডাইন সেটার নাম দিয়েছেন 'অর্নামেন্টালিজম'। তার মতে, কার্জন এক 'আয়োজনসর্বস্ব ব্যক্তি'। ক্যানাডাইন গোটা একটা বই লিখে আলোচনা করেছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরোটা জুড়ে আছে স্রেফ 'খানদানি ও সম্ভ্রান্তগিরি, ঐতিহ্য আর কদর, নিয়মকানুন আর পরাধীনতা; গৌরব আর শৌর্য, হাতি

---

[৯০] শুধু যে মহারাজাদেরই কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তা নয়। ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশদের চাপানো ড্রেসকোডের ভুক্তভোগী প্রতিটি স্কুলগামী ভারতীয় শিশু, বিশেষ করে টাই নামক একটা ফাঁস তাদের প্রত্যেকের গলায় চিরকালের জন্য ঝুলে গেছে, এমনকি আজও পর্যন্ত ভারতের ফুটন্ত আবহাওয়ায় তারা এটা পরতে বাধ্য।

[৯১] আমি ১৮৯০-এর দশকের ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো ঘেঁটে এই সংস্করণটার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি। পরে লোকমুখে এর আরও উন্নতি ঘটেছে। তাই কিছু পাঠক হয়তো তৃতীয় চরণে My cheek is pink, my hair is sleek শুনে থাকবেন। (অনুবাদকের সংযোজন: ব্লেনহিম ক্যাসেল বা প্যালেস হলো ইংল্যান্ডের অন্যতম বৃহত্তম একটি রাজকীয় বাসভবন।)

আর ঘোড়া, নাইট আর পিয়ার, শোভাযাত্রা আর অনুষ্ঠান, পালকযুক্ত হ্যাট আর পশমি আলখাল্লা; চিফ আর আমীর, সুলতান আর নবাব, ভাইসরয় আর প্রোকনসাল; সিংহাসন আর মুকুট, শাসন আর পদমর্যাদা, চাকচিক্য আর আলংকারিকতা'।[৯২] পুরো শাসনামলজুড়ে এসব চালিয়ে যায় তারা। অবশেষে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের সময় আসে। সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাড়ম্বর পোশাক তখন তার নড়বড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে বড়ই বেখাপ্পা ঠেকে।

ব্রিটিশরা যে শানশওকতের বাহার দেখাত, তা শুধু তাদের নিজেদের রানিকে সম্মান দেখানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পদমর্যাদার ক্রম রক্ষা করার এই ধারা ভারতেও ছড়িয়ে দেয় তারা। 'দেশীয় শাসক'দের তাজিম করার প্রচলন চালু করা হয়। কিছু মানুষকে দেওয়া হয় অভিজাত সব পদ-পদবি। সৃষ্টি করা হয় একটা বানোয়াট অভিজাতপ্রথা। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনকে বৈধতা প্রদান। ব্রিটিশরা একটি দরবারি সংস্কৃতি চালু করে, যা শাসকরা মেনে চলতে বাধ্য। ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষকে দেখানো হয় মুঘল সম্রাটের উত্তরসূরি হিসেবে, এরপর মর্যাদার ক্রম অনুযায়ী তাদের নিচে অন্যান্য দেশীয় শাসক। ফাঁকা গুলি ছুড়ে সম্মান জানানোর নিয়মও সাজানো হয় খুব ভেবেচিন্তে। ৯ থেকে ১৯টি পর্যন্ত ফাঁকা গুলির সালাম পেতেন একেকজন শাসক (শুধু পাঁচজনের ক্ষেত্রে ২১টি করে দেওয়া হয়েছিল)।[৯৩]

ব্রিটিশদের সাথে মাখামাখির পরিমাণ অনুযায়ী এই সম্মানের মাত্রা নির্ধারণ করা হতো। কাকে 'হাইনেস' ডাকা যাবে বা যাবে না, সেই নিয়মও ঠিক করা হয়। (হায়দ্রাবাদের নিযাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হিজ হাইনেস থেকে পদোন্নতি পেয়ে হিজ এক্সলটেড হাইনেসে পরিণত হন। যুদ্ধে মূলত বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি।) শব্দচয়ন করা হয় নিখুঁত হিসাবনিকাশ করে। 'দেশীয় নেতৃবৃন্দ' ('রাজা' না কিন্তু) হলেন 'শাসক' পরিবারের সদস্য, 'রাজপরিবারে'র না। তাদের শাসিত এলাকাগুলো 'রাজ্য' না, বরং 'প্রিন্সলি স্টেইট'। এই সবকিছু মিলিয়ে একটা রাজকীয়তার মায়াজাল

---

[৯২] ডেভিড ক্যানাডাইন, অর্নামেন্টালিজম: হাউ দ্য ব্রিটিশ স দি এম্পায়ার, লন্ডন: অ্যালেন লেইন, ২০০১।

[৯৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শুধু হায়দ্রাবাদ, বারোদা ও মাইসুরু ২১ ফাঁকা গুলির সালাম পেত। গোয়ালিওর এবং জম্মু ও কাশ্মীর এই তালিকায় যুক্ত হয় যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯২১ সালে। বিশ্বযুদ্ধে সেসব জায়গার সৈনিকেরা ব্রিটিশদের যে সেবা দিয়েছে, তারই পুরস্কার এটা। অন্য রাজাগণ নিজেদের শাসনাঞ্চলের ভেতর ২১ সালাম নিতে পারেন, তবে বাইরে ১৯টির বেশি না ইত্যাদি। মানে, নিয়মকানুনের বাহার দেখে বলিহারি যেতে হয়।

তৈরি করে রাখা হয়, এমনকি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে রাখা হয় একই রকমের দুটো দরজা। যদি সমমর্যাদার দুজন ভারতীয় শাসককে একইসাথে স্বাগত জানানোর প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কাউকে যেন কারও চেয়ে ছোট না করা হয় ইত্যাদি...।

এত নিয়মকানুন আর জাঁকজমক চাপিয়ে দেওয়ার পরও ব্রিটিশরা তাদের বানানো এই অভিজাত ভারতীয়দের থোড়াই দাম দিত। ব্যাপারটি ভালো করে তুলে ধরেছেন ডেভিড গিলমোর। কার্জন নিজেই এসব 'আধা-ইংরেজ, আধা-বিজাতীয়, ইউরোপীয় নারীকামুক, মেকি খেলুড়ে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই মদারু দেশীয় তরুণ নেতা'কে দেখে নাক সিটকাতেন। কিন্তু তিনি এও উপলব্ধি করেন যে, দোষটা ব্রিটেনেরই। তারাই সাম্রাজ্যের একটা শ্রেণি হিসেবে ভারতীয় রাজরাজড়াদের সৃষ্টি করেছে। এক ব্রিটিশ কর্মকর্তার কথা বলা যাক। তিনি মধ্য ভারতে কর্মরত ছিলেন ১৮৮৮ সালে। তিনি জানিয়েছেন, 'রাজ তরুণদের নিয়ে একটি ইংরেজি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম' আয়োজন করা হয়েছিল। ফলাফল হিসেবে তখন পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন '২টা সমকামী, ১টা অপদার্থ, ১টা নেশাখোর...[এবং] গনোরিয়ার কারণে রানির জন্মদিনে হাজির হতে না-পারা একজন জেন্টলম্যান'।

কার্জন নিজেই ১৯০০ সালে অভিযোগ করেন, রত্নখচিত ভারতীয় রাজপুত্তুররা আদতে 'মূর্খ এবং কিছুক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র অপব্যয়ী ও অলস লোক'। রানি ভিক্টোরিয়াকে চিঠিতে লিখেছেন, ধোলপুরের রানা 'রাতারাতি একজন কুটিল ও মদ্যপ লোকে পরিণত হচ্ছেন'। পাতিয়ালার মহারাজা 'প্রতারক পর্যায়ের লোক'। মহারাজা হোলকার একটা 'আধা-পাগল' এবং 'ভয়ানক সব অপরাধে আসক্ত'। কাপুরথালার রাজা প্যারিসে ঘুরে ঘুরে নাগরগিরি করা ছাড়া আর কিছুই পারেন না।[৯৪] হ্যাঁ, আলোকিত ও উদার মনের অধিকারী ভারতীয় রাজাও ছিলেন। কেউ কেউ তো ছিলেন রীতিমতো দূরদর্শী নেতা। বারোদা, থিরুভাংকোড় ও মাইসুরি এরকম তিনটি উদাহরণ। এখানকার শাসকরা ছিলেন নক্ষত্রের মতো, প্রজাদের কল্যাণকামী আদর্শ রাজা, কিন্তু সুশাসনের গল্পের চেয়ে চরিত্রহীন রাজাদের কাহিনি সংখ্যায় অনেক বেশি।

অ-ভারতীয় সরকারি সেবা ব্রিটিশ রাজ যখন ভারতশাসন শুরু করে, তার বাহিরটা ছিল যথেষ্ট পরিপাটি ও সুদর্শন। মহারানি তার শাসনের ভেতরটাকে আরও ভালোভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন। তার ১৮৫৮ সালের বিখ্যাত ঘোষণায়

[৯৪] ডেভিড গিলমোর, কার্জন: ইম্পেরিয়াল স্টেইটসম্যান, নিউ ইয়র্ক: ফারার, স্ট্রস অ্যান্ড জিরুক্স, ২০০৩।

তিনি ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, 'আমাদের প্রজাগণ ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে অবাধে ও নিরপেক্ষভাবে চাকুরিতে ঢুকবেন। শিক্ষা, যোগ্যতা ও সততার ভিত্তিতে চাকুরি পাবেন তারা।'

কিন্তু বাস্তবতা কী ছিল? উইল ডুরান্টের ভাষায় 'রাজনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক ঘৃণা' ছিল। বাংলার ঔপনিবেশিক প্রশাসক এফ. জে. শোর হাউজ অব কমন্সের সামনে স্বীকারোক্তি দেন, 'সবচেয়ে নীচ ইংরেজকেও যে সম্মান, মর্যাদা ও চাকরি দেওয়া হয়, ভারতীয়রা সেটা থেকেও বঞ্চিত।' কয়েক দশক পর ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে ভারতীয় স্নাতকরা। কিন্তু এসে দেখে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে নিচু সরকারি চাকরিগুলো তাদের জন্য বরাদ্দ। ডুরান্টের মতে, ১৯৩০ সালে এসেও ইন্ডিয়ান (শুরুতে ছিল 'ইম্পেরিয়াল') সিভিল সার্ভিসের টপ ক্যাডারদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ছিল ভারতীয়।

এমন কিন্তু নয় যে, সবচেয়ে সেরা ও মেধাবী ব্রিটিশরাই ভারতে চাকরি করতে আসত। লর্ড আসকুথ ১৯০৯ সালে বলেন, 'ভারতে উঁচু পদগুলো দখল করে রেখেছে সব অযোগ্য ইংরেজ। তাদের দ্বিগুণ যোগ্যতাধারী হিন্দুদেরও যদি সেসব চাকরিতে বসানো হতো, তাহলে চারিদিকে ছি ছি ধ্বনি শুরু হয়ে যেত।' সাদামাটা মেধার অধিকারীরা সব চাকরিতে গেড়ে বসে ছিল। আর তারা বেতন পেত ভারতীয়দের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কারণ, ওদের 'কষ্ট করে' ভারতের উত্তাপ সহ্য করা লাগত। অথচ বেশিরভাগ ইংরেজের কাছে কিন্তু সূর্যের এই উষ্ণতা বরং স্বস্তিদায়ক, নিশিময় বিলাতের ঠান্ডা ও ধূসর কুয়াশা থেকে একটুখানি মুক্তি। (রুডইয়ার্ড কিপলিং তার দ্য লাইট দ্যাট ফেইল্‌ড উপন্যাসে যেমনটি বলেছেন। লন্ডনে ফিরে গিয়ে সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে : 'কুয়াশার একটা পাতলা ধূসর চাদর ঝুলে আছে শহরটার ওপর, রাস্তাগুলো প্রচণ্ড ঠান্ডা; কারণ, ইংল্যান্ডে তখন গ্রীষ্মকাল।') এরাই আবার ছিল অত্যন্ত নাক-উঁচু স্বভাবের। বেশিরভাগ সময় ভারতীয়দের অসহ্য রকমের খবরদারি করত (বাকি সময়টুকুতে করত ঘৃণা)। জওহরলাল নেহরু তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেছেন : ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস 'না ইন্ডিয়ান, না সিভিল, আর না কোনো সার্ভিস'।[৯৫]

ব্রিটিশরা ঊনবিংশ শতকের ভারতকে শাসন করেছে অবিচল আত্মাভিমান-সহকারে। পুরোটাজুড়ে ছিল শুধু প্রোটোকল, মদের বোতল আর প্রচুর

---

[৯৫] জওহরলাল নেহরু, গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি: বিয়িং ফারদার লেটারস টু হিজ ডটার, লন্ডন: লিন্ডসে ড্রুমন্ট লি:, ১৯৪৯, পৃ. ৯৪।

ঘৃণা-বিদ্বেষের বোল। 'মাত্র কয়েকশ ইংরেজ মিলে গোটা ভারতকে শাসন করা'র ব্যাপারটা স্ট্যালিনের কাছে মনে হয়েছে 'হাস্যকর'।[৯৬] গাণিতিকভাবে তার কথা খুব একটা সঠিক না হলেও মূল বক্তব্যটা ঠিকই আছে। ভারতে ১৮০৫ সালে মাত্র ৩১,০০০ ব্রিটিশ বাস করত (তাদের মধ্যে ২২,০০০ সেনাবাহিনীতে আর ২,০০০ বেসামরিক প্রশাসনে)। এই সংখ্যা ১৮৫৭ সালের পর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। তারপরও ১৮৯০ সালে ৬,০০০ ব্রিটিশ কর্মকর্তা শাসন করত ২৫ কোটি ভারতীয়কে। সাথে সৈনিক হিসেবে ছিল প্রায় ৭০,০০০ ইউরোপীয় এবং তাদের চেয়েও বেশিসংখ্যক উর্দিধারী ভারতীয়। ১৯১১ সালে ভারতে বাস করত ১,৬৪,০০০ ব্রিটিশ (যাদের মধ্যে ৬৬,০০০ সেনা ও পুলিশ এবং মাত্র ৪,০০০ বেসামরিক প্রশাসনের লোক)। তাদের শাসিত দেশটির জনসংখ্যা তখন ৩০ কোটি ছুঁইছুঁই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে ছিল বর্ণবাদী আত্মম্ভরিতা, উন্নততর সামরিক প্রযুক্তি, আধুনিকতার মায়াজাল এবং আলোকায়ন ও প্রগতিবাদী ফাঁদের অসাধারণ সমন্বয়ে। প্রয়োজনমতো বলপ্রয়োগের বিষয়টাও ছিল তার সাথে। এও ভুললে চলবে না যে, বিজিতরাও ছিল লোভী ও সুযোগসন্ধানী। পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি তারা। ব্রিটিশরা কোনোকালেই ভারতের মোট জনসংখ্যার ০.০৫ শতাংশের বেশি হয়নি।[৯৭] হবসম প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'অল্পকিছু মানুষের পরম ভক্তি এবং অসংখ্য মানুষের নিষ্ক্রিয়তার বদৌলতে এত সহজে জিতে গেছে, এত কমের ওপর দিয়ে পার পেয়ে গেছে, এত উদ্ভট রকম সহজে শাসন করতে পেরেছে।'[৯৮]

ক্লাইভের আমলে কোম্পানি একটি 'দ্বৈত' ব্যবস্থা চালু রেখেছিল: কোম্পানিই মূল ক্ষমতার মালিক, কিন্তু সামনে সাঁটিয়ে রাখত একজন পুতুল নবাবকে। ওয়ারেন হেস্টিংস এসে এই অভিনয়ের সমাপ্তি ঘটান এবং নবাবকে ছুড়ে ফেলে দেন। এবার প্রশাসন সরাসরিই কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। কর্নওয়ালিস ১৭৮৫ সালে কোম্পানির কর্মচারীদের নিয়ে একটা ক্যাডার বাহিনী তৈরি করেন। তারা কোম্পানির পক্ষ থেকে দেশ চালাবে। সবগুলো উঁচু পদ ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিটা জেলার দায়িত্বে একজন করে ইংরেজকে

---

[৯৬] ভারতবাসী সহমর্মী ব্রিটিশদের জীবনী, কর্মজীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি জানতে দ্রষ্টব্য ফিলিপ ম্যাসন, দ্য মেন হু রুলড ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: ডাব্লিও. ডাব্লিও. নর্টন, ১৯৮৫ এবং চার্লস অ্যালেন, প্লেইন টেইল্‌স ফ্রম দ্য রাজ, লন্ডন: অ্যাবাকাস, ১৯৮৮।

[৯৭] ম্যাডিসন, 'দি একোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অব কলোনিয়াল রুল ইন ইন্ডিয়া', ক্লাস স্ট্রাকচার।

[৯৮] এরিক হবসম, দি এইজ অব এম্পায়ার, হ্যাশেট, ২০১০, পৃ. ৮২।

বসানো হয়। তাদের পদের বাহ্যিক নাম 'কালেক্টর', যেহেতু রাজস্ব সংগ্রহ করাটাই তাদের প্রধান দায়িত্ব। এই কালেক্টরই তার এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বৈত খেদমত আঞ্জাম দিত।[৯১] ব্রিটিশরা তাই সরকার চালায়, খাজনা তোলে, আর বিচারকার্য বলতে যা বোঝায় তাও করে। একটা কাজেও ভারতীয়দের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

এই কাজগুলো করতে করতেই একটি সিভিল সার্ভিসের জন্ম হয়ে যায়। কোম্পানির রুই-কাতলারা তাদের চেনা-পরিচিত প্রভাবশালী তরুণদের বাছাই করে নেন। লন্ডনের কাছে হেইলিবারি কলেজে ১৮০৬ সালের পর তাদের প্রশিক্ষণ দেন কোম্পানির চাকরি করার জন্য। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন করা হয় ১৮৩৩ সালের পরে। অবশ্য ডিরেক্টরদের মনোনীতরা তখনো একটা চোখের ইশারাতেই সরাসরি চাকরিতে ঢুকে যেতে পারত। ১৮৫৩ সালের পর থেকে পুরো বাছাইপ্রক্রিয়াই হয়ে যায় পরীক্ষানির্ভর। সকল শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিসের চাকরি ছিল পরম আরাধ্য। কারণ, এর বেতন-ভাতা ছিল হাস্যকর মাত্রায় বেশি। কোম্পানির চাকুরেদের হাতেই ভারতের আসল রাজনৈতিক ক্ষমতা। ব্রিটেনে এর সমতুল্য কোনো চাকরি পাওয়াই অসম্ভব। পরীক্ষায় ভারত বা এর জনগণের সাথে সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান যাচাই করা হতো না। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল খাঁটি ইংরেজ জেন্টলম্যান বাছাই করা। জোরারোপ করা হতো ক্লাসিক্যাল শিক্ষা এবং ভাষাগত দক্ষতার ওপর। ভারতীয়রা পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায় ১৮৬০ সালের পর। কিন্তু ভারতীয় সরকারি সেবা আদতে ব্রিটিশই রয়ে যায়।

এক ভাইসরয় লর্ড মায়ো ঘোষণা করেছেন, 'আমরা সকলে ব্রিটিশ ভদ্রলোক। নিচু এক জাতিকে শাসন করার মহান কাজে নিয়োজিত আছি।' 'বাদামি চামড়ার প্রতি ভাবালুতা' শুধু রানি ভিক্টোরিয়ারই ছিল, আর তেমন কারও না। ডেভিড গিলমোরের ভাষ্যে, ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের জন্য

---

[৯১] ব্রিটিশরা একাধিক সংস্করণবিশিষ্ট এক জটিল প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাঁড় করায়। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বিস্তৃতি যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন একজন গভর্নর-জেনারেল (পরবর্তীকালে ভাইসরয়) এর অধীনে দেশটিকে কয়েকটি প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশে ভাগ করা হতো। প্রতিটির শাসক হিসেবে থাকতেন একজন গভর্নর, অথবা লেফটেন্যান্ট গভর্নর, অথবা কমিশনার। জায়গাটির আকৃতি ও গুরুত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো এই পদ। প্রতিটি প্রেসিডেন্সি বা প্রদেশ আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। শাসন করতেন একজন করে ডিভিশনাল কমিশনার। বিভাগের অধীনে ছিল জেলা। এগুলোই মৌলিক প্রশাসনিক একক। প্রতিটি জেলার প্রধান হিসেবে থাকতেন একজন করে কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ডেপুটি কমিশনার (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবগুলো পদে একজনই থাকতেন। এই মানুষগুলো সাধারণত পঁচিশ থেকে ৩০ বছর বয়সি কোনো ইংরেজ যুবক।)

প্রস্তুত করার মিথ্যে আশা কেউই পোষণ করত না মনে।[১০০] ভারতীয়দের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে কর্তাসুলভ, আর সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে বিদ্বেষপূর্ণ (বিংশ শতাব্দীর পরে এসেও তারা বলত আর লিখত যে, ভারতীয়রা 'বাচ্চাসুলভ', যারা নিজেরা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম)। কিছু পরিবার কয়েক প্রজন্ম যাবৎ ভারতে চাকুরি করেছে, কোনোটা তো আবার তিন শতাব্দী বা প্রজন্মেরও বেশি। কিন্তু এরা কখনোই ভারতে শেকড় প্রোথিত করেনি: সন্তানদের তারা 'দেশের বাড়িতে' পাঠিয়ে দিত স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। আর নিজেরা প্রিয়জনদের থেকে বছরের পর বছর বিচ্ছেদের 'বেদনা সহ্য' করত। এই কথিত আত্মত্যাগ আর হাড়ভাঙা খাটুনির প্রতিদান হিসেবে আইসিএসের কর্মীরা যে বেতন পেত, তা গোটা বিশ্বের যে-কোনো কর্মকর্তার চেয়ে বেশি। সাথে লম্বা লম্বা ছুটি আর নিশ্চিত অবসরভাতা তো ছিলই। কারও কারও জন্য তো উপার্জিত টাকা খরচ করাটাই হয়ে উঠত 'বেশ অসম্ভব'। ইংরেজ রাজনৈতিক সংস্কারক জন ব্রাইট তাই যথার্থই বলেছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেন 'গ্রেট ব্রিটেনের অভিজাত সদস্যদের জন্য বাইরের আলো-বাতাস খাওয়ার এক দৈত্যাকার ব্যবস্থা'।

আইসিএস কর্মীরা ভারতে চাকরি করার জন্য যে মনোভাব নিয়ে এসেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তার নিদারুণ অবক্ষয় ঘটে। প্রথমে ছিল কৌতূহল আর উদ্‌বেগ, পরে তা হয়ে যায় আত্মতুষ্টি ও তাচ্ছিল্য। আইসিএসে ৩০ বছর চাকরি করার পর এইচ. ফিল্ডিং-হল লিখেছেন, 'শাসিতের প্রতি শাসকের পুরো মনমানসিকতাই দূষিত হয়ে গেছে। রয়েছে জানাশোনা ও বোঝাপড়ার অভাব। সেগুলোর জায়গা দখল করে নিয়েছে ভুল ধারণা বা ত্রুটিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। এগুলোর ভিত্তিতে গৎবাঁধা মনোভাব গড়ে ওঠে। এরপর হয়তো পরিস্থিতি পালটায়, তবু মনোভাব সংশোধিত হয় না। তরুণ সেক্রেটারিরা অতীতের নথিপত্র পড়ে, আগের ভুলগুলোই করে যায় বারেবারে।'[১০১]

ব্রিটিশ লেবার পার্টির রাজনীতিবিদ কিয়ার হার্ডির মতে ভারতের ব্রিটিশ শাসন ছিল 'এক বিশাল সামরিক স্বৈরতন্ত্র, যার লাগাম আংশিক ধরে রেখেছিল একটি বেসামরিক আমলাতন্ত্র'। এই আমলাতন্ত্র ছিল সর্বব্যাপী, অতিরিক্ত বেতনভুক্ত, গোঁয়ারের মতো জটিল, নিদারুণভাবে অকার্যকর এবং শাসিত জনগণের কল্যাণের প্রতি মোটাদাগে উদাসীন; অথচ এই জনগণের জন্যই তাদের সৃষ্টি। লর্ড লিটন হাসতে হাসতে ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে বলেছেন

[১০০] ডেভিড গিলমোর, দ্য রুলিং কাস্ট: ইম্পেরিয়াল লাইভস ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান রাজ, নিউ ইয়র্ক: ফারার, স্ট্রস অ্যান্ড জিরুক্স, ২০০৬, পৃ. ৫, ৩৩, ১৯, ২৪৪।
[১০১] ফিল্ডিং-হল, পাসিং দি এম্পায়ার, পৃ. ৫৪।

'অফিস-বক্সের এক স্বৈরতন্ত্র, মাঝে মাঝে যার চাবি হারিয়ে যেত'। এই আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারিতার সূচনা ঘটে কোম্পানি আমলের শুরুতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তখন লর্ড কর্নওয়ালিস বলেন, 'সব অধিকার আজ কাগজে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে গালভারি 'এক্সামিনার অব ইন্ডিয়ান কোরেসপনডেন্স' পদে কাজ করতেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তার মতে, 'ভারতীয় প্রশাসনের বিশাল সাফল্য' এই ছিল যে, 'এটি লেখালেখির ওপর চলত'। কিন্তু আসলে এটা ব্রিটিশ শাসনের বিশাল ত্রুটি। ভারতীয় শাসকরা অতীতে স্থানীয় প্রজাদের সাথে সরাসরি কথা বলতেন, কারণ তাদের একসাথে বসবাস করা লাগত। এখন কোম্পানি তার প্রজাদের থেকে দূরে দূরে থাকে। একটাই ধ্যানজ্ঞান তাদের—সুদূর লন্ডনে-বসা ডিরেক্টরদের কাছে যথাসম্ভব দ্রুত ও সহজে নগদ টাকা পাঠানো। স্টুয়ার্ট মিল যে কাগজের বন্যার এত প্রশংসা করেছেন, সেটার আসল বাস্তবতা তুলে ধরেছেন জন উইলসন। বলেছেন, এসব কাগজ 'চিঠি, খতিয়ান আর হিসাবের এক পাহাড় গড়ে তোলে, যা খুব পরিপাটি করে সাজানো থাকত ঠিকই, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ যে নিয়মে চলে, তার কিছুই এখান থেকে বোঝা যায় না...। কাগজপত্রের গোলকধাঁধায় ঢাকা পড়ে যায় চোখ। রাষ্ট্র আর স্থানীয় নেতাদের মাঝে কোনো সর্বজনীন বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, অথচ এই সম্পর্কের ওপরই এতদিন নির্ভর করত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।'[১০২]

এর আরেকটা অর্থ হলো, এখন সব সিদ্ধান্ত হয় অফিসের ভেতর, বদ্ধ দরজার আড়ালে, বিদেশিদের হাতে। তারা এমনসব মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে, যাদের সাথে তাদের কোনো ওঠাবসাই নেই। শাসকের কাজকর্ম আগে জনসমক্ষে দেখা যেত। এখন তা অবোধ্য সব কাগজের গোপন হাতবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সিদ্ধান্ত যাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে, সিদ্ধান্তদাতারা তাদের দৃষ্টির সীমার আড়ালে। আগে ভারতীয়রা তাদের শাসককে জনসমক্ষে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতে পারত। এখন সেই সুযোগ না থাকায় বেড়ে চলে ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির সুযোগ। ভারতীয়রা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় যে, তাদের মতামত ছাড়াই চূড়ান্ত হচ্ছে সব সিদ্ধান্ত। তাই এসব মহাগুরুত্বপূর্ণ নথিতে কী এমন সোনাটা লেখা আছে, তা জেনে দেওয়ার জন্য করণিকদের হাতে ঢোকে ঘুসের টাকা। বন্ধ দরজার পেছনে কী হচ্ছে, সে ব্যাপারে খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন নদিয়ার রাজা। কালেক্টরের অফিসের এক বাঙালি কেরানিকে ঘুস দেন তিনি। জেলার রাজধানী আর কলকাতার মধ্যে চালাচালি-হওয়া চিঠিতে কী

[১০২] উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ১২৮।

লেখা আছে, তা জেনে দিতে বলেন।[১০৩]

অতীতে যে ভারতীয় শাসকরা জনগণের হাতের কাছে ছিলেন, তাদের সরিয়ে দেয় নতুন অফিসকুনো ব্রিটিশ আমলারা। তারা নতুন নিয়মানুযায়ী কাগজপত্র ওলটপালট করতে বেজায় দক্ষ। কিন্তু প্রজাদের কল্যাণের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। আধিপত্য ফলানোর একমাত্র উপায়টাও হলো ওইসব নিয়মকানুনের দোহাই প্রদান। যখন এতে কাজ হয় না, তখন বলপ্রয়োগে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করাটাই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র পথ। উইলসন বলেন, 'ভারতের গ্রামাঞ্চলে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করাটা এই নতুন নিয়মের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ব্রিটেনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যেসব অসততা ও অপরাধের অভিযোগ উঠেছে, সেগুলো থেকে কোম্পানিকে বাঁচানোটাই ছিল আসল লক্ষ্য। এর জন্যই হয়েছে মেট্রোপলিটান নৈতিক টানাপোড়েনকে শান্ত করার জন্য। কোম্পানি কর্মকর্তারা ভারতে যা-কিছু করছে, সে ব্যাপারে ভারতীয়দের অভিযোগ-অনুযোগকে আমলেই নেওয়া হয়নি।'[১০৪] কোম্পানির অফিসে-রাখা সাজানো-গোছানো খাতাপত্র দেখে 'ব্রিটিশ কর্মকর্তারা তৃপ্তি পান। ভাবেন, তারা একটা কার্যকরী, সুসংহত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছেন। ক্ষমতার একটা কল্পচিত্রে বাস করতেন তারা'।[১০৫]

কোম্পানি-শাসনের এই স্বভাবটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে রাজ-শাসন। নতুন শাসনব্যবস্থাও চলতে থাকে আগের মতো, কোনো পরিবর্তন ছাড়া। লিটনের কথা থেকে বোঝা যায়, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অনেককিছুই ছিল মাত্রাতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক। যে জিনিস চারবার করে ফরমে লেখা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই কিছুতেই অবিচার হতে পারে না! (অথবা স্ট্যাম্প কাগজেও লেখা হয়ে থাকতে পারে। ব্রিটিশদের উদ্ভাবিত এই জিনিস যেন একটা কাগজকে খুব কর্তা-কর্তা ভাব দেয়। ব্রিটিশদেরও অনুভূতি হয়, সব তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।) মনে মনে এই দুর্বল আশা পোষণের কারণেই হয়তো নিয়মকানুন আর কাগজ-দস্তাবেজের প্রতি তাদের এত প্রীতি। আর যে সমাজকে শাসন করছে, সেটার প্রতি এত ভীতি। কারণ, ওই সমাজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ একদমই পলকা। মানসিক অনিরাপত্তা ঢাকতেই তারা একের পর এক নিয়ম-বহি রচনা করে চলে। নিয়ম বানিয়ে সেটা ঢালাওভাবে সবখানে প্রয়োগ করা হবে, প্রেক্ষাপট গোল্লায় যাক। যার ওপর নিয়ম খাটানো হচ্ছে, তার পরিস্থিতি ও প্রয়োজনকে

---

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০,
[১০৪] প্রাগুক্ত, ১২৮–১২৯।
[১০৫] প্রাগুক্ত, ২২৫।

বিবেচনায় নেওয়ারই দরকার নেই। সিদ্ধান্ত হতো নিয়মের ভিত্তিতে, বাস্তবতার ভিত্তিতে না। যেন মানুষের জন্য নিয়ম নয়, নিয়মের জন্য মানুষ। 'একটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য আগে যে রাজনৈতিক দায়িত্ব সামাল দিতে হয়, সেটা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেন কর্মকর্তারা।'

ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে যে-কোনো মানদণ্ডেই অসাধারণ বলতে হয়। ২৪ বছর বয়সি এক জেলা কর্মকর্তা আচমকাই আবিষ্কার করেন, তিনি এখন ৪,০০০ বর্গমাইল এলাকার শাসক। তার অধীনে দশ লাখ মানুষ। জেলা কর্মকর্তাকে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হতো, সেটার তালিকা এক সামসময়িক বর্ণনায় উঠে এসেছে এভাবে—'ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক, জেলার ভূসম্পত্তির অধ্যক্ষ, জমিদার ও ভাড়াটের মধ্যকার বিচারক, আদালতের সরকারপক্ষীয় কর্মকর্তা, জেলার কোষাধক্ষ্য ও হিসাবরক্ষক, স্থানীয় মূল্যমান পরিষদের দায়িত্ববলে প্রেসিডেন্ট, সরকারি উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসাকারী, স্থানীয় যে-কোনো মামলায় সরকার পক্ষের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণপূর্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যস্থতাকারী, নাবালকদের ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাপক, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারক, পুলিশপ্রধান, জেলা পরিষদের দায়িত্ববলে প্রেসিডেন্ট... ।'[১০৬] এই সবগুলো দায়িত্ব পালন করতেন এক তরুণ। যার বসবাস বিদেশ-বিভুঁইয়ে, স্থানীয় ভাষা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে যার জ্ঞান অপর্যাপ্ত, তার কাজের নিয়মকানুন বানিয়ে দিয়েছে দূরবর্তী এক সরকার, তাও আবার ঢালাওভাবে। শাসকের একমাত্র যোগ্যতা, তিনি মনে মনে নিজেকে প্রজাদের চেয়ে শ্রেয় ভাবেন। স্বয়ং ঈশ্বর এই অধিকার দিয়েছেন থাকে। কল্যাণ নেই, আছে শুধু কর্তৃত্ব। এত যে বিশাল দায়িত্বের ফর্দ, এর মধ্যে 'উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড' নামক জিনিসটাই নেই।

এতেই বুঝি শেষ না। এই তরুণকে 'অগ্রাধিকারের নিয়ম' নামক অত্যাচার মেনে চলতে হতো। পদক্রম-সচেতন এক সমাজে সমঝে চলতে হতো কঠোর সব প্রোটোকল। তাস খেলা শিখে নেওয়াটা ছিল তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ওটাই একাকিত্বের একমাত্র ঔষধ। কালক্রমে ঊর্ধ্বতনদের সাথে অসহ্য সব সামাজিকতার সাথেও মানিয়ে নিতে হতো (একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর একই দিনে কয়েক বেলার খাবারের অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন: নৌভ্রমণে দুপুরের খাবার, বিকেলের চা-নৃত্য ও বাগানবিলাস এবং ক্লাবে নৈশভোজ)। বিনোদনের কোনো অভাব ছিল না। ব্রিটিশ আমলারা আনন্দ-ফুর্তির সাথে সাত পাকে বাঁধা। সমতলের অসহনীয় উত্তাপ থেকে বাঁচতে তারা মাসের

[১০৬] হিন্ডম্যান, রুইন অব ইন্ডিয়া বাই ব্রিটিশ।

ছয় মাস অবসর কাটাতেন পাহাড়চূড়ার দুর্গে। সেখানে তারা সময় কাটান বিনোদন, নাচানাচি আর সামাজিক ফষ্টিনষ্টির মধ্যে। ওদিকে পাতালপুরীতে তাদের শাসিত বন্ধুরা তথা ভারতীয় জনগণ নির্দয়ভাবে পিষ্ট হতে থাকে।

শিমলা ছিল গ্রীষ্মের রাজধানী। 'সাময়িক বিধবা' মেমসাহেবরা সেখানকার ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করতেন, আর তাদের স্বামীরা সমতলের গরমে খাটাখাটুনি করে চলতেন। মেমসাহেবদের সময় কাটানোর প্রধান প্রধান মাধ্যম ছিল 'জুয়া খেলা, মদপান করা এবং সপ্তম আজ্ঞা[১০৭] ভঙ্গ করা'।[১০৮]

নিঃসন্দেহে বহু সরকারি চাকুরের হাতে নায়কোচিত অনেক কাজ হয়েছে। তারা খাল খনন করেছেন, কলেজ স্থাপন করেছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কেউ কেউ তো ভারতের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষেও আওয়াজ তুলেছেন। উপমহাদেশের ভূগোলের অংশ হয়ে গেছে তাদের নাম: অ্যাবোটাবাদ, লায়ালপুর, কক্সবাজারের মতো শহর, করবেট পার্ক, কটন হিল, ম্যাকনাবোয়া খাল। আইসিএসে বামপন্থিরা ছিলেন দুর্লভ। এমনই এক ব্যক্তি জন মেনার্ড বলেছেন, 'কুৎসিত মলিন খিটখিটে মানুষেরাই... করে ফেলতেন দারুণ সব কাজকারবার, তাও আবার হাজারো অসন্তুষ্টি ও অসৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও।'[১০৯]

কিন্তু তাদের জীবনযাপনের ধরনটাই এমন ছিল, যার ফলে শাসিত জনগণের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ভারতবাসী ব্রিটিশরা ইংরেজপনার ছোট ছোট দ্বীপ গড়ে তোলে। ঘরের চারপাশ সাজিয়ে তোলে ফার্ন আর গোলাপ গাছ লাগিয়ে। কটেজের নামও দেয় এমন, যা ইংল্যান্ডের স্মৃতিকাতরতায় গদগদ, যেমন—উটির গ্রাসমেয়ার লজ এবং দার্জিলিং-এর উইলোডেইল। উনবিংশ শতাব্দী শুরু হতে হতে ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের একটা আলাদা বর্ণে পরিণত করে। 'নিচু' বর্ণের মানুষ তথা ভারতীয়দের সাথে তারা একসাথে খায় না, তাদের সাথে বিয়েশাদি করে না। বাস করে নিজেদের এলাকায় নিজেদের বাংলোতে। সেসব এলাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং 'সভ্য রেখা' নামে পরিচিত। স্থানীয়দের আবাসস্থল 'ব্ল্যাক টাউনস' থেকে সেগুলো আলাদা। তারা নিজেদের ক্লাবের ভেতরেই থাকে, যেখানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। আনুগত্য বাঁধা পড়ে থাকে তাদের সুদূর স্বদেশের সাথেই। সন্তানদের জাহাজে করে পাঠিয়ে দেয় ব্রিটিশ পাবলিক স্কুলে ভর্তির জন্য। 'নেটিভ'দের সাথে মিশতে দেওয়া হয় না তাদের। তাদের পোশাক ও কেনাকাটার জিনিস আসে

[১০৭] বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের ১০টি আজ্ঞার মধ্যে সপ্তমটি হলো ব্যভিচার না করা। (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪) — অনুবাদক।

[১০৮] গিলমোর, দ্য রুলিং কাস্ট, পৃ. ২৭১।

[১০৯] গিলমোর, দ্য রুলিং কাস্ট, পৃ. ১০৪।

ব্রিটেন থেকে। সেখান থেকেই আসে তাদের বইপত্র ও ধ্যানধারণা। ভারতে কর্মজীবন শেষ হলে বেশিরভাগই ফিরে যায় 'দেশের বাড়ি'তে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইংরেজ লেখক হেনরি নেভিনসন যেমনটি বলেছেন—'দূরবর্তী এক দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক আধিপত্য বজায় রেখে চলে। এ দেশে তারা কোনো সামাজিক মেলামেশা, বিবাহ ও স্থায়ী বসতি স্থাপন করে না।'[১১০] আরেক সহানুভূতিশীল ইংরেজ ১৯০৭ সালে লিখেছেন, 'আসলে ভারতকে এখন শাসন করে একের পর এক চটের ঝোলাধারী ইংরেজ। তারা চটের ঝোলা নিয়ে দেশ ছাড়ে আর সম্পদের সিন্দুক নিয়ে ফেরত আসে। নেটিভদের প্রতি এদের সত্যিকারের সহানুভূতি যেমন নেই, তেমনই নেই তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতির ব্যাপারে কোনো গভীর জ্ঞান।'[১১১]

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস তার কর্মীদের জন্য অদ্ভুত এক নিয়ম করে দিয়েছিল। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কুমার থাকতে হবে তাদের। ফলে 'জেলে-নৌকা'গুলো যখন আসবে, তখন জালে আটকা পড়ার জন্য তারা মুখিয়ে থাকবে। জেলে-নৌকা মানে ইংরেজ নারীদের দিয়ে ভর্তি-হয়ে ভারতে আসা জাহাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ও শেষ দিকে নারীরা এভাবে এই ভারতে আসত যোগ্য স্বামীর সন্ধানে। এসব মহিলা সাধারণত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ব্রিটিশদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে-আসা কুমারী। অতিরিক্ত চৌকস বা অতিরিক্ত ম্যাড়ম্যাড়ে হওয়ার কারণে তারা স্বদেশে 'ভালো স্বামী' পায়নি। বয়স বিশের কাছাকাছি বা বিশের চেয়ে একটু বেশি। ইংল্যান্ডের বিয়ের বাজারে তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাই তাদের সামনে এখন শুধু দুটো পথ খোলা। হয় ভারতগামী জাহাজে চড়ে বসা, আর নয়তো স্বদেশে চিরকুমারী গৃহশিক্ষিকা হয়ে জীবন পার করে দেওয়া।

উপনিবেশে ব্রিটিশদের জীবন কত আরামের, সেই গল্প শুনতে শুনতে জাহাজকেই আকর্ষণীয় মনে হয় বেশি। আইসিএস কর্মকর্তাদের (এবং অন্য বেসামরিকদেরও) ভারতীয় নারীদের সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ। তাই তারা বিষণ্ন, একাকী এবং তিরিশের কশাঘাতে হতাশ। বিয়ের জন্য একপায়ে খাড়া। যোগ্য পুরুষেরা গিয়ে গিয়ে খাতির জমাবে নারীদের সাথে, ইংলিশ ক্লাবে আর টেনিস খেলায়, জমকালো বলনৃত্যে আর বাঘশিকার অভিযানে তাদের সঙ্গী বানাবে। এই মহিলারা যেভাবে বড় হয়েছে, তাতে তারা ভারত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। চাকরদের বহর তাদের ফরমায়েশ নেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ

---

[১১০] হেনরি ডাব্লিও. নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন: হারপার অ্যান্ড ব্রাদার্স, ১৯০৮, পৃ. ৩২৯।

[১১১] এইচ. এম. হিন্ডম্যান, রুইন অব ইন্ডিয়া বাই ব্রিটিশ, পৃ. ৫১৩–৩৩।

সটান প্রস্তুত। এর বাইরে আর কোনো ভারতীয়ের সংস্পর্শে যায় না তারা। শ্বেতাঙ্গ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে যেসব গৎবাঁধা ভুল ধারণা রয়েছে, সব তারা গিলে এসেছে। তাই এই নারীরাই ছিল সবচেয়ে বেশি বর্ণবাদী আচরণের দোষে দুষ্ট। ভারতের প্রতি বিতৃষ্ণাও তাদেরই বেশি। ব্রিটিশ সমাজকে ভারতীয়দের ব্যাপারে নাক-উঁচু করে তোলার দায়টাও তাদের ওপরই বর্তায়।[১১২]

এই ছিল আইসিএসের লোকদের জীবন। এরপর উপমহাদেশে ২৫ বা আরও কয়েক বছর সময় কাটিয়ে তারা ফেরে চেলটেনহ্যাম বা সাউথ কিংসটনে। এমনসব ইংরেজ শহরতলিতে, যেগুলো 'এশিয়া মাইনর' বা 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার' নামে পরিচিতি লাভ করে। শাসন-করে-আসা ভূমির ভগ্নাবশেষ ও স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে এসব এলাকা ঘিরে আছে। টেমস নদীর পাড়ে টেডিংটনে বসতি স্থাপনকারী এক ব্যক্তি তার বাসার নাম দিয়েছিলেন 'কোয়েটা'। এটা বেলুচিস্তানের রাজধানীর নাম। আরেক ব্যক্তি উইলিয়াম স্ট্র্যাচি ইংল্যান্ডে থেকেও তার ঘড়ির কাঁটা কলকাতার সাথে মিলিয়ে রাখতেন। 'সকালের নাস্তা করতেন বিকেলের চায়ের সময়ে আর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন মোমবাতির আলোয়।' আহা! সাধু সাধু! কিন্তু মোমবাতির আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। ব্রিটিশদের নামে রাখা বেশিরভাগ জায়গার নতুন নাম রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের লায়ালপুরের নাম পালটে এক সৌদি বাদশাহর নামে রাখা হয়েছে ফয়সালাবাদ। অতীতের শাসকশ্রেণি এখন আর গুরুত্ব পায় না।[১১৩]

ইম্পেরিয়াল সার্ভিসে ঠিক যে দোষের কারণে সরকারি চাকুরির ব্যবস্থাটি ভারতীয়দের চোখে খারাপ, ঠিক সেই একই গুণে সেটা ইংরেজদের চোখে ভালো। অর্থাৎ, ব্যবস্থাটির অ-ভারতীয় চরিত্র এবং শাসিতের কল্যাণের প্রতি উদাসীনতা। ভারতীয়দের আইসিএসে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের প্রতিটি পর্যায় থেকে সেটাকে বাধাগ্রস্ত করা হতে থাকে। মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুঠি থেকে যেভাবে শেষ স্বর্ণের টুকরোটা ছিনিয়ে নিতে হয়, ভারতীয়রাও সেভাবেই চাকরি পাওয়ার জন্য ইংরেজদের সাথে কুস্তি করত। এইচ. ফিল্ডিং-হল ছিলেন নিতান্ত ছা-পোষা এক সরকারি কর্মচারী (অবসর গ্রহণের পর তিনি ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ বহু বই লিখেছেন, যদিও সেগুলো আবার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণায় দুষ্ট)। সেই তিনিও উঁচু সরকারি পদে ভারতীয়দের নিয়োগের বিরুদ্ধে বলেছেন—'ভারতের সরকার

---

[১১২] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য অ্যান ডি কারসি, দ্য ফিশিং-ফ্লীট: হাজব্যান্ড-হান্টিং ইন দ্য রাজ, লন্ডন: ওয়েইডেনফিল্ড অ্যান্ড নিকোলসন, ২০১২।

[১১৩] গিলমোর, দ্য রুলিং কাস্ট।

তো ভারতীয় নয়, বরং ইংরেজ। একে ইংরেজই হতে হবে... কারণ, ইংল্যান্ড নিজের কাঁধে ভারতের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। সেই দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে দেওয়া বা ভাগাভাগি করা ঠিক নয়।'[১১৪] তিনি আরও বলেন, 'সরকারকে তার নিজের মতো কাজ করা উচিত, মানে ইংরেজদের মতো। কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এই জিনিস জানা সম্ভব নয়।'[১১৫]

ফলাফল এই দাঁড়ায়—ভারতের মাটিতে রানি ভিক্টোরিয়ার যত ভাস্কর্য আছে, উঁচু সরকারি পদে ততজন ভারতীয় নেই। ব্রিটিশরা অবশ্য নিতান্ত বর্ণবাদী অজুহাত দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। যৌক্তিক ছুতোও দেওয়ার চেষ্টা করেছে—'যেসব জায়গায় সামরিক কর্মকর্তা বা সামরিক পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা করা জরুরি, সেখানে বেসামরিক ভারতীয়দের বসানো অসম্ভব।' কিন্তু সমস্যার গোড়া অচিরেই বেরিয়ে আসে। ভারতবাসী শ্বেতাঙ্গরা সত্যিকারের কর্তৃত্বের আসনে জীবনেও কোনো ভারতীয়কে দেখতে চায় না। ফিল্ডিং-হল ১৯১৩ সালে বলেন, 'ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের শাসন করবে, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং প্রশাসন ও বিচারকার্য চালাতে তারা ভারতীয়দের মুখ পানে চেয়ে থাকবে—এসব তো অকল্পনীয়। প্রশাসন ইংরেজ বলেই তা স্থিতিশীল আছে। এই স্থিতিশীলতায় কোনো ব্যাঘাত ঘটলে তা সহ্য করা হবে না।'

নিজের দাবির পক্ষে প্রমাণ তুলে ধরার জন্য ফিল্ডিং-হল জনৈক ভারতীয়ের সাথে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। 'মি. শেটি' নামক সেই লোকটি আইসিএসে কর্মরত ছিলেন। রেন'স ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাগ্রহণ শেষ করে এসেছেন তিনি। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রথম সারির ফলাফল অর্জন করে নিয়োগ পান ভারতের একটি জেলায়। কিন্তু সেখানকার ক্লাব তাকে সদস্য হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এসব ক্লাব ছিল কর্মকর্তা আর অন্য বেসামরিক ইংরেজদের পুরো সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। ভারতীয় লোকটি যে এখানে প্রবেশাধিকার পেল না, এটা কিন্তু স্রেফ ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং এতে তার গোটা কর্মজীবনই পঙ্গু হয়ে যায়। কারণ, অফিসের বহু কাজ এবং পেশাগত সম্পর্কের অনেককিছুই করতে হয় ক্লাবে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে। ফিল্ডিং-হল তার স্বজাতীয়দের এহেন বর্ণবাদী পদক্ষেপের কোনো বিরোধিতা করেননি। উলটো সেটার দোষ চাপান নিয়োগ-প্রক্রিয়ার ওপর। যেসব কাজ শুধু ইংরেজদের করা উচিত, সেখানে একজন ভারতীয়কে ঢোকানোটাই নাকি ছিল ভুল।[১১৬] শেটির মতো আইসিএস কর্মকর্তাদের ব্যাপারে তার অনুযোগ—

---

[১১৪] ফিল্ডিং-হল, পাসিং অব এম্পায়ার, পৃ. ১৮২।

[১১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

'সামাজিকভাবে তিনি কোনো দিকেই নেই। তিনি নিজের পৃথিবীকে ছেড়ে এসেছেন, অন্যেরটায় ঢুকতে পারছেন না। সামাজিক জীবন আর কর্মজীবনকে আলাদা করার সুযোগ তো নেই। এ দুটি আলাদা নয়, বরং একই জিনিস।' তিনি আরও বলেন, 'শেষমেশ শেটি গুলি করে আত্মহত্যা করেন। তার মতো মেধাবী ও ভালো মানুষের জন্য এ বড় করুণ পরিণতি। পরিণতিটা যদিও অস্বাভাবিক, কিন্তু তার কারণটা স্বাভাবিকই। আমি আরও কিছু ভারতীয় কর্মকর্তাকে চিনি, এবং... আমার ধারণা, তাদের সকলেই অসুখী।'[১১৭]

যে-কোনো আধুনিক পাঠকই এহেন কথাবার্তা পড়ে শিউরে উঠবেন। কিন্তু ফিল্ডিং-হল তার স্বগোত্রীয়দের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষটি নন: তার লেখালেখি পড়লে বুঝবেন, বেশিরভাগ সঙ্গীর চেয়ে বরং তিনিই বেশ উদারমনা ও মানবিক। পুরো আইসিএসজুড়ে ছিল বর্ণবৈষম্য। ভারতীয়দের উঁচু সরকারি পদে ঢুকতে কাগজে-কলমে কোনো বাধা নেই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই) ১৮৬৩ সালেই এই আভিজাত্যের দেওয়াল ভেঙে হানা দিয়েছেন। কিন্তু বেশিরভাগ আবেদনকারীকেই ফিরিয়ে দেওয়া হতো। সত্যেন্দ্রনাথের পরে মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র এরকম চাকরিতে টিকে থেকেছেন, তাও অল্প কয়েক দশক। পুরো কর্মজীবনে তাদের সকলকেই ভোগ করতে হয়েছে মর্মন্তুদ বর্ণবৈষম্য এবং ব্যক্তিগত অপমান। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এক দুর্দান্ত ভাষাবিদ, গীতিকার ও সমাজ-সংস্কারক। ৩০ বছর ধরে আইসিএসে বিভিন্ন নগণ্য পদে চাকরি করার পর মহারাষ্ট্রের প্রাদেশিক শহর সাতারার বিচারক হিসেবে অবসরে যান তিনি।

ভাইসরয় লর্ড লিটন লন্ডনে তার ঊর্ধ্বতনদের সাথে চুপেচাপে যোগাযোগ করেন ১৮৭৮ সালে। সেখানে কোনো ভণিতা ছাড়াই তিনি স্বীকার করেন যে, শিক্ষিত ভারতীয়দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। 'সরকার বলেছিল তারা এই শিক্ষিত ভারতীয়দের বিকাশ ঘটাতে চায়, অথচ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সরকার অক্ষম। অতীতে সংরক্ষিত ছিল, বর্তমানে এরকম সরকারি পদে নিয়োগ পাওয়া মানেই কালক্রমে সর্বোচ্চ পদোন্নতি পাওয়াটা তার অধিকার। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, ভারতীয়দের এসব অধিকার কখনো পূরণ করা সম্ভবও না, কখনো হবেও না। [মূল লেখাতেই এই অংশে জোরারোপ করা হয়েছে] আমাদের সামনে দুটো পথ ছিল—তাদের প্রত্যাখ্যান করা অথবা তাদের সাথে প্রতারণা করা। আর আমরা কিনা বাঁকা পথটাই বেছে নিলাম।'[১১৮]

---

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।
[১১৮] ব্রিটিশ রুল কনডেম্‌ড, পৃ. ১৩।

এই প্রতারণা আরও কয়েক দশক যাবৎ করুণভাবে চলমান থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই একদম শুরুর দিকে আইসিএসে প্রবেশকারী আরেকজন ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তিনি চাকরিতে ঢোকেন ১৮৬৯ সালে। প্রথমে তাকে বয়স জালিয়াতি করার অভিযোগে চাকরিচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই অপবাদের বিরুদ্ধে মামলা করে সফল হন তিনি। তাকে সিলেটে একটি ছোট পদে নিয়োগ দেওয়া হলেও ক্ষমা করা হয়নি। শেষমেশ ১৮৭৪ সালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় খুবই তুচ্ছ অভিযোগে (ব্রিটিশরা যেরকম এলাকায় থাকে, তার সমমান আবাসনের আবেদন করেছিলেন তিনি। তা করতে গিয়ে প্রক্রিয়ায় কিছুটা গরমিল হয়। কোনো ইংরেজ এই মাত্রার ভুল করলে তাকে সামান্য বকাঝকাও সহ্য করা লাগত না।)। পরে তিনি একজন বিশিষ্ট অ্যাকাডেমিশিয়ান, সাংবাদিক, সম্পাদক ও বক্তায় পরিণত হন (জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, গ্ল্যাডস্টোনের পর তিনিই ইংরেজিতে সবচেয়ে তুখোড় বক্তা। স্বদেশিদের প্রতি এক স্মরণীয় বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'ক্ষুব্ধ হোন, ক্ষুব্ধ হোন, ক্ষুব্ধ হোন—আপনারা এখনো গজগজানোর শিল্পটা শিখে উঠতে পারলেন না।')।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন দুইবার। সামসময়িকদের চেয়ে যিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রশাসনিক দক্ষতায় এতটাই এগিয়ে, ব্রিটিশরা তার কোনো মূল্যই দিলো না। সরকারের উপকারার্থে তাকে কত ভালোভাবে ব্যবহার করা যেত। তা না করে ইচ্ছে করে বরখাস্ত করে দেওয়া হলো চাকরি থেকে। (অবশ্য প্রায় চার দশকের সংগ্রামের পর সুরেন্দ্রনাথ নাইটহুড লাভ করেন। হতাশ জাতীয়তাবাদীরা যেমনটা বলে, হয়তো ততদিনে তিনি কিছুটা পালটে গিয়েছিলেন, পালটেছিল ব্রিটিশরাও। আইসিএসের প্রথম দুই ভারতীয় যে কণ্টকাকীর্ণ পথটাকে দুর্বিষহ কষ্টে পাড়ি দিয়েছেন, ততদিনে তাদের স্বদেশিয়রা বেশ বড় সংখ্যায় সেই একই পথ পার হচ্ছে তুলনামূলক সহজেই।)

এরকম আরেক ব্যক্তি অরবিন্দ ঘোষ—সেসময় অবশ্য ইংরেজি বানান করা হতো অ্যাকরয়েড ঘোষ। ম্যানচেস্টার, সেন্ট পল'স স্কুল ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন তিনি। তারপর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় কয়েক হাজার প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যেমন চাকরিতে ঢুকতে অন্তত পেরেছিলেন, ইনি তাও পারেননি। অশ্বচালনা পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয় তাকে। (এতে হয়তো তিনি পূর্বসূরির মতোই চাকরির মাঝপথে বরখাস্ত হওয়া থেকে বেঁচে গেছেন। কারণ, ব্রিটিশ প্রভুদের সাথে তার মেজাজের যে পার্থক্য, তাতে তাকে একসময় না একসময়

বরখাস্ত করা হতোই। শ্রী অরবিন্দ নামে তিনি বিশ্বব্যাপী অমর খ্যাতি লাভ করেন পরবর্তীকালে। তার শুরু-করা বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক আন্দোলন আজও পুরোদমে চালু আছে পণ্ডিচেরিতে।)

এরপর শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। হাজারো তরুণ ব্রিটিশকে তাড়িয়ে নেওয়া হয় যুদ্ধের ময়দানে পরিখা পাহারার জন্য। তখন গিয়ে ব্রিটিশরা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে স্বীকার করে যে, এখন ভারতীয়দের নিয়োগ বাড়াতে হবে। রাজশাসনের পরবর্তী তিন দশকে আইসিএসে ভারতীয়ের সংখ্যা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

তাতে ভারতীয়রা পদ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সত্যিকারের কর্তৃত্ব পায়নি। জাস্টিস সৈয়দ মাহমুদ ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বেঞ্চে নিয়োগ পান। ক্যামব্রিজ-শিক্ষিত এই ভারতীয় বিচারক আসলেই দুর্লভ অর্জনের অধিকারী। কিন্তু প্রতিদিনই তাকে ভোগ করতে হতো বৈষম্য ও গঞ্জনা, বিশেষ করে প্রধান বিচারপতি স্যার জন এজের কাছে। মাহমুদের কাছে মনে হতো, ইনি যেন তাকে সহকর্মী হিসেবে না, বরং বিজিত প্রজার মতো মনে করছেন। সদ্য ইংল্যান্ড-ফেরত যুবক হিসেবে ব্রিটিশদের ব্যাপারে অনেক আশা ছিল মাহমুদের মনে। তিনি এমন এক দিনের স্বপ্ন দেখতেন, যেদিন 'ইংরেজ জনগণকে আমরা দেখব বন্ধু ও সতীর্থ প্রজা হিসেবে, শাসক ও বিদেশি বিজেতা হিসেবে না'। কিন্তু সেটা কখনো হওয়ার ছিল না। বরখাস্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে ১৮৯২ সালে তিনি অব্যাহতি নেন। একদিকে ব্রিটিশ আইনের প্রতি তার অগাধ আস্থা ছিল, আরেক দিকে সেই আইনের বাস্তবায়নকারীরাই তাকে উচ্চ টেবিল থেকে বাদ দিয়ে রাখে। এই দুটো জিনিসের মাঝে কিছুতেই সমন্বয় করতে পারেননি তিনি। ফলে মদপান ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ভগ্নহৃদয়ে মারা যান মাত্র ৫৩ বছর বয়সে।[১১৯]

তার পিতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান এক বিখ্যাত সংস্কারক। ভারতীয় মুসলিমদের মাঝে তার সমর্থন ও সহযোগিতা ব্রিটিশদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি অ্যাংলো-মোহামেডান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক বিখ্যাত সমর্থক। এলাহাবাদ উচ্চ আদালত থেকে তার ছেলের জোরপূর্বক অব্যাহতির সময় তিনি লিখেছেন :

> এরকম একটি পদে থেকে যদি কোনো ভারতীয় তার আত্মসম্মান রক্ষা করতে চায়—যেটা তার মর্যাদা ও সততার অপরিহার্য অংশ—তাহলে ইউরোপীয়

---

[১১৯] জন উইলসন, 'দ্য টেম্পেরামেন্ট অব এম্পায়ার। ল অ্যান্ড কনকোয়েস্ট ইন লেইট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া', গানেল সেড্রেলো এবং সংযুক্তা দাস গুপ্ত, সাবজেক্টস, সিটিজেনস অ্যান্ড ল: কলোনিয়াল অ্যান্ড পোস্টকলোনিয়াল ইন্ডিয়া, রুটলেজ, ২০১৬।

সহকর্মীদের সাথে তিক্ত হয়ে যায় তার সম্পর্ক। পক্ষান্তরে যদি আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে সে নিজেকে ইউরোপীয় সহকর্মীর আজ্ঞাবহ বানিয়ে ফেলে—যে সহকর্মীটি বিজেতা জাতির সদস্য হওয়ার কারণে নিজেকে সহজাতভাবেই শ্রেয় ভাবে—তাহলে আবার তাদের মাঝে সম্পর্ক বেশ ভালোই থাকে। কিন্তু যে মানুষটি তার বিবেকের সাথে সৎ থাকতে চায়, যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে তার সম্ভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের রক্ত, তার কাছ থেকে এহেন আচরণ কিছুতেই প্রত্যাশা করা যায় না। স্বদেশির প্রতি ও অন্যদের প্রতি একজন ইংরেজের আচার-আচরণে সেরকমই পার্থক্য বিরাজমান, যেমন পার্থক্য সাদায় আর কালোয় [মূল লেখায় জোরারোপ]। এসব ব্যাপার আর মোটেই গোপন নেই।[১২০]

কালো আর সাদা, রাত আর দিন—প্রতিটি পর্যায়ে এই পার্থক্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হতো। ভারতের ব্রিটিশ আমলারা কেমন বিশাল বেতন পায়, সে ব্যাপারে আগে আলোকপাত করেছি। কিন্তু স্থানীয় সহকর্মীদের সাথে তাদের বেতনের ফারাকটা দেখলে বোঝা যায়, বৈষম্য কত বেশি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জে. টি. সান্ডারল্যান্ড বেতন ও ভাতার পার্থক্য তুলে ধরেন। ব্যবধান এতই বেশি যে, ৮,০০০ ব্রিটিশ কর্মকর্তার মোট আয় ১,৩৯,৩০,৫৫৪ পাউন্ড। পক্ষান্তরে ১,৩০,০০০ ভারতীয় কর্মীর সম্মিলিত আয় ৩২,৮৪,১৬৩ পাউন্ড।[১২১] ভারতীয়দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় তাদের পদ আর পদবি কোথায়, কর্মজীবনে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ কত কম। প্রতিমাসে বেতনের রশিদ এলে তারা সেটা নতুন করে উপলব্ধি করে।

এই বৈষম্যের একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হলো ভারতে জনশক্তি গড়ে না ওঠা।

দাদাভাই নওরোজি ১৮৮০ সালে বলেছেন,

'বস্তুগত সম্পদের সাথে সাথে দেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও বেরিয়ে যায়। সরকারের প্রতিটি বিভাগের সবগুলো উচ্চপদ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয়দের দখলে। ভারতে থাকাকালে তারা ভারতের টাকা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে নেয়। আর যখন চলে যায়, তখন সবই নিয়ে যায় সাথে করে। ভারতকে বানিয়ে যায় আর্থিক ও নৈতিকভাবে গরীব। যে-কোনো দেশের উদীয়মান প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হলেন সেখানকার প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রবীণগণ। তারাই দেশের সহজাত ভাগ্যনিয়ন্তা। অথচ ভারতে এমন কেউ

[১২০] প্রাগুক্ত।

[১২১] সান্ডারল্যান্ড, ১৯২৯।

নেই, থাকতে পারেনও না। এ এক করুণস্যকরুণ ক্ষতি।'[১২২]

সাম্রাজ্যবাদী বর্ণবাদ : ওনলি ডিসকানেক্ট কিন্তু এ সবই ইচ্ছাকৃত। উইলিয়াম মেইকপিস থ্যাকারি বলেছেন, ভারতের 'ঔদ্ধত্য', 'গভীর চিন্তাভাবনা' ও 'স্বাধীনতা'কে দাবিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, 'তারা আমাদের ক্ষমতা ও স্বার্থের সাথে সরাসরি শত্রুতা পোষণ করে। আমরা সেনাপতি, রাষ্ট্রনায়ক বা আইনপ্রণেতা চাই না। আমরা চাই পরিশ্রমী খামারি।' এর ফলাফল জীবনের প্রতিটি পদে বর্ণবৈষম্য। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' ১৯১৫ সালে লন্ডনে যেমনটি বলেছে—'রোমানরা অধীন জাতিগুলোকে একীভূত করে ফেলার জন্য গণহারে ল্যাটিনায়ন করেছিল। ইংল্যান্ড সেটা করেনি। ইংল্যান্ড যা করেছে, তা হলো একটি জাতির বস্তুগত মুনাফার জন্য আরেক জাতিকে শোষণ ও অপদস্থ করা।'

শুধু সরকারি চাকরি না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি দিককেই আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে বর্ণবাদ। এটা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই ছিল : ব্যাপক বিস্তৃত, নিদারুণ অপমানজনক। ব্রিটিশদের ক্ষমতা যতই বাড়ে, বর্ণবাদও বেড়ে চলে পাল্লা দিয়ে। ক্ষমতাধর হয়ে ওঠার আগে ভারতে শ্বেতাঙ্গদের আচরণ কেমন ছিল, তা অনেককিছু বলে দেয়। প্রথম দুই শতকে, অর্থাৎ ১৬০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেমন ছিল,[১২৩] তা খুব ভালোভাবে বর্ণনা করেছেন উইলিয়াম ডালরিম্পল। সেসময় উপনিবেশায়িত এবং ঔপনিবেশিকের মাঝে দারুণ মাত্রায় মিথস্ক্রিয়া হতো। শুধু ব্যাবসায়িক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে তা শেষ নয়, বরং সেইসাথে তৈরি হতো বন্ধুত্ব, প্রেম এবং বেশ অহরহ বিবাহ।

ডালরিম্পল লিখেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 'পশ্চিমারা যেভাবে ভারতের রীতি-প্রথা ও ধর্ম গ্রহণ করে নিতে থাকে, ভারতীয়রাও উলটোটা করে চলে প্রায় সমানতালে। গৎবাঁধা ধ্যানধারণা তো দূরের কথা, বরং কোম্পানির এত লোক ভারতীয় পোশাক-আশাক ধারণ করে নেয়, যা রীতিমতো অবাক কাণ্ড। নিজেদের ব্রিটিশপনাকে তারা ঝেড়ে ফেলে অনাকাঙ্ক্ষিত খোলসের মতো করে। যে মুঘল শাসক শ্রেণিকে তারা হটিয়ে দিয়েছে, তাদের জীবনাচারই

---

[১২২] দাদাভাই নওরোজি, 'দ্য মরাল পোভার্টি অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেটিভ থটস অন দ্য প্রেজেন্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পলিসি (মেমোরেন্ডাম নং ২, ১৬ই নভে., ১৮৮০)', ১৮৮০, পুনরুদ্ধৃত করেছেন নওরোজি, পোভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন: সোয়ান সোনেনশাইন, ১৯০১।

[১২৩] দুটি বইয়ে এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে উঠে এসেছে। জোনাথন গিল হ্যারিস, দ্য ফার্স্ট ফিরাঙ্গিস, নয়াদিল্লি: আলেফ বুক কোম্পানি, ২০১৫ এবং উইলিয়াম ডালরিম্পল, হোয়াইট মুঘলস: লাভ অ্যান্ড বিট্রেয়াল ইন এইটিন্থ-সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া, লন্ডন: হারপার পেরেনিয়াল, ২০০২।

অনুসরণ করতে থাকে কোম্পানির লোকেরা।'[১২৪] সালমান রুশদি এই জিনিসটাকে বলেছেন 'চাটনিফিকেশান'। ডালরিম্পল এই লোকদের নাম দিয়েছেন 'শ্বেতাঙ্গ মুঘল'।

ডালরিম্পল বলে চলেন, ১৭৮০ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে 'কোম্পানির এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা তাদের উইলে সব সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন ভারতীয় স্ত্রীদের নামে। অনেকের উইলেই থাকত টইটম্বুর প্রেমের কথাবার্তা। কাছের বন্ধুদের অনুরোধ করে গেছেন, যেন তারা তাদের "প্রিয়তমা" ভারতীয় সঙ্গিনীদের যত্ন-আত্তি করে। একজনের ভাষ্য ছিল এমন—'আমার দুই সন্তানের অসাধারণ ও সম্মাননীয়া মাতা, যার প্রতি আমি অপরিসীম ভালোবাসা, সোহাগ ও শ্রদ্ধা বোধ করি।' সেসময়কার পারিবারিক চিত্রকর্মগুলো দেখলে এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়। কত সহজেই তখন দুটো জাতি আর ধর্ম সহাবস্থান করত। ব্রিটিশ পুরুষদের পরনে পাগড়ি ও কুর্তা-পাজামা, আর তাদের ভারতীয় স্ত্রীরা বসে আছে ইউরোপীয় আসবাবের ওপর ইউরোপীয় কায়দায়। এরকম এক কর্মকর্তা স্যার ডেভিড অক্টারলোনির জন্ম বোস্টনে। তিনি প্রতিসন্ধ্যায় তার ১৩ জন ভারতীয় সঙ্গিনীর প্রত্যেককে নিয়ে দিল্লিতে ঘুরতে বের হতেন; প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা হাতির পিঠে। এমনকি তিনি নিজের ও প্রধান স্ত্রীর জন্য মুঘল ঢঙে একটি বাগান সমাধিও তৈরি করেন। তার মাঝখানের গম্বুজটার ওপরে ছিল একটি ক্রুশ, আর চারপাশে সারি সারি মিনার। অক্টারলোনির এক লেখা থেকে জানা যায় ওই যুগটি কী অদ্ভুতভাবে বহুধর্মীয় ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। কলকাতার উদ্দেশে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'মিসেস অক্টারলোনি মক্কায় হজে যাওয়ার জন্য ছুটির আবেদন করেছেন।'[১২৫]

ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে তারা রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, সেইসাথে আসতে থাকে 'জেলে-নৌকা'। তা ছাড়া, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ (বা 'মিউটিনি')-এর পর গুণোত্তর হারে বেড়ে যায় আশঙ্কা ও আক্রোশ। স্যার ম্যালকম (যিনি পরবর্তীকালে মুম্বাইয়ের গভর্নর হয়েছিলেন) ১৮৩২ সালে লিখেছেন, 'আমাদের প্রাচ্যীয় সাম্রাজ্য... যেভাবে তরবারির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তাকে রক্ষাও করা উচিত ঠিক সেভাবেই।'[১২৬] শাসিতের সম্মতিতে শাসন করার অভিনয়টাও আর থাকেনি (ম্যালকম আরও যোগ করেছেন, '[ভারতীয়রা] তাদের বিদেশি প্রভুদের যা দেবে, তা হলো পরোক্ষ আনুগত্য')। বরং এক অর্থে জাতিগত পৃথক্করণ শুরু হয়ে যায়।

[১২৪] ডালরিম্পল, হোয়াইট মুঘলস।

[১২৫] প্রাগুক্ত।

[১২৬] উদ্ধৃত করেছেন উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ১৬৩।

ব্রিটিশরা গভীরভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে বর্ণপার্থক্যকে। 'জাতিগত ও ধর্মীয় সীমানাকে কঠোরভাবে পাহারা দিয়ে রাখার ফলে বন্ধুত্ব বা বিবাহ আর হয়নি বললেই চলে।'[১২৭]

এই জিনিসটা আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ১৯৪২ সালেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবল বিপর্যয়ের মুখে তখন ব্রিটিশরা মালয়, সিঙ্গাপুর ও বার্মা থেকে পিছু হটে এসেছে। মহাত্মা গান্ধি ১৯৪২ সালের আগস্টে খবরের কাগজে লিখেছেন—'হাজারে না হলেও শতে শতে মানুষ বার্মা থেকে পালিয়ে আসার সময় খাবার ও পানীয়ের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবুও এই অসহায় মানুষগুলোকে বৈষম্যের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। এক পথে যাবে শ্বেতাঙ্গরা, আরেক পথে কালোরা! সব খাবার ও আশ্রয় শ্বেতাঙ্গদের জন্য, কালোদের জন্য কিচ্ছুটি নেই! জাপানিরা হামলে পড়ার আগে থেকেই ভারতীয়দের মাটির সাথে পিষে দিয়ে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।'[১২৮] পরাজয়ের মুখেও এভাবেই গোঁ ধরে বর্ণবৈষম্য চালিয়ে যায় ব্রিটিশরা। সে মাসেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ঘোষণা করার পেছনে এ বিষয়টাও উৎসাহ জুগিয়েছে গান্ধিকে। এর মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশদের আহ্বান জানান ভারত থেকে বিদায় হওয়ার জন্য।

সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যের বড় অংশজুড়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেখানো হয়েছে একটা 'পরিবারে'র মতো। রানি হলেন মমতাময়ী মাতা। বহুদূরের সন্তানদের ওপর গভীর মাতৃছায়া হয়ে আছেন তিনি। ভারতীয়রা তার অবুঝ সন্তান, যাদের কড়া শাসনে রাখতে হয়। গোটা সাম্রাজ্যটা যেন একধরনের সুসজ্জিত ভিক্টোরিয়ান বসার ঘর। সেখানে সভ্য-ভব্য আচরণের বিপরীতে অসভ্য বিধর্মী দঙ্গলটার পার্থক্য একদম স্পষ্ট। ই. এম. ফর্স্টারের আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া-তে রনি আর মিসেস মুরের কথা কাটাকাটিতে এই উপমাটাই ফুটে ওঠে। রনির যুক্তি—'ইন্ডিয়া কোনো ড্রয়িং রুম না।' বিপরীতে তার মায়ের চোখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সৌজন্য ও মহানুভবতার মতো ঘরোয়া গুণাবলিতে মহীয়ান। এ কারণেই তা হয়ে উঠেছে 'এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান'।[১২৯]

সাম্রাজ্যবাদ এভাবেই দুই জাতির মূল্যবোধকে আলাদা করে দেখে। রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর 'নাবোথ' গল্পটি এরকম এক উদাহরণ। এটি এক ভারতীয় ফেরিওয়ালার গল্প। সে এক ঔপনিবেশিক ইংরেজের মহানুভবতার অন্যায় ফায়দা লোটে। ধীরে ধীরে দখল করতে থাকে তার জমি। একসময় নিজেই একটা কুঁড়েঘর তুলে বসে সেখানে। শেষে গিয়ে ইংরেজটি অতি

---

[১২৭] ডালরিম্পল, হোয়াইট মুঘলস।
[১২৮] উদ্ধৃত করেছেন উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ৪৪৯–৪৫০।
[১২৯] এ. এম. ফর্স্টার, আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া, লন্ডন: অ্যালেন লেইন, ১৯২৪, পৃ. ৫০–৫১।

অবশ্যই ভারতীয়কে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। (তাও আবার ভারতীয় মাটি থেকেই!) গল্প শেষ হয় অকৃতজ্ঞ ভারতীয়ের ওপর নিঃসঙ্গ কথকের বিজয়ের মধ্য দিয়ে—'নাবোথ এবার দূর হয়েছে। তার কুঁড়েঘরটি ওই মাটিতেই মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। লবণের বদলে মিষ্টান্ন দিয়ে চিহ্ন দেওয়া আছে যে, ওই জায়গাটা অভিশপ্ত। বাগানের শেষ মাথায় নজর রাখার জন্য আমি একটি গ্রীষ্মকালীন ঘর তুলেছি। এটা আমার সীমান্তদুর্গের মতো, যেখান থেকে আমি আমার সাম্রাজ্যকে পাহারা দিই।'[১৩০]

ব্রিটেনের পোয়েট লরিয়েট হওয়ার একাধিক প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬)। কিন্তু সাবালক জীবনের বেশিরভাগ সময়জুড়েই তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের অঘোষিত পোয়েট লরিয়েট। যেভাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের ঘোরতর লেখক হয়ে উঠলেন, তার শেকড় বেশ গভীরে। লাহোর ও লখনৌয়ের পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসেবে সাত বছর কাজ করেছেন কিপলিং। লর্ড রিপন একবার চেষ্টা করেছিলেন, ইউরোপীয় আসামিদের বিচার করার জন্য ভারতীয় বিচারকদের অনুমতি দেওয়া যায় কি না। তার সেই ব্যর্থ চেষ্টার সময় কিপলিং-এর বয়স ১৮। এই বিতর্কিত ঘটনাই কিপলিং-এর দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দেয় (জানা কথা, উক্ত বিতর্কে কিপলিং তার বর্ণবাদী অভিবাসীদের প্রতিই সমবেদনা জানিয়েছেন)। 'আইনশৃঙ্খলা-বিহীন নিকৃষ্ট গোষ্ঠী'র ওপর 'কর্তৃত্ব' বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা তখন থেকেই তার মাথায় গেঁথে যায়। প্রবন্ধ লিখে লিখে তিনি বোঝাতে থাকেন, ভারতীয়রা কেন নিজেদের শাসন করতে অক্ষম।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী নবির মতো বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এই বর্বরদের সভ্য করে তোলার দায়িত্বের বোঝাটা শ্বেতাঙ্গের ঘাড়ে। কিপলিং-এর প্রতি একটু সদয় হওয়ার চেষ্টা করেছেন তার এক জীবনীকার। তিনি স্বীকার করে নেন যে, কিপলিং ভারতীয়দের ব্যাপারে লেখালেখি করেছেন 'কখনো একদমই না বুঝে, কখনো কর্কশ ও গৎবাঁধা আক্রোশের বশে'।[১৩১] কিপলিং তার লেখালেখিতে ভারতীয়দের কীভাবে তুলে ধরেছেন, সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, এমনকি সেখানে তিনি ভারতের চেহারা ও সমাজকে যেভাবে বিকৃত করেছেন, সে কথাও বাদ, বরং তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটাকে কেমন আবেগকাঁপা চোখ দিয়ে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, সেটাই বিশ্লেষণ

---

[১৩০] 'নাবোথ', লাইফ'স হ্যান্ডিক্যাপ (১৮৯১), পুনঃপ্রকাশ একো বুকস, লন্ডন, ২০০৭, পৃ. ২৮৯।

[১৩১] ফিলিপ ম্যাসন, কিপলিং: দ্য গ্লাস, দ্য শ্যাডো অ্যান্ড দ্য ফায়ার, নিউ ইয়র্ক: হোল্ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইলসন, ১৯৭৫, পৃ. ২৭।

করব আমরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিপলিং-এর লেখাগুলো 'উপনিবেশবাদের পরিচিতিমূলক বয়ানের অংশ'। এসব লেখা একইসাথে 'সাংস্কৃতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ। এগুলোর ফলেই ইংরেজের দুই পরিচয়ের মাঝে ব্যবধানটা গড়ে ওঠে। একদিকে সে প্রায়-দেবতা, আরেক দিকে ব্যর্থ মানব। একদিকে ঔপনিবেশিক, আরেক দিকে আধা-নেটিভ'।[১৩২]

ব্রিটিশরা মনে করত, তারা অন্যদের সভ্য করে তুলছে। কবি স্যার লুইস মরিসের ভাষ্যে 'ঝড়াক্রান্ত সাগরমাঝে/দুঃসাহসী দ্বীপ-দুর্গ'।[১৩৩] রানি ভিক্টোরিয়ার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই কবিতাটি লিখেছিলেন তিনি। ম্যাকাউলির যত দোষই থাকুক, সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ভণ্ডামিগুলো তিনিই আরও ভালোভাবে তুলে ধরেছেন। লিখেছেন, 'মানুষের পিতা ও নিপীড়ক হোন, ন্যায়বান ও জালিম হোন, সংযমী ও লোভী হোন।'[১৩৪] ভারতের সব ইংরেজই যে এসব বিকৃত সাম্রাজ্যবাদী চেতনার সেবক ছিলেন, তা নয়। ফর্স্টারের আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া-তে শিক্ষক সিরিল ফিল্ডিং এমনই এক উদাহরণ। তার মতো অনেকেই স্বীকার করতেন যে, চাকরির দরকার বলেই তারা ভারতে আছেন। তারা চেতনার আদিখ্যেতাবিহীন ও ছা-পোষা মানুষ। চোখের সামনেই তারা দেখেছেন, সেই চেতনা প্রচারিত হয়েছে বাইবেল, বেয়োনেট আর ব্র্যান্ডির জোরে।

ব্রিটিশ অভিজাতরা অবশ্য নিজেদের অন্য গ্রহের মানুষ ভাবত। ভারতীয় সে যে বংশের বা যে গুণেরই অধিকারী হোক, ব্রিটিশরাই তাদের চেয়ে এগিয়ে। লন্ডনের কলেজ অব হেরাল্ডস এক বক্তব্যে বলেছে—'আগা খানকে তার অনুসারীরা সরাসরি ঈশ্বরের বংশধর মনে করে। ইংরেজ ডিউকগণ এরচেয়েও ওপরে।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের আচরণে একটা স্ববিরোধিতা তৈরি হয়। তারা যাদের বর্বর বলে মনে করে, তাদের সভ্য করার জন্য নিজেরাই বর্বরতা চালায়। রুডইয়ার্ড কিপলিং সেই স্ববিরোধিতারই মূর্তপ্রতীক। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কিন্তু এটা স্রেফ ভূমি পদানত করার অভিযান নয়, বরং মেট্রোপোলের[১৩৫] মেরুদণ্ড যে দিনে দিনে নরম হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে শক্তি জোগানোটাও তাদের

---

[১৩২] যোরে টি. সুলিভান, ন্যারেটিভস অব এম্পায়ার: দ্য ফিকশানস অব রুডইয়ার্ড কিপলিং, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ২৫।

[১৩৩] স্যার লুইস মরিস, 'ওড', দ্য টাইমস, লন্ডন, ২২ জুন ১৮৯৭।

[১৩৪] যোরে টি. সুলিভান, ন্যারেটিভস অব এম্পায়ার, পৃ. ৪।

[১৩৫] সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজেদেরকে 'কেন্দ্র' (মেট্রোপোল) এবং উপনিবেশগুলোকে 'স্যাটেলাইট' মনে করার একটি প্রবণতা তাদের মাঝে ছিল বা আছে। —অনুবাদক।

এক মহাগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। দূরদেশের বন্য পরিবেশ এমন এক ময়দান, যেখানে ইংরেজ তার সাহসের পরীক্ষা দেয়, নিজের দৃঢ়তা দেখায়, পুরুষত্বের জয়গান গায়, ভাই-বেরাদরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মেলায়, এবং রানি ও দেশের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করে। কিপলিং-এর কিম উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় ইংরেজ নায়ক দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত যামযামা কামানের ওপর। পাঞ্জাবের ওপর তার আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পাচ্ছে এতে। সামনে-থাকা হিন্দু ও মুসলিমদের সে বন্দুকের ধাক্কায় ফেলে দিয়েছে। 'যামযামা নামক "আগুন-ফোঁকা ড্রাগন" যার নিয়ন্ত্রণে, পাঞ্জাবও তারই নিয়ন্ত্রণে। কারণ, বিজেতা সবসময়ই সবার আগে হাত করে ওই বিশাল সবুজ ব্রোঞ্জের টুকরাকে। কিমের কথায় কিছু যুক্তি আছে বটে। কারণ, পাঞ্জাব ইংরেজদের দখলে এবং কিম একজন ইংরেজ।'[১৩৬]

এই চিন্তাধারা অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের জন্য দরকার একদল সাহসী পুরুষ, যারা সহিংস হতে জানে, যুদ্ধের জন্য তৈরি এবং নোংরাদের ওপর জয়লাভের জন্য সদাপ্রস্তুত। কিপলিং-এর লেখালেখিতে বারবার উঠে এসেছে এসব গুণ (যেমন স্টকি অ্যান্ড কোং, যেখানে ব্রিটিশ স্কুলছাত্ররা চূড়ান্ত খ্যাপাটে আচরণ করে)। সাম্রাজ্যের অন্য 'পুরুষালি' লেখকদের ক্ষেত্রেও একই কথা। এসব সাহিত্যিক হম্বিতম্বি হাস্যকর রকমের স্ববিরোধী। কারণ, এই বন্য গুণাবলি ব্যবহার করেই অন্যদের সভ্য করার চেষ্টা করে ব্রিটিশরা।[১৩৭]

লেফটেন্যান্ট হার্বার্ট এডওয়ার্ড তার ভারত-অভিযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৮৪৬ সালে লিখেছেন—'পাঞ্জাবের মতো একটি জাতির কেশরের ওপর সভ্যতার হাত রাখার মাঝে একটা মহান ব্যাপার আছে।'[১৩৮] এই উপমায় পাঞ্জাবকে বলা হয়েছে বন্য পশু। সভ্যতার হাত দিয়ে তাকে চেপে ধরে পোষ মানাবে ব্রিটিশরা। লর্ড কার্জন ১৯০৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষণ দেন। বলেন যে, সাম্রাজ্যের অসভ্য সীমান্তেই রয়েছে 'আমাদের যুবকদের মহত্ত্ব হাসিলের উপলক্ষ্য। এতে তারা আরাম-আয়েশে ক্ষয়ে যাওয়া থেকে যেমন মুক্তি পাবে, তেমনই রেহাই পাবে পশ্চিমা সভ্যতার অস্বাস্থ্যকর

---

[১৩৬] রুডইয়ার্ড কিপলিং, কিম, নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮, পৃ. ১।

[১৩৭] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য এম. ড্যাফনি কার্টযার, এম্পায়ার'স চিলড্রেন: এম্পায়ার অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম ইন ক্লাসিক ব্রিটিশ চিলড্রেন'স বুকস, লন্ডন: রুটলেজ, ২০০২, পৃ. ১৩–৪৪।

[১৩৮] উদ্ধৃত করেছেন সি. জে. ওয়ান-লিং উই, কালচার, এম্পায়ার, অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন অব বিয়িং মডার্ন, নিউ ইয়র্ক: লেক্সিংটন বুকস, ২০০৩, পৃ. ৮০।

উত্তেজনা থেকেও'।[১০৯] এমন ধ্যানধারণার ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি রুচির পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষিত 'কালো'দের তুলনায় সম্ভ্রান্ত বর্বরদেরই বেশি পছন্দ করতে শুরু করে তারা। সম্ভ্রান্ত বর্বর মানে আদিম, বন্য, যুদ্ধংদেহী কিন্তু 'পুরুষালি' গোত্রীয় জনগোষ্ঠী। আর শিক্ষিত 'কালো'রা হলো প্রাচ্যের ওইসব ভদ্দরনোক, যারা দুর্বল ও পশ্চিমায়িত, সাংস্কৃতিকভাবে সংকর। তাচ্ছিল্য করে এদের ডাকা হতো ম্যাকাউলিপুত্র। কিপলিং-এর বর্ণবাদ-ঠাসা উপন্যাস কিম-এ এরকম এক শিক্ষিত কালো চরিত্রের নাম হরি চন্দ্র মুখার্জি। তিনি নৃবিশেষজ্ঞ হিসেবে ব্রিটিশদের অধীনে চাকুরিরত 'বাবু'। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলেন আর ব্রিটিশ রয়াল সোসাইটিতে নির্বাচিত হওয়ার অলীক আশা লালন করেন। যে জিনিস কখনো তার কপালে জুটবে না, সেটার আশায় থাকার কারণে বিদ্রুপ করা হয় তাকে। নিতান্ত প্রজা হয়েও তিনি ঔপনিবেশিকদের সারিতে ঢুকতে উদ্‌গ্রীব।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে সবচেয়ে অবিমিশ্রিত প্রশংসা পেয়েছে যে ইংরেজি উপন্যাস, তা হলো ই. এম. ফর্স্টারের আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া। (এমনকি ইন্ডিয়া লিগের প্রধান কৃষ্ণা মেনোন অ্যালেন লেইন কর্তৃক সেটার প্রকাশনারও আয়োজন করেছেন।) সেই ফর্স্টারও সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণারই প্রতিধ্বনি করেছেন, বিশেষ করে উপন্যাসটির অন্তিম বাক্যগুলোতে। ইংরেজ ও ভারতীয়ের মাঝে বন্ধুত্বের অসম্ভাব্যতা উঠে এসেছে সেখানে :

'এখন আমরা বন্ধু হতে পারি না?' অপরজন তাকে সাদরে ধরে বলল। 'আমি তো এটাই চাই। তুমিও তা-ই চাও।' কিন্তু ঘোড়া-দুটো তা চাইছিল না—তারা দুদিকে সরে যায়। পৃথিবী তা চাইছিল না। সে এমনকিছু পাথর তুলে দেয়, যার ফলে দুই অশ্বারোহী দুই গলি দিয়ে পার হতে বাধ্য হয়। তারা বেরিয়ে এসে নিচে মাউয়ের দিকে তাকানোর পর চোখে পড়ে যে মন্দির, দিঘি, জেলখানা, প্রাসাদ, পাখপাখালি, আবর্জনা, আর গেস্ট হাউজ : তারা চাইছিল না। শত কণ্ঠে তারা বলে চলে, 'না, এখনই না।' আকাশ বলে, 'না, এখন না।'

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এক মধ্যবিত্ত ভারতীয় ডাক্তার। গড়পড়তা মুসলিম পরিবার থেকে তার উঠে আসা। সে সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তার ইংরেজ সাথি ফিল্ডিং-এর সমকক্ষ নয়। হয়তো এমনকি স্বাধীন ভারতেও তাদের সত্যিকারের বন্ধুত্ব অসম্ভবই থাকত। পুরো উপন্যাসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো নামগন্ধও নেই। একমাত্র প্রধান হিন্দু চরিত্রটিও লেখকের নিতান্ত ঠাট্টার পাত্র। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো যারা আইসিএসে জায়গা করে

---

[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০–৮১।

নিয়েছেন কিংবা জওহরলাল নেহরুর মতো যাদের সমালোচনা ব্রিটিশ রাজের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে—এরকম ভারতীয়দের চিত্র আঁকতেই জানেন না ফর্স্টার। এহেন সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বেকুবদেরই থাকতে পারে। উপন্যাসের সুহৃদ ইংরেজ চরিত্রটির চোখে ভারত এক রহস্য ও গোলকধাঁধা। ফর্স্টার নিজেও সেই ধাঁধা থেকে বেরোতে পারেননি। তারই আরেক উপন্যাস হাওয়ার্ডস এন্ড শুরু হয়েছে এক স্মরণীয় এপিগ্রাফ দিয়ে : 'ওনলি কানেক্ট'। ভারতীয় পাঠক হিসেবে ভাবি, আহা! আমার আর ভারতবাসী ব্রিটিশের মধ্যে যদি ওই জিনিসটা কোনোকালে থাকত!

ব্রিটিশ সরকারব্যবস্থা, স্বদেশি আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধির আবির্ভাব ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল হয়তো একেবারেই স্বার্থান্ধ, যা আমি প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি। কিন্তু একটা ইতিবাচক দিকও আছে। তাদের সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে এসেছে আইন ও শৃঙ্খলা, যেখানে পূর্বেকার অবস্থাটা দেখতে ছিল অসহ্য নৈরাজ্যের মতো। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের মাঝে চলমান অনন্ত সংঘাতকে তারা মীমাংসিত করে দিয়েছে। তুলনামূলক কম সহিংস রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ভারতে। রবার্ট কাপলান বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ একধরনের ঢিলেঢালা ও গ্রহণযোগ্য ধাঁচের সার্বভৌমত্ব দান করে। নৈরাজ্য এবং একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝামাঝিতে এর অবস্থান।'[১৪০] 'গ্রহণযোগ্য' কি না, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে নীরব বশ্যতাও একধরনের মেনে নেওয়াই বটে। বহু ভারতীয়ই শেষমেশ ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে, কারণ তাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

গভর্নর-জেনারেল (যার নতুন নাম হয় ভাইসরয়) পদটিকে পালটে দেয় ১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আইন। ভারতের প্রশাসন এখন সরাসরি তার হাতে, সাথে আছেন অন্য প্রাদেশিক গভর্নরবৃন্দও। গভর্নর-জেনারেলদের সাথে থাকে কয়েকটি পরিষদ। মনোনয়নের মাধ্যমে এসব পরিষদের সদস্যরা নিয়োগ পান। নতুন এক আইন হয় ১৮৬১ সালে। এর মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরের আইন পরিষদে সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার অধিকার লাভ করে ভারতীয়রা। এতে করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা থেকে সত্যিকারের উপকার পাওয়ার জন্য ভারতীয়দের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস আইন (যা ১৮৬১ সালের আইনটিকে সংশোধিত করে) এবং ১৯০৯ সালের মিন্টো-মর্লি সংস্কার পাশ হওয়া পর্যন্ত। দুটিই ইন্ডিয়ান

---

[১৪০] রবার্ট কাপলান, 'ইন ডিফেন্স অব এম্পায়ার', দি আটলান্টিক, এপ্রিল ২০১৪।

ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরের ঘটনা। কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজি-জানা ভারতীয়ের সাথে মিলে অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ও উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন এই দলটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ১৮৮৫ সালে।

কিন্তু ১৮৯২ ও ১৯০৯ সালের আইন দুটিকে বড়জোর বাইরের সাজসজ্জা বলা চলে। ভেতরে ভেতরে সবকিছু যেভাবে চলছিল, তা একই থাকে। এসব ভারতীয় পরিষদ কীভাবে তৈরি হবে ও কাজ করবে, তাতে ওসব আইনের থোড়াই প্রভাব পড়েছে। এ দুটি আইনের ফলে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বাড়ে ঠিকই (পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মানে আসলে ব্রিটিশদের হাতে বাছাইকৃত), কিন্তু বাস্তবে এসব পরিষদের হাতে তেমন কোনো ক্ষমতাই ছিল না। পরিষদে তারা বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করতে পারবেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। তারা ভারতীয় জনগণের (বা নিদেনপক্ষে অভিজাত, ইংরেজি-শিক্ষিত অংশটির) দাবিদাওয়া তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু আইন বা বাজেট পাশ করানোর অধিকার তাদের নেই। সেই ক্ষমতা এখনো গভর্নর-জেনারেলের হাতেই। পরিষদের পাশ-করানো যে-কোনো প্রস্তাবনা তিনি নাকচ করে দিতে সক্ষম। বরং তিনি নিজে যদি কোনো প্রস্তাবনাকে ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহলে পরিষদকে বাধ্য করতে পারবেন সেগুলো আলোচনা ও পাশ করানোর জন্য।

ভারতের রাষ্ট্রীয় সচিব ছিলেন জন মর্লি, যার নামে ১৯০৯ সালের সংশোধনী আইনের নাম। তিনি ভারতীয় পরিষদে ভারতীয় সদস্য বাড়ানোর বিরোধিতা করেছিলেন। তার মতে, ভারতের ব্রিটিশ সরকারের যে কয়জন ভারতীয়ের সম্মতি ও প্রতিনিধিত্ব দরকার, সেটুকু ইতোমধ্যে আছে। তিনি ঘোষণা করেন, 'এই সংশোধনীর ফলে [যদি] ভারতে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সেটার সাথে অন্তত আমার কোনো লেনাদেনা নেই।'[১৪১] আসলে সংস্কারকদের চিন্তাচেতনা এমনই ছিল। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আইন (১৯৩৫) পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রশাসনে যতগুলো 'সংস্কার' সাধন করেছে, প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ছিল গভর্নর-জেনালের ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একচ্ছত্র আধিপত্যকে সুরক্ষিত রাখা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে যেসব ভারতীয় পরিষদ ছিল, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সত্যিকারের কোনো ক্ষমতাই ছিল না। বাজেট, প্রতিরক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলার মতো বিষয়গুলো থাকত ব্রিটিশদের মুঠিতে। এসব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল সরকারে প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো, পূর্ণ মাত্রায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা নয়।

---

[১৪১] মর্লি, ইন্ডিয়ান স্পিচেস লন্ডন, ১৯১০, ৯১, ইশ্তিয়াক হুসাইন কুরেশি, দ্য স্ট্রাগল ফর পাকিস্তান, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৮।

রিকাভারিং লিবার্টিজ গ্রন্থের লেখক প্রয়াত অধ্যাপক সি. এ. বেইলি। সেখানে তিনি এক আকাশ-কুসুম দাবি করেছেন যে, ব্রিটিশরা ভারতে উদারতাবাদের শেকড় প্রোথিত করতে সাহায্য করেছে। তারা স্কুল-কলেজ, পত্র-পত্রিকা ও ঔপনিবেশিক আইন-আদালতের মাধ্যমে এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে। এর ফলে পালটে গেছে ভারতীয়দের পুরো একটা প্রজন্মের চিন্তার ধরন। এতে করে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে এমনভাবে গড়ে নিতে পেরেছে, যার ফলাফল আজকের ভারতীয় গণতন্ত্র।[১৪২] সমস্যাটা হলো, এই উদারতাবাদ চর্চা করা হয়েছে মারাত্মক সীমিত আকারে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামক একজন স্কটিশ এবং একদল সুশিক্ষিত, আইন মান্যকারী ভারতীয়। একটা সত্যিকারের উদারপন্থি প্রশাসনের তো উচিত এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো। কারণ, এটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এক বড়সড় পদক্ষেপ। অথচ ব্রিটিশরা এর প্রতিক্রিয়া দেখায় নানা মাত্রার শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশের মাধ্যমে। ইংরেজ সাংবাদিক হেনরি নেভিনসন ১৯০৮ সালে লিখেছেন:

> ২২ বছর যাবৎ তারা [কংগ্রেস] ছিল শৃঙ্খলা ও সাংবিধানিক আনুগত্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তারা দারুণ সব প্রস্তাবনা পাশ করে, সত্যিকারের অভাব-অভিযোগের সমাধান দাবি করে, আস্থা ও নিষ্ঠাসহকারে রাজকর্তৃপক্ষের দূতদের কাছে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা [ভারতবাসী ব্রিটিশরা][১৪৩] তাদের সাংবিধানিক আনুগত্যকে বলত ভীরুতা। তাদের প্রস্তাবনাগুলোর দিকে ফিরেও তাকায়নি, তাদের অভাব-অভিযোগের সমাধান করেনি, রাজদূতদের সাথে তাদের প্রতিনিধিদের দেখাও করতে দেয়নি... [ভারতীয়রা উপলব্ধি করে যে,] তাদের একনিষ্ঠ প্রস্তাবনাগুলোর ঠাঁই হয় অফিসের ময়লার ঝুড়িতে।[১৪৪]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও সহিংস করে তোলার পেছনে ব্রিটিশদের এই মনোভাবটাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। তারা এমনসব রাজনৈতিক

---

[১৪২] এ. বেইলি, রিকাভারিং লিবার্টিজ: ইন্ডিয়ান থট ইন দি এইজ অব লিবারেলিজম অ্যান্ড এম্পায়ার, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১।

[১৪৩] ব্রিটিশরা 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান' বলতে বোঝাত ভারতে বসবাসকারী ও চাকরিরত ব্রিটিশদের, আর মিশ্রজাতের ইউরোপীয়দের বলত 'ইউরেশিয়ান'। অর্থাৎ, যাদের বাবারা নিচু পদের ইউরোপীয় হওয়ার কারণে 'জেলে-নৌকা'র কোনো মহিলাকে টানতে পারেনি, ফলে শেষমেশ ভারতীয় নারীদের যৌনসঙ্গী বা কিছু ক্ষেত্রে স্বামী হয়ে গেছে। বর্তমানে এই ইউরেশীয়দের বংশধররাই 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত। তাই ঔপনিবেশিক আমলের নথিপত্র পড়তে গেলে এই দুই অর্থের মাঝে প্যাঁচ লাগে। ওসব কাগজপত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলতে শুধু ভারতবাসী ইংরেজদেরই বোঝানো হয়।

[১৪৪] নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৩২৭।

কর্মকাণ্ডও দমিয়ে দিতে চাইত, যেখানে স্রেফ বাক্‌স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই লাগে না। এতেই বোঝা যায়, তাদের উদারতাবাদের দাবি কতটা অসৎ, বা অন্ততপক্ষে অপর্যাপ্ত। যেমন—নেভিনসন একটি ভারতীয় রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। নতুন শতাব্দীর শুরুতে মাদ্রাজের সৈকতে সেটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি নিজের অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে:

সভাপতি... বিগত বছরের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ তুলে ধরলেন। পুরোটাজুড়ে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে শিশু ও শিক্ষার্থীদের ওপর সন্দেহ, দমন-পীড়ন, বিতাড়ন, বন্দীকরণ, প্রহার এবং 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাবেশ আইন'। এই সবকিছু বলা হয়েছে কোনো আবেগ বা অতিরঞ্জন ছাড়াই। সবশেষে তিনি বিতাড়ন আইন প্রত্যাহার করার দাবি জানান। হাবিয়াস করপাসের[১৪৫] অধীনে ইংল্যান্ড নিজেকে যেসব অধিকার দিয়েছে, উক্ত আইন সেগুলোর পরিপন্থি। চারজন বক্তা এই প্রস্তাবনাকে সমর্থন জানান। প্রত্যেকের বক্তব্যে ছিল একই রকমের সৌম্য যৌক্তিকতা। প্রাচ্যের মনমানসিকতা আমরা যেরকম মনে করি, তার থেকে একদমই ভিন্ন এক চিত্র...। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা [ভারতবাসী ইংরেজরা] ছাড়া আর কেউই এগুলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বক্তব্য বলে আখ্যায়িত করবে না। একজন গড়পড়তা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের কাছে সরকারের যে-কোনো সমালোচনা, স্বাধীনতার যে-কোনো দাবিই বিচ্ছিন্নতাবাদ। সবাই জানত, এটা ছিল চরমপন্থিদের একটা সমাবেশ, অথচ সেখানে এমনসব সাদামাটা মানবাধিকারের দাবি তোলা হয়েছে, যেগুলো অন্যান্য জাতি এমনিতেই ভোগ করে। যেমন: নিজেদের বিষয়-আশয়ে মত দেওয়ার অধিকার এবং নিজেদের টাকা খরচ করার অধিকার।[১৪৬]

এভাবে যেহেতু কাজ হয়নি, সেহেতু জাতীয় আন্দোলনের গতিপথ শীঘ্রই পালটে যেতে থাকে। কার্জনের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন, এতে যদি ব্রিটিশদের কিছুটা হলেও টনক নড়ে। উত্তাল বাঙালি যুবকরা শহরে-গ্রামে প্রচারণা চালাতে থাকে। ঢাকঢোল পিটিয়ে তারা জনগণকে জানান দেয় যে, তারা মাতৃভূমির এই ঔপনিবেশিক কাটাছেঁড়া মানে না। স্বদেশি আন্দোলনের ডাক দিয়ে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বান করা হয়। যেসব দোকান তখনো বিদেশি পণ্য বিক্রি করে চলছিল, যুবকরা সেগুলো ঘিরে অবস্থান নেয়। ক্রেতাকে কোনো ভয়ভীতি দেখায় না তারা, বরং অনুনয় করে, এমনকি কখনো সেজদায় লুটিয়ে পড়ে অনুরোধ করে, যেন তারা কিছু না

---

[১৪৫] কাউকে অন্যায়ভাবে বন্দি করে রাখলে আদালতে সে ব্যাপারে বিবেচনার আবেদন জানানোর অধিকার।—অনুবাদক

[১৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯—৩০, ১৩২।

কেনে সেসব দোকান থেকে। এসব কাজকর্ম তো সহিংস নয়, কিন্তু ব্রিটিশরা এসবের সাথে অভ্যস্ত নয়। নাটকীয়ভাবে বিক্রি কমে যাওয়ায় বাংলার ব্রিটিশ বণিকদের মাথায় হাত। নিয়মিত মুনাফার পরিবর্তে দেখা দেয় অভূতপূর্ব লোকসান। আন্দোলন জয়ী হয় : ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষে ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসেন এক শীর্ণকায়, চশমাধারী আইনজীবী। পরনে তাঁতে-কাটা মোটা পোশাক। নাম তার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। দেশে যে একটি ক্ষণজীবী গণ-রাজনৈতিক বিস্ফোরণ সফলভাবে শেষ হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি ভালো করেই অবগত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ভারতীয় অভিবাসীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন অনুপম নৈতিকতা-সহকারে, করেছেন 'সত্য নিয়ে পরীক্ষা'। এসব কীর্তি তাকে এনে দিয়েছে 'মহাত্মা' খেতাব। কর্মজীবনের শুরুটা হয়েছিল নিতান্ত গড়পড়তা আইনজীবী হিসেবে। এক ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর পক্ষে তিনি সাদামাটা একটা মামলা লড়েন। সেখান থেকেই কালক্রমে গান্ধি হয়ে ওঠেন এক দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্ব। তার স্বদেশিরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে মারাত্মক বর্ণবৈষম্যের শিকার হতো। মর্মাহত গান্ধি তাই ধারাবাহিকভাবে কিছু আইনি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। ব্রিটিশ এবং বোয়াররা[১৪৭] ভারতীয়দের ওপর যেসব বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলোর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করাটাই এসব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়ে চলেন তিনি (এবং তাদের মন জয় করার জন্য ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে তোলেন এক স্বেচ্ছাসেবী অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী)। কিন্তু এসবের ফল শূন্য। গান্ধি এরপর প্রতিরোধের এক অনন্য পদ্ধতি বের করেন : অহিংস অসহযোগ।

গান্ধির যেমন ছিল সাংগঠনিক দক্ষতা (তিনি নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা[১৪৮]), তেমনই ছিল আত্ম-নিরীক্ষা ও দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমাজে তার অবস্থান যেরকম ছিল, তাতে তিনি সহজেই বুর্জোয়া আয়েশ ভোগ করতে পারতেন। তা না করে তিনি ডারবানের বাইরে একটি সমবায় খামার গড়ে তোলেন, হেনরি ডেভিড থোরুর লেখালেখি পড়েন, এবং জন রাসকিন ও লিও টলস্টয়ের মতো মানুষদের সাথে পত্রযোগাযোগ করেন। সেইসাথে চলতে থাকে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামষ্টিক পরিসরে 'সত্যে'র ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া তৈরির চেষ্টা। অনুযোগের রাজনীতি থেকে সত্যাগ্রহ (মোটামুটি অর্থ, অহিংসা-সহকারে সত্যের ওপর অবিচল থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা) পর্যন্ত তার পথচলাটা সংক্ষিপ্ত ছিল না,

[১৪৭] ডাচ, জার্মান বা ফরাসি বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গদের বোয়ার বলে।—অনুবাদক।
[১৪৮] নাটাল ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উপনিবেশ (পরবর্তীকালে প্রদেশ)।—অনুবাদক।

সহজও ছিল না। কিন্তু শেষমেশ তিনি তা পূর্ণ করে ছাড়েন। ফিরে আসেন স্বদেশে। ভারতে প্রস্ফূটনরত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি হাজির হন দ্বৈত খ্যাতি নিয়ে। একইসাথে তিনি সন্ন্যাসী ও সুকৌশলী।

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝে যান যে, ড্রয়িংরুমে বসে রাজনীতি-করা একদল আত্মম্ভরী ও অনির্বাচিত অভিজাত শ্রেণির হাত ধরে জীবনেও স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হবে না। তার মতে, স্বায়ত্তশাসনে জনগণের ক্ষমতায়ন থাকা চাই। এরাই তো ভারতের নিষ্পেষিত সংখ্যাগুরু, যাদের নাম ভাঙিয়ে উঁচু শ্রেণির মানুষেরা স্বরাজ স্বরাজ বলে চ্যাঁচাচ্ছে। ভারতের রাজনীতিবিদ শ্রেণি তাতে সায় দিতে পারেনি। সেসময় এই শ্রেণির সদস্য ছিল মূলত অভিজাত ও আইনজীবীরা। এমনসব অবস্থাপন্ন মানুষ, যারা ইংরেজিতে বকবকান এবং ইংরেজদের মতো অধিকার চান। গান্ধি আরও বলেন, জনগণকে রাজরাজড়ার পদ্ধতিতে আন্দোলন করলে হবে না; বরং তাদের মূল চালিকাশক্তি হবে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধ, যার মূর্তরূপ স্বদেশি ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

কথাকে কাজে রূপ দেওয়ার জন্য মহাত্মা একটি আশ্রমে প্রায় নিঃস্ব জীবনযাপন করেন। এখান থেকে ওখানে আসা-যাওয়া করেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির বগিতে। প্রচারাভিযান চালান অস্পৃশ্যতা, মানবেতর স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। এমন এক মূল্যবোধ প্রচার করেন, যাতে ছিল বৈচিত্র্যময় জিনিসের সমাহার। যেমন—চিরকুমারত্ব, নিজের বানানো খাদি কাপড় পরিধান এবং নিয়মিত ডুশ গ্রহণের উপকারিতা। তিনি যে খামখেয়ালি মানুষ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তিনি যে গণমানুষের মনের তারে অনুরণন সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি যে এক অদম্য রাজনৈতিক শক্তি, তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে অচিরেই।

ব্রিটিশ রাজ তাদের নিজেদের প্রচারিত নীতি ও মূল্যবোধের বাস্তবায়ন ঘটাতে ব্যর্থ বলেই গান্ধির উত্থান হয়েছে। তাই এটি ব্রিটিশ উদারতাবাদের স্বীকৃতি নয়, যেমনটা বেইলি দাবি করেন; বরং নিরেট প্রত্যাখ্যান।

***

বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে রয়েসয়ে একটা পদক্ষেপের দিকে এগোতে থাকে। তা হলো সেক্রেটারি অব স্টেইট ফর ইন্ডিয়া, লর্ড মন্টেগুর ভাষ্যে যেটাকে বলে 'দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন'। এখানেও ভারতের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বাসনা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ভারতের এবং বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধির সমর্থন লাভ করে। আর ভারতীয় সেনারা যে আত্মত্যাগ দেখিয়েছে, তার কথা

তো বলাই বাহুল্য। এর ফলে সকলের মনে প্রবল আশা ছিল যে, যুদ্ধশেষে ভারতকে ডমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে (অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও 'শ্বেতাঙ্গ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশ এই মর্যাদা উপভোগ করে)। লর্ড মন্টেগু ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সামনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কথা দেন যে, 'চূড়ান্ত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ভারতে ক্রমান্বয়ে স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো' হবে। সাবেক ভাইসরয় এবং পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জনের কাছে এটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো। ইয়েস, মিনিস্টার নাটকের স্যার হামফ্রি অ্যাপ্লবির মতো করেই একটি কথা বলেন তিনি। প্রস্তাবিত ঘোষণার শব্দগুলো পালটে দিতে বলেন এভাবে—সরকার 'প্রশাসনের সকল শাখায় ভারতীয়দের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি এবং স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে' কাজ করে যাবে, 'যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভারত ক্রমান্বয়ে এক দায়িত্বশীল সরকার বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যায়'। মন্টেগুর কথাটি ছিল সোজাসাপটা, আর কার্জনেরটা প্যাঁচালো। মন্ত্রিসভা কার্জনের এই অসাধু ফরমুলাকেই অনুমোদন দেয়। এতে যে উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেটা অর্জন করতে শপথ নিয়ে ফেলে।

'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে'র এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে স্বায়ত্তশাসনের তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু শেষমেশ তাতে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে ভারতীয়রা স্রেফ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জানালার পর্দার মতো। একদল ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হতেন কিছু জনপ্রতিনিধি। সেই ভোটার তালিকাও এত বাঁধাধরা যে, প্রতি ২৫০ জনে মাত্র একজন ভারতীয়ের ভোটাধিকার ছিল। ওই প্রতিনিধিরা এমন কিছু 'নিরীহ' বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন, যেগুলো নিয়ে ব্রিটিশদের তেমন মাথাব্যথা নেই, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। পক্ষান্তরে আসল ক্ষমতা থাকত প্রদেশের ব্রিটিশ গভর্নরের হাতে, যেমন করারোপ, আইন-শৃঙ্খলা এবং যে-কোনো ভারতীয় প্রতিনিধির ভোট নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা। প্রাদেশিক গভর্নর এবং কেন্দ্রীয় ভাইসরয় চাইলেই নির্বাচিত আইন-প্রণেতাদের যে-কোনো ভোট প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আবার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেসব আইন পাশ করাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, চাইলেই সেগুলো প্রয়োগ করতে পারেন গভর্নর ও ভাইসরয়। 'ক্রমান্বয়ে এক দায়িত্বশীল সরকার বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে' যাওয়া তো দূরের কথা, উলটো সেখান থেকে পিছিয়ে যেতে থাকে ভারত। গোটা ভারতের জনগণ এবং মহাত্মা গান্ধি এই ব্যবস্থাকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যান করেন। চরম প্রতারিত বোধ করেন গান্ধি।

শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। পরে অবশ্য গান্ধি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কারণ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এক মর্মন্তুদ সহিংসতা ঘটিয়ে বসেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সাথে যে আর আপস করা সম্ভব নয়, তা ততদিনে স্পষ্ট। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাদের পথ পালটে নেয় ১৯৩০ সালের মধ্যে। তারা ১৯১৮ সালে যে ভদ্র গোছের লক্ষ্য অর্জনে কাজ শুরু করেছিল, এবার আর অতটুকুতে বসে থাকার জো নেই। ২৬ জানুয়ারি ১৯৩০ তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে :

ভারতের ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের শুধু তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা টিকেই ছিল জনগণকে শোষণ করার মাধ্যমে। ভারতকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা... । অতএব, ভারতের উচিত ব্রিটিশদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করা।[১৪৯]

মহাযুদ্ধ ও মহা বেইমানি

এই প্রতারিত হওয়ার অনুভূতির প্রেক্ষাপটটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধি ভারতে ফিরে আসার আট বছর পূর্বে এবং বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বেশ আগে সেই ১৯০৮ সালেই নেভিনসন বলে দিয়েছেন কেন ভারতীয়রা ব্রিটিশ রাজের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট :

ভারতে অস্থিরতার কারণ হলো বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে ভারতীয়দের অনুভূতিকে ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করা; ভারতীয়দের অপমান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে লর্ড কার্জনের ভাষণ দেওয়া; রানি ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণার বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারি চাকরি থেকে যোগ্য ভারতীয়দের বঞ্চিত করা; আদালতে কয়েকটি কুখ্যাত অবিচারের ঘটনা, যেখানে অপরাধীরা ছিল ইংরেজ; রাজনৈতিক মত প্রকাশের দায়ে অসংখ্য মানুষকে অন্যায়ভাবে হয়রানি করা; ব্যক্তিগত ও বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ; পুলিশ ও ডাক কর্মকর্তাদের গুপ্তচরবৃত্তি এবং দুরাচারী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ঔদ্ধত্য ক্রমেই বেড়ে চলা। এগুলো তাদের দৈনন্দিন আচরণে যেমন দেখা যায়, তেমনই তাদের ছাপানো পত্রপত্রিকাতেও দৃশ্যমান।[১৫০]

এর সাথে যোগ হলো বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের অসামান্য অংশগ্রহণ এবং

---

[১৪৯] www.gktoday.in/poorna-swaraj-resolution-declaration-of-independence.

[১৫০] নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৩২২।

বিনিময়ে ব্রিটিশদের অপমানজনক প্রতিদান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কমপক্ষে ৭৪,১৮৭ জন ভারতীয় সেনা মারা যায়, আহত হয় এরচেয়ে অনেক অনেক বেশি। যুদ্ধের প্রচলিত ব্রিটিশ ইতিহাসে তাদের গল্প, তাদের বীরত্বগাথা হয় একেবারে বাদ পড়ে গেছে, নয়তো ঠাঁই পেয়েছে পাদটীকায়।

ইউরোপীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, মেসোপটেমীয়, উত্তর আফ্রিকান ও পূর্ব আফ্রিকান যুদ্ধক্ষেত্রগুলোয় অনেকগুলো ডিভিশান ও ব্রিগেড পাঠিয়েছে ভারত। লোকবল, পশু, খাবার, রসদ ও টাকার হিসাবে ভারত এত পরিমাণ সাহায্য করেছে যে, অন্য যে-কোনো দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। ইতিহাস-বিষয়ক রচনায় প্রায়ই এটাকে এমনভাবে বলা হয় যে, 'ভারতীয় সরকার' এই সাহায্যগুলো ব্রিটিশদের কাছে 'নিবেদন' করেছে। সেগুলো 'সাদরে বরণ' করে নিয়েছে মহারাজার সরকার। টাকার অঙ্কটা ছিল এত বড় যে, তা রীতিমতো অন্যায়। ইউরোপে একটি যুদ্ধেই দিয়েছে প্রায় ১ কোটি পাউন্ড।[১৫১] চালাকি করে 'ভারতীয় সরকার' বলা হলো, কারণ এই সরকারের সদস্যরা সবাই ইংরেজ। তাদের জবাবদিহিতাও কেবল ব্রিটেনের মহারাজার সরকারের প্রতিই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত থেকে যে পরিমাণ সৈনিক ও সহকারী কর্মচারী বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে, তার সংখ্যাটা প্রকাণ্ড। তাদের মধ্যে ৫,৮৮,৭১৭ জন গেছে মেসোপটেমিয়ায়, ১,১৬,১৫৯ জন মিশরে, ১,৩১,৪৯৬ জন ফ্রান্সে, ৪৬,৯৩৬ জন পূর্ব আফ্রিকায়, ৪,৪২৮ জন গালিপোলিতে, ৪,৯৩৮ জন সালোনিকায়, ২০,২৪৩ জন আদেনে এবং ২৯,৪৫৭ জন পারস্য উপসাগরে। এই ভারতীয়দের মাঝে ২৯,৭৬২ জন নিহত, ৫৯,২৯৬ জন আহত, ৩,২৮৯ জন নিখোঁজ ও মৃত হিসেবে বিবেচিত এবং ৩,২৮৯ জন হয় বন্দি। বিদেশে যে মোট ১২,১৫,৩১৮ জন সৈনিক পাঠানো হয়েছে, তাদের মাঝে হতাহতের সংখ্যা ১,০১,৪৩৯।

ব্রিটিশরা ভারত থেকে লোকবল ও অর্থের পাশাপাশি সংগ্রহ করেছে বিশাল পরিমাণ খাবার, নগদ অর্থ ও গোলাবারুদ। এগুলো ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশদের চাপানো খাজনা থেকে যেমন এসেছে, তেমনই এসেছে নামেমাত্র স্বাধীন প্রিন্সলি স্টেইটগুলো থেকেও। তা ছাড়া, ভারতের ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও সেনানিবাসের অধিবাসীদের জন্য ভারত আরও ৩৫ লক্ষ পাউন্ড পরিশোধ করেছে 'যুদ্ধের পারিতোষিক' হিসেবে। ভারতের রাজস্ব থেকে আরও ১ কোটি

[১৫১] এম. বি. এল. ভার্গব, ইন্ডিয়া'স সারভিসেস ইন দ্য ওয়ার, এলাহাবাদ: বিশ্বম্ভরনাথ ভার্গব, ১৯১৯।

৩১ লক্ষ পাউন্ড দেওয়া হয় যুদ্ধের খরচ জোগাতে। ধারণা করা হয়, তৎকালে ভারতের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্যের মোট মূল্যমান ছিল ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ পাউন্ড। আজকের হিসেবে তা মোটামুটি ৫,০০০ কোটি পাউন্ড হবে। (কিছু কিছু হিসাবে ভারতের অবদান এরচেয়ে আরও অনেক বেশি।)

ইউরোপে যেসব সৈনিককে পরিখার বিভীষিকা সহ্য করতে হয়েছিল, তাদের মাঝে প্রথম সারিতে ছিল ভারতীয়রা। যুদ্ধ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণের আগেই তারা দলে দলে মারা পড়ে, বয়ে চলে বহু জার্মান আক্রমণের ক্ষত। ভারতীয় পদাতিক সেনারা যুদ্ধ শুরুর পরপরই ১৯১৪ সালের শুরুতে জার্মানদের অগ্রগতি প্রায় ঠেকিয়েই দিয়েছে। ওদিকে ব্রিটিশরা তখনো নিজেদের বাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। নেভ শাপেলের এক সংঘাতে অসীম সাহসিকতা দেখিয়েও পরাজিত হয়ে নিহত হয় শত শত সেনা। গালিপোলিতে মারা যায় হাজারের অধিক। এর কৃতিত্ব চার্চিলের। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যেভাবে লাইট ব্রিগেড আক্রমণ করেছিল, তিনি সেটার অনুকরণে অপরিকল্পিত এক হামলা চালানোর আদেশ দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় ৭,০০,০০০ ভারতীয় সিপাহি মেসোপটেমিয়ায় জার্মানদের মিত্র উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হয়ে স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল বহু ভারতীয় মুসলিম।

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে অবস্থানরত ভারতীয় সেনারা গ্রামে তাদের পরিবারের কাছে বহু চিঠি লিখেছে। হৃদয়বিদারক ভাষায় তুলে ধরেছে সাংস্কৃতিক স্থানচ্যুতির বেদনা। একজন লিখেছে, 'বর্ষার বৃষ্টির মতো শেল ঝরে।' আরেকজনের ভাষ্যে, 'ফসলের তাড়ির মতো স্তূপ হয়ে পড়ে থাকে লাশ।'

এই মানুষগুলো নিঃসন্দেহে বীর। অপরিচিত ভূমিতে রুক্ষ ও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় যুদ্ধ করার জন্য তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে তারা না ছিল পরিচিত, না ছিল প্রস্তুত। তারা এমনসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যাদের ব্যাপারে তারা কিছু জানতই না। দিনের পর দিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা বায়বীয় গৌরব ছাড়া আর কিছুই পায়নি। তারপরও যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইতিহাসে তারা রয়ে গেল অপরিচিত। যে ব্রিটিশদের জন্য লড়াই করল, তারাও উপেক্ষা করল। যে স্বদেশ থেকে এলো, তারাও অগ্রাহ্য করে গেল। এর একটা কারণ হলো, তারা ভারতের জন্য লড়েনি। কেউই আইনানুগ সৈনিক ছিল না। সৈনিকগিরি ছিল তাদের পেশা। তারা সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই পদসেবা করেছে, যেটা স্বদেশে তাদের স্বজাতিকে নিষ্পেষিত করে চলেছে।

ভারতের এই অসামান্য অবদানের বিনিময়ে ব্রিটিশরা কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেয়। বলে যে, যুদ্ধশেষে ক্রমান্বয়ে স্বায়ত্তশাসন দেবে ভারতকে। তারা কথা রাখলে হয়তো ভারতীয়রা পুরো বিষয়টাকেই ভিন্নভাবে দেখত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের আত্মত্যাগকে মাতৃভূমির স্বাধীনতায় অবদান বলেই মেনে নিত তারা।

কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আজীবনের জন্য স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে। তিনি যুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে বোয়ার যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের। তিনি আশা করেছিলেন—'ভারত এই কাজটার মাধ্যমে [ব্রিটিশদের] প্রিয়তম সংগীতে পরিণত হবে, বর্ণবৈষম্য হয়ে যাবে অতীতের কোনো বিষয়।' স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য জাতীয়তাবাদ নিয়ে ঠাট্টাই করতেন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি লিখেছেন, 'আমরা প্রাচ্যের ভুখা-নাঙ্গা ইতররা নাকি গোটা মানবতার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব! আমাদের ভাষায় তো "নেশান"-এর কোনো সমার্থক শব্দই নেই।' যুদ্ধের খরচ মেটাতে ভারতের ওপর বিশাল করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর সাথে যোগ হয় উচ্চ মূল্যস্ফীতি। ওদিকে সংঘাতের কারণে যে ব্যাবসা-বাণিজ্য থমকে আছে, তার ফলে দেখা দেয় ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পুরো দেশ তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে কাতরাচ্ছে। লাখো প্রাণহানি হয়েছে এর ফলে। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা মন্টেগুর ১৯১৭ সালের ঘোষণা শুনে প্রতারিত হন। ধরে নেন যে, যুদ্ধশেষে ভারতকে ডমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে, যেটা এতদিন যাবৎ 'শ্বেতাঙ্গ কমনওয়েলথে'র জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। ব্রিটেনের দুর্বার জয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু ভারতকে দেওয়া হয়নি তার প্রতিশ্রুত পুরস্কার। স্বায়ত্তশাসনের বদলে ব্রিটিশরা ১৯১৮ সালে ভারতের হাতে তুলে দেয় মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস নামের ঠগবাজি। তাতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা হয় ব্রিটিশদের কাছে। আর অগুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিসে ন্যূনতম ক্ষমতা দিয়ে পুতুলের মতো বসিয়ে রাখা হয় কয়েকটা ভারতীয়কে। ভারতীয়রা তো অসন্তুষ্টই, ব্রিটিশরাও এই অবিচার মেনে নিতে পারেনি। ব্রিটিশ সাংসদ ড. ভিকারম্যান রাদারফোর্ড ঘোষণা করেছেন :

ইংল্যান্ড ভারতের সাথে যা করল, ইতিহাসে কখনোই কোনো মহান জাতির সাথে এহেন জালিয়াতি হয়নি। মহাযুদ্ধে ভারতের অমূল্য অবদানের বিনিময়ে আমরা তাদের দিয়েছি এক নিন্দনীয়, অপমানজনক, অগণতান্ত্রিক ও

স্বৈরাচারী সংবিধান।[১৫২]

গণতন্ত্র বাড়ানোর বদলে আরও বিপরীত দিকে হাঁটে ব্রিটেন। নিপীড়নমূলক রাওলাট আইন পাশ করায় ১৯১৯ সালে। যুদ্ধের সময় বাক্‌স্বাধীনতা ও জনসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, যা যুদ্ধবিরতির সাথে সাথেই তুলে নেওয়া হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে ভারতীয়দের ওপর পুনর্বহাল করা হয় সেইসব নিষেধাজ্ঞা। ভাইসরয়ের সরকারের হাতে বিরাট ক্ষমতা তুলে দেয় এই আইন। সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' নিবারণ করার উদ্দেশ্যে সরকার সংবাদমাধ্যমের গলা চেপে ধরতে পারবে। বিনা বিচারে বন্দি করে রাখতে পারবে রাজনৈতিক কর্মীদের। রাষ্ট্রদ্রোহের সন্দেহভাজন যে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে সমন ছাড়াই। এই আইনের বলে কর্তৃপক্ষ স্রেফ সন্দেহের বশে যে-কোনো ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করার অধিকার রাখে, তাদের বিচার করতে পারবে একদম গোপনে, যেখানে আসামির উকিল গ্রহণ বা আপিল করার কোনো অধিকার নেই। এ যে স্প্যানিশ ইনকুইজিশানের প্রত্যাবর্তন। অভিযুক্তকে অপরাধী বলেই গণ্য করা হয় এবং তার সকল অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ভারত ভেবেছিল, তারা নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্যের নিয়ন্তা হওয়ার অধিকার এবার পেয়েই যাবে, অথচ পেল এই জিনিস।

এই মগের মুল্লুকের আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা হলে নির্দয়ভাবে দমন করা হতো। এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ ১৯১৯ সালের এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যা। শত শত নিরস্ত্র নিরপরাধকে হত্যা করা হয় সেদিন। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এর ওপর আরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাবেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, অমৃতসরে মারাত্মক পাশবিকতা ও বর্ণবাদ দেখানো ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার ব্রিটিশদের কাছে একজন বীর। তার কাজের পুরস্কার হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে দেয় ব্রিটিশরা। এরই মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় প্রজাদের মাঝে চিরবিভেদ সৃষ্টি হয়। 'ভারতে ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে আমাদের অসহায় অবস্থা'র প্রতিবাদ হিসেবে নাইটহুড ফিরিয়ে দেন স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বে লাভ-ক্ষতি বিবেচনায় ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করতেন না। কিন্তু অমৃতসরের ঘটনার পর তার অবস্থান পালটে যায়। তার ভাষ্যে এটি 'বিদেশি জাতির হাতে শাসিত হওয়ার দুর্ভাগ্যে'র ব্যাপারে এক 'নির্মম মোহভঙ্গ'। 'এত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার' শিকার হয়ে তিনি এই 'মর্যাদার নিশান'কে ধারণ করতে পারেন না।

যে ভারত যুদ্ধে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিলো, বিনিময়ে সে পেল লাথি-

[১৫২] উদ্ধৃত করেছেন ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া।

উল্টা। গল্পের তিক্ত সমাপ্তি হলো ব্রিটিশদের বেঈমানির মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বুঝে এলো যে, বিশ্বাসঘাতক আলবিয়নের[১৫৩] কাছ থেকে আইনি তরিকায় স্বায়ত্তশাসন মিলবে না, বরং কুস্তি লড়ে ব্রিটিশদের মুঠি থেকে বের করে আনতে হবে স্বাধীনতা।

[১৫৩] ব্রিটেন বা ইংল্যান্ডের প্রাচীন নাম।—অনুবাদক।

০৩

গণতন্ত্র, সংবাদমাধ্যম, সংসদীয় ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন

ব্রিটিশদের দাবি, তারা ভারতে রাজনৈতিক অখণ্ডতা এবং গণতন্ত্র সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক যুগে গণতন্ত্রের তিনটি প্রধান উপাদানের বিবর্তনকে এই দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয় : স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, প্রাথমিক পর্যায়ের সংসদীয় ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন। এই ত্রয়ী এখনো ভারতে বিদ্যমান এবং নিজের মতো করে বিকাশমান। এগুলোর অস্তিত্ব ঔপনিবেশিক যুগেও ছিল বটে, কিন্তু তাতে ছিল উল্লেখযোগ্য কিছু ত্রুটি। তাই বিষয়গুলো আলোচনার দাবিদার।

একবিংশ শতাব্দী তখন শুরু হচ্ছে। আমেরিকা প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরাকে আক্রমণ করার, রাশিয়া পিছু হটছে, তালিবানের অবস্থা হযবরল এবং বিন লাদেন আত্মগোপনে, আর সারা বিশ্বে বিশ্বায়নের স্রোত বইছে অত্যন্ত জোরেশোরে (এবং আপাতদৃষ্টে অপ্রতিরোধ্যভাবে)। এমনই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ঘাউড়ামির একশেষ দেখিয়ে ছাড়লেন বিতর্কিত স্কটিশ ইতিহাসবিদ নায়াল ফারগুসন। প্রকাশ করলেন তার বই এম্পায়ার : হাউ ব্রিটেন মেড দ্য ওয়ার্ল্ড। বর্তমানে তিনি যত মহৎ গুণাবলির জয়গান করতে চান, সবগুলোই আবিষ্কার করে বসেছেন অতীত ইতিহাসে। ফারগুসনের মতে, ব্রিটিশরা একটা প্রাথমিক ধাঁচের বিশ্বায়ন সৃষ্টি করেছিল। তার ব্যবহৃত শব্দটা আরেকটু বেমানান—অ্যাংলোগ্লোবালাইজেশান। সেটা ছিল বাণিজ্য, যুদ্ধজয় এবং এক ধরনের 'তাবলিগি সাম্রাজ্যবাদে'র সমষ্টি।[১৫৪] আর এই কাজ করতে গিয়ে ব্রিটেন পৃথিবীর বড় একটা অংশকে উপহার দিয়েছে নয়টি অসাধারণ নজরানা। আর এই তারিফযোগ্য জিনিসগুলোই ব্রিটেনকে বানিয়েছে মহান। সেগুলো হলো

[১৫৪] নায়াল ফারগুসন, এম্পায়ার: দ্য রাইজ অ্যান্ড ডিমাইজ অব দ্য ব্রিটিশ ওয়ার্ল্ড অর্ডার অ্যান্ড দ্য লেসনস ফর গ্লোবাল পাওয়ার, নিউ ইয়র্ক: বেসিক বুকস, ২০০৩, পৃ. ১২৫।

ইংরেজি ভাষা, ইংরেজ ধাঁচের ভূমি-মালিকানা, স্কটিশ ও ইংলিশ ব্যাংকিং, সর্বজনীন আইন, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম, দলগত ক্রীড়া, 'নাইট ওয়াচম্যান' রাষ্ট্র, প্রতিনিধিত্বমূলক সমাবেশ এবং উদারতার ধারণা। তিনি বলেন, এই শেষেরটাই 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য'। কারণ, 'যখনই ব্রিটিশরা স্বৈরাচারী আচরণ শুরু করেছে, তখন ব্রিটিশ সমাজের ভেতর থেকেই উদারপন্থিরা সেই আচরণের সমালোচনা করেছে'।[১৫৫]

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা ফারগুসনের বিশ্লেষণের প্রধান উপাদানগুলোর ব্যবচ্ছেদ করব (এবং লরেন্স জেইমসের মতো আরও যারা সাম্রাজ্যবাদের সাফাই-গায়ক আছেন, তাদেরও)। আপাতত আমরা আলোচনা করব এই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দাবিটা নিয়ে। ফারগুসন নিজের দাবিতে একদম আপসহীন। তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ শাসনের কাছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের ঋণ এতই বেশি যে, তা ভদ্র ভাষায় বলা সম্ভব নয়। তার সব অভিজাত স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি চাকরি, সেনাবাহিনী, সংবাদমাধ্যম ও সংসদীয় ব্যবস্থা—সবই এখনো দাঁড়িয়ে আছে স্পষ্ট ব্রিটিশ নমুনার ওপর...। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বদৌলতেই আজকে বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্র সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আপন করে নিয়েছে। অন্যথায় তারা নিজেরা নিজেরা এই কাজ করে ফেলত, এমনটা ভাবাই যায় না।'[১৫৬]

ফারগুসন পরবর্তীকালে আরেকটি নিবন্ধ লিখেছেন, যা তার অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ পরিচয়ের সাথে বেশ ভালোভাবে যায়। সেটার পরিসর শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি লিখেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'পণ্য, শ্রম ও পুঁজির অবাধ বিনিময় তো নিশ্চিত করেছেই, পাশাপাশি এমনসব অবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করেছে, যেগুলো ছাড়া বাজারব্যবস্থা চলতেই পারত না। যেমন : শান্তি ও শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, দুর্নীতিহীন প্রশাসন, স্থিতিশীল আর্থিক ও মুদ্রাগত নীতিমালা। আরও আছে জনগণের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের জোগানদান। যেমন : পরিবহণ অবকাঠামো, হাসপাতাল ও স্কুল। অন্যথায় এগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকত না।'[১৫৭] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদারতাবাদের অর্থ হলো, এর প্রজারা নিজেদের পরাধীনতা থেকে দারুণভাবে উপকৃত হবে। আর ফারগুসনের কাছে এটাই সাম্রাজ্যের উপকারিতার প্রমাণ। এতে উপনিবেশায়িত অঞ্চলগুলো যেমন উপকৃত হয়েছে, তেমনই হয়েছে সাম্রাজ্যের

---

[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩, ৫৬, ১২৫।
[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২, ৩২৬, ৩৫৮।
[১৫৭] নায়াল ফারগুসন, কলোসাস: দ্য প্রাইস অব আমেরিকা'স এম্পায়ার, নিউ ইয়র্ক: পেঙ্গুইন, ২০০৪, পৃ. ২।

কেন্দ্রটাও। এই নিবন্ধে ফারগুসনের একটি প্রিয় উদাহরণ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন। উদার গণতন্ত্রের যেসব উপাদান নিয়ে ব্রিটিশ রাজের সাফাই-গায়করা এত ঢাকঢোল পেটান, সেগুলোই আমরা পর্যালোচনা করব এই (এবং বিগত ও আগামী) অধ্যায়ে। দেখব ব্রিটেন আসলে কতটুকু কাজ করেছে।

(আংশিক) স্বাধীন সংবাদমাধ্যম

সাফাই-গায়করা তো বটেই, ব্রিটেনের অনেক সমালোচকও ভারতে সংবাদমাধ্যমের ধারণা প্রবর্তন করার কৃতিত্ব দেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে। তারাই প্রথম খবরের কাগজ চালু করে। একজন স্বাধীন নাগরিকের যেসব অধিকার প্রাপ্য, সেগুলোর ব্যাপারে তৈরি হয় সচেতনতা। সক্রিয় সংবাদমাধ্যম না থাকলে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে যেতে পারত না, তা তো অনস্বীকার্য।

উপমহাদেশে ১৫৫০ সালে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেছে পর্তুগিজরা। কিন্তু সেখান থেকে ছাপা হতো শুধু বই। প্রথম ব্রিটিশ ছাপাখানাও সেই একই কাজ করত। সেটা মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। ভারতে প্রথম সংবাদপত্র ছাপা হতে সময় লাগে আরও এক শতাব্দীরও বেশি। জেইমস অগাস্টাস হিকি ১৭৮০ সালে প্রকাশ করেন বেঙ্গল গ্যাজেট, অথবা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অচিরেই তার এসব অস্বস্তিকর মতামতের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে শুরু করে। দুই বছর পর বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে কোম্পানি তার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে ১৭৮২ সালে।

অবশ্য যারা হিকির মতো অতটা ঠোঁটকাটা নয়, তাদের কোনো বাধা দেয়নি তারা। কিছুকাল পরেই ভারতে প্রকাশিত হতে থাকে একগুচ্ছ ব্রিটিশ সংবাদপত্র: প্রথম চারটি প্রকাশিত হয় কোম্পানির রাজধানী কলকাতা থেকে—১৭৮৪ সালে দ্য ক্যালকাটা গ্যাজেট, ১৭৮৫ সালে দ্য বেঙ্গল গ্যাজেট ও দি ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অব ক্যালকাটা, এবং ১৭৮৬ সালে দ্য ক্যালকাটা ক্রনিক্ল। এরপর আরও দুটি পত্রিকা চালু হয় ব্রিটিশদের অন্য দুটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে—১৭৮৮ সালে দ্য মাদ্রাজ কুরিয়ার এবং ১৭৮৯ সালে বম্বে হেরাল্ড। এইসব পত্রিকা ছিল ক্ষুদ্র ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মতের প্রতিফলন। বিশেষ মনোযোগ ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর। জাহাজের আসা-যাওয়া এবং উপনিবেশের প্রশাসন নিয়ে সেখানে দরকারি তথ্য থাকত, যদিও সবসময় সঠিক হতো না সেসব তথ্য। তবে ব্রিটিশ ভারতে খবরের কাগজের একটা

সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। শুরুর দিকের ওসব পত্রিকার একটাও টিকতে পারেনি বটে, কিন্তু সংবাদমাধ্যম যে স্থায়ী হতে চলেছে, তা ততদিনে স্পষ্ট।

পত্রিকার এহেন বিস্তার দেখে কোম্পানি চিন্তিত হয়ে ওঠে। সমালোচক ও শত্রুরা (ফরাসিরা-সহ) এখন একে ব্যবহার করতে পারে কোম্পানির ক্ষতি করার জন্য। তাই লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ সালে সেন্সরশিপ অব দ্য প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তন করেন। এখন থেকে সব পত্রিকাকেই প্রকাশের আগে ভারত সরকারের তদন্তের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এই আইনের পরিসর বাড়ানো হয় ১৮০৭ সালে। এবার সব ধরনের প্রকাশনাই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত—খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বই ও পুস্তিকা। পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় কিছু অতিরিক্ত বেয়াড়া প্রকাশনাকে। ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড, বেঙ্গল গ্যাজেট এবং ক্যালকাটা জার্নাল-এর সম্পাদকদের তো গ্রেপ্তার করে ইংল্যান্ডেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা কোম্পানির কর্মকর্তা ও নীতিমালার খুব চাঁছাছোলা সমালোচনা করতেন। তার মানে, ভারতে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি।

কালক্রমে কোম্পানির বজ্রমুষ্টি ভালোভাবে ভারতের গলায় চেপে বসে। প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয়রাও এখন আর কোনো হুমকি নয়। তাই কোম্পানি এসব খ্যাপাটে আইন শিথিল করে দেয়। তাদের মাতৃভূমিতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্রমেই বাড়ছিল। এর প্রতিফলন ঘটতে থাকে ভারতেও। শুরুর দিকের বহু সংবাদপত্র হারিয়ে গেছে বটে। তাদের প্রকাশকরা হয় মারা গেছেন, আর না হয় দেশে ফিরে গেছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে পাঠকসংখ্যা কম হওয়ায় লাভের মুখ দেখছিল না ব্যাবসা। কোনোটার সম্পাদক ও কর্মচারীরা এমনিতেই কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাদের বিকল্প হিসেবে আর কেউ আসেনি। কিন্তু এগুলোর বাইরে অন্য পত্রিকাগুলো টিকে তো গেছেই, সেগুলোর পাঠকসংখ্যাও ছিল বেশ ভালো। বম্বেতে ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া এবং কলকাতায় স্টেইটসম্যান (যার জন্ম হয়েছিল ১৮৭৫ সালে, কিন্তু পরে ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়াকে একীভূত করে নেয়)। এই দুটো পত্রিকা রাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য খুঁটি হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতি তারা একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত। কিন্তু সরকারের নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডকে তারা সমালোচনা করত দায়িত্ববোধের খাতিরে। এরপর ব্রিটিশদের থাবা উত্তর ভারতেও বিস্তৃত হয়। তখন উপনিবেশের তৃতীয় পত্রিকা হিসেবে লখনৌতে প্রতিষ্ঠা পায় দ্য পায়োনিয়ার। এই ত্রয়ীর প্রকাশিত মতামত মোটাদাগে ভারতবাসী ব্রিটিশ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে।

তাই স্বীকার করতেই হয়, ভারতে সংবাদপত্র প্রবর্তিত করেছে ব্রিটিশরা। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এই পুরো ব্যাপারটাই অপরিচিত ছিল।

ভারতীয়দেরও যে তারা এই ময়দানে প্রতিযোগিতায় নামতে দিয়েছে, সেটাও ব্রিটিশদের কৃতিত্ব। ফলে ভারতীয়রা ইংরেজিতে পত্রিকা বের করেছে, যার ভোক্তা ছিল একটা ক্ষুদ্র ইংরেজি-শিক্ষিত জনগোষ্ঠী (এবং তাদের অনুকরণপ্রিয়রা), আবার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়ও বের করেছে। গুজরাটি ভাষার বম্বে সমাচার চালু হয় ১৮২২ সালে (এবং তা এখনো টিকে আছে। তারা সগৌরবে দাবি করে যে, এশিয়ায় টিকে-থাকা পত্রিকাগুলোর মাঝে তারাই সবচেয়ে পুরাতন)। এর কয়েক দশক পরে কলকাতায় চালু হয় দুটি বাঙালি মালিকানাধীন পত্রিকা। দ্য বাঙ্গালি চালু হয় ১৮৭৯ সালে (আইসিএস ছেড়ে আসার পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এটি কিনে নেন এবং ৩৭ বছর যাবৎ এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন), আর ১৮৬৮ সালে বাজারে আসে দুর্ধর্ষ অমৃত বাজার পত্রিকা (এর সূচনাটা হয়েছিল বাংলায়। পরে তা কিছু সময় যাবৎ দুই ভাষাতেই প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হিসেবে। অবশেষে ১৮৭৮ সালে তা হয়ে যায় ইংরেজি পত্রিকা, যার উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদী প্রচারণা চালানো। অমৃত বাজার পত্রিকা কংগ্রেসপন্থিদের এক দুর্দান্ত মুখপত্রে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর একদম শেষ ভাগ পর্যন্ত টিকে থাকার পর ১৯৮৬ সালে বন্ধ হয়)।

ভারতীয় মালিকানাধীন অন্যান্য ইংরেজি পত্রিকার উদ্দিষ্ট পাঠক ভারতীয়রা। কিন্তু তারা এতটুকু জানত যে, ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাদের ওপর নজর রাখবে। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। এসব পত্রিকার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলা যায় মাদ্রাজের দ্য হিন্দু-কে। সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৮৭৮ সালে এর পথচলা শুরু হয়। পরে তা দৈনিকে পরিণত হয় ১৮৮৯ সালে। ব্রিটিশদের চোখে এই পত্রিকাটি ছিল দায়িত্বশীল ভারতীয়দের মুখপত্র। (দ্য হিন্দুর প্রথম সংখ্যাটি ৮০ কপি ছাপা হয়, যা সে সময়ের হিসাবে বিশাল। আইনের চারজন ছাত্র ও দুজন শিক্ষক মিলে এক রুপি আট আনা ধারকর্জ করে পত্রিকাটি ছাপায়)।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা খোলাখুলি নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের জন্য সংবাদপত্র চালু করতে শুরু করে। এগুলোর মধ্যে বম্বে ক্রনিকল সবার সেরা। সাবেক কংগ্রেস সভাপতি স্যার ফিরোজশাহ মেহতা এটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১০ সালে। কংগ্রেস-সমর্থক বিরলা ব্যবসায়ী পরিবার ১৯২৪ সালে চালু করে হিন্দুস্তান টাইমস। আর জওহরলাল নেহরুর নিজস্ব পত্রিকা ন্যাশনাল হেরাল্ড ১৯৩৮ সালে যাত্রা শুরু করে। বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভাগ্য খুলে যায়, তখন তারাও প্রবেশ করে এই প্রতিযোগিতায়। মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ ১৯৪১ সালে করাচিতে চালু করেন ডন।

ধারণা করা হয়, ১৮৭৫ সালের মধ্যে ভারতে সংবাদপত্রের সংখ্যা দাঁড়ায়

৪৭৫টি। বেশিরভাগের মালিক ও সম্পাদক ভারতীয়। তাদের উদ্দিষ্ট পাঠক শিক্ষিত সংখ্যালঘুরা। সেসময় তারা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশও ছিল না। কিন্তু পত্রিকাগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি এতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কারণ, তাদের প্রকাশিত খবরাখবর ও মতামত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত সারা দেশে। সদ্যোজাত গ্রন্থাগার আন্দোলন তাতে বেশ বড় ভূমিকা রেখেছে। একই কাজ করেছে গণপাঠাগারও। একেকটা কপির পাঠক ছিল কয়েক ডজন করে। সংবাদপত্র ছাপা ও প্রকাশিত হতো বড় বড় শহর থেকে। কিন্তু গ্রাম ও মফস্‌সল শহরেও ছড়িয়ে পড়ত সেগুলোর সংস্করণ, চাই সেটা দিন তিনেক পরে হলেও। সেখানকার পাঠকরা মুখিয়ে থাকত পত্রিকা আসার জন্য, পড়ত গোগ্রাসে। সংবাদমাধ্যম যে ভারতীয়দের মাঝে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বৃহত্তর গণ-সচেতনতা গড়ে তুলেছে এর মাধ্যমে। ফাঁস করে দিয়েছে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বহু ব্যর্থতাকে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে এগুলোর প্রভাব ছিল ব্যাপক।

স্বভাবতই ব্রিটিশরা নড়েচড়ে বসতে শুরু করে। লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে নিয়ে আসেন ভার্নাকুলার প্রেস আইন, এর উদ্দেশ্য ভারতীয় ভাষার পত্রিকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইংরেজিগুলোর দিকে সরকার ওভাবে নজর দেয়নি। (এই আইনের কারণেই অমৃত বাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকায় পরিণত হয়, যাতে নতুন আইনের আওতার বাইরে থাকা যায়।) তারপরও, গণহারে নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা দিতে থাকলে স্বয়ং ব্রিটেনের জনগণই সেটাকে ভালো চোখে দেখত না। তাই কর্তৃপক্ষকে খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। কালেভদ্রে যদি ব্রিটেনের জন্য খুব বেশি বিপদ দেখা দিত, তখনই শুধু সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হতো পত্রিকার স্বাধীনতার ওপর। বিশেষত যুদ্ধের সময়, যখন জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ উঠতির দিকে। রাওলাট আইন এরকম একটা উদাহরণ। এমনিতে বেশিরভাগ সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করতেও সমস্যা নেই। ভারতীয় ভাষার পত্রিকাগুলো চরম আক্রমণাত্মক কথা বলেও অনেকসময় পার পেয়ে গেছে। যেমন: বাংলা পত্রিকা হালিশহর পত্রিকায় ১৮৮৯ সালে ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের ব্যাপারে খুবই সুচালো ভাষায় লেখা হয় 'লোমশ বাঁদর ক্যাম্পবেল...। তার চোখ রাগে ধিকিধিকি করে আর লেজে সারাক্ষণ লেগে থাকে আগুন'। কিন্তু উপনিবেশবাদ-বিরোধী কথাবার্তার স্বর যদি আরেকটু রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, তখন কর্তৃপক্ষ আর এত সহনশীল থাকে না। যেমন: ব্রিটিশ শাসনের বৈধতাকে প্রশ্ন করা বা একে উৎখাত করার প্রসঙ্গ তুলে পার

পেয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গণমাধ্যম তাদের অন্যতম সেরা দাওটা মারে ১৮৯১ সালে। ওই সময়টায় বেশ ভালোই স্বাধীনতা উপভোগ করত পত্রিকাগুলো। মজার ব্যাপার হলো, ওই ঘটনার পরিণাম আজও উপমহাদেশকে তাড়িয়ে বেড়ায়। অমৃত বাজার পত্রিকার এক সাংবাদিক কোনোক্রমে ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডৌনের অফিসে ময়লা কাগজের ঝুড়িটা ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ পেয়ে যান। সেখানে একটা চিঠির কুচিকুচি টুকরো তার নজর কাড়ে। অনেক ঘাম ঝরিয়ে টুকরোগুলো জোড়া লাগান তিনি। বেরিয়ে আসে এক বিস্ফোরক খবর। তখন জম্মু ও কাশ্মীর রাষ্ট্র ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এক হিন্দু মহারাজা-শাসিত। রাষ্ট্রটি দখল করার পরিকল্পনা ভাইসরয় খুব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন সেই চিঠিতে। ব্রিটিশ সরকারকে ভড়কে দিয়ে অমৃত বাজার পত্রিকা তাদের প্রথম পাতায় চিঠিটি ছাপিয়ে দেয়। বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। পত্রিকাটি কাশ্মীরের মহারাজার হাতে পৌঁছায়। ত্বরিত প্রতিবাদ জানান তিনি এবং জাহাজ ছুটিয়ে চলে যান লন্ডনে। জোর গলায় তিনি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন তাদের পূর্বসূরিদের দিয়ে-যাওয়া প্রতিশ্রুতি। তারা নিশ্চয়তা দিয়ে গিয়েছিলেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর 'স্বাধীন' পদমর্যাদার অধিকারী থাকবে। মহারাজার দেনদরবার সফল হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অমৃত বাজার পত্রিকাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায় এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেওয়ার কারণে। এই মুখোশ যদি উন্মোচিত না হতো, তাহলে কাশ্মীর আদৌ 'প্রিন্সলি স্টেইট' থাকত না, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময় তারা নিজেদের পছন্দমতো দেশ ও শর্তাবলি বেছে নেওয়ার অধিকারও পেত না। সেটা হয়ে যেত ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ। দেশভাগের সময় এলোপাতাড়ি ব্রিটিশ কলমের দাগেই নির্ধারিত হতো তার সীমানা। 'কাশ্মীর সমস্যা'র চেহারা আজ একেবারেই ভিন্নরকম হতো।

কিন্তু যত যা-ই হোক, ল্যান্সডৌন-বনাম-অমৃত বাজার পত্রিকা পর্বটি ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। বেশিরভাগ সময়েই ভারতীয় গণমাধ্যমকে কাজ করতে হতো কড়া নজরদারির অধীনে। জনমতের ওপর সম্পাদকদের প্রভাব হ্রাস করতে ১৯১০ সালে সংশোধিত প্রেস আইন পাশ করানো হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমের ওপর ব্রিটিশ খবরদারির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই আইন। এই আইন বলে, আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ছাপাখানা ও পত্রিকা এখন সরকারের কাছে ৫,০০০ রুপি জামানত দেবে (সেসময়কার বিচারে বড় অঙ্কের টাকা)। আর নতুন প্রকাশনার জন্য দিতে হবে ২,০০০ পর্যন্ত। পত্রিকায় ছাপানো কোনোকিছু যদি সরকারের মনঃপূত না হয়, তাহলে ওই টাকা

বাজেয়াপ্ত হবে, ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে, এবং তাদের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদককে শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। যেমন: কংগ্রেস নেত্রী অ্যানি বেসান্ট স্বরাজের পক্ষে একটি কাগজ ছাপিয়েছিলেন। তিনি এর জামানত পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান। তাই আইন ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

উত্তেজক বা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ছাপানো তাই নিষিদ্ধ। কিন্তু দেখার ব্যাপার হলো, এই নিষেধাজ্ঞা মানতে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয় শুধু ভারতীয় প্রকাশনীগুলোর। ব্রিটিশ-মালিকানাধীন প্রকাশনীর বর্ণবাদকে কখনোই এসব পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়নি। সব প্রদেশের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার চাইলেই যে-কোনো পত্রিকা তল্লাশি করতে পারে। 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' জিনিসপত্র পেলে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা তাদের অধিকার। অর্থাৎ, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্বাধীন নয়, বরং শেকলবন্দি ছিল। তাই জনমতের প্রতিনিধি হিসেবে যে সংবাদমাধ্যমের অস্তিত্ব ছিল, সেটা ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় গণমাধ্যম-কর্মীদের যৌথ কৃতিত্ব।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো অহরহ জরিমানা, দমন ও বাজেয়াপ্তকরণের শিকার হতে থাকে, বিশেষত দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো, যারা ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি বেশি বেয়াড়া। তাদের সম্পাদকদের প্রায়ই কারাবন্দি করা হয়। কখনো-বা একেকটা উসকানিমূলক লেখার জন্য আরোপ করা হয় ২৩ মাসের কঠিন সশ্রম কারাদণ্ড। প্রেস অ্যাক্টের বলে তাদের ছাপার অক্ষরগুলোও বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্ভব, অথচ এগুলো না থাকলে কাগজ ছাপানোই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-পন্থি ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোকে কখনোই এসব হুমকি দেওয়া হয় না। সুহৃদ ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক হেনরি নেভিনসন ১৯০৮ সালে বলেছেন, একটা ভারতীয় পত্রিকাকেও 'কখনো দেখিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলোর মতো করে এভাবে বর্ণবিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়াতে। অথচ এদের কোনো শাস্তিই পেতে হয় না'।[১৫৮] উদাহরণ হিসেবে তিনি কলকাতার সাপ্তাহিক দি এশিয়ান-এর একটি লেখা তুলে ধরেন, যেখানে কোনো রাখঢাক ও বাছবিচার ছাড়াই মানুষ হত্যার উসকানি দেওয়া হচ্ছে (৯ই মে ১৯০৮):

জনাব কিংসফোর্ডের [কলকাতার একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট, যার আদালতে বোমাহামলা করা হয়েছিল] সামনে এক দারুণ সুযোগ। আমরা আশা করি স্বল্প দূরত্বে তার হাতের টিপ মোটামুটি ভালোই। আমাদের পরামর্শ থাকবে মাউজার পিস্তল ব্যবহার করার, যেটার গুলির নাক থেকে নিকেল সরিয়ে ফেলা

[১৫৮] নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ২০৬ থেকে।

চাই। অথবা কোল্ট'স অটোম্যাটিকও ব্যবহার করা যায়, যার বুলেট বেশ ভারি পাতলা এবং আঘাত মারাত্মক। আমরা আশা করি জনাব কিংসফোর্ডের 'ঝুলি' এবার বেশ বড়সড়ই হবে। ইস! কী ঈর্ষার ব্যাপার। তার বাড়ি বা শরীরের দিকে কোনো অপরিচিত নেটিভ এগিয়ে আসতে চাইলেই তিনি তাদের ছেদা করে দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখেন। আমাদের বিশ্বাস, নিজের ভালোর জন্যই তিনি সোজাসুজি গুলি করতে শিখবেন, তাও আবার কোটের পকেট থেকে অস্ত্র বের না করেই। এতে যেমন সময় বাঁচে, তেমনই প্রায় ১০ থেকে ১৫ গজ দূরত্ব পর্যন্ত নিশানাও লাগানো যায় খুব নিখুঁতভাবে। পরিস্থিতির দাবি সম্পর্কে ভালো করে জানেন, এরকম ব্যক্তিকে আমরা সর্বোত্তম শুভকামনা জানাচ্ছি।

নেভিনসন আরও বলেন, 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকার ভাষা প্রায় সবসময়ই উদ্ধত আর উসকানিমূলক। "বিচ্ছিন্নতাবাদী" মানে যদি হয় "সহিংসতার সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী", তাহলে এগুলোও বিচ্ছিন্নতাবাদ।'

মোটকথা, সংবাদমাধ্যম স্বাধীনই ছিল, কিন্তু কিছু পত্রিকা (যেগুলো ব্রিটিশ-মালিকানাধীন) ছিল অন্যগুলোর চেয়ে বেশি স্বাধীন।

ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা

স্বাধীন হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসে, ততদিনে আরও অনেক ব্রিটিশ উপনিবেশের মতো ব্রিটিশ ভারতেও আছে নির্বাচন, একাধিক রাজনৈতিক দল, মোটামুটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং আইনের শাসন। স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, ও বেলজিয়ান উপনিবেশগুলো সেই সৌভাগ্য পায়নি। গণতন্ত্রায়ণের গতি হয়তো কম ছিল। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ধীরে ধীরে দেওয়া হয়েছে সেটা। কিন্তু সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে এই প্রক্রিয়া যতটা সাফল্যের মুখ দেখেছে, অন্যান্য উপনিবেশে তা হয়নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম কয়েকটি ধাপে বিবর্তিত হয়েছে। ধাপগুলো হলো—ভদ্র উদারপন্থিদের আইনি অধিকার দাবি, স্বরাজের জন্য 'চরমপন্থিদের' চ্যাঁচামেচি, গান্ধি ও তার অনুসারীদের অহিংস আন্দোলন এবং সীমিত ভোটাধিকার সত্ত্বেও কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্বাধীনতাপূর্ব এই প্রতিটি ঘটনাই ছিল গণতন্ত্রে প্রবেশের একেকটা ধাপ। স্বাধীনতা অর্জনের পথটাও সুগম হয়েছে এগুলোর ফলে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হওয়ার পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান লিখতে বসে। কী অসাধারণ ব্যাপার, পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই তারা গড়ে তুলেছে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে।

এতদিন গণতন্ত্র-বঞ্চিত ছিল বলেই কি তারা ভারতের জন্য ওয়েস্টমিন্সটারের একটা নকল দাঁড় করাতে চেয়েছে, নাকি ব্রিটিশরা নিজেরা দৃষ্টান্ত হয়ে ভারতীয়দের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই ব্যবস্থাটা আসলেই অনুকরণযোগ্য?

***

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে ঘুরে আসি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মোটেও মনে করি না যে, ব্রিটিশদের ব্যবস্থাটা ভারতের জন্য মানানসই। আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করে নিয়েছি, তা ব্রিটিশদের বিকৃত আচরণেরই অনুকরণ। এখানে একদল আইনপ্রণেতাকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। এতে এমন একদল আইনপ্রণেতা গড়ে উঠেছে, যারা আইন প্রণয়নেরই যোগ্য নয়। নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা (বা প্রভাবিত) করার জন্যই কেবল তারা নির্বাচন চায়। এর ফলে এমন সরকার গড়ে ওঠে, যাদের মনোযোগ কেবল রাজনীতির ওপর। নীতিমালা বা কার্যকারিতা তাদের মাথাব্যথা নয়। ভোটাররা শুধু চেনে তারা কাকে ভোট দিচ্ছে। কিন্তু সে নির্বাচনে পাশ করে কী নীতিমালা অনুসরণ করবে, সেটা ভোটাররা না-ও জানতে পারে। ঘুরেফিরে দেশ পরিচালনার ওপর ভোটারের আর কোনো অধিকারই রইল না। এমনসব রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে, যারা স্রেফ ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে আনুগত্য পরিবর্তন করে, কোনো সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রতি অটল থাকে না। সরকার দেশ চালনায় মনোযোগ না দিয়ে বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করে। জোটের ন্যূনতম স্বার্থটা আদায় হয়ে গেলেই হলো। একে পালটানোর সময় এসেছে।

বহুত্ববাদী গণতন্ত্র হলো ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি। কিন্তু বর্তমানে এটা যে পদ্ধতিতে চলছে, সেটাই আবার ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ভারতের বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা দরকার, যেখানে চটপট কাজ করা যায়। অথচ এখন যা চলছে, তাতে কেবল দীর্ঘসূত্রতা আর সিদ্ধান্তহীনতা ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। ভারতের এমন এক সরকার-ব্যবস্থা দরকার, যেখানে নেতারা ক্ষমতায় টিকে থাকার বদলে বরং দেশচালনায় মন দেবেন। সংসদীয় ব্যবস্থা যে এখন এসে কার্যকারিতা হারিয়েছে, তা নয়। শুরু থেকেই এটি ভারতের পরিস্থিতির জন্য অনুপযুক্ত ছিল। দেশের বহু রাজনৈতিক সমস্যার গোড়াও এখানেই। এজন্যই আমি বারবার ভারতের জন্য প্রেসিডেনশিয়াল ব্যবস্থার কথা বলে আসছি।[১৫৭] সেটা শুধু নয়াদিল্লির ফেডারেল সরকারের ক্ষেত্রেই নয়, বরং গ্রাম, শহর, রাজ্য ও কেন্দ্র-সহ প্রতিটা পর্যায়ে প্রধান কার্যনির্বাহীরা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

[১৫৭] দ্রষ্টব্য ইন্ডিয়া শাস্ত্র: রিফলেকশানস অন দ্য নেশান ইন আওয়ার টাইমস-এ প্রকাশিত আমার এ-বিষয়ক প্রবন্ধ, নয়াদিল্লি: আলেফ বুক কোম্পানি, ২০১৫।

তাদের জবাবদিহিতা হবে ভোটারদের কাছে: আইনসভা, পৌরসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদাপরিবর্তনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে না।

পক্ষান্তরে, ব্রিটেন হলো ছোট একটা দ্বীপ দেশ। তাদের সংসদীয় ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে সে অনুযায়ী। শুরুতে একেকজন সাংসদের বিপরীতে ছিল মাত্র কয়েক হাজার ভোটার, এমনকি বর্তমানেও একেকটা নির্বাচনি এলাকায় ভোটারের সংখ্যা ১ লাখের কম। ভারতের বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোকে সুসংজ্ঞায়িত হতে হয়। প্রত্যেক দলের সুসংলগ্ন নীতিমালা ও পছন্দ-অপছন্দ থাকা চাই, যা তাকে অন্যান্য দল থেকে আলাদা করে। ভারতে একেকটা পার্টি মানে স্রেফ একটা তকমা। বলিউডের অভিনেতারা যেভাবে বেশভূষা পালটায়, রাজনীতিবিদরাও দল পালটায় সেভাবেই। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শই ধোঁয়াশা। 'জাতীয়' দলগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক দলের 'মতাদর্শ'ই মধ্যমপন্থি পপুলিজমের কোনো-না-কোনো সংস্করণ। কংগ্রেসের নেহরুবাদী সমাজতন্ত্রকেই বিভিন্ন মাত্রায় উলটে-পালটে নিয়েছে তারা। আমাদের পূর্বপুরুষরা 'সব পার্লামেন্টের মা' তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকেই অনুকরণ করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু আমাদের ওপর এই ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার দায়টা ব্রিটিশদের নয়। প্রথম কথা হলো, ভারতীয়দেরকে গণতন্ত্র দান করার কোনো ইচ্ছাই ব্রিটিশদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনি অধিবেশনে ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় সংসদীয় ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে।

দুই শতক আগের আমেরিকান বিপ্লবীদের মতোই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও লড়াই করেছে 'ইংরেজের অধিকার' পাওয়ার জন্য। ভেবেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাঠামো নকল করলেই সেটা হয়ে যাবে। হাজার হোক, ওটাই গণতন্ত্রের মূর্তরূপ কিনা! প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ছিলেন ব্রিটিশ সংবিধান কমিশনের একজন সদস্য। তিনি ভারতীয় নেতাদের প্রস্তাব দেন যে, ভারতে প্রেসিডেনশিয়াল ব্যবস্থা চালু করা হোক। ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'তারা বেশ জোরেশোরে নাকচ করে দেন। আমার কাছে মনে হলো, তারা যেন ভাবছেন আমি মাখনের বদলে মার্জারিন সাধছি।'[১৬০] আমাদের অনেক পোড়খাওয়া সাংসদই ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরতে পেরে খুব খুশি। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার ইংল্যান্ড থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন। ব্রিটিশ সংসদীয় রীতিকে তারা বেশ মুগ্ধ

[১৬০] বার্নার্ড উইদারহিল, 'রিলেশানস বিটুইন কমনওয়েলথ পার্লামেন্টস অ্যান্ড দ্য হাউজ অব কমন্স', আরএসএ জার্নাল, খণ্ড ১৩৭, সংখ্যা ৫৩৯৯, অক্টোবর ১৯৮৯, পৃ. ৭৩৫–৭৪১। প্রকাশক রয়াল সোসাইটি ফর দি এনকারেজমেন্ট অব আর্টস, ম্যানুফ্যাকচারস অ্যান্ড কমার্স।

চোখে দেখেন। আদি ও অকৃত্রিম ব্যবস্থার অনুসারী বলে নিজেদের বেশ বাহবা দেন তারা। ভারতীয় এমপিরা এখনো সমর্থন জানাতে হাতে তালি না দিয়ে টেবিল থাপড়ান। যখন কোনো আইন পাশের জন্য মৌখিক ভোটাভুটি করা হয়, ইতিবাচক ভোট দিতে 'ইয়েস' না বলে 'আই' বলতে হয়। এমনকি আমাদের কমিউনিস্টরা পর্যন্ত মহানন্দে এই ব্যবস্থাকে বুকে টেনে নিয়েছেন। জনৈক ইংরেজভক্ত মার্ক্সবাদী সাংসদ প্রফেসর হীরেন মুখার্জি এমনই এক ব্যক্তি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেন যে প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের চেয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টে বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন, এ কথা হীরেন সাহেব খুব গর্বের সাথে বলে থাকেন।

তবে ছয় দশকের স্বাধীনতা এতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ব্রিটিশদের সাথে ঘষাঘষির স্মৃতি মলিন হয়ে আসছে। পুনরায় মাথা তুলছে ভারতের সহজাত চপলতা। কিছু রাজ্যসভায় ইতোমধ্যে দেখা গেছে অসভ্য বিধায়কদের আসবাব ছোড়াছুড়ি, মাইক্রোফোন ভাঙাভাঙি আর চপ্পল ছুড়ে মারার দৃশ্য। রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঘুসাঘুসি আর কাপড় ছেঁড়াছিঁড়ির কথা তো বলাই বাহুল্য। জাতীয় আইনসভার কুয়ায় পিপার স্প্রে ঢেলে দিয়েছেন জনৈক প্রতিবাদী সাংসদ। এসবের জন্যও ব্রিটিশদের দোষ দেওয়া কঠিন।

***

কিন্তু তারপরও ব্রিটেন আমাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের খোলসটা দিয়ে গেছে—এই দাবি হালে পানি পায় না। ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বাস্তবতা এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে এমন এক ব্যক্তির কথা নিয়ে আসছি, যিনি আসলেই জীবদ্দশায় ঔপনিবেশিক যুগকে পেয়েছেন। তিনি জওহরলাল নেহরু। লর্ড লোথিয়ান নামক এক ইংরেজের প্রতি তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন ১৯৩৬ সালে। নেহরু তাতে বলেন, ব্রিটিশ শাসনের 'ভিত্তি হলো সর্বব্যাপী সহিংসতার এক চরম রূপ। ভীতি ছাড়া এখানে আর কিছুরই অনুমোদন নেই। জনগণের বিকাশের জন্য যতটুকু স্বাধীনতা একদম বাঞ্ছনীয়, সেটাকেও দমন করে ফেলা হয়। সাহস, নির্ভীকতা ও সংবেদনশীলতাকে ব্রিটিশ শাসন গুঁড়িয়ে দেয়, আর উৎসাহিত করে পোষমানা, সুযোগসন্ধানী, চোর ও গুন্ডাদের। গোয়েন্দা, গুপ্তচর আর উসকানিদাতাদের এক বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে তারা নিজেদের ঘিরে রাখে। এহেন পরিবেশে কি কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব?'[১৬১] নেহরু আরও তুলে

[১৬১] জওহরলাল নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস, মুম্বাই: এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, ১৯৫৮, পৃ. ২৩৬।

ধরেন 'মানবীয় মর্যাদা ও সম্মানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া আত্মিক ও দৈহিক ক্ষতে'র কথা, যা 'নিপীড়ক-নিপীড়িত উভয়কেই অপদস্থ করে ছাড়ে'। এসব করে তো ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা এর প্রতি সম্মান তৈরি করা সম্ভব নয়। ভারতের আত্মাকে তথা একটা জাতির আত্মসম্মানকে যে এভাবে আঘাত করা হলো—এই ব্যাপারটাই উপনিবেশবাদের সাফাই-গায়করা সবসময় এড়িয়ে যান।

'আইনের শাসন': বুট এবং প্লিহা

ব্রিটেন ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও গণতন্ত্র দান করেছে, এই দাবির সূত্র ধরেই বলা হয়, এই দেশে 'আইনের শাসন'ও প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা। ব্রিটিশরা এটাকে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলেও দাবি করে। কোন কোন কাজকে তারা ভারতে নিজেদের 'মিশন' বলে মনে করত, সে ব্যাপারে কিছু আলাপ আমরা আগেও করেছি। তাদের মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিল নেটিভদেরকে ব্রিটিশ আইনের ছায়াতলে নিয়ে আসা। এই মহান দায়িত্বকে আবার কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করতেন কিপলিং। ব্রিটিশরাই আইন বানাবে, আবার ওই আইনের বলেই তারা নিজেদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে বৈধতা দেবে। কিন্তু ভারতের মতো অনেক জায়গায় ব্রিটিশ শাসন গেড়ে বসার আগে থেকেই আইন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। তাই ব্রিটিশ আইনকে সেসব জায়গায় জোর করে চাপিয়ে দিতে হয়েছে। ধামাচাপা দিতে হয়েছে একটি প্রবীণ ও জটিল সভ্যতাকে, যার ছিল নিজস্ব আইনি সংস্কৃতি। এখানে এসেই কিপলিং-সুলভ অজুহাতগুলো ভেঙে পড়তে থাকে। ভারতে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রায়ই বলপ্রয়োগ ও সহিংসতা ব্যবহার করা লাগত। এতদিন ধরে চলে আসা রীতিনীতি ও ঐতিহ্য বাতিল করার আদেশ দিত তারা। এভাবে গোটা সমাজকেই তারা ভেঙেচুরে নিজেদের মনোমতো গড়ার চেষ্টা করতে থাকে। জনৈক ব্রিটিশ গবেষক তাই বলেন, 'এভাবে যে আইন খাড়া করা হলো, সেটা উপনিবেশের প্রজাদের আদৌ কোনো উপকারে আসেনি।'[১৬২]

সাম্রাজ্যবাদের মহত্তম অবদান হিসেবে বলা হয়, ব্রিটিশ শাসনই ভারতকে একটা গোছালো দণ্ডবিধি তৈরি করে দিয়েছে। জিনিসটার খসড়া তৈরি

---

[১৬২] ডায়ান কারবি এবং ক্যাথেরিন কোলবোর্ন (সম্পা.), ল, হিস্ট্রি অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম: দ্য রিচ অব এম্পায়ার, ম্যানচেস্টার: ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১, উদ্ধৃত করেছেন রিচার্ড প্রাইস, 'ওয়ান বিগ থিং: ব্রিটেন, ইটস এম্পায়ার, অ্যান্ড দেয়ার ইম্পেরিয়াল কালচার' জার্নাল অব ব্রিটিশ স্টাডিজ, খণ্ড ৪৫, সংখ্যা ৩, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৬০২–৬২৭। দ্য নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন ব্রিটিশ স্টাডিজের পক্ষ থেকে প্রকাশক ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। www.jstor.org/stable/10.1086/503593.

করেছেন ম্যাকাউলি। মনেপ্রাণে তার উদ্দেশ্য ছিল 'বিজিত জাতির জন্য একটা আইন-বিধান তৈরি করে দেওয়া। আমাদের নিজস্ব যে সংবিধান, সেটার আশীর্বাদ এখনই তাদের উপভোগ করতে দেওয়াটা নিরাপদ নয়'। ম্যাকাউলি উঁচু দেওয়ালের পেছনে বসে থাকেন তিন বছর যাবৎ। যে জাতিটার জন্য এত ঘাম ঝরাচ্ছেন, তাদের থেকেই তিনি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। এভাবেই তিনি তৈরি করেন গোটা একটা দণ্ডবিধি। 'সবার জন্য লিখিত এই বিধিমালা আদতে কারও জন্যই নয়। আগেকার ভারতীয় আইন বা সরকারব্যবস্থার সাথে এর কোনো সম্পর্কই ছিল না।'[১৬৩] এমনকি ব্রিটিশরা নিজেরাও নিশ্চিত ছিল না এ ব্যাপারে। তাই ম্যাকাউলি ১৮৩৭ সালে কাজ শেষ করলেও সেটা চব্বিশ বছর যাবৎ কাগজের ভেতরেই পড়ে থাকে। অবশেষে তা বাস্তবায়ন করা হয় ১৮৬১ সালে। আজও এই দণ্ডবিধি তার ভিক্টোরিয়ান মহিমায় ভাস্বর হয়ে ভারতে টিকে আছে। এখানেই শেষ নয়। জুরির মাধ্যমে বিচার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের ধারণাগুলোও এখানে প্রবর্তন করেছে ব্রিটিশরা। এগুলো আইনের অনস্বীকার্য অঙ্গ, কিন্তু তাদের প্রয়োগ তো ঠিকভাবে করা চাই। ঔপনিবেশিক যুগে আইনের প্রয়োগ পুরোপুরি নিরপেক্ষ ছিল না।

ব্রিটিশ ভারতে ন্যায়বিচার অন্ধ ছিল না। আসামির গায়ের রংকে সে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা অপরাধ করলে দায়সারা শাস্তি দেওয়া হতো। ভারতীয় চাকরকে গুলি করে মেরে ফেলার কারণে এক ইংরেজকে দেওয়া হয়েছিল ছোটখাটো অর্থদণ্ড-সহ (ওই সময়ের প্রায় ১০০ রুপি) ছয় মাসের কারাদণ্ড। ওদিকে এক ইংরেজ নারীকে ধর্ষণচেষ্টায় অভিযুক্ত ভারতীয়কে দেওয়া হয় ২০ বছরের কঠোর সশ্রম জেল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ১৫০ বছরে খুনের আসামি ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজ। ব্রিটিশের হাতে ভারতীয় মারা গেলেই সেটা দুর্ঘটনা, আর ভারতীয়ের দোষে ব্রিটিশ মারা যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড।

ভারতীয় বিচারকরাও বর্ণবৈষম্যের শিকার হতেন। জাস্টিস সৈয়দ মাহমুদের ঘটনা তো আমরা দেখলামই। ব্রিটিশ আসামিদের বিচার করার অধিকার ভারতীয় বিচারকদের ছিল না। তাদের সে অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন লর্ড রিপন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে-প্রেরিত একমাত্র মানবিক, বর্ণবাদমুক্ত ভাইসরয়। তিনি আরও চেয়েছিলেন, যেন পৌরসভা-সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ভারতীয় বিচারকদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয় ('ইলবার্ট বিলে'র

[১৬৩] উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ২১৩–৪।

মাধ্যমে)। এসবের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। তার সহকারীরা প্রতিবাদ করে ওঠেন। বলেন যে, 'বাঙালি বাবুদের স্কুল বা ড্রেইন নিয়ে মাথা ঘামাতে দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তেমন ক্ষতি নেই।' কিন্তু আদালত বা পৌরসভার ময়দানে ভারতীয়দের এত বেশি বিচরণ করতে দেওয়াটা একেবারেই অনুচিত, বিশেষত প্রশ্নটা যদি হয় ব্রিটিশদের ঘিরে। প্রবাসী ব্রিটিশরা রিপনকে বয়কট করে। এসব বর্ণবাদী চিৎকারের ফলে ইলবার্ট বিল ধসে পড়ে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অব্যাহতি দেওয়া হয় রিপনকে।[১৬৪]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আদালতে প্রায়ই এক বিশেষ ধরনের মামলা উঠে আসত। ম্যালেরিয়ায় (বা অন্যান্য রোগের কারণে) বহু ভারতীয়ের প্লিহা বড় হয়ে যেত। কোনো ব্রিটিশ মনিব যদি নেটিভ চাকরকে লাথি মারতেন (তখনকার এক স্বাভাবিক চিত্র), তাহলে অনেকসময় ওই ফোলা প্লিহা ফেটে মৃত্যু ঘটত চাকরের। আদালত যে প্রশ্ন নিয়ে ধস্তাধস্তি করত, তা হলো : ওই লাথিটা কি হত্যাকাণ্ডের শামিল হবে, নাকি এমনি অপরাধমূলক আচরণ? রবার্ট অগাস্টাস ফুলার ১৮৭৫ সালে এভাবেই হত্যা করেন তার এক চাকরকে। ফুলারের দাবি, তিনি মুখে আঘাত করেছেন। কিন্তু তিন সাক্ষী বলে যে, তিনি মেরেছেন পেটে। শেষমেশ রায় দেওয়া হয়, তিনি 'ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যথা দিয়েছেন'। শাস্তি হিসেবে তিনি ১৫ দিন জেল খাটেন এবং চাকরের বিধবা স্ত্রীকে ৩০ রুপি জরিমানা দেন। (ময়না তদন্তকারীর মতে, চাকরটির প্লিহা এতই বড় ছিল যে, 'রয়েসয়ে' মার দিলেও তা ফেটে যেত।)[১৬৫]

ক্যাপ্টেন স্ট্যানলি দ্য ভিয়ার জুলিয়াস ১৯০৩ সালে তার নোটস অন স্ট্রাইকিং নেটিভস গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'উত্তপ্ত রাতের মাঝখানে হঠাৎ পাখা থেমে যায়। ব্যারাক-রুমের এক লোক গরম ও অনিদ্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাঁড়ায়, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে দৌড়ে আসে, এবং পাখা-চালককে লাথি মেরে বসে ভুল জায়গায়, প্লিহাতে। তাকে কি দোষ দেওয়া যাবে? হ্যাঁ এবং না। লাথি মারার আগে সে বুট পরে নিয়েছিল কি না—এর ওপর উত্তরটা আংশিক নির্ভর করবে।' পাঞ্চ ম্যাগাজিনে তো পুরো একটা কবিতাই ছাপানো হয়েছে 'দ্য স্টাউট ব্রিটিশ বুট' নামে। নেটিভদের সোজা রাখার জন্য এটাই তাদের পছন্দনীয় অস্ত্র। কবিতাটা শেষ হয়েছে এভাবে—'লেদার-ঢাকা পায়ের নামে স্তুতিগান গেয়ে উঠি/লিখে দিই আজ

---

[১৬৪] এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩৮–১৩৯।

[১৬৫] জর্ডানা বেইলকিন, 'দ্য বুট অ্যান্ড দ্য স্প্লিন: হোয়েন ওয়াজ মার্ডার পসিবল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া?', কম্প্যারাটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যান্ড হিস্ট্রি, ৪৮ (২), ২০০৬, পৃ. ৪৬২–৯৩।

পতাকায় মোদের "সুঠাম ব্রিটিশ বুট" ।'[১৬৬]

ভারতবাসী ব্রিটিশ বিচারকরা মানতেই চাইতেন না যে, কোনো ইংরেজ কোনো ভারতীয়কে হত্যার দায়ে অপরাধী হতে পারে। এর প্রতিচ্ছবি হিসেবেই যেন ভিক্টোরিয়ান লন্ডনেও কমে যেতে থাকে খুনের মামলা। মার্টিন উইনার একটা 'রপ্তানি' তত্ত্ব তুলে আনেন। তার মতে, ব্রিটেনে খুনের মামলা কমে যাওয়ার কারণ হলো, 'উগ্রতম নাগরিকরা সবাই বিদেশের মাটিতে রপ্তানি হয়ে গেছে। সেখানেই তারা] নারকীয় উচ্ছৃঙ্খলতা করতে ব্যস্ত।'[১৬৭] লক্ষণীয় যে, লন্ডনে প্রাণঘাতী লাথিকে ধরা হতো 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড', আর ভারতে একই জিনিসের মামলা হতো 'ব্যথা দেওয়া' বা 'বেপরোয়া আচরণ' হিসেবে—যদি ভুক্তভোগীটি হয়ে থাকে ভারতীয়।

হ্যাঁ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে জঙ্গি আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সেটা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। নেটিভদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের সহিংসতার মামলায় রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো এই বিষয়টা প্রভাবিত করেছে বিচারকদের। কিন্তু ইউরোপীয়দের হাতে যারা মারা গেছে, তারা স্বদেশি আন্দোলনের বোমারু নয়, বরং বেশিরভাগই চাকর বা অন্যান্য ছা-পোষা মানুষ। রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না, তারপরও সবসময়ই ঘটনাকে টেনেহিঁচড়ে ইংরেজের অপরাধকে লাঘব করা হতো। লেফটেন্যান্ট টমসন ও লেফটেন্যান্ট নিভ ব্যাঙ্গালোরে এক ভারতীয় বালককে গুলি করে হত্যা করেন। নিভের বন্দুক জোর করে কেড়ে নেয় ভারতীয় গ্রামবাসী, অথচ শ্বেতাঙ্গের অস্ত্র হাতিয়ে নেওয়ায় ছয় মাসের কারাবরণ করে দুজন গ্রামবাসী। খুনিদের বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মামলা নথিভুক্ত হয়েছিলই 'নেটিভস এগেইন্সট ইউরোপিয়ানস' শিরোনামে।

ব্রিটিশ বিচারকরা একই অপরাধে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের কখনোই সমান শাস্তি দিতেন না। ধারণা করা হয়, কলকাতায় একই অপরাধের জন্য ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের তুলনায় দশ গুণেরও বেশি সময় কারাভোগ করে। আসামি যদি ভারতীয় হয়, তাহলে তার খুন বা হত্যাচেষ্টা মামলা খাওয়ার সম্ভাবনা ইউরোপীয়ের চেয়ে দ্বিগুণ। পরিসংখ্যান বলে, ভারতীয়দের ওপর ইউরোপীয়দের আক্রমণের ঘটনা অনেক বেশি, তার উলটোটা অনেক কম;

---

[১৬৬] 'দ্য ব্রিটিশ বুট', পাঞ্চ ৬৮, (৩০ জানুয়ারি ১৮৭৫), পৃ. ৫০, উদ্ধৃত করেছেন জর্ডানা বেইলকিন, 'দ্য বুট অ্যান্ড দ্য স্প্লিন: হোয়েন ওয়াজ মার্ডার পসিবল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া?', কম্প্যারাটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যান্ড হিস্ট্রি, ৪৮ (২), ২০০৬, পৃ. ৪৬২–৯৩।

[১৬৭] মার্টিন উইনার, মেন অব ব্লাড: ভায়োলেন্স, ম্যানলিনেস অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস ইন ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪, পৃ. ২।

অথচ প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের নামে হত্যামামলা দায়ের হতো। আর ইউরোপীয়দের অপরাধকে দেখা হতো হয় দুর্ঘটনা, আর নয়তো আত্মরক্ষার চেষ্টা হিসেবে। খুন করে থাকলেও সেটাকে নামিয়ে দেওয়া হতো নিতান্ত আক্রমণের পর্যায়ে। এক মামলায় ব্রিটিশ বিচারক প্রমাণ পেলেন যে, অপরাধটি 'স্পষ্টতই' খুন। তখন আবিষ্কৃত হলো, ব্রিটিশ খুনিটি মানসিক বিকারগ্রস্ত। কাজেই নিজের কাজকর্মের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না।

ব্রিটিশরা সবাই কিন্তু এহেন অবিচারে সন্তুষ্ট ছিল না। শিয়ালকোটের ৯ম ল্যান্সারস রেজিমেন্টের তিন সৈনিক ১৯০২ সালে এক ভারতীয়কে পিটিয়ে মেরে ফেলে। রাতে মজার করার জন্য সৈনিকরা একটা মহিলা এনে দিতে বলেছিল। নিহত লোকটির অপরাধ, সে এই কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। রেজিমেন্ট কর্তৃপক্ষ এটার তদন্তের কোনো উদ্যোগই নেয়নি। নিহতকে মাতাল বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু এই ঘটনায় খেপে ওঠে কয়েকজন ভারতবাসী ব্রিটিশ, আর তাদের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়; এমনকি যে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ভারতীয়দের দেখতেই পারতেন না, তিনি পর্যন্ত শিউরে উঠে বলেন, 'এ দেশে এমনিতেই বহু অপরাধকে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। আমি এরকম কোনো ঘৃণ্য কাজের অংশ হতে নারাজ। আমি এই তত্ত্বও মানতে নারাজ যে, স্রেফ শালার নিগার বলেই একজন কৃষ্ণাঙ্গকে পিটিয়ে বা হত্যা করে পার পেয়ে যাবে শ্বেতাঙ্গরা।'[১৬৮] কার্জন শাস্তি বাড়াতে পারেননি বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট পুরো ব্রিটিশ রেজিমেন্টকে তিনি আদেনে বদলি করে দেন। এতেও শেষ হয়ে যায়নি ঘটনা। কয়েক সপ্তাহ পরে দিল্লিতে একটা প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। কার্জন কঠিন চোখে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন যে, ওই একই রেজিমেন্ট তার সামনে দিয়ে ড্যাংড্যাং করে কুচকাওয়াজ করে চলে গেল। দর্শকদের ইংরেজ অংশটাও পাগলের মতো বাহবা দিচ্ছে তাদের। কার্জনের মতো একটা লোক যখন ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি দেখালেন, তাহলে বোঝাই যায় ঘটনায় ভয়াবহতা কেমন ছিল।

বিশেষজ্ঞ জর্ডানা বেইলকিন দেখিয়েছেন যে, এরকম বর্ণ-সচেতন বিচারব্যবস্থায় অল্প কয়েকটা (যদিও খুবই অল্প) ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটেছে। ভারতীয়দের হত্যা করার অপরাধে ব্রিটিশদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দুর্লভ ঘটনা ঘটেছে তিনবার। আসামিরা হলো : বাংলার জন রুড (১৮৬১), মুম্বাইয়ের চার নাবিক উইলসন, অ্যাপোসল, নিকোলাস, ও পিটারস (১৮৬৭), এবং বাংলার জর্জ নায়ার্নস (১৮৮০)। কিন্তু ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনে ঔপনিবেশিক

[১৬৮] নয়ন গোরাদিয়া, লর্ড কার্জন: দ্য লাস্ট অব দ্য ব্রিটিশ মোগুলস, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩।

প্রভুদের হাতে নিহত হয়েছে হাজারো ভারতীয়। এগুলোর মাঝে এই তিনটি মামলাই কেবল ব্যতিক্রম। সার্বিকভাবে, দেওয়ানি ব্রিটিশ বিচারক এবং মফস্‌সলের ম্যাজিস্ট্রেটরা ইউরোপীয়দের শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফৌজদারি আদালত এবং শহুরে উচ্চ আদালতগুলো ভারতীয়দের ওপর আক্রমণের অপরাধে তুলনামূলক গুরুতর শাস্তি আরোপ করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ৩০ বছর আইসিএসে কাজ করেছেন জনৈক কর্মকর্তা। তার চোখে, 'জনগণ ও আদালতের মাঝে এক বিশাল ও বিপজ্জনক দূরত্ব বিদ্যমান। এই দূরত্ব ঘোচানোর কোনো উপায়ও নেই।'[১৬৯]

জনৈক ভারতীয়কে লাথি মেরে হত্যা করার পর বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছিল এক ইংরেজকে। মধ্যমপন্থি জাতীয়তাবাদী ম্যাগাজিন প্রভাত-এর ডিসেম্বর ১৯২৫ সংখ্যায় এ ব্যাপারে আফসোস করে লেখা হয়েছে :

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়রা কেন এত বীতশ্রদ্ধ, তার উত্তর এসব ঘটনা। ভারতীয়দের জীবনের প্রতি এইরকম বেদনাময় তাচ্ছিল্য প্রত্যেক ভারতীয়ের অন্তরেই এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। তাই অহিংসার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধির ক্রমাগত আহ্বানের পরও পথভ্রষ্ট ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকেই বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যায়। বুট আর প্লিহার মাঝে যতদিন এই সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভারত বিশ্বের সবচেয়ে অস্পৃশ্য ও অসম্মানিত দেশ হয়েই রইবে।

সাম্রাজ্যবাদী আইন-ব্যবস্থা তৈরি করেছে একটি বিদেশি জাতি, তারপর চাপিয়ে দিয়েছে একটা বিজিত জনগোষ্ঠীর ওপর। আইন সৃষ্টির সময় সেই জনগোষ্ঠীর সাথে কোনো আলাপই করা হয়নি। সোজা কথায়, সেটা ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্যেরই এক হাতিয়ার। হেনরি নেভিনসন যথার্থই দেখিয়েছেন যে, এই কথিত আইনের শাসনের ফলে ভারতীয়রা 'সার্বক্ষণিক সরকারি নজরদারির অধীনে বাস করতে বাধ্য হয়। এই আইন তাদের ব্যক্তিগত চিঠি খুলে পড়ে, তাদের টেলিগ্রাম আটকে দেয় এবং লোক ভাড়া করে তাদের কাজকর্মের ওপর চোখ রাখে'।[১৭০]

এই সেই আইন, যা ব্রিটিশরা আমাদের শিখিয়ে গেছে। এই শিক্ষার অনেককিছুই ভুলে যেতে হবে আমাদের।

***

সমস্যা আরও ছিল। ঔপনিবেশিক 'আইনের শাসন' সাধারণত শ্বেতাঙ্গ

---

[১৬৯] ফিল্ডিং-হল, পাসিং অব দি এম্পায়ার, পৃ. ১০৩।

[১৭০] নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ২০৪।

অভিবাসী, অভিজাত ও পুরুষদের হয়ে কাজ করত। বর্ণবৈষম্য আইনত বৈধ। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, প্রাইভেট ক্লাবের দরজা শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্যই খোলা। বহু ব্রিটিশ হোটেল ও স্থাপনায় সাইনবোর্ড টাঙানো থাকত 'ভারতীয় ও কুকুর প্রবেশ নিষেধ'। (এরকমই এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন জামসেতজি টাটা। মুম্বাইয়ের ওয়াটসন'স হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় তাকে। এই জিদেই তিনি ওই জামানার অন্যতম বিলাসবহুল ও চমৎকার হোটেলটি প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম তাজ মহল। এখানে ভারতীয়দের ঢুকতে কোনো মানা নেই।)

নারীদের সহ্য করতে হতো ভিক্টোরিয়ান পুরুষতান্ত্রিকতা। নারীবিদ্বেষেরও অভাব ছিল না। যেমন : মালাবার উপকূলের সমাজে মায়ের সূত্রে উত্তরাধিকার লাভের আইন ছিল। তাই সেখানে বিপুল সম্পত্তি এবং সামাজিক অধিকার পেত নারীরা। শারীরিক স্বাধীনতার কথা তো বলাই বাহুল্য। তাদের ওপর পুরুষতান্ত্রিক শেকল চাপিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, এটাই 'সঠিক' ও 'নৈতিক' জীবনপদ্ধতি। শারীরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বামী ও পুত্রের অধীন করে দেওয়া হয় তাদের।[১৭১] ঔপনিবেশিক আমলের ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ধর্ষণের ব্যাপারে যে আইন করা হয়, তাতে একটা অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয় ভুক্তভোগীর ঘাড়ে। তাকে নিজের 'সচ্চরিত্রে'র প্রমাণ দিতে হবে। তারপর প্রমাণ করতে হবে যে, ধর্ষণ আসলেই হয়েছে। ফলে সহজেই তাকে অপমান করার সুযোগ পেয়ে যায় মামলার প্রতিপক্ষ। বিচারিক প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগীকে যেসব অপমান সহ্য করতে হতো, সেগুলোর ভয়ে অনেক ধর্ষণের কথাই চেপে যাওয়া হতো।

আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ওপর ব্রিটিশ দখলদারত্বকে চিরস্থায়ী করা। তাই তাকে তৈরিই করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে। রাজনৈতিক ভিন্নমতকে আইন করে দমন করা হয়। দণ্ডবিধিতে ৪৯টি আইন ছিল স্রেফ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণের অপরাধ-সংক্রান্ত (আর মৃত্যু-সংক্রান্ত আইন মাত্র ১১টা)।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বর্ণবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তার দণ্ডবিধিতেও। এরকমই এক আইন ১৯১১ সালের ক্রিমিনাল ট্রাইবস লেজিসলেশান। এতে করে ব্রিটিশরা কিছু জাতিগোষ্ঠীর লোকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, তল্লাশি, এমনকি বন্দি করার অধিকার পর্যন্ত পেয়ে যায়। কারণ,

---

[১৭১] এই ব্যাপারটি দুর্দান্তভাবে বর্ণনা করেছেন মনু পিল্লাই, দি আইভোরি থ্রোন, নয়াদিল্লি: হারপার কলিনস, ২০১৫।

ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা ক্রমাগত 'অপরাধমূলক' কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হয়।[১৭২] সমাজবিজ্ঞান বা আইনশাস্ত্র, দুদিক দিয়েই এ এক নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ স্বাধীনতার পরেও কিতাবে এই আইনের অস্তিত্ব রয়ে গিয়েছিল। তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার, এর ফলাফল ছিল অমানবিক। এই 'অপরাধী গোষ্ঠী' নামক ধারণা উদ্ভাবিত করার ফলাফল কী রকম হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করেছেন সঞ্জয় নিগাম।[১৭৩] ব্রিটিশরা প্রথমে আইন করে এহেন শ্রেণিভেদকে বৈধতা দেয়। তারপর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করে জোগাড় করে তাদের বিস্তারিত তথ্য। তারা এসব গোত্রের সদস্যদের চলাচল সীমিত করে দেয়। 'অপরাধী গোত্রে'র লোকদের তারা জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করে গ্রাম্য একালায় বা সংশোধন শিবিরে। জেনেশুনে পিতামাতা ও সন্তানদের তারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

আদালত-ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান এবং ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ—এ সবই ব্রিটিশদের-দেওয়া অসাধারণ সব উত্তরাধিকার। যদিও ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয়রা এসবের নিরপেক্ষ প্রয়োগ দেখেনি, তবুও এগুলো পেয়ে তারা অবশ্যই খুশি। কিন্তু এই করতে গিয়ে ব্রিটিশরা আমাদের ওপর এক সংঘাতময় আইনি ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার আতিশয্যে আসল জিনিস চাপা পড়ে যায়। অথচ এর আগে ভারতের যে বিচারব্যবস্থা ছিল, তাতে এসব ঝামেলা ছিলই না। হ্যাঁ, কিছু অঞ্চলের বিচারব্যবস্থায় কিছু মারাত্মক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন : উত্তর ভারতের খাপ পঞ্চায়েত (বর্ণ পরিষদ)। অনেক সময় এগুলো ঘুরেফিরে সামাজিক বৈষম্যকেই আরও হাওয়া দেয়। কিন্তু আদিব্যবস্থাকে যে আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব, তার বাস্তব উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছে রুয়ান্ডার গাক্কা আদালতগুলো। পশ্চিমা ব্যবস্থার মতো অতি-আনুষ্ঠানিকতা, প্রক্রিয়াগত বিলম্ব ইত্যাদির কোনো প্রয়োজনই পড়েনি। ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে একেকটা মামলা চলতে থাকে অনন্তকাল ধরে। এর ফলে ভারতে ঝুলে-থাকা মামলার তালিকা এত লম্বা হয়ে যায়, যা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। (ভারতের নিম্ন আদালতগুলোতে এখনো এমন কিছু মামলা ঝুলে আছে, যেগুলো দায়ের করা হয়েছিল ব্রিটিশ

---

[১৭২] ডি. এম. পিয়ারস এবং এন. গুপ্ত (সম্পা.), ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২।

[১৭৩] সঞ্জয় নিগাম, ১৯৯০, 'ডিসিপ্লিনিং অ্যান্ড পুলিসিং দ্য 'ক্রিমিনালস বাই বার্থ', পার্ট ১: দ্য মেকিং অব আ কলোনিয়াল স্টেরিওটাইপ দ্য ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব নর্থ ইন্ডিয়া', এবং 'পার্ট ২: দ্য ডেভেলাপমেন্ট অব আ ডিসিপ্লিনারি সিস্টেম, ১৮৭১–১৯০০', ইন্ডিয়ান একোনমিক সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ২৭, পৃ. ১৩১–১৬৪ এবং ২৫৭–২৮৭।

রাজের আমলে।)

হস্তক্ষেপ পরিহার, না ব্যবহার?

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মহানুভবতা তুলে ধরতে গিয়ে আরও বলা হয় যে, ব্রিটিশরা ছিল অনাগ্রাসি শাসক। একটা সীমার বাইরে তারা ভারতীয় জনগণের স্থানীয় বিষয়-আশয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তাদের বিশ্বাস, ভারতীয়দের রীতিনীতি ও প্রথা 'যতই "জঘন্য" ও "আদিম" হোক না কেন', সেগুলোকে শ্রদ্ধা করতে হবে, মহারানির ১৮৫৮ সালের ঘোষণায় যেমনটা নিঃসংকোচে বলা হয়েছে :

আমরা সানন্দে আমার রাজ-ইচ্ছা ঘোষণা করছি যে..., কাউকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-প্রথার কারণে নিপীড়ন বা উত্ত্যক্ত করা যাবে না, বরং সকলেই আইনের দ্বারা সমান ও নিরপেক্ষ সুরক্ষা উপভোগ করবে। আমাদের অধীনে যারা দায়িত্বশীল থাকবেন, তাদের প্রতি কঠোরভাবে আদেশ প্রদান করছি, তারা যেন আমাদের যে-কোনো প্রজার ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনার ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। যদি এমনটি করা হয়, তবে তা হবে আমাদের সর্বোচ্চ অসন্তুষ্টির কারণ।[১৭৪]

স্প্যানিশরা উপনিবেশবাদী হয়ে উঠেছিল খ্রিষ্টান ক্রুসেডীয় জযবার বশে, আর ফরাসিরা সাংস্কৃতিক চেতনার ঠ্যালায়। ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে এর কোনোটাই সত্য নয়; বরং তাদের চালিকাশক্তি ছিল আর্থিক মুনাফা। তাই তারা ভারতীয় সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়তে বা নিজেদের ছাঁচে গড়ে তুলতে অতটা উদ্‌গ্রীব ছিল না। তবে এটা সত্যি যে, খ্রিষ্টান শ্রেষ্ঠত্ববাদও ব্রিটিশ বর্ণবাদের পালে হাওয়া জুগিয়েছে। ব্রিটেনের সবচেয়ে বিখ্যাত খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম উইলবারফোর্স যেমন বলেছেন—'আমাদের দ্বীন মহান, বিশুদ্ধ, ও উপকারী। আর তাদেরটা নীচ, অশ্লীল, ও নিষ্ঠুর।'[১৭৫]

বহু ব্রিটিশের কাছেই সাম্রাজ্যবাদ জায়িয, কারণ এটা মূলত একটা নৈতিক ক্রুসেড। এর উদ্দেশ্য 'অজ্ঞতা, মূর্তিপূজা ও পাপাচার' থেকে ভারতীয়দের মুক্ত করা। কিন্তু কেন যেন তারা ওই অনুযায়ী কাজ করতে বড়ই অনিচ্ছুক। যেমন : পর্তুগিজরা বিদ্যুদ্‌বেগে গোয়া অঞ্চলকে খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলেছে, অথচ ব্রিটিশরা

---

[১৭৪] 'হার ম্যাজেস্টি'জ প্রোক্লেমেশান (১৮৫৮)', ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস, আফ্রিকা, প্যাসিফিক অ্যান্ড এশিয়া কালেকশানস, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন: এল/পিঅ্যান্ডএস/৬.৪৬৩ ফাইল ৩৬, ফোলিও ২১৫–১৬।

[১৭৫] উদ্ধৃত করেছেন লরেন্স জেইমস, রাজ: দ্য মেইকিং অ্যান্ড আনমেইকিং অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: সেন্ট মার্টিন'স গ্রিফিন, ১৯৯৭, পৃ. ২২৩।

তাদের প্রথম বিশোপকে আনিয়েছে ১৮১৩ সালে। জন উইলসন লিখেছেন, 'ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রথম এবং কিছুক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাটিতে ব্রিটেনের অবস্থানকে প্রতিরক্ষা দেওয়া।'[১৭৬] বেশিরভাগ সাম্রাজ্যবাদীর কাছে ভারত কোনো ক্রুসেড নয়, বরং ক্যারিয়ার; ভারতকে পালটানো লক্ষ্য নয়, বরং ভারত থেকে টাকা বানানোটা লক্ষ্য। আঙ্গাস ম্যাডিসন বলেন, 'গ্রাম্য সমাজ, বর্ণপ্রথা, অস্পৃশ্যদের অবস্থা, যৌথ পরিবারব্যবস্থা বা কৃষির উৎপাদন কৌশলে তেমন কোনো বড় পরিবর্তন আসেনি।'[১৭৭] তার কথা অবশ্য পুরোপুরি সঠিক নয়। সামনে আমরা দেখব, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের তুলনায় ব্রিটিশ শাসনাধীনে বর্ণপ্রথা আরও কঠোর হয়েছে। তারপরও ব্রিটিশরা সতীদাহ ও ঠগির মতো বর্বর প্রথা বিলুপ্ত করেছে বলে কৃতিত্ব দাবি করে। (সতীদাহ মানে মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীর স্বেচ্ছায় পুড়ে যাওয়া। বিষয়টা আরও উৎকট হয়েছে এ কারণে যে, ভুক্তভোগীদের অনেকেই ছিল বুড়োদের সাথে বিবাহিতা কমবয়সি। আর ঠগি মানে একধরনের প্রথাগত ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড। একদল অপরাধী কালী দেবীর নামে এই কাজ করত। তাদের বদৌলতেই ইংরেজি ভাষায় Thugs শব্দটি জায়গা করে নিয়েছে।) আসলে ব্রিটিশরা সামাজিক প্রথায় বাগড়া দিত নিজেদের সুবিধামতো।[১৭৮] কিতাবি সর্বজনীন উদারতাবাদ আর বাস্তবের উপনিবেশবাদী শাসনের মাঝে ছিল বিস্তর ফারাক। ব্রিটিশ সমাজ-সংস্কারের যেসব দাবি একটু বেশিই ভুয়া, সেগুলো আমি বইয়ের শেষের দিকে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এতটুকু দেখাব যে, ব্রিটিশদের মনে চাইলেই কেবল তারা স্থানীয় আচার-প্রথায় হস্তক্ষেপ করত, অন্যথায় বিরত থাকত তা থেকে। উভয় কাজের জন্যই বিশাল নেকি দাবি করত তারা।

আইন-ব্যবস্থা তৈরি আর ভারতীয় দণ্ডবিধি ঠিক করতে গিয়েই ব্রিটিশরা ভারতীয় সমাজে এমনকিছু কুসংস্কার প্রোথিত করে দেয়, যেগুলো তারা স্বদেশে বহু আগেই ঝেড়ে ফেলেছে। কিন্তু সেগুলো এখন ভারতে এমনভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে, যা লাখো মানুষের দুর্দশার কারণ। ভারতে ২০১৬ সালে বেশ কিছু উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়। আপাতদৃষ্টে একটা বিষয়ের সাথে আরেকটার

---

[১৭৬] উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ৬।

[১৭৭] ম্যাডিসন, ক্লাস স্ট্রাকচার।

[১৭৮] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, দাসপ্রথা-বিরোধীরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে কাতরভাবে আবেদন জানায়, যেন দাসত্ব-সংক্রান্ত কিছু পুরাতন আচার-প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা স্বভাবতই উপেক্ষা করেন এই আবেদনকে: উইলসন অ্যান্টি-স্লেভারি কালেকশান, আ ব্রিফ ভিউ অব স্লেভারি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮৪১, ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড: দ্য ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার, জন রাইল্যান্ডস ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি। ইউআরএল: www.jstor.org/stable/60228274

কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভালো করে দেখলে সবগুলো বিতর্কেরই গোড়া এক। প্রত্যেকটাই ঔপনিবেশিক যুগে বানানো ব্রিটিশ আইনের সাথে সম্পর্কিত। এমনসব আইন, যেগুলো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ভারত অপারগ বা অনিচ্ছুক।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসব আইন বানিয়েছে। সেই সংবিধানের ৩৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমকামিতা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই এর পক্ষে কথা বলা মানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'। ফলে সমকামিতার অধিকারের পক্ষে স্লোগানরত শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যভিচারের ব্যাপারেও এই সংবিধানের আচরণ দ্বিমুখী।

এই 'বিচ্ছিন্নতাবাদে'র খ্যাপাটে ধারণাটা ১৮৭০ সালে এমনভাবে প্রয়োগ করা হতো, যেন এর ছুতোয় ব্রিটিশ নীতিমালার যে-কোনো সমালোচনাকে দমন করা যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুযায়ী, 'সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ উদ্রেককারী শব্দ, চিহ্ন বা যে-কোনো দৃশ্যমান প্রতীক' ব্যবহারকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তাদের শাস্তি হতে পারে যাবজ্জীবন। যুক্তি হিসেবে তখন বেশ খোলাখুলিই বলা হতো যে, অধীনস্থ রাষ্ট্রের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করাই যায়। জনৈক ব্রিটিশ ১৮৭০ সালে একদম অকপটে বলেন, 'পুরোপুরি শান্তি বিনষ্ট করে না, এরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী অপরাধ' দমনের জন্যও আইন থাকা উচিত। মোটকথা, ভারতীয়দের মতপ্রকাশের কোনো স্বাধীনতাই থাকতে পারবে না।

আইন আরও শক্ত হয় ১৮৯৮ সালে। ইংল্যান্ডে যেরকম ছিল, তারচেয়েও কঠোর করা হয়। বাংলার ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্বীকার করেন, 'স্বজাতীয় ও স্বধর্মীয় সরকারের অধীন জাতির জন্য যতটুকু বিচ্ছিন্নতাবাদ আইন থাকা যথেষ্ট, বিদেশি শাসনাধীনে-থাকা জাতির জন্য ততটুকু যথেষ্ট নাও হতে পারে, বা কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে একদমই অনুপযুক্ত।'

তার মানে, বিচ্ছিন্নতাবাদ আইনের উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আতঙ্কের ওপর রাখা। মহাত্মা গান্ধি এর অন্যতম ভুক্তভোগী। গণতান্ত্রিক ভারতে এই আইনের প্রয়োগ বহু ভারতীয়কেই চমকে দেয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে। এক অভিযুক্ত সন্ত্রাসীর সহকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদ করেছিল তারা। তাদের স্লোগান নাকি 'ভারত-বিরোধী' ছিল। একই অভিযোগে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে মামলা দায়ের করা হয় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধেও। এসব মামলা করা সম্ভব হয়েছে ওই ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত ঢালাও আইনের কারণেই।

ঔপনিবেশিক আমলের এসব ধারার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করছেন, তাদের সাথে আমি একমত। তাই সাংসদ হিসেবে আমি লোকসভায় এসব আইন সংশোধনের প্রস্তাব দাখিল করি। যুক্তি দিই যে, সংবিধানে এসব ধারা থেকে গেলে কর্তৃপক্ষ আমাদের দণ্ডবিধির অপব্যবহার করতে পারে। এতে করে আঘাত আসতে পারে ভারতীয়দের সাংবিধানিক অধিকারের ওপরও। আমার প্রস্তাবনামতে, বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ করা যাবে শুধু তিনটি ক্ষেত্রে। প্রথমত, যদি তার কথা বা কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে সহিংসতা সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়ত, যদি সহিংসতা উসকে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, যদি সে এমন কোনো অপরাধ করে থাকে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী যাবজ্জীবন সাজার যোগ্য—শাস্তিযোগ্য হত্যাকাণ্ড, ইচ্ছাকৃত খুন বা ধর্ষণ। স্রেফ সরকারের কোনো পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে শব্দ বা প্রতীক ব্যবহার করলেই সেটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলা যাবে না। আমার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে বাক্‌স্বাধীনতা ও সরকারের সাথে দ্বিমত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, আরেক দিকে সহিংসতার উসকানিমূলক শব্দ ব্যবহার প্রতিহত করা। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয়রা এই সুযোগটুকু পায়নি।

একই কথা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেও। এটি ১৮৬০ সালে কার্যকর হয়। 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ শারীরিক সঙ্গম'কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এতে। এই কথাখানি এতই সেকেলে যে, বেশিরভাগ আধুনিক সমাজ এ নিয়ে রীতিমতো রসিকতা করবে। হিন্দুস্তানীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক চর্চায় সমকামিতা কোনোকালেই ট্যাবু ছিল না। ব্রিটিশ ভিক্টোরিয়ানরা এসে প্রথমবার একে অপরাধে পরিণত করে। অনুচ্ছেদ ৩৭৭ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে গোপনে-হওয়া সম্মতিসূচক যৌনতাও অপরাধ। এই অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ধারা ২১, ১৪ ও ১৫-এর লঙ্ঘন। ধারা ২১ অনুযায়ী, নাগরিকের গোপনীয়তা ও সম্ভ্রম রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ধারা ১৪ অনুযায়ী আইনের চোখে সকলে সমান এবং ১৫ অনুযায়ী বৈষম্য করা নিষিদ্ধ।[১৭৯]

আমি অনুচ্ছেদ ৩৭৭-এর যে সংশোধনী প্রস্তাব করেছি, তাতে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্মতিতে সংঘটিত যৌনতা কোনো অপরাধ নয়, তাদের লিঙ্গ বা যৌন চাহিদা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের রক্ষণশীল সাংসদগণ পার্লামেন্টে এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে দেন। ফলে এলজিবিটি কর্মীরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ধরনা দেয়। ইতঃপূর্বে আইন বহাল রেখে যে

---

[১৭৯] **লেখক এখানে সমকামিতা, বিপরীতকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদ সম্পর্কে যা যা বলেছেন, তা নিতান্তই হিন্দুয়ানি দৃষ্টিকোণ। ইসলামি দৃষ্টিকোণ অনুসারে এগুলো সম্পূর্ণ হারাম।**– অনুবাদক

রায় দেওয়া হয়েছিল, সর্বোচ্চ আদালত সেটার 'সংশোধনমূলক পুনর্বিবেচনা' শুনতে সম্মত হয়। বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দণ্ডবিধির এই অন্যায় আইনটিকে পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব। মাত্র দুই বছরে (২০১৪ ও ২০১৫) অনুচ্ছেদ ৩৭৭-এর বলে গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৮জন ভারতীয় নাগরিক, সেটাও আবার নিজেদের ঘরের ভেতরে গোপনে-করা কাজের কারণে। চিন্তা করুন, ৫৮ জন।

পরিহাসটা এখানেই যে, ভিন্নতর লিঙ্গ পরিচয় বা যৌন চাহিদার মানুষদের জন্য ভারত চিরকালই এক অভয়াশ্রয় ছিল। যৌনপার্থক্যের প্রতি বৈষম্যমূলক চিন্তাধারার কোনো উদাহরণ ভারতীয় ইতিহাস বা পৌরাণিক কাহিনিতে নেই, বরং মহাভারত মহাকাব্যে ভিষ্মকে হত্যা করে লিঙ্গ-পরিবর্তনকারী শিখণ্ডী। অর্ধনারীশ্বর নামে একটি ধারণা আছে। এখানে ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয় অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী হিসেবে। তাই আশির দশকের চলচ্চিত্র-তারকা ও অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. টি. রাম রাও একদিন অর্ধনারীশ্বর বেশে হাজির হয়ে চমকে দেন তার ভক্তদের। কাজটা অস্বাভাবিক, এমনকি উদ্ভটও বটে; কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে এটি একদম সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে রূপান্তরিত লিঙ্গের মানুষদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নপুংসক লিঙ্গ হিসেবে। ভারতের গোটা ইতিহাসজুড়ে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের (এমনকি মুঘল যুগের ইসলামি দরবারেও[১৮০])। জৈন গ্রন্থসমূহে লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাটা বেশ প্রশস্ত। শারীরিক লিঙ্গ এবং মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গকে সেখানে আলাদা ধরা হয়। আফসোস, ব্রিটিশদের-লেখা ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এমনসব মানবীয় আচরণ ও বাস্তবতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে তকমা দেওয়া হয়েছে, যেগুলোকে খোদ ভারতই অপরাধ মনে করত না। ভারতীয় দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ ৩৭৭ এবং ১৮৭১ সালের ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট উভয়ের লক্ষ্যবস্তু ছিল রূপান্তরিত লিঙ্গের ও সমকামী ব্যক্তিরা। কমপক্ষে ২,০০০ বছর ধরে ভারতের সংস্কৃতি, পুরাকথা, ইতিহাস, পুরাণ এবং ভারতীয় জীবনধারায় যে নৈতিকতা ও ঐতিহ্য ছিল, এ দুটি আইন সেসবকে বুড়ো আঙুল দেখায়। ভারতের ঐতিহ্য হলো সহনশীলতা এবং 'বাঁচো ও বাঁচতে দাও' নীতি, অথচ ব্রিটিশরা নিজেদের উপনিবেশবাদী বুঝ অনুযায়ী চাপিয়ে দিয়েছে কোনটা ভারতের জন্য ভালো বা খারাপ। ট্রেজারি বেঞ্চে যে স্বঘোষিত ভারতীয় সংস্কৃতির ('বৈদিক' ভারত) রক্ষাকর্তারা বসে আছেন, তারাই কিনা ব্রিটিশ

[১৮০] এখানে যদিও জন্মগত হিজড়া উদ্দেশ্য, কিন্তু লেখক পুরো আলোচনার সবখানে 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি ব্যবহার করায় মূলের অনুকরণে 'রূপান্তরিত লিঙ্গ' লেখা হয়েছে। তবে জন্মগত হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার এক জিনিস নয়—অনুবাদক।

ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার সবচেয়ে বাজে কুসংস্কারগুলোর সাফাই গাইছেন। কী নির্মম পরিহাস!

ভারতীয় দণ্ডবিধি বিপরীতকামী নারীদের ওপরও খুব একটা সদয় নয়। অনুচ্ছেদ ৪৯৭ অনুযায়ী ব্যভিচার দণ্ডনীয় অপরাধ। বিবাহিতা নারী পরকীয়া করলে শাস্তি পায়, কিন্তু বিবাহিত পুরুষ শাস্তি পায় না। পরকীয়া করার কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমিককে শাস্তির মুখোমুখি করতে পারবে। কিন্তু স্বামী যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা ও অবিবাহিতা নারীর সাথে পরকীয়া করে থাকে, তাহলে স্ত্রী তার নামে মামলা করতে পারবে না। এই দ্বিমুখিতা প্রকাশ্যে চলে এসেছে সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি মামলায়। এখানেও একবিংশ শতাব্দীর নৈতিকতা নয়, বরং ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। মজার ব্যাপার হলো, তিনটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের আইনই ঘুরিয়ে দিয়েছে। তার মানে, তারা ভারতে যেসব বিষয়কে অপরাধ আখ্যা দিয়ে গিয়েছিল, ব্রিটেনে এখন সেগুলোর কোনোটাই বেআইনি নয়। উপনিবেশবাদের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলোর মধ্যে এটা একটা। সাম্রাজ্য মরে যায়, তার কুপ্রভাবগুলো বেঁচে থাকে।

এসব অবিচার টিকে থাকার জন্য একা ব্রিটিশদের দায়ী করি না আমি। কিন্তু এসব আইনকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিয়ে গেছে ব্রিটিশরাই। তাই এগুলোকে সংশোধন করাও বিরাট ঝক্কি। অসাধারণ ব্যাপার হলো, দণ্ডবিধির যে আপাদমস্তক সংস্কার প্রয়োজন, এই কথাটা উচ্চারণ করেছেন রাষ্ট্রপ্রধানের মতো একজন মানুষ। প্রণব মুখার্জি ঘোষণা করেছেন যে, এই দণ্ডবিধি বহুলাংশেই 'ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে ব্রিটিশদের বানানো'। তাই 'সামসময়িক সামাজিক সচেতনতা'র প্রতিফলন ঘটাতে একে সংশোধন করা চাই। তাহলেই এটা হয়ে উঠবে 'মৌলিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা এক সভ্যতার নির্মোহ প্রতিফলন'। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৫তম বার্ষিকীর দিনটিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন এই কথা বলার জন্য। ভারতীয়রা যে এই সংশোধনের কাজটি এখনো করেনি, সেটা মোটেও ব্রিটিশদের দোষ নয়। কিন্তু কিতাবে এসব অন্যায় আইন লিখে দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শুরুটা তারাই করেছে। ব্রিটিশরা জনগণের শোয়ার ঘরগুলোয় ঢুকে পড়তে ইতস্তত করেনি। একবিংশ শতকের ভারত সরকারের সময় এসেছে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার। একটি সজীব ও আলোচনাপূর্ণ গণতন্ত্রে নানান ধরনের রাজনৈতিক মতের স্থান রয়েছে। এরকম এক পরিবেশের সাথে ঔপনিবেশিক আমলের বিচ্ছিন্নতাবাদ আইন কিছুতেই খাপ খায় না। এটা বোঝার সময় কিন্তু পেরিয়ে যাচ্ছে।

০৪

ভাঙো আর শাসন করো

ব্রিটিশদের দাবি, তারা ভারতে একটি টেকসই রাজনৈতিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক চেতনা, কার্যকর আমলাতন্ত্র এবং আইনের শাসন সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আগের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, এ সবই ফাঁকা বুলি। ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা প্রদানের ওই একটা দাবি থেকেই বাকিসব কথার জন্ম। তবে এসব চলতে চলতেই ব্রিটিশদের আরেকটি গণতন্ত্র-বিরোধী প্রকল্প মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। এখান থেকে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা ভিক্ষা দেওয়াটা কস্মিনকালেও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

হিন্দু ও মুসলিম সেনারা একসাথে বিদ্রোহ করে ওঠে ১৮৫৭ সালে। লড়াই করতে থাকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তারা একে অপরের নেতৃত্বে ধেয়ে যেতে প্রস্তুত। যৌথভাবে তারা আনুগত্য জানিয়েছে মিনমিনে মুঘল রাজার কাছে। এই দৃশ্য ব্রিটিশদের ভড়কে দেয়। অচিরেই তারা সিদ্ধান্তে আসে যে, এই দুই দলকে বিভক্ত করে দিতে হবে। এদের একটাকে আরেকটার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলে তবেই বিনা প্রশ্নে টিকে থাকবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। সেই ১৮৫৯ সালেই তৎকালীন বম্বের ব্রিটিশ গভর্নর নর্ড এলফিনস্টোন লন্ডনকে উপদেশ দেন, 'একটা প্রাচীন রোমান প্রবাদ আছে—ডিভাইড এট ইমপেরা। এখন এটা আমাদের প্রবাদ হওয়া চাই।' (তার কথা খুব একটা সঠিক নয়; প্রবাদটা রোমানদের নয়, বরং ম্যাসিডোনিয়ার দ্বিতীয় ফিলিপের উক্তি। অবশ্য কিছু রোমান বিজেতাও এই নীতি অনুসরণ করেছেন।) অল্প কয়েক দশক পর স্যার জন স্ট্র্যাচি মত দেন, 'ভারতে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য সেখানকার জনগণের মাঝে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকা' আবশ্যক।

ভেদাভেদ তৈরি করা এবং সেটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর কাজে ব্রিটিশরা ওস্তাদ। নিজেদের সকল উপনিবেশে তারা সীমানা আঁকিবুঁকি করেছে জাতিসত্তার ভিত্তিতে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এত জাতির ভিড়ের মাঝে নিজেদের পরিচয়কে হারিয়ে ফেলার আতঙ্ক থেকেই ব্রিটিশরা এই কাজ করে। তারা চায় না যে, তাদের মহা-আরাধ্য ইংরেজ পরিচয়ের দিকে ঔপনিবেশিক প্রজারা হাত বাড়াক। এদিক দিয়ে ফরাসিদের থেকে তারা বেশ আলাদা। ফরাসিরা চাইত নিজেদের সংস্কৃতিতে প্রজাদের মিশিয়ে ফেলতে। এমনকি সেনেগাল ও ভিয়েতনামের স্কুলে ছোট্ট ছোট্ট আফ্রিকান ও এশিয়ান বাচ্চারা খুব দায়িত্বশীল ভঙ্গিতে গান গাইত 'ন আঁসেত্রা লে গলওয়া' (আমাদের পূর্বপুরুষ গল জাতি)। ভারতীয়রা চিরকালই প্রজা হয়ে থেকেছে, নাগরিক হতে পারেনি। ফরাসি-অধীন আফ্রিকানদের 'যা সুই ফ্রাঁসে' গাইতে রীতিমতো উৎসাহিত করা হতো। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয়রা 'আই অ্যাম ব্রিটিশ' কথাটা উচ্চারণ করবে, এমনটা ভাবাই যেত না।

বিভেদ সৃষ্টির এই প্রবণতা শুরু থেকেই ব্রিটিশদের আচরণে দৃশ্যমান ছিল। তাদের একমাত্র যে উপনিবেশটি আগে থেকেই শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত, সেই আয়ারল্যান্ডেও এই খাসলতের স্বাক্ষর রেখেছে ব্রিটিশরা।[১৮১] ব্রিটিশ জাতির ভেতর আইরিশদের জায়গা করে দেওয়া তো দূর কি বাত, বরং দুই জাতির মাঝে বিয়েও নিষিদ্ধ ছিল (এমনকি আইরিশ ভাষা শেখা বা পোশাকের ধাঁচ অনুকরণ করার ক্ষেত্রেও একই নিষেধাজ্ঞা)। বেশিরভাগ আইরিশকেই ঠেলে দেওয়া হয় 'beyond the Pale'.[১৮২] নিজেদের মতো চেহারাওয়ালা মানুষদের সাথেই যদি ব্রিটিশরা এই কাজ করতে পারে, তাহলে বিজিত ভারতের কৃষ্ণতর চামড়ার লোকদের সাথে তো আরও খারাপ আচরণ করার কথা। এর কয়েকটা দিক আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা দেখব কীভাবে তারা ভারতীয়দের নানান রকমের কাঠখোট্টা শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে, বিশেষ করে বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে।

প্রথমে আমরা ব্রিটিশদের ব্যাপারে সুধারণা করে নিই। ধরে নিচ্ছি,

---

[১৮১] সিজার লিটন ফলকিনার, ইলাসট্রেশানস অব আইরিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড টোপোগ্রাফি, মেইনলি অব দ্য ১৭থ সেঞ্চুরি, লন্ডন: লংম্যানস, গ্রিন, অ্যান্ড কোং, ১৯০৪, পৃ. ১১৭।

[১৮২] Beyond the pale কথাটি এমনিতে একটি ইংরেজি বাগ্‌ধারা, যার অর্থ 'সীমারেখার বাইরে'। কিন্তু বড় হাতের P ব্যবহার করে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। Pale ছিল আয়ারল্যান্ডের একটি ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত এলাকা। তাই যা-কিছু ব্রিটিশদের অনুমোদিত রীতিনীতির বিপরীত, সেটাকেই ব্যঙ্গ করে বলা হয় beyond the Pale'. —অনুবাদক।

তারাও হয়তো ভারতীয়দের নিজেদের মতোই ভেবেছে, যারা নিজ নিজ পরিচয়কেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু ব্রিটিশরা জাতি, ধর্ম, ধারা ও বর্ণের পার্থক্যগুলোকে বোঝার জন্য যে চেষ্টা করেছে, সেটার উদ্দেশ্য সৎ থাকেনি। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল নিজেরা সংজ্ঞার্থ ঠিক করে দেওয়া, বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এসব পার্থক্যকে চিরকাল জিইয়ে রাখা। তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসন তার প্রজাদের সারাক্ষণই নানা রকম ভাগে ভাগ করে চলে। একটার চেয়ে আরেকটা ভাগ ছোট থেকে ছোট। হিসাব মেলাতে মাথা গুলিয়ে যায়। ভাষা, ধর্ম, ধারা, বর্ণ, উপবর্ণ, জাতিসত্তা, গায়ের রং—কিছুই বাদ যায় না। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই নিয়মিত প্রতিবেদন, লেখালেখি ও শুমারি পরিচালনা করতে থাকে তারা। এতসব শ্রেণিবিভাগ তৈরি করতে করতে নতুন নতুন মানবগোষ্ঠীর উদ্ভব হতে থাকে। যারা চারপাশের মানুষদের থেকে নিজেদের খুব একটা আলাদা মনে করত না, তারাও হঠাৎ করে সম্পূর্ণ নতুন বানানো একটা গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে যায়।[১৮৩]

আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী নিকোলাস ডার্কস এটাকে সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> উপনিবেশবাদ প্রথমে খোলাখুলি ও পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশি সৈকতে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু তার জন্ম, বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার পেছনে সমপরিমাণে ভূমিকা রেখেছে সাংস্কৃতিক কলাকৌশল। উপনিবেশবাদ নিজেই একটা সাংস্কৃতিক প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। ঔপনিবেশিক জ্ঞানের ফলে যেমন নতুন নতুন দেশ দখল করা সম্ভব হয়েছে, তেমনই ওই দখলের ফলেই আবার বেড়েছে দখলদারের জ্ঞান। একদিক থেকে দেখলে, উপনিবেশবাদের আরেক নামই জ্ঞান। সমাজের বিশেষ কিছু সাংস্কৃতিক রূপকে "সনাতন" বলে তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক জ্ঞান সেগুলোকে নানাভাবে ভেঙে গড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশায়িত, ইউরোপীয় ও এশীয়, আধুনিক ও সনাতন এবং পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে সৃষ্টি করতে থাকে নতুন নতুন শ্রেণি ও বৈপরীত্য...। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতকে নিয়ে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়। এর সামাজিক গঠন, রাজনৈতিক সামর্থ্য এবং সভ্যতার উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি করা হয় সুবিধাজনক বয়ান। জোর করে দেখানো হয় যে, পরাধীন হওয়াটাই তার নিয়তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন সেখানে স্থায়ী না হয়ে

---

[১৮৩] নরম্যান জি. ব্যারিয়ার, দ্য সেনসাস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া: নিউ পার্সপেক্টিভস, নয়াদিল্লি: মনোহর পাবলিশার্স, ১৯৮১।

উপায় নেই।'[১৮৪]

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ওপর একজন বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড কন। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশরা ভারতের সমাজে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখেছে, সেগুলোকে ভুল বোঝার পাশাপাশি অতিসরলীকরণও করে ফেলেছে। তারা নিজেদের বানানো একেকটা গৎবাঁধা বাক্সে বসিয়ে দিয়েছে ভারতীয়দের। কথিত প্রাচীন ঐতিহ্যের নামে নামকরণ করে তাদের—'ভারতকে বোঝা এবং এর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে ব্রিটিশরা যে কাল্পনিক ছক তৈরি করেছে, সেখানে গোঁয়ারের মতো এই যুক্তিই অনুসরণ করে গেছে তারা। অসীম রকমের জটিল ভাষা ও তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্থকে তারা সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে অল্প কয়েকটি মেটোনিমির[১৮৫] মাঝে।' আইনকানুন এমনভাবে অনুবাদ করে দেওয়া লাগত, যাতে ব্রিটিশরা সেগুলো বোঝে এবং প্রয়োগ করতে পারে। ভারত একটা যৌগিক সমাজ। কখনো এলোমেলো, চিরকালই পরিবর্তনময়। একে 'ব্রিটিশরা পালটে দিয়ে কিতাবি নিয়মকানুনের একটা আখড়ায় পরিণত করে। নিজেদের মনোমতো কিছু একটা বানিয়ে ব্রিটিশরা এর নাম দেয় ভারতীয় নিয়ম-রীতি। তারপর ভারতীয়দেরই সেসব বানোয়াট রীতি মেনে চলতে হয়।'[১৮৬]

প্রাক-আধুনিক যুগে এহেন কাজ কখনোই সম্ভব ছিল না। কারণ, তখন এসব জাতিগত পরিচয় ছিল বেশ শিথিল ও 'ঘোলাটে'। যোগাযোগব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। তাই স্থানীয় পরিচয়ের চেয়ে বৃহত্তর কোনো চেতনা ধারণ করাটাও ছিল কঠিন। জাতীয়তাবাদী চিন্তার এক যুগান্তকারী লেখক বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন। তিনি বেশ দারুণভাবেই দেখিয়েছেন যে, একটি বড়সড় জনগোষ্ঠীকে একই পরিচয়ের চেতনায় দীক্ষিত করাটা সম্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রযুক্তিগত উন্নতির পরে।[১৮৭] এসব বৃহত্তর জাতিগত পরিচয় যে বেশ

[১৮৪] নিকোলাস বি. ডার্কস, কাস্টস অব মাইন্ড: কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড দ্য মেইকিং অব মডার্ন ইন্ডিয়া, প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১।

[১৮৫] কোনোকিছুকে বোঝাতে এর সাথে সম্পর্কিত অন্য শব্দ ব্যবহার করলে তাকে metonymy বলে। যেমন—'ওপরের কক্ষ থেকে এই আদেশ এসেছে।' এখানে 'ঊর্ধ্বতন আদেশদাতা' বোঝাতে তার সাথে সম্পর্কিত 'ওপরের কক্ষ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই 'ওপরের কক্ষ' হলো metonymy. —অনুবাদক।

[১৮৬] বার্নার্ড এস. কন, অ্যান অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট অ্যামাং দ্য হিস্টোরিয়ানস অ্যান্ড আদার এসেজ, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭। আরও দ্রষ্টব্য রঞ্জিত গুহ, ডমিন্যান্স উইদাউট হিজ্যামনি: হিস্ট্রি অ্যান্ড পাওয়ার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, ক্যামব্রিজ, এমএ: হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

[১৮৭] বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন, ইম্যাজিনড কমিউনিটিজ: রিফ্লেকশানস অন দি ওরিজিন অ্যান্ড স্প্রেড অব ন্যাশনালিজম, ২য় সংস্করণ, লন্ডন: ভারসো, ১৯৯১।

সাম্প্রতিক কালের ঘটনা, এ নিয়ে তেমন কারও দ্বিমত নেই। অ্যান্ডারসনের আরেকটা বিখ্যাত প্রস্তাবনা হলো, এসব পরিচয় মূলত 'কাল্পনিক' বা 'উদ্ভাবিত'। এই তত্ত্বও মোটামুটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে। পরিবহণ ও যোগাযোগ যখন আধুনিক হয়ে উঠছিল, বৃহত্তর পরিচয় ও চেতনা সৃষ্টি করাটা যখন সম্ভব হয়ে উঠছিল, ঠিক তখনই ভারত শাসন করতে আসে ব্রিটিশরা। মহান মুঘল সম্রাট আকবরের হাতে এই প্রযুক্তি থাকলে হয়তো তিনি বৈচিত্র্যময় সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশরা সেই একই জিনিসকে ব্যবহার করেছে মানুষকে বিচ্ছিন্ন, শ্রেণিবদ্ধ ও বিভক্ত করার কাজে।

কিছু সমালোচক বলেন, ভারতীয় সমাজে আগে থেকেই নানা রকম ভেদাভেদ ছিল, বিশেষ করে বর্ণপ্রথার কথা তো না বললেই না। এর ফলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ অংশই এমনসব ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যেত (এবং এখনো হয়) যে, তাদের মাঝে আর মিলমিশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে ব্রিটিশদের কী দোষ? কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এটাও সত্য যে, ব্রিটিশরা জেনে হোক বা না জেনে হোক, বর্ণপ্রথার এই বৈষম্যকে পোক্ত ও স্থায়ী হতে সহায়তা করেছে। ব্রিটিশরা নিজেরাই এসেছে এমন এক নাক-উঁচু সমাজ থেকে, যেখানে শ্রেণিপ্রথা একটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। স্বভাবতই তারা ভারতে অনুরূপ কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে থাকে।

প্রথমে তারা ভারতীয় সমাজকে এমন কিছু 'শ্রেণি'তে বিভক্ত করে, যেগুলো তাদের মতে 'মূলত ধর্মীয়'। এরপর তারা ধরে বর্ণপ্রথাকে। কিন্তু প্রাক-ব্রিটিশ সমাজে বর্ণপার্থক্য সেরকম ধরাবাঁধা কোনো বিষয় ছিল না। হ্যাঁ, সময় ও স্থানভেদে এর নানা রকম প্রকরণের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু কে কোন বর্ণের লোক, এই ধারণাটায় নিয়মিতই ভাঙাগড়া চলতে থাকত। মানে জিনিসটা একটা গতিশীল সামাজিক কাঠামো। একেক যুগের প্রভাবশালী পুরুষদের বিশ্বাস, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে বর্ণের ধারণাকে হরেক কিসিমে সাজানো হতো। কিন্তু ব্রিটিশদের প্রচারিত তত্ত্ব হলো, ভারতীয় সমাজ সবখানে একই রকম বর্ণভেদ ও বৈষম্য মেনে চলে, এটাই সমাজের মূল চালিকাশক্তি। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সমাজ আসলে কীভাবে কাজ করত, তার খুবই সংকীর্ণ একটা চিত্র এঁকে দেওয়া হলো এর মাধ্যমে। আর ঔপনিবেশিক শাসনের বদৌলতেই এই ভুল ধারণাটা এখন চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ডার্কস তার বিখ্যাত বই কাস্টস অব মাইন্ড-এ খুব বিস্তারিতভাবে এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন। দেখিয়েছেন যে, 'ভারতে বৈচিত্র্যময় সব সামাজিক পরিচয়, গোষ্ঠী ও সংঘ' ছিল। ব্রিটিশ আমলে সেগুলোকে 'বোঝার,

বোঝানোর, সর্বোপরি "গুছিয়ে তুলে ধরা"র' একমাত্র পরিভাষা হয়ে উঠেছে 'বর্ণ'। 'দীর্ঘ ২০০ বছরের ব্রিটিশ আধিপত্যকালে আধুনিকতার সাথে [ভারতের] মিথস্ক্রিয়া হয়েছে। এর দৃশ্যমান ফলাফল হিসেবেই... উপনিবেশবাদ আজকের বর্ণ নামক ধারণাটার জন্ম দিয়েছে।'[১৮৮] ব্রিটিশরা তাদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বর্ণকে সকল সামাজিক বিষয় বোঝার মাপকাঠি বানিয়ে দিয়েছে। বিষয়টাকে কল্পনার জগৎ থেকে ধরে এনে একটা মূর্ত রূপ দিয়ে দিয়েছে তারা। ডার্কস এহেন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার কড়া সমালোচক।

তিনি বলেছেন, বর্ণ আসলে 'ছিল বহু শ্রেণিবিন্যাসের মাঝে একটামাত্র; পরিচয় প্রকাশের একটামাত্র পদ্ধতি। উপরন্তু, শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্ণ কোনো একক ধারণা নয়; অথবা একটামাত্র সূত্র ব্যবহার করেই সব ধরনের বর্ণভেদ করা হতো না, এমনকি যে ব্রাহ্মণরা বর্ণপ্রথার সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী, তারাও এত সরলভাবে দেখত না বর্ণের বিষয়টিকে। অঞ্চল, গ্রাম, বসতি, আত্মীয়তা, উপদল, নেতা, রাজনৈতিক আনুগত্যসহ আরও বিভিন্ন বিষয় বর্ণপরিচয়কে ছাপিয়ে যেত। কখনো-বা এগুলোর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতো বর্ণবিন্যাস...। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বর্ণপ্রথাকে অনেক ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, সর্বব্যাপী আকারে তুলে ধরা হয়, ধামাচাপা দেওয়া হয় এর নানা রূপকে। এমনটা আগে কখনোই করা হয়নি।' ডার্কসের চোখে এটি ঔপনিবেশিক শক্তির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সমাজের ব্যাপারে জ্ঞানকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে তারা। তিনি বলেন, জেনেশুনে বর্ণপ্রথাকে বানানো হয়েছে 'সভ্য সমাজের ঔপনিবেশিক রূপ'।[১৮৯] পার্থ চ্যাটার্জির ভাষায় বললে—ভারতে কেন সভ্য সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, এই মতের পক্ষে ঔপনিবেশিকদের প্রধান যুক্তি হয়ে ওঠে বর্ণপ্রথা। তাই ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও বৈধ (যত যা-ই হোক, তারা তো নাগরিক নয়, প্রজা)। অতএব, ঔপনিবেশিক শাসন বিনে গতি নেই।[১৯০]

প্রাক-ঔপনিবেশিক বর্ণব্যবস্থা নিয়ে যে বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেছেন, তারা চার বর্ণের এই ধারণাটাকেই প্রত্যাখ্যান করেন। এখানে বর্ণানুক্রমে সবার ওপরে ব্রাহ্মণদের অবস্থান, এমনকি রাজা ও যোদ্ধারাও তাদের চেয়ে এক ধাপ নিচে। এটা বাস্তবতার সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য মোটেও যথেষ্ট

---

[১৮৮] ডার্কস, ২০০১।

[১৮৯] প্রাগুক্ত।

[১৯০] আরও বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য পার্থ চ্যাটার্জি, লিনিয়েজ অব পলিটিকাল সোসাইটি: স্টাডিজ ইন পোস্টকলোনিয়াল ডেমোক্রেসি, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ এবং দ্য নেশান অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস: কলোনিয়াল অ্যান্ড পোস্টকলোনিয়াল হিস্ট্রিজ', প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩।

নয়। (যেমন : ক্ষত্রিয় রাজারা বাস্তবে কখনোই ব্রাহ্মণদের অধীন ছিলেন না, বরং তারাই ব্রাহ্মণদের চাকরি, বেতন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পছন্দ হলে রাখতেন, অন্যথায় সরিয়ে দিতেন।) তা ছাড়া, বিশাল উপমহাদেশজুড়ে থাকা সকল সামাজিক পরিচয় ও সম্পর্ককে এত সরলভাবে চার বর্ণে সীমাবদ্ধ করাও অসম্ভব। ভিন্নতর পরিচয়, উপবর্ণ, গোত্র এবং অন্যান্য সংঘেরও অস্তিত্ব ছিল। একেক জায়গায় এগুলোর বিকাশ ঘটেছে একেক উপায়ে। গোটা ভারতে এবং তার জটিল ও বৈচিত্র্যময় সভ্যতায় শুধু চারটিই বর্ণ ছিল—এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্ভট পরিবেশে। আধুনিক গবেষকগণ বেশ উল্লেখযোগ্য প্রমাণসহকারে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তত্ত্বের সাথে যে বাস্তবতা নাও মিলতে পারে, এই মৌলিক সত্যটা ব্রিটিশরা হয় বোঝেনি, আর না হয় না দেখার ভান করেছে।

ব্রিটিশ পণ্ডিততন্ত্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের গলায় চেপে বসছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুষ্টি। কোম্পানির কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সত্যিকার অর্থেই দেশটিকে বুঝতে আগ্রহী ছিলেন। তাই ব্রিটিশরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করে। অর্থাৎ, সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করে। আইনের পাশাপাশি আরও নানা বিষয়ে এসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলো অধ্যয়নের পেছনে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু আইনি নীতিমালা গড়ে তোলা। ভারতীয় জনসমাজের বিভিন্ন বিবাদ মীমাংসার জন্য এ-সকল আইন ব্যবহৃত হবে। গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১১জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভাড়া করেন এই কাজের জন্য। তাদের সহায়তায় গড়ে তোলেন দ্য কোড অব জেন্টু লজ ওরফে দি অর্ডিনেশানস অব দ্য পান্ডিটস। ব্রিটিশরা প্রাচীন সংস্কৃত লেখা পড়তে বা পাঠোদ্ধার করতে অক্ষম, তাই তারা ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাদের শরণাপন্ন হয়, যাদের ভারতীয় ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও রীতিনীতির ব্যাপারে জানাশোনা ভালো। তাই এগুলোর ভিত্তিতে আইনকানুন রচনার কাজটাও তারাই করতে পারবেন। এর ফলাফল হিসেবে জন্ম নেয় এক 'অ্যাংলো-ব্রাহ্মণীয়' রচনা। আক্ষরিক ও চেতনাগত উভয় দিক থেকেই এটি বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। আক্ষরিকভাবে সাংঘর্ষিক, কারণ মূল রচনাবলির তুলনায় তাদের কাজগুলো অসম্পূর্ণ। চেতনাগতভাবে সাংঘর্ষিক, কারণ এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিয়ে পণ্ডিতরা নিজেদের বর্ণকে অযাচিত সুবিধা দিয়ে দিয়েছেন। ব্যাখ্যা বা জালিয়াতির মাধ্যমেও তারা এমনসব অলঙ্ঘনীয় বিধান বানিয়ে নিয়েছেন, শাস্ত্রে যেগুলোর কোনো ভিত্তিই নেই। এতে করে দেশের

বর্ণপ্রথা সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়।

গবেষকরা বলেন, ইতঃপূর্বে ভারতীয় জনসমাজের বিবাদ মীমাংসা করত তার জাতি বা বিরাদ্রি (গোত্র)। অর্থাৎ, আসামির ব্যাপারে রায় দিত তার গোষ্ঠী বা স্বজাতির ব্যক্তিবর্গ। স্থানীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ অনুসারে দেওয়া হতো সেসব রায়। কোনো উচ্চতর বর্ণের কাছ থেকে সেটা অনুমোদন করিয়ে আনা লাগত না। পণ্ডিতরা এসব বহুল প্রচলিত চর্চার দিকে ফিরেই তাকায়নি, বরং এমনসব পুথি থেকে উপদেশবাণী তুলে আনে, যেগুলো কালের গর্ভে প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। নিজেদের বানিয়ে ফেলে একমাত্র হর্তাকর্তা শ্রেণি। বেশিরভাগ ব্রিটিশ তাদের কথা চোখ বুজে মেনে নেয়। (কারও কারও সন্দেহ ছিল। এদের মাঝে একজন হলেন সবচেয়ে শিক্ষিত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোনস। তিনি কলকাতায় ১৭৯৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। কাজ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট অব জুডিকেচারে। তিনি মন্তব্য করেন, 'পণ্ডিতগণের করুণার পাত্র হয়ে থাকাটা আমার আর সহ্য হয় না। তারা হিন্দু আইন নিয়ে যথেচ্ছ আচরণ করেন। যখন মনোমতো জিনিস খুঁজে পান না, তখন যথাযথ দাম চুকিয়ে সেটা বানিয়ে নেন।' অল্প বয়সে জোনসের মারা যাওয়াটা দুঃখজনক। উত্তরসূরিরা কখনোই তার মতো জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি।)

ভারতীয় সমাজের ওপর সাধারণভাবে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, বাস্তবে সামাজিক চর্চাগুলো ঠিক আনুষ্ঠানিক বা 'শাস্ত্রীয়' আইন মেনে চলত না। কিন্তু পণ্ডিতরা এখন প্রাচীন পুথিপুস্তকের উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেন। সেগুলোর ওপর এমন অলঙ্ঘনীয়তা আরোপ করেন, আসলে যেটার অধিকারী তারা নয়। মূলত এই সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের স্বনির্ভরতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের নামে একে আরও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা।[১৯১] আখেরে উপকৃত হয় ব্রিটিশ সরকার। কারণ, কোনো রাখঢাক ছাড়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে 'তাদের [ঔপনিবেশিক] জনগোষ্ঠী ও সম্পদের হিসাব রাখা, শ্রেণিবিন্যস্ত করা এবং নিরীক্ষা করা'।[১৯২] জাত, জাতি, সমাজ ও বর্ণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হতো সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের অংশ হিসেবে। এতে করে পরাধীন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর আরও ভালোভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও প্রয়োগ করা যাবে। ব্রিটিশরা আরও বিশ্বাস করত যে, ভারতকে

---

[১৯১] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, মধু কিশওয়ার, যিলাস রিফরমার্স, ডেডলি লজ, নয়াদিল্লি: সেইজ পাবলিকেশানস, ২০০৮।

[১৯২] ক্রিস্টোফার বেইলি, দ্য ব্রিটিশ অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, ১৭৮০–১৯১৪: গ্লোবাল কানেকশানস অ্যান্ড কম্প্যারিজনস, লন্ডন: ওয়াইলি-ব্ল্যাকওয়েল, ২০০৪, পৃ. ২৭৫।

শাসন করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে যোগ্য। কারণ, তারা বেদের ব্যাপারে জ্ঞানী। ব্রাহ্মণরা ব্রিটিশদের দানাপানি পায় অন্য সকল গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি। ফলে নিজেদের তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করে। ব্রিটিশরাও ব্রাহ্মণদের বড়ি গিলে বাকিদের মনে করতে থাকে নিচু বর্ণ।

এর ফলাফল ব্রিটিশ রাজের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্রাহ্মণদের নজরকাড়া প্রাধান্য। তারা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি নয়, অথচ সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের জন্য যতগুলো পদ বরাদ্দ, তার ৯০ শতাংশই ব্রাহ্মণদের দখলে। ছোটখাটো ছা-পোষা পদগুলোর কথা ভিন্ন। ভারতীয়দের জন্য যেসব পেশার ময়দান উন্মুক্ত, সেখানেও ব্রাহ্মণদের দাপট, বিশেষ করে উকিলগিরি ও ডাক্তারিতে। সাংবাদিকতা ও শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা প্রবেশ করে। ফলে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কণ্ঠটাই শোনা যায় সবচেয়ে বেশি। ইতঃপূর্বে ভারত আরও অনেক বেশি মেধাতান্ত্রিক সমাজ ছিল। তারপর ব্রিটিশ রাজ আসন পেতে বসে এবং ব্রাহ্মণদের নিয়ে পণ্ডিততন্ত্র শুরু করে।

ঊনবিংশ শতকের গাত্রবর্ণের ধারণাও এখানে গুবলেট পাকায়। এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ টমাস মেটকাফ।[১৯৩] গাত্রবর্ণ মতাদর্শ বলে, ইউরোপীয় সভ্যতা হলো মানবীয় উন্নতির চূড়া, আর কৃষ্ণতর বর্ণের মানুষদের দেখানো হয় আদিম ও দুর্বল হিসেবে। ইউরোপীয়দের হাতে দীক্ষা না পেলে তারা উন্নতি করতে অক্ষম। ভারতীয়রা এসব কুসংস্কার অনেকাংশেই গলাধঃকরণ করে নেয়। ২০০ বছর সাদা লোকের অধীনে থাকার ফল এটা। ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্বের যন্তরমন্তর দিয়ে ভালো করে মগজধোলাই করা হয় তাদের। ছোট থাকতে একটা লেখায় পড়েছিলাম, ইংল্যান্ডে ঘুরতে গিয়ে এক ভারতীয় খুবই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই দেখে যে, সে দেশের জুতা পালিশকারী ছোকরাগুলোও ব্রিটিশ। তরুণ রাজকুমার এবং পরবর্তীকালে ক্রিকেটার রঞ্জি ইংল্যান্ডে যান ছাত্র হিসেবে। 'ব্রিটিশরা নিচু বর্ণের লোকদের কাজ করছে' দেখে তার চোখ কপালে উঠে যায় (তার ধারণা ছিল কুলি-মোটের কাজগুলো 'শুধু আইরিশরাই' করে)।

---

[১৯৩] টমাস মেটকাফ, আইডিওলজিস অব দ্য রাজ, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, পৃ. ৮৯।

জনশুমারি যেভাবে জনমতকে আড়াল করে[১৯৪]

ব্রিটিশরা মানচিত্র গবেষণা করে নতুন নতুন জায়গাকে শাসনের আশায়। মানচিত্র হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। জাদুঘরের ধারণাটা ব্রিটিশদের রেখে-যাওয়া এক মূল্যবান উত্তরাধিকার। এমনকি এটারও জন্ম হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সেবা করার জন্য। কারণ, এখানে বিভিন্ন জিনিসপত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ও নিদর্শনকে ধরে এনে, নাম দিয়ে, লেবেল সাঁটিয়ে, গুছিয়ে, সারি সারি করে, শ্রেণিবদ্ধ করে রাখা যায় তথা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ঠিক যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানুষকে।

মানচিত্র ও জাদুঘরের হাতিয়ারদ্বয়কে এক করে তৈরি হয় শুমারি। এটা ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আরেক অস্ত্র। শ্রেণিবিন্যাস আর সামাজিক বিভাগের প্রতি ব্রিটিশদের এমনিতেও খুব আগ্রহ। তাদের পুরো শাসনামলে এর প্রতিফলন ঘটে চলেছে। এই আগ্রহ আনুষ্ঠানিক রূপ পায় ১৮৭২ সালে জনশুমারির মাধ্যমে। এরপর ১৮৮১ সাল থেকে ১০ বছর অন্তর অন্তর এই কাজ চলতে থাকে। শেষে ১৯০১ সালে এর নাম দেওয়া হয় 'নৃতাত্ত্বিক শুমারি'।

কারও বর্ণ ঠিক করে দেওয়া এবং তার ওপর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটা আরও জোরদার হয় শুমারির মাধ্যমে। কখনো গোটা একটা গোষ্ঠীর গায়ে বসিয়ে দেওয়া হয় চমৎকার সব তকমা, যেমন 'যুদ্ধবাজ জাতি' বা 'অপরাধী গোষ্ঠী'। এভাবেই 'ব্রাহ্মণ' হয়ে ওঠে এক বহুলাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক পদমর্যাদা। শুমারিতে কারও জাত 'শূদ্র' লিখে দেওয়া মানে তার কপাল পোড়ানো। পুরো দেশে এখন এটাই তার পরিচয়। ব্রিটিশ শাসনের আগে কোনো শূদ্রকে তার নিজ গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেই হতো, জাতের পরিচয় সেখানে তার পিছু নিত না। নিশ্চিন্তে জীবিকা অন্বেষণ করত অন্য কোনো রাজ্যে। কিন্তু উপনিবেশবাদ তাকে আজীবনের জন্য, সর্বত্র শূদ্রে পরিণত করে দেয়। ব্রিটিশরা নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীকে 'যুদ্ধবাজ জাতি' বলে বিশ্বাস করে। এতে করে যারা এই শ্রেণিতে পড়ে না, তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়। কারণ, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় এই বর্ণবিভেদ মেনে চলা হয়। অতীতে উচ্চতা ও পেশিশক্তির শর্ত পূরণ করলে যে-কেউ যোদ্ধা হিসেবে জীবিকা অর্জন করতে পারত, তার জাত-বর্ণ যা-ই হোক না

---

[১৯৪] এই আলোচনা বহুলাংশে নির্ভরশীল কে. ডাব্লিও. জোনসের 'রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান সেনসাস'-এর ওপর, দ্য সেনসাস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া: নিউ পার্সপেক্টিভস, এন. জি. ব্যারিয়ার (সম্পা.), নয়াদিল্লি: মনোহর পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ. ৭৩–১০২।

কেন। ব্রিটিশ ভারতে সেটা অসম্ভব না হলেও অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। একেকটা রেজিমেন্ট গড়ে তোলা হয় বর্ণ পরিচয়ের ভিত্তিতে।

ব্রিটেনে যেভাবে জনশুমারি করা হতো, তারচেয়ে ব্রিটিশ ভারতেরটা বেশ আলাদা। কারণ, ভারতের শুমারিতে নেতৃত্ব দিতেন ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানীরা। ভারতীয় সমাজকে শ্রেণিবিন্যস্ত করার পেছনে তাদের লক্ষ্যই ছিল একে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করা। আগেই যেমনটি বললাম, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয়রা নানা রকম গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করত। একেকটা গোষ্ঠীতে থাকত বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক চর্চার মিশ্রণ। সেখানে আত্মপরিচয়ের চেতনা ছিল অকিঞ্চিৎকর। অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নিজেরা ঠিক কীভাবে আলাদা, তার খুঁটিনাটি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না কেউ। এমনিতে ঢালাও একটা বোঝাপড়া ছিল শুধু। এই ব্যাপারটা আলোচনা করেছেন গবেষক সুদীপ্ত কবিরাজ। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীগুলোর সীমারেখা ছিল অনির্দিষ্ট ('ঘোলাটে')। কারণ, কিছু সামষ্টিক পরিচয় এলাকাভিত্তিক ছিল না। 'সামাজিক বিন্যাস এরকম ঘোলাটে হওয়ার আরেকটা কারণ হলো, অতীতের গোষ্ঠীগুলোর কোনো হিসাব রাখা হয়নি, যেমনটা আধুনিক যুগে করা হয়ে থাকে।'[১৯৫]

জনশুমারি এই অবস্থাকে পালটে দেয়। এ ছাড়াও, ঔপনিবেশিকরা তাদের নতুন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম মানচিত্রগুলোতে একেকটা এলাকার সীমানা একদম নির্দিষ্ট করে এঁকে দেয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এসব সীমানা এত ধরাবাঁধা ছিল না। তাই সেখানে বসবাসকারী মানুষদের মন-মানসেও এত গুরুত্ব রাখত না এসব বিষয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এসব বিষয়ে খুব সচেতন হয়ে ওঠে তারা। আধুনিক যুগে 'মিত্রতা খুবই সুনির্দিষ্ট ও কড়াকড়ি', তাই শত্রুতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এই ব্যাপারটা না থাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে শত্রুতার সম্ভাবনা ছিল কম। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পার্থক্য সেভাবে চোখেই ধরা পড়ত না। ব্রিটিশরা এসে একেকটা পরিচয়কে এভাবে কেটে আলাদা করে দেওয়ার ফলেই এসব শত্রুতার জন্ম।

ব্রিটিশরা এমন কাউকে পায়নি, যারা এসব গোষ্ঠীর সংখ্যা ও অবস্থানের ব্যাপারে তাদের প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারে। শুমারি কর্মকর্তারা দেখলেন যে, হিন্দু, শিখ আর জৈনদের মাঝে তেমন পার্থক্য নেই বললেই চলে। আবার, দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলিম গোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচারে মিল রয়েছে, যেমন বিয়ে, উৎসব, খাবার ও উপাসনার

---

[১৯৫] সুদীপ্ত কবিরাজ, 'দি ইম্যাজিনারি ইন্সটিটিউশানস অব ইন্ডিয়া', সাবল্টার্ন স্টাডিজ ৮, পার্থ চ্যাটার্জি ও জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে (সম্পা.), নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২, পৃ. ২৬।

ক্ষেত্রে। এটা ঔপনিবেশিক ধারণার বিরুদ্ধে যায়। তাদের ধারণা ছিল, একেকটা গোষ্ঠী অন্যটার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। আর প্রত্যেকটা ব্যক্তিকেই হতে হবে কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর সদস্য। তাই ব্রিটিশরা সরল মনে নিজেদের ধারণাকে ভারতীয় বাস্তবতার ওপর চাপিয়ে দেয় এবং মানুষকে শ্রেণিবিন্যস্ত করে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে। শুমারি কর্মকর্তাদের প্রশ্নের জবাবে মানুষ যেসব স্থূল উত্তর দিত, সেগুলো ধরেই মনোমতো একেকটা গোষ্ঠীতে ফেলে দেওয়া হতো তাদের।

ব্রিটিশদের এই পদ্ধতি সে যুগের কুসংস্কার ও সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত। আইসিএসের হারবার্ট রিজলি ছিলেন ১৯০১ সালের জনশুমারির কর্মকর্তা এবং সারসংক্ষিপ্ত গ্রন্থ দ্য পিপল অব ইন্ডিয়ার রচয়িতা। তিনি একটি নৃবৈজ্ঞানিক ও জন্মভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সে যুগের চটকদার তত্ত্ব ছিল, খুলি ও নাকের আকৃতি দিয়ে জাতিগত পরিচয় জানা যায়। রিজলি এগুলোই মাপামাপি করতে থাকেন। (তিনিই ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯০১ সালের শুমারিটা হতে চলেছে নৃতাত্ত্বিক। এটার নেতৃত্বের দায়িত্বও নেন নিজের ঘাড়ে।) মুখাকৃতি এবং সামাজিক রীতির অসংখ্য আলোকচিত্র ছিল তার সম্বল। রিজলির কাজের ফলে ব্রিটিশদের দুই দিক দিয়ে উপকার হয়। ভারতীয়দের চেয়ে ইউরোপীয়রা যে শারীরবৃত্তিকভাবে শ্রেয়, এই ব্যাপারে আবারও আশ্বস্ত হয় তারা। সেই সাথে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মাঝে বর্ণগত, সামাজিক ও 'গোত্রীয়' সীমারেখা এঁকে দিতেও সুবিধা হয়। এর ফলে 'সমাজবিষয়ক জ্ঞানের প্রচলিত মূলধারা'কেও ইচ্ছেমতো আকৃতি দান করা যায়।[১৯৬]

রিজলির কর্মীবাহিনী শুমারি করতে গিয়ে ভারতীয়দের নানা প্রশ্ন করতেন। এর জবাবে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের জাত-বর্ণের পরিচয় তুলে ধরে। অন্যান্য বর্ণের তুলনায় তারা কী কী বিশেষত্বের অধিকারী, সেগুলোও বলেছে হয়তো। ব্রিটিশরা যেসব পার্থক্য আবিষ্কার করতে চাইছিল, ঠিক সেগুলোই পেয়ে যায়। তারপর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে নিজেদের এই আবিষ্কারকে। এসব উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয়রা চাইত বিশেষ কোনো সুবিধা বাগিয়ে নিতে, যেমন নির্দিষ্ট কোনো সেনাদলে চাকরি পাওয়া বা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃত্তি লাভ করা। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এরকম বর্ণ-প্রতিযোগিতার কোনো অস্তিত্বই

---

[১৯৬] দ্রষ্টব্য ই. এম. কলিংহ্যাম, ইম্পেরিয়াল বডিজ: দ্য ফিজিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স অব দ্য রাজ, ১৮০০–১৯৪৭, অক্সফোর্ড: পলিটি প্রেস, ২০০১; ক্রিস্টোফার পিনি, 'ক্লাসিফিকেশান অ্যান্ড ফ্যান্টাসি ইন দ্য ফোটোগ্রাফিক কন্সট্রাকশান অব কাস্ট অ্যান্ড ট্রাইব', ভিজুয়াল অ্যান্থ্রোপোলজি ৩, (১৯৯০), পৃ. ২৫৯–২৮৪, পৃ. ২৬৭, এবং পিটার গটশক্ষ, রিলিজান, সায়েন্স অ্যান্ড এম্পায়ার: ক্লাসিফায়িং হিন্দুইজম অ্যান্ড ইসলাম ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসব কারণেই এত জোরদার হয়ে ওঠে বর্ণ-সচেতনতা।[১৯৭]

এইসব শ্রেণিবিভেদ ঘুরেফিরে ঔপনিবেশিকদের স্বার্থকেই উপকৃত করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তারা যে হরেক রকমের পার্থক্যের অনুভূতি তৈরি করতে চায়, সেটার হাতিয়ার হয়ে ওঠে জনশুমারি। ভারতীয়দের মাঝে ঐক্য প্রতিহত করা সম্ভব হয়। অজুহাত পাওয়া যায় ব্রিটিশ প্রভুত্বের পক্ষে। কারণ, সবাই মিলে ব্রিটিশদের প্রভু হিসেবে মেনে নেওয়াটাই ঐক্যের একমাত্র পথ। তাহলেই ভারতীয়রা সব ভেদাভেদ ভুলে উচ্চতর ও সভ্যতর হয়ে উঠবে। শুভাকাঙ্ক্ষী সাম্রাজ্যবাদীরা হাতে ধরে তাদের শেখাবে সবকিছু। ব্রিটিশরা এই বিভেদকে রীতিমতো ঈমানের মৌলিক রুকন বানিয়ে দেয়। তাই যেসব লেখক মোটাদাগে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে পরিচিত, তারাও পারেননি এই বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে। এজন্যই ই. এম. ফর্স্টার তার উপন্যাস আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার প্রধান ভারতীয় চরিত্র আযীযকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'কোনোকিছু দিয়েই গোটা ভারতকে মোড়ানো যায় না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।'[১৯৮]

পরিচয়-নির্মাণের এই ঔপনিবেশিক চক্রান্ত থেকে ভাষাগত পরিচয়ও রক্ষা পায়নি। ব্রিটিশরা বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীকে তাদের বসবাসের অঞ্চল অনুযায়ী ভাগ করে। এটারও উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমাজকে শ্রেণিবদ্ধ ও গণনাযোগ্য বানিয়ে তোলা; মোটকথা, ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা। ডেভিড ওয়াশব্রুক ও ডেভিড লেলিভেল্ড উভয় বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত।[১৯৯] ঊনবিংশ শতকে এমন একটা বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে ওঠে ভাষার ভিত্তিতে। উক্ত গবেষকদ্বয়ের মতে, ভাষাগত পরিচয়ের ধারণাটার জন্মই হয়েছে এই বিশ্বাস থেকে। এই বিশ্বাস পরোক্ষভাবে বোঝাতে চায় যে, একটা 'জাত' বা 'জাতি'র সব সদস্য একটা ভাষাতেই কথা বলে। বসবাসও করে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে। দেবদাসী (মন্দিরের নর্তকী) ও বাইজি (রাজদরবারের

---

[১৯৭] দ্রষ্টব্য এম. এন. শ্রীনিবাস, সোশ্যাল চেইঞ্জ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট লংম্যান ইন্ডিয়া, ১৯৭২, ব্রিটিশদের আবির্ভাবের আগে সামাজিক পরিবর্তন এবং বর্ণগত গতিশীলতা কী রকম ছিল, তা এখানে আলোচিত হয়েছে।

[১৯৮] ফর্স্টার, আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া, পৃ. ১৬০।

[১৯৯] ডেভিড ওয়াশব্রুক, 'টু ইচ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অব হিজ ওন: ল্যাঙ্গুয়েজ, কালচার, অ্যান্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া', ল্যাঙ্গুয়েজ, হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লাস, পেনেলপি জে. করফিল্ড (সম্পা.), লন্ডন: ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৯১, পৃ. ১৭৯–২০৩; ডেভিড লেলিভেল্ড, 'দ্য ফেইট অব হিন্দুস্তানি: কলোনিয়াল নলেজ অ্যান্ড দ্য প্রজেক্ট অব আ ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ', ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দ্য পোস্টকলোনিয়াল প্রেডিক্যামেন্ট, ক্যারোল এ. ব্রেকেনরিজ অ্যান্ড পিটার ফন ডার ভিয়ার (সম্পা.), ফিলাডেলফিয়া: ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৯–২১৪।

গায়িকা) পেশাগুলো বেশ প্রাচীন। ভারতীয় সমাজে এগুলো মোটেও অসম্মানের পেশা ছিল না। জাপানের গেইশাদের সাথে তাদের ভূমিকার কিছু মিল রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশরা যেহেতু শ্রেণিকরণের জযবায় উন্মত্ত, সেহেতু এই বিষয়টাকে বোঝার মতো সময়ই নেয়নি তারা। নিজেদের চেনাজানা 'বেশ্যা' শ্রেণিতে ফেলে দেয় দেবদাসী ও বাইজিদের। ভারতের ইতিহাসে তাদের প্রথমবারের মতো ছুড়ে ফেলা হয় সম্মাননীয় সমাজের বাইরে।[২০০]

এভাবে তো সামাজিক আধিপত্যের বিন্যাস পালটে গেল, কিন্তু এর একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল রাজনৈতিক : ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় সমাজের নিচু শ্রেণিগুলোকে গণতন্ত্রের ছায়াতলে আসতে দেয়নি। সেই সুযোগ আসে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। তখন ব্রিটিশদের বানানো ভারতীয় সমাজের কিছু কঠোরতা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে জায়গা করে নেয় 'পিছিয়ে পড়া শ্রেণির' অসংখ্য মানুষ।

ব্রিটিশ নীতিমালার ফলে যে সামাজিক বিভেদ শুরু হয়, তা অচিরেই রূপ নেয় মনস্তাত্ত্বিক বিভেদে। মনের অমিল দানা বাঁধতে থাকে। এরই হাত ধরে যেখানে যেখানে সুযোগ ছিল, সেখানে সেখানে এসেছে শারীরিক বিচ্ছিন্নতাও। তারপর যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি-দাওয়া উঠল, তখন চলে এলো রাজনৈতিক ভেদাভেদ। কারণ, প্রতিটি গোষ্ঠীর মনেই সন্দেহ জন্মায় যে, অপর গোষ্ঠীর সাফল্যে তাদের নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবেই। এসব ভেদাভেদ ব্রিটিশরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা উভয় পদ্ধতিতে সৃষ্টি করুক, বাস্তব ফলাফল একই।

হিন্দু-মুসলিম বিভেদ এ-সকল পরিচয়-পার্থক্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মীয় ফাটল, হোক তা সত্যিকারের বা কাল্পনিক। অচিরেই এই দ্বন্দ্বের মূল মঞ্চ হয়ে ওঠে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়।

ভাঙো আর শাসো নীতির এক কার্যকর হাতিয়ার হয়ে ওঠে ধর্ম। আমেরিকান ধর্মগবেষক পিটার গটশঙ্ক দেখিয়েছেন যে, এই হিন্দু-মুসলিম বিভেদটা ব্রিটিশদের ইচ্ছাকৃত ফন্দি।[২০১] তারাই এই বিভেদ উদ্ভাবন করেছে, তাতে রং চড়িয়ে দেখিয়েছে এবং আগুনে ফুঁক দিয়েছে। খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার বলেন, ব্রিটিশরা ভারতীয় ইতিহাসের একটা ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা হাজির করে। এর পেছনে তাদের যুক্তি ছিল তিনটি।

প্রথমত, ব্রিটিশরা ভারতের ইতিহাসকে শাসকদের ধর্ম অনুযায়ী কয়েকটা

[২০০] রত্নাবলি চ্যাটার্জি, 'দ্য কুইন'স ডটারস: প্রস্টিটিউটস অ্যাজ অ্যান আউটকাস্ট গ্রুপ ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া', ক্রিশ্চিয়ান মিশেলসেন ইন্সটিটিউট রিপোর্ট ১৯৯২: ৮।

[২০১] পিটার গটশঙ্ক, রিলিজান, সায়েন্স, অ্যান্ড এম্পায়ার, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২।

'যুগে' ভাগ করে। জেইমস মিল তার দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া গ্রন্থে (১৮১৭ থেকে ১৮২৬-এর মধ্যে প্রকাশিত) 'হিন্দু', 'মুসলিম' ও 'ব্রিটিশ' এই তিন যুগের কথা তুলে আনেন। এরকম যুগ-বিভাগের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দাবি করা হলো যে, ভারত চিরকালই পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন গুটিকয়েক ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত ছিল, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম।

দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রাক-ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতিটা ছিল একধরনের 'প্রাচ্যীয় স্বৈরতন্ত্র'। ধরেই নেওয়া হয় যে, ভারতীয় সমাজ ছিল স্থবির। একে শাসন করত 'স্বৈরতান্ত্রিক ও অত্যাচারী শাসকরা', যাদের হস্ত সমস্ত কাঙালের ধন চুরি করে চলত। আগের পৃষ্ঠাগুলোয় আমি এই ধারণার অসারতা দেখিয়েছি।

তৃতীয়ত, হিন্দু-সমাজ চিরকালই চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত ছিল। এই যুক্তিটি আমি এই অধ্যায়েই পৃথকভাবে খণ্ডন করেছি।

ব্রিটেনে কাজ করতেন তিন জার্মান ভারতবিদ মিল, ম্যাকাউলি ও [ফ্রেডরিখ ম্যাক্স] মুলার। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই ত্রয়ী মিলে ঔপনিবেশিক চোখ দিয়ে ভারতের একটা ইতিহাস দাঁড় করান, এমনকি স্বয়ং ভারতীয়দেরও শেখানো হয় ইতিহাসের এই সংস্করণ গলাধঃকরণ করার জন্য। এই তিন ম-এর চোখে, ভারতীয় সভ্যতা মূলত উঁচু বর্ণের হিন্দু এবং আর্য জাতির বংশধর। দাবি করা হয়, এই আর্যরা ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে মধ্য-এশীয় মরু প্রান্তর থেকে ধেয়ে আসে, ভারতের উত্তর অংশে আক্রমণ করে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎখাত করে এবং তাদের সাথে মিশে যায়। তারপর তারা একটা থিতু কৃষিজীবী সভ্যতা গড়ে তোলে, সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে এবং রচনা করে বেদ। হানাদার হিসেবে প্রথমে মুসলিমরা আসে, এরপর তাদের জায়গা নেয় ব্রিটিশরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা কালক্রমে এই ইতিহাসকেই আপ্তজ্ঞান হিসেবে মেনে নেয়। একই কাজ করে হিন্দু ও মুসলিম পুনর্জাগরণবাদীরাও। এমনকি প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক কিছু অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম করেনি। এরকম এক উদাহরণ থিওসফিক্যাল সোসাইটি, যার সহপ্রতিষ্ঠাতা কর্নেল এইচ. এস. ওলকট। আর্য জাতি থেকেই যে ভারতীয়দের উদ্ভব, এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রচারক হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু ওলকট প্রথমবারের মতো দাবি করেন, আর্যরা ভারতেরই আদিনিবাসী। ভারত থেকে পশ্চিমা বিশ্বে সভ্যতা বয়ে নিয়ে গেছে তারা। হালের হিন্দুত্ববাদীরাও এই ধারণারই সমর্থক।

এভাবে ব্রিটিশরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ইতিহাসের ঔপনিবেশিক

ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। জাতীয়তাবাদী বয়ান থেকে বাদ দিয়ে দেয় মুসলিমদের। এরই ফলে বিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেয় দ্বিজাতি তত্ত্ব, যার মাধ্যমে কালক্রমে ভাগ হয়ে যায় দেশটি। এই বয়ানের আরেকটা সুফল হলো, রীতিমতো বিশেষজ্ঞ গবেষণার চাদর পরিয়ে ব্রিটিশদের 'ভাঙো ও শাসো' কৌশলকে বৈধতা প্রদান। এই কৌশলের অংশ হিসেবে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেনি সাম্রাজ্যবাদীরা। মুসলিমদের বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, হিন্দুদের অগ্রগতি তাদের নিজেদের স্বার্থের প্রতি সাংঘর্ষিক।

প্রাক-ঔপনিবেশিক ইতিহাসে যেমন বর্ণগত বা ভাষাগত পার্থক্যগুলোর কোনো ভিত্তি ছিল না, এই ধর্মীয় বিভেদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। গবেষক জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে তার গবেষণাকর্মে দেখিয়েছেন,[২০২] ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা অনেকাংশেই ঔপনিবেশিকদের বানানো। ঔপনিবেশিকরা তাদের শাসিত ভারতকে শ্রেণিবদ্ধ ও তালিকাবদ্ধ করতে গিয়ে এমন এক বর্ণবাদী চেতনার জন্ম দেয়, যেখানে এক বর্ণের অবস্থান আরেকটির ঊর্ধ্বে। হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে ধর্মীয় পার্থক্যের ব্যাপারেও মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা সৃষ্টি করে তারা। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ অনেক সময় ইচ্ছা করেই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের উসকে দিত; যেমন : গরু জবাইয়ের ব্যাপারে তাদের ধর্মের বিশ্বাস ও রীতি কী, এই ব্যাপারে প্রশ্ন ছুড়ে দিত। তখন উভয় সম্প্রদায়ই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠত সেটার একটা কঠোর সংস্করণ দাঁড় করানোর জন্য। সেটাকেই বানিয়ে নিত 'আবহমান' রীতি! পান্ডে বলেছেন, ঔপনিবেশিক যুগের আগ থেকে এসব পার্থক্যের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার বিশ্বাস, উপনিবেশবাদীরা এগুলোকে অনেক বেশি কাঠখোট্টা করে তুলেছে নিজেদের স্বার্থে।[২০৩]

পান্ডের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ যৌক্তিক। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে দুই সম্প্রদায় মিলে স্বচ্ছন্দে এমনসব কাজ করেছে, যেগুলোতে উপকৃত হয়েছে তাদের মধ্যে যে-কোনো এক পক্ষ। এরকম ঘটনার উদাহরণ ভূরিভূরি। যেমন—কোনো একটা মাজার পুনর্নির্মাণে হিন্দুরা সহযোগিতা করল, অথবা মন্দির সংস্কারে মুসলিমরা হাত লাগাল। বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নাম ছিল মুসলিমদের মতো। তাদের কেউ কেউ আবার ছিল ফারসি ভাষায় দক্ষ। হিন্দু মারাঠি যোদ্ধা রাজা শিবাজির সেনাবাহিনীতে মুসলিমরাও চাকরি করত, তেমনই সাচ্চা মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাহিনীতে ছিল হিন্দু রাজপুতরা। বিজয়নগর

---

[২০২] জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, দ্য কন্সট্রাকশান অব কমিউনালিজম ইন কলোনিয়াল নর্থ ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০।

[২০৩] প্রাগুক্ত, ২০৪।

সেনাদলে মুসলিম অশ্বারোহীদের আলাদা দলই থাকত। অনেক ইতিহাসবিদের দাবি, গ্রামাঞ্চলে বহু বিষয়ে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের আচরিত প্রথা ও বিশ্বাস ছিল একই রকম। কখনো কখনো তারা একই সাধু বা পবিত্র স্থানকে যৌথভাবে উপাসনা করত। কেরালার এক বিখ্যাত তীর্থস্থান সবরিমালা। স্বামী আয়াপ্পানের মঠে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে খুব কষ্ট করে এক পাহাড় বাইতে হয়। ভক্তরা প্রথমেই চোখের সামনে যে জিনিসটি দেখতে পায়, তা হলো তার এক মুসলিম শিষ্য বাবর স্বামীর মাজার। মুসলিম রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেখানে কোনো মূর্তি নেই, শুধু আছে একটা প্রতীকী পাথরের পাত, একটি তরবারি (বাবর ছিলেন যোদ্ধা) এবং একটি সবুজ কাপড়, যা ইসলামের রং। মুসলিম খাদিমরা সেই মাজারের দেখাশোনা করেন। (এরকম আরেকটা অদ্ভুতুড়ে উদাহরণ আছে। অদ্ভুতুড়ে, কারণ এই কাহিনিতে যেমন এক যুগের চরিত্রকে আরেক যুগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তেমনই এক ধর্মের কাহিনির সাথে আরেকটির চরিত্র মিশে গেছে। তামিল নাড়ুর দক্ষিণ আরকাড়ুর এক মন্দিরে মুত্তাল রভুত্তন নামক দেবতার মূর্তি আছে। তিনি একজন মুসলিম গ্রাম্য নেতা। মুখভরতি দাড়ি, কুমকুম আর হাতে তাড়ির পাত্র। মহাভারত-এ তিনি দ্রৌপদীর রক্ষাকর্তা। অবশ্য জানা কথা, মহাভারত রচিত হওয়ার সময় ইসলামের অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু ইসলামের জন্মের পর মহাকাব্যের আরও যত সংস্করণ বেরিয়েছে, তার কোনো একটায় কীভাবে যেন ঢুকে পড়েছেন এই মুসলিম নেতা![২০৪])

সব ধর্মের ভারতীয়রা দীর্ঘকাল যাবৎ মিলেমিশে জীবনযাপন করেছে, এমনকি ধর্মীয় আচারেও কেউ কাউকে বাদ দিত না, তাই মুসলিম গানের দলের লোকেরা গাইত হিন্দুদের ভক্তিমূলক গান। সূফিদের মাজারে ভিড় করে মুসলিম পীরদের আরাধনা করত হিন্দুরা। বেনারসের মুসলিম কারিগররা তৈরি করত হিন্দুদের রাম-লীলার ঐতিহ্যবাহী মুখোশ। উত্তর ভারতে 'গঙ্গা-যমুনি তেহযীব' নামে একটা উৎসব ছিল। এই মিশ্র-উৎসবে ছিল উভয় ধর্মের সাংস্কৃতিক আচারের মিশ্রণ। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন, মুসলিম হিসেবে জন্ম-নেওয়া কতিপয় কবি হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা করতেন। খুবই গভীর আবেগে ভক্তিমূলক কাব্য রচনা করেছেন তারা। বিশেষ করে সাইয়াদ ইব্রাহীম, যিনি রাসখান নামে সমধিক পরিচিত। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের উদ্দেশে

[২০৪] বীরাপত্তি, তিরুকোইলুর তালুক, দক্ষিণ আরকাড়ু, তামিল নাড়ুতে মুত্তাল রভুত্তনের মূর্তি রয়েছে। দ্রষ্টব্য আলফ হিল্টেবেইটেল, 'দ্রৌপদি'জ টু গার্ডিয়ানস: বাফেলো কিং অ্যান্ড মুসলিম ডিভোটি', ক্রিমিনাল গডস অ্যান্ড ডিমন ডিভোটিজ: এসেজ অন দ্য গার্ডিয়ানস অব পপুলার হিন্দুইজম, বিংহ্যামটন, নিউ ইয়র্ক: এসইউএনওয়াই প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩৮ থেকে শুরু।

লেখা তার দোহা ও ভজনগুলো ষোড়শ শতাব্দীতে বহুল আবৃত্তি হতো। মুঘল শাসকদের অনবদ্য পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত ধর্মীয় গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে ফারসি ভাষায়। এর মাঝে রয়েছে মহাভারত (অনূদিত নাম রাযমনামা) এবং ভগবদ্‌গীতাও। ফারসি বিশেষজ্ঞদের সাথে অনুবাদ কাজে সহযোগিতা করতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা।[২০৫]

মুঘল রাজদরবারে যেমন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন, তেমনই শিখ শাসক রঞ্জিত সিংহের রাজন্যদের মাঝেও ছিলেন হিন্দু ও মুসলিম মন্ত্রিবর্গ। এ-সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সে যুগে আত্মচেতনা 'ঘোলাটে' ছিল, ধর্মের (এমনকি বর্ণের) ভিত্তিতে আত্ম-পরিচয় নির্ধারিত হতো না। সেটা হিন্দু ও মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[২০৬] এসব গল্প মোটেও বিসদৃশ বা শত্রুভাবাপন্ন ধর্মমতের ইঙ্গিত দেয় না। শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ তার বিখ্যাত ভাষণে বলেছেন, সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্নতার প্রতি সহনশীলতা।

সামষ্টিক কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রেও অতীতে ধর্মকেই একমাত্র ভিত্তি হিসেবে ধরা হতো না, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা তো বলাই বাহুল্য। বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতি ও বিরাদ্রির স্ব স্ব ভূমিকা থাকত সেখানে; কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এসে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহজাত পরিসরকে সংকুচিত করে দেয়, নাকচ করে দেয় তাদের আদি সামাজিক সম্পর্ককে। তাই এ-সকল পার্থক্য সত্ত্বেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা যে বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল, সেই বন্ধন ঢিলা হয়ে আসে।[২০৭]

বাস্তবতা স্পষ্ট

হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে বড় আকারের (ধর্মীয় চেতনা-তাড়িত) সংঘাত শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক যুগে।[২০৮] প্রাচ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে ঔপনিবেশিকরা ধরেই নেয় যে, ভারতীয় সমাজের মৌলিক বিভক্তি ধর্ম নিয়ে। তাই অন্য বহু ধরনের সামাজিক টানাপোড়েনকেও ধর্মীয় তকমা দিয়ে দেয় তারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতে ওই অর্থে কোনো সর্বব্যাপী হিন্দু ও

[২০৫] রোমিলা থাপার, অন ন্যাশনালিজম, নয়াদিল্লি: আলেফ বুক কোম্পানি, ২০১৬, পৃ. ১৪–১৫।

[২০৬] জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, কনস্ট্রাকশানস অব কমিউনালিজম।

[২০৭] রোমিলা থাপার, অন ন্যাশনালিজম।

[২০৮] দ্রষ্টব্য স্যান্ড্রিয়া ফ্রাইটাগ, কালেক্টিভ অ্যাকশান অ্যান্ড কমিউনিটি: পাবলিক এরেনাজ অ্যান্ড দি এমারজেন্স অব কমিউনালিজম ইন নর্থ ইন্ডিয়া, বার্কলি: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।

মুসলিম পরিচয়ের অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না, এই ব্যাপারটা বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। একটা সার্বিক ঐকমত্য রয়েছে এই প্রশ্নের পক্ষে।[২০৯]

বুঝতে পারছি, দ্বিমতকারীরা ইতোমধ্যে ফুঁসে উঠছেন। তারা বলবেন যে, মুসলিম আর হিন্দুরা সেই ৭১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই পরস্পরকে জবাই করে আসছে। ওই বছরে সিন্ধুর হিন্দু রাজ্য জয় করেন কিশোর বয়সি আরব যোদ্ধা মুহাম্মাদ বিন কাসিম। উত্তর ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে নিয়ে ১২০০ বছর ধরে যে টানাপোড়েন চলছে, এই কথাটা প্রায়ই তুলে আনে একদিকে পাকিস্তানিরা (দেশভাগের যৌক্তিকতা বোঝাতে) এবং আরেক দিকে হিন্দুত্ববাদের প্রচারকরা। এই দ্বিতীয় দলটা ক্রমাগত বলতে থাকে, গত কয়েক শতকে মুসলিম শাসকেরা কীভাবে ৬০,০০০ হিন্দু মন্দির মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, তাও আবার ৩,০০০ মসজিদ গড়ে তুলেছেন মন্দিরের ভিত্তির ওপর।

এইসব ঘটনার কিছু-না-কিছু যে আসলেই ঘটেছে, তা অনস্বীকার্য। দিল্লির কুতুব কমপ্লেক্সে সুলতান ইলতুতমিশের বিখ্যাত মসজিদ এবং এর আশেপাশের স্থাপনাগুলো একবার ঘুরে দেখলেই তা বোঝা যায়। স্তম্ভগুলোর গায়ে এখনো শোভা পাচ্ছে খোদাইকৃত হিন্দুধর্মীয় সব নকশা। কিন্তু গবেষণার ফলাফল এই কথাটা আরেকটু ভিন্নভাবে বলে। ভারতের দুটি আলাদা অংশে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ইতিহাসবিদ সিনথিয়া ট্যালবট এবং রিচার্ড এম. ইটন। তাদের মতে, মন্দির ধ্বংস করাটা মূলত 'চলমান যুদ্ধের ময়দানের ঘটনা'। সশস্ত্র সংঘাত চলাকালেই এসব ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে যখন এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পর্যায়ে চলে যেত লড়াই। ইটনের বিশ্বাস, ভারতজুড়ে তুর্কি ও মুসলিম শাসকরা যেসব রাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধরত ছিলেন, প্রধানত সেখানেই মন্দির ভেঙেছেন তারা।

হিন্দু রাজনৈতিক দর্শনে একটা রাজকীয় মন্দির হলো সেখানকার রাজার ক্ষমতার প্রতীক। সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া মানে রাজার চরমতম অপমান। অন্ধ্র প্রদেশে ট্যালবটের গবেষণার ফলাফলও একই। ওই অঞ্চলে মুসলিমদের রাজ্যবিস্তারের সময় এসব ঘটনা ঘটেছে। মোটকথা, মন্দিরে হামলা করাটা ধর্মীয় নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। ধর্মীয় উগ্রতার বশেই যে-কোনো মুসলিম যে-কোনো সময় যে-কোনো মূর্তি আর মন্দির ভেঙে ফেলতে পারে—এই দাবিখানা ইটন ও ট্যালবট উভয়ের মতেই মিথ্যা। মাহমুদ গযনবি, মুহাম্মাদ ঘুরি বা নাদির শাহের মতো যে হানাদাররা এসেছেন আর

[২০৯] সি. এ. বেইলি, 'দ্য প্রি-হিস্ট্রি অব "কমিউনালিজম"? রিলিজাস কনফ্লিক্ট ইন ইন্ডিয়া, ১৭০০–১৮৬০', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, খণ্ড ১৯(২), ১৯৮৫, পৃ. ২০২।

চলে গিয়েছেন, তারা নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ করেছেন ঠিকই, কিন্তু যে মুসলিম শাসকরা ভারতে থেকে গিয়েছেন, তারা মন্দিরে আক্রমণ করেছেন সেগুলোকে ঘৃণা করার কারণে নয়, বরং সেগুলোর তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বলে।[২১০]

এই যুক্তির তুমুল বিরোধিতা আসতে বাধ্য, বিশেষত মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে প্রতিমা ভাঙার যে অগণিত উদাহরণ রয়েছে, সেগুলোর কারণে। কিন্তু সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের উদাহরণ এরচেয়ে ঢের বেশি। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের ধর্মীয় সহাবস্থানের সেরা উদাহরণ কেরালা। ব্রিটিশরা যার নাম দিয়েছে মালাবার উপকূল। আত্মপরিচয় যে কতটা সৃজনশীল হতে পারে, কত সহজেই যে তাতে অন্যদের জায়গা করে দেওয়া যায়, তা-ই দেখা যাবে কেরালার উদাহরণে। মালয়ি (কেরালাবাসী) জনগণের ঐতিহ্য ব্যাবসা। এরই প্রতিফলন হিসেবে বাইরের প্রভাবের প্রতি তারা খুবই উদার, হোক সেটা আরব, রোমান, চীনা, ব্রিটিশ, ইসলামি, খ্রিষ্টীয় বা ব্রাহ্মণ্য।

দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময় আগে থেকে কেরালাবাসীর সাথে অনেক জাতির ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ছিল, তাও শুধু ভারতের বিভিন্ন অংশের সাথেই নয়, সম্পর্ক ছিল আরব বিশ্ব, ফিনিশীয় জাতি এবং রোমান সাম্রাজ্যের সাথেও। তাই দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বমানবতার প্রতি মালয়িদের মনোভাব অত্যন্ত সাদর ও উন্মুক্ত। রোমানদের ধরপাকড় থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিরা এখানে আশ্রয় পেয়েছে। সেই ৬৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই কোণ্ডুঙ্গাল্লুরে তাদের বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তার ১,৫০০ বছর পর ইহুদিরা কোচিতে আবাস গড়ে, যেখানে তাদের নির্মিত নয়নাভিরাম সিনাগগ এখনো সগৌরবে দণ্ডায়মান। ফিলিস্তিনের বাইরে যতগুলো খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী বাস করে, তাদের মাঝে কেরালার খ্রিষ্টানরা অন্যতম প্রাচীন। যিশুর ১২ শিষ্যের একজন সেন্ট টমাস যখন কেরালায় খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে আসেন, তখন উপকূলে বাঁশির মূর্ছনায় এই নতুন ধর্মবিশ্বাসকে স্বাগত জানায় এক ইহুদি বালিকা।

সেন্ট টমাস উঁচু বর্ণের অভিজাত নম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতেন। তার মানে, বহু ভারতীয় পরিবারের পূর্বপুরুষরা এত প্রাচীনকাল থেকে খ্রিষ্টধর্ম পালন করে আসছেন যে, কোনো খ্রিষ্টান ব্রিটিশের চৌদ্দ গুষ্টিও

[২১০] রিচার্ড এম. ইটন, 'টেম্পল ডেসেক্রেশান অ্যান্ড দি ইমেইজ অব দ্য হোলি ওয়ারিয়র ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রিওগ্রাফি', (নিবন্ধটি উপস্থাপিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশান ফর এশিয়ান স্টাডিজের বার্ষিক সম্মেলনে, বোস্টন, এপ্রিল ১৯৯৪), উদ্ধৃত করেছেন সিন্থিয়া ট্যালবট, 'ইনস্ক্রাইবিং দি আদার, ইনস্ক্রাইবিং দ্য সেলফ: হিন্দু-মুসলিম আইডেন্টিটিজ ইন প্রি-কলোনিয়াল ইন্ডিয়া', কম্প্যারাটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যান্ড হিস্ট্রি, খণ্ড ৩৭ (৪), ১৯৯৫, পৃ. ১৭৮।

তার নাগাল পাবে না।

উত্তর ভারতে তরবারির মাধ্যমে ইসলামের আগমন হলেও কেরালাতে সেটা হয়েছে ব্যবসায়ী, পর্যটক ও দাঈদের মাধ্যমে। উপকূলীয় মানুষদের কাছে তারা নিয়ে এসেছেন ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। সেখানে নতুন ধর্মবিশ্বাসকে শান্তিপূর্ণভাবে বুকে টেনে নেওয়া হয়, প্রত্যাখ্যানের বদলে করা হয় উৎসাহিত। ষোড়শ শতাব্দীতে কালিকটের সামুদিরির কথা তো আগেই বলেছি। তিনি এই সাগরচারী জাতির দক্ষতায় এতই মুগ্ধ হন যে, শুধু মুসলিমদের নিয়েই নিজের নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। আদেশ জারি করেন যে, তার রাজ্যের প্রত্যেক জেলে-পরিবারের একজন পুত্র সন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করতে হবে। আরব বংশোদ্ভূত কুঞ্জলি মারাইকার নাবিকরা সেই নৌবাহিনী পরিচালনা করে। লিখিত ইতিহাসে কেরালার মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো সংঘাতে জড়ায় ব্রিটিশ শাসনামলে। প্রতিপক্ষের যোদ্ধা বা রাজার বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় পরিচয়ে তারা যুদ্ধ করে ১৯২০ সালের 'মোপলা বিদ্রোহে'র সময়।

দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপে মুসলিমরা আক্রমণ করে চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়টাতেও মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের বেশিরভাগ মানুষ ছিল অমুসলিম, এমনকি যেসব জায়গায় মুসলিমরা রাজনৈতিক আধিপত্যের অধিকারী, সেখানেও। তাই সিনথিয়া ট্যালবট বলেছেন, দুটি সমাজ সবসময়ই পাশাপাশি অবস্থান করেছে।[২১১] এই অবস্থায় তাদের মাঝে কিছু-না-কিছু মাত্রায় সহযোগিতা না থেকেই পারে না। উপদ্বীপের মুসলিম প্রশাসন ছিল হিন্দু কর্মকর্তা ও যোদ্ধাদের ওপর নির্ভরশীল। না হলে তাদের পক্ষে কর সংগ্রহ করা এবং গ্রামাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হতো না। 'পুরোটা যুগজুড়েই অপরের প্রতি অপমানজনক মনোভাব যেমন ছিল, তেমনই ছিল সহনশীলতাও'। কিন্তু তাতে বিধর্মিতার চেয়ে বরং বিজাতীয়তার ব্যাপারটাই সামনে আসত বেশি। আর জাতির ভিন্নতা এমন এক জিনিস, যা কালের পরিক্রমায় পুরোপুরি মুছে না গেলেও অন্তত ঝাপসা হয়ে আসে।

ব্রিটিশরা এই প্রাক-ঔপনিবেশিক অতীতকে বেমালুম অস্বীকার করে। সাম্রাজ্যবাদীরা ১৮৫৭ সাল থেকে গড়ে তোলে 'W'। এর রাজনৈতিক পরিণাম

---

[২১১] ট্যালবট, 'ইন্সক্রাইবিং দি আদার', পৃ. ৬৯২–৭২২। আরও দ্রষ্টব্য এইচ. কে. শেরওয়ানি, 'কালচারাল সিন্থেসিস ইন মিডিভাল ইন্ডিয়া,' জার্নাল অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ৪১, ১৯৬৩, পৃ. ২৩৯–৫৯; ডাব্লিও. এইচ. সিদ্দিকি, 'রিলিজাস টলারেন্স অ্যাজ গ্লিনড ফ্রম মিডিভাল ইন্সক্রিপশানস', প্রোসিডিংস অব সেমিনার অন মিডিভাল ইন্সক্রিপশানস, আলিগড়: সেন্টার অব অ্যাডভান্সড স্টাডি, ইতিহাস বিভাগ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ. ৫০–৫৮।

প্রকটভাবে ফুটে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম যখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাতে সব ধর্মের ভারতীয়দের হাত খুলে স্বাগত জানান তিনি। এর প্রথম কয়েকজন সভাপতি ছিলেন হিন্দু, খ্রিষ্টান, পারসি ও মুসলিম। তাদের বেশিরভাগই পেশায় আইনজীবী। ধর্মের সীমানা ডিঙিয়ে কংগ্রেস একটি সেকুলার মঞ্চ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশরা হিউমের এই উদার চেতনায় সায় দেয়নি। (তারা ভারতীয়দের মাঝে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলার দাবি করে, যারা ইংরেজি শিক্ষিত এবং সহযোগী মনোভাবের। এই দাবি যদি সত্যিই হতো, তাহলে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই উদারপন্থি আইনজীবীদেরই বেছে নিতে পারত তারা।) এর বদলে তারা কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দিকে রক্তচক্ষু করে তাকিয়ে থাকে, হিন্দু-প্রধান সংগঠন বলে তকমা দেয় একে। তারা ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম নবাব খাজা সলিমুল্লাহকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। তাই তিনি শুধুই স্বধর্মীদের নিয়ে ১৯০৬ সালে গড়ে তোলেন এক প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন মুসলিম লীগ।

এরই মাঝে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। বাইরে বাইরে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হলেও এর আসল উদ্দেশ্য ছিল পূর্বদিকে একটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গড়ে তোলা। বাঙালি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এর তুমুল বিরোধিতা করে। তাদের চোখে এটি ছিল দেশকে বিভক্ত করার পাঁয়তারা। ব্রিটিশরা মুসলিমদের কাছে এমনভাবে বঙ্গভঙ্গের 'বিজ্ঞাপন' করে, যেন এটা তাদের উপকারের জন্যই করা হচ্ছে। ঢাকার নবাব শুরুতে প্রদেশের এই বিভক্তিকে 'পাশবিক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, কিন্তু লর্ড কার্জন তার সাথে সাক্ষাৎ করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করান। এর পরই সুর পালটে ফেলেন নবাব। ভাইসরয় পরপর কয়েকটি ভাষণ দেন এই বিষয়ে। তাতে বলা হয়, বঙ্গভঙ্গ 'পূর্ব বাংলার মোহামেডানদের এমন এক ঐক্য দান করবে, যেটা তারা সেই মুসলমান সুবাদার ও রাজাদের যুগের পর থেকে আর উপভোগ করতে পারেনি'। বড়িকে আরও মিঠা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নবাবকে সহজ শর্তে ১ লাখ পাউন্ড ব্যক্তিগত ঋণ প্রদান করে। দ্রুতই নবাব ও তার অনুসারীরা উলটো ঘুরে বঙ্গভঙ্গের কট্টর সমর্থক হয়ে ওঠেন।

ব্রিটিশরা তাদের পক্ষপাতিত্ব আড়াল করার কোনো চেষ্টাই করেনি। এই চক্রান্তের নির্মাতা হার্বার্ট রিজলি অকপটে স্বীকার করেন—'এর একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শক্ত বিরোধী দলকে ভেঙে দুর্বল করে দেওয়া।' বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জনসমক্ষে বলেছেন যে, তার 'দুই স্ত্রীর (অর্থাৎ, প্রদেশটির

হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর) মধ্যে মোহামেডানরাই তার প্রিয়তর'। পরে দাবি করেছিলেন, এই কথা তিনি মজাক করে বলেছেন। তবে এই 'মজাক'কে বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়ে নেয় কতিপয় মুসলিম। পূর্ব বাংলায় তখন হিন্দুবিরোধী সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে। ওই মুসলিমরা ধরে নেয়, এখন এসব সহিংসতার লাইসেন্স মিলে গেছে। শুরু হয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, ধর্ষণ ও অপহরণ। হেনরি নেভিনসন বলেন, 'এভাবে পূর্ব বাংলায় এক নতুন ধর্মীয় বিবাদ শুরু হয়ে যায়।'[২১২] প্রতিবাদকারীদের চোখে, প্রশাসনিক বিভাজনের হাত ধরে বাঙালি সম্প্রদায়গুলোর মাঝে সামাজিক ঐক্যের ওপরও আঘাত আসে।

নেভিনসন বলে চলেন :

> যেখানেই জাত-ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, প্রায় সব জায়গাতেই দেখেছি, ইংরেজ কর্মকর্তা ও কর্তাব্যক্তিরা মোহামেডানদের পক্ষে; আর পূর্ব বাংলায় এই জাতীয় পক্ষপাতিত্ব আরও আশকারা পায়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মোহামেডানদের সমর্থন ধরে রাখার জন্য সরকারের পক্ষে যা-কিছু করা সম্ভব, সবই করার জন্য তারা ছিল খোলাখুলি বদ্ধপরিকর। চাকরির জগতে যত ছোটলোকি শাস্তি ছিল, সবগুলোই ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে। শুধু তারাই বঞ্চিত হতো সরকারি পদ থেকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সরিয়ে নেওয়া হয় শুধু হিন্দু স্কুলগুলো থেকে। মোহেমেডানরা যখন দাঙ্গা বাঁধায়, তখন লাঠিয়াল পুলিশ গিয়ে হিন্দুদের বাড়ি তছনছ করে। বেঁটে গুর্খাদের বাহিনী গিয়ে ঘিরে ধরে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে। এক জায়গায় নদীর ধারে বসা নিষিদ্ধ করা হয়, সেটাও শুধু হিন্দুদের ক্ষেত্রেই। কারণটা সরল। জাতিকে বিভক্ত করার সরকারি নীতির বিরোধিতা করে একমাত্র হিন্দুরা, তাই তারাই দমন-পীড়নের শিকার হয়।[২১৩]

তারপরও এই ঘটনাপ্রবাহকে কংগ্রেস প্রথম প্রথম ইতিবাচকভাবে নেয়। তারা মুসলিম লীগকে কিছু অভিজাত জমিদার ও উঁচু শ্রেণির বণিকের দল হিসেবে দেখে। এই ধনিকশ্রেণি হয়তো মূল মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নয়, তাই এদের হুমকি মনে করারও কোনো কারণ নেই। আসলেই যখন মধ্যমপন্থি আগা খানকে দলটির প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তখনো এই মনোভাবকে সঠিকই মনে হচ্ছিল। কংগ্রেস ঘোষণা করল, লীগের সদস্য হওয়াটা কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কংগ্রেসের সমাবেশে নিমন্ত্রণ পেতে থাকেন লীগের সদস্যরা। কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার জন্য মুসলিম লীগ সদস্যদের নির্বাচিত করা হয় তিন তিনবার। (এই

---

[২১২] নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ১৯২–১৯৩।

[২১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

বিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছেন হাকিম আজমল খান, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি এবং ড. এম. এ. আনসারি। তারা কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের সভাপতি হয়েছেন, কোনোটাকেই ছেড়ে দিতে হয়নি।)

মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের সহযোগিতার সম্পর্ক কেমন হবে, সেই নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয় ১৯১৬ সালে। এই কাজ পরিচালনার জন্য মনোনীত হন মতিলাল নেহরু এবং এক ধীমান তরুণ মুসলিম আইনজীবী মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ। এই নীতিমালায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থ ও বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। যদি করতেই হয়, তবে ওই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতি নিতে হবে। তাদের প্রণীত এই নীতিমালাই বিখ্যাত লখনৌ চুক্তির মূল ভিত্তি। মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহকে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতিভূ' বলে প্রশংসা করেন কংগ্রেসের সাহিত্যিক পুরোধা কবি সরোজিনী নাইডু। তিনি জিন্নাহর বক্তৃতা ও লেখালেখির একটি সংকলন তৈরির কাজ শুরু করে দেন।

ব্রিটিশদের এত চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও ভারতের মুসলিমদের মনোভাব এমনই ছিল। তাদের ভবিষ্যৎ যে স্বদেশি হিন্দুদের সাথে একসূত্রে গাঁথা, তা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়নি। অসাধারণ একটা ব্যাপার এই যে, 'ভারত প্রশ্ন'-সংক্রান্ত তার সবচেয়ে সারগর্ভ বইটিতে আগা খান ভারতকে দেখেছেন চারটি সভ্যতার মোহনা হিসেবে : 'পশ্চিমা', 'দূরপ্রাচ্যীয়', 'ব্রাহ্মণীয়' ও 'মোহাম্মদীয়'। বেশি দিন আগের নয়, এটা এই ১৯১৮ সালের কথা। তিনি এমন এক 'ভারতীয় স্বদেশপ্রেমে'র কথা বলেন, যেখানে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে নিবিড় বোঝাপড়া বিদ্যমান (এমনকি সেখানে পূর্ব আফ্রিকাকে উপনিবেশায়িত করারও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়; কিন্তু ব্রিটেনের হয়ে না, বরং ভারতের হয়ে!)। একইভাবে, তিনি 'বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ইসলামপন্থা'র ধারণাটাও নাকচ করে দেন। তার মতে, ইসলাম একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। গোটা বিশ্বের বিশ্বাসীকে তা নৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে ঠিকই, কিন্তু 'আধুনিক বিশ্বে ধর্ম ক্রমেই একটি আধ্যাত্মিক শক্তি হয়ে উঠছে, কমে আসছে তার জাগতিক আবেদন। এই [যুগে] ধর্মীয় বন্ধনের ওপর জাতীয় ও জাগতিক স্বার্থই অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী'।[২১৪] শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিমদের মাঝে এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ব্যাপক। এর আগে চার দশক যাবৎ একই রকম কথা বলে

---

[২১৪] দি আগা খান, ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশান: এ স্টাডি ইন পলিটিকাল এভোল্যুশান, (ফিলিপ লি ওয়ারেন, লিখেছেন মেডিসি সোসাইটির জন্য, লন্ডন, ১৯১৮); সভ্যতা-সংক্রান্ত তার তত্ত্বগুলোর জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য অধ্যায় ১, পৃ. ১–১৫; অধ্যায় ১৩ 'ইন্ডিয়া'জ ক্লেইম টু ইস্ট আফ্রিকা'; পৃ. ১২৩–১৩২, এবং ইসলামের ব্যাপারে অধ্যায় ২৫, পৃ. ১৫৬–১৬১।

গিয়েছেন জাস্টিস সৈয়দ মাহমুদ।

কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের পর মহাত্মা গান্ধিও মুসলিমদের মতামতের সাথে ঐক্য পোষণের তোড়জোড় শুরু করেন এবং কথা বলেন খিলাফত আন্দোলনের পক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর তুরস্কে খিলাফত পুনরুদ্ধারের দাবিতে এই আন্দোলন গড়ে তোলে ভারতের মুসলিমরা। দেশের ভেতরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছায়ায় এই আন্দোলন পরে থিতিয়ে আসে (কতিপয় খিলাফতপন্থি মিলে হিন্দুদের ওপরও আক্রমণ করেছিল এই অজুহাতে যে, তারা আন্দোলনে যথেষ্ট সমর্থন দিচ্ছে না)। তুরস্কেও ঘটনা যেভাবে এগোয়, তাতে এই আন্দোলন এমনিতেও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু একটা বিষয় এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কংগ্রেস ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে বদ্ধপরিকর। ধর্মীয় বিভাজন তৈরির ব্রিটিশ চক্রান্তের কাছে কিছুতেই মাথা নত করবে না তারা।

ব্রিটিশদের-পরিচালিত জনশুমারির খোলাখুলি রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। কারণ, বিংশ শতকের শুরুর দিকের রাজনৈতিক বিতর্কগুলোতে এসব শুমারির হিসাব-কিতাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব হিসাবের কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও উর্দিধারী ভারতীয় সেনাদের মাঝে ৫০ শতাংশই মুসলিম। (দলিত নেতা ড. বি. আর. আম্বেদকার বলেছেন, এই বৈষম্য ইচ্ছাকৃত, যাতে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে 'হিন্দু আন্দোলনকে দমন করা যায়'।[২১৫]) কিন্তু প্রসঙ্গ যখন রাজনীতি, তখন ব্রিটিশরা উলটো খেলা শুরু করে। মুসলিমদের সামনে তারা এমন এক জুজু তুলে ধরে যে, তারাই দেশের বিপন্ন সংখ্যালঘু। মিন্টো-মর্লি সংস্কারের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ভোটারদের ভাগ করা হয় ধর্মের ভিত্তিতে। তাই সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—পুরোটাই পরিকল্পিত। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, জনশুমারির হিসাবনিকাশ ঔপনিবেশিক শাসনেও বিশাল এক জোয়ার তোলে। এরই মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের বৈধতা আদায় করতে চেয়েছিল ব্রিটিশরা।

একই ফন্দি করা হয় মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের ক্ষেত্রেও। এই সংস্কারের মাধ্যমে সাধারণ ভারতীয়দের সীমিত আকারে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। সেই ভোটও আবার এমনসব পদের জন্য দিতে হয়, যেগুলোর ক্ষমতার সীমা-পরিসীমা ব্রিটিশরাই ঠিক করে দেয়। আবার, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমাজের ভেতর যেসকল সাম্প্রদায়িক পরিচয় সৃষ্টি করেছে, সেগুলো ধরে

[২১৫] ড. বি. আর. আম্বেদকার, থটস অন পাকিস্তান, মুম্বাই: পপুলার প্রকাশন, ১৯৪১, পৃ. ৮৯।

ধরেই ভোটাধিকার প্রদান করা হতে থাকে। মানে, ঔপনিবেশিক প্রভুদের সুনজর লাভ করার লক্ষ্যে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন প্রার্থীরা। তাই হিন্দু, মুসলিম, শিখ ইত্যাদির জন্য আলাদাসংখ্যক আসন বরাদ্দ থাকে। এতে করে আরও চোখা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক পরিচয়। ভারতীয়দের যাও-বা একটু রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হলো, সেটাও হয়ে গেল সীমিত সম্পদ নিয়ে নানা সম্প্রদায়ের মাঝে কাড়াকাড়ি। ভারতীয়দের মাঝে মতপার্থক্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর জন্য জনমতকেও উত্তেজিত করে তোলা সম্ভব। এরও ফসল ঘরে তোলে সেই ব্রিটিশরাই। যত যা-ই হোক, তারা তো এসব কামড়াকামড়ির ঊর্ধ্বে। লন্ডনের নির্বাচনে গোল্ডারস গ্রিনের ইহুদিদের জন্য আলাদা ভোটের ইন্তিজাম করার কথা ভাবতেও শিউরে উঠবে ইংরেজরা। সেই তারাই ভারতের মুসলিমদের জন্য এই কাজ করে বসে। সেখানে মুসলিমরা ভোট দেবে শুধু মুসলিম প্রার্থীদের, শিখরা শিখদের এবং খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টানদের। তাই তো উইল ডুরান্ট সিদ্ধান্তে আসেন যে, ব্রিটিশদের এই পদ্ধতি 'এমনসব জাতিগত ও ধর্মীয় বিভেদকে উসকে দিতে থাকে, যেগুলোকে বরং সারিয়ে তোলাটাই ছিল রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব'।

কিন্তু রোগ সারানো কখনোই ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে ছিল না। এই অধ্যায়ের শুরু থেকেই আমরা তা দেখে আসছি। বিভক্ত জাতিকে পদানত করা সহজতর। লর্ড অলিভার ১৯২০-এর দশকে ভারতের রাষ্ট্রীয় সচিব ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, 'ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব খুবই জোরদার...। মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদকে হালকা করার জন্য বাটখারা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বিষয়টাকে।'[২১৬] মুসলিমরা যা চাইত, ব্রিটিশদের প্রবণতা ছিল তারচেয়েও বেশি দেওয়ার। মুসলিম লীগ একবার দাবি করে যে, পাঁচটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তাদের দুটি সুবিধার মাঝে যে-কোনো একটি দিতে হবে : হয় আইনানুযায়ী কোনো প্রদেশকে স্থায়ীভাবে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘোষণা করতে হবে, যেখানে সব ধরনের ভোটারই থাকবে, আর নয়তো শুধু মুসলিমদের জন্য আলাদা ভোটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে মুসলিম লীগারদের দুটিই দিয়ে দেয় ব্রিটিশরা : স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ এবং আলাদা ভোটার।

আফসোস, ভারতীয় রাজনীতিকে ব্রিটিশ রাজনীতির আদলে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। দিলে এখানেও একদিকে রক্ষণশীল এবং আরেকদিকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দল থাকত। তাদের মাঝখানে থাকত কিছু উদারপন্থি

---

[২১৬] ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩৭–১৩৮।

দল। কারণ, ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের মাঝে এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যের মানুষই ছিলেন। এরকম নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতকে ঐক্যবদ্ধই রাখত। জিন্নাহ আর নেহরু হতেন উদীয়মান ভারতের ডিজরায়েলি ও গ্ল্যাডস্টোন।[২১৭] কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতিমালার কারণে রক্ষণশীল ও সমাজতান্ত্রিক উভয় পক্ষই নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলে সাম্প্রদায়িক আদলে, যার অন্তিম ফলাফল দেশের করুণ বিভাজন।

এসবের ফলে ভারতীয় চেতনায় গভীর সব পরিবর্তন এসেছে। অতীতে ভারতে যে মিলমিশের সংস্কৃতি ছিল, সেটা ক্রমেই কেটে আলাদা হয়ে গেছে। এর দায়টা ব্রিটিশদের ওপরই চাপিয়েছেন ভারতীয় ইতিহাসের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ। অ্যালেক্স ফন টুনযেমলমানের লেখা ইতিহাসগ্রন্থ ইন্ডিয়ান সামার: দ্য সিক্রেট হিস্ট্রি অব দি এন্ড অব অ্যান এম্পায়ার। সেখানে তিনি বলেছেন, 'ব্রিটিশরা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে "সম্প্রদায়" ঠিক করে দিতে থাকে। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বও দান করে ওই অনুসারে। সেই থেকে নিয়ে বহু ভারতীয় নিজেদের চিন্তাচেতনার মাঝে বৈচিত্র্যকে মেনে নেওয়া বন্ধ করে দেয়। কে কোন বাক্সের সদস্য, তা নিয়ে হয়ে ওঠে খুবই সচেতন।'

শুধু এক ধর্মের সাথে আরেক ধর্মের নয়, বরং এসব ভেদাভেদ একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজেদের মাঝেও প্রকট হয়ে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত লখনৌর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে শিয়া-সুন্নি টানাপোড়েন ছিল না বললেই চলে। সেটা সৃষ্টি করার জন্যও ব্রিটিশরাই অনেকাংশেই দায়ী। ব্রিটিশরা ঔধ (আওয়াধ) অঞ্চল দখল করার আগে সেখানে দুই গোষ্ঠীর মুসলিমরা একজন শিয়া নবাবের অধীনে শান্তিতে বসবাস করত। শিয়াদের মুহাররম উদ্‌যাপনে সুন্নি ও হিন্দুরা অংশগ্রহণ করে তাদের ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ ঘটাত। ব্রিটিশরা যখন ১৮৫৬ সালে নবাবকে উৎখাত করে, তখন সেই ঐক্যের প্রতীকটাই আর থাকেনি। পরিণামে রাজ্যের শিয়া অভিজাত শাসক গোষ্ঠী এবং অ-শিয়া (সুন্নি ও হিন্দু) জনগণের মাঝে সম্পর্ক চিরতরে পালটে যায়। ব্রিটিশদের বানানো অতিরঞ্জিত সাম্প্রদায়িক পরিচিতি এবার মুসলিমদের এই দুটি ধারাকেও আক্রান্ত করে।

গবেষক কিথ জোর্টশোজ বলেন,

'শিয়া ও সুন্নিদের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ১৯০৫ সালের মাঝে এতই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে, লখনৌর সুন্নিরা মুহাররমের মর্সিয়া মাতমে আর যোগ দেয়নি। এর বদলে তারা প্রথম তিন খলিফার স্তবগীতি করতে থাকে, যাকে বলা হয় মাদহে সাহাবা। শিয়ারা এর জবাব দেয় সাহাবাদের প্রতি তাবাররা অভিশাপ

[২১৭] বেঞ্জামিন ডিজরায়েলি এবং উইলিয়াম ইওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রাজনীতির দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। প্রথমজন রক্ষণশীল, দ্বিতীয়জন উদারপন্থি।

নিক্ষেপের মাধ্যমে।' শিয়া নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারকে বুঝ দেন যে, সুন্নিদের কাজগুলো মুহাররমের সাথে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। তাই ব্রিটিশরা কঠিন আইন করে দেয়। শিয়াদের কাছে আপত্তিকর, সুন্নিরা এমন কোনো আচার পালন করতে পারবে না। অচিরেই ব্রিটিশরা মুহাররম উদ্‌যাপনের জন্য শিয়া ও সুন্নিদের পৃথক পৃথক মিছিলের অনুমতি প্রদান করে।[২১৮]

ব্রিটিশরা কীভাবে বিভেদ উসকে দেয়, তার অন্যতম স্পষ্ট উদাহরণ লখনৌর শিয়া-সুন্নি বিভাজনে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা। ভারতীয়রাও সম্প্রদায় বানিয়ে এনে ব্রিটিশ রাজ থেকে অনুমোদন নিত, যাতে এতে রাজনৈতিক গুরত্ব আরোপ করা যায়। এসব ঘটনা ঘটতে থাকে ঠিক মিন্টো-মর্লি সংস্কারের সময়টাতেই। রাজনীতিতে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব তখন বেড়েছে। ভাইসরয় ও গভর্নরের পর্ষদে যথাসম্ভব জায়গা করে নেওয়ার জন্য ঠোকাঠুকি করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী। জোর্টশোজ বলেন, 'ধর্মীয় উদ্‌যাপনের বৈধতা, বিরোধ মীমাংসা, মিছিলের গমনপথ এগুলো যখন ব্রিটিশরা ঠিক করে দিতে থাকে, ধর্মীয় মতপার্থক্য তখন রাজনৈতিক ও আইনি বিষয়ে পরিণত হয়। এখনো এরকমই রয়ে গেছে।'

ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা প্রদান তো দূর কি বাত, ব্রিটিশ সরকার বরং এমনসব বিভেদ খুঁজে খুঁজে সেগুলোর প্রকটতা বাড়ায় এবং আইনি বৈধতা দেয়। শুধু হিন্দু-মুসলিম ফাটল সৃষ্টিই তাদের একমাত্র কৃতিত্ব নয়, বরং সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে তারা যেভাবে আইনি উপায়ে নতুন রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করেছে, সেটাও তারীফের দাবিদার।

মুসলিমদের মাঝে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও ফাটল ধরেছে। মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি একজন দেওবন্দি আলেম। তিনি ব্রিটিশদের প্রচারিত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রকল্পেরও বিরোধিতা করেন তিনি। এই ১৯৪৫ সালে এসেও স্বধর্মের এক ব্যক্তির উদ্দেশে চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

মুসলিমরা যেদিন থেকে হিন্দুস্তানে এসেছে, সেদিন থেকেই হিন্দুদের সাথে সহাবস্থান করে এসেছে তারা। আর আমি তাদের সাথে সহাবস্থান করেছি নিজের জন্মের পর থেকে। আমি এই মাটিতে জন্মেছি আর বড় হয়েছি। দুটো মানুষ যদি একই দেশে, একই শহরে বাস করে, তাহলে তাদের অনেককিছুই একই রকম হয়। যতদিন ভারতে মুসলিমরা আছে, ততদিন তারা হিন্দুদের

[২১৮] কিথ জর্টশোজ, 'শি'ই আইডেন্টিটি অ্যান্ড দ্য সিগনিফিকেন্স অব মুহাররম ইন লাকনোও, ইন্ডিয়া', মার্টিন ক্রেমার (সম্পা.), শি'ইজম, রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড রেভোলিউশান, বোউল্ডার: ওয়েস্টভিউ প্রেস, ১৯৮৭, পৃ. ২৩৪।

সাথে একত্রেই থাকবে। বাজারে, বাড়িতে, রেলওয়েতে, ট্রামে, বাসে, লরিতে, স্টেশনে, কলেজে, ডাকঘরে, কারাগারে, পুলিশ ফাঁড়িতে, আদালতে, পর্ষদে, সংসদে, হোটেলে—সবখানে। আমাকে একটা সময় বা জায়গা দেখান তো, যেখানে তাদের সাথে আমাদের দেখা হয় না। ধরুন আপনি জমিদার। আপনার হিন্দু প্রজা থাকবে না? ধরুন আপনি ব্যবসায়ী। আপনাকে হিন্দুদের সাথে বেচাকেনা করতে হবে না? আপনি আইনজীবী; তাহলে হিন্দু মক্কেল থাকবে না? কোনো জেলা বা পৌরসভার পর্ষদে আছেন; হিন্দুদের সাথে লেনদেন করতে হবে না? কে নেই হিন্দুদের সাথে?[২১৯]

হিন্দু-মুসলিম শত্রুতার সৃষ্টি ও স্থায়ীকরণ হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ডিভাইড এট ইম্পেরা নীতি তার পূর্ণ ফলাফল দেখেছে ১৯৪৭ সালে, যখন ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তির সাথে সাথে দেশভাগের মতো ভয়াবহ বিষয়ও সংঘটিত হয়।

পাপীদের মাঝে এক পুণ্যাত্মা

ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে এক অদম্য ভারতীয় প্রতিবাদী ছিলেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেন এক অন্যরকম উপায়ে: সহিংসতার মাধ্যমে নয়, বরং নৈতিক শক্তির বলে। গান্ধির জীবনটাই তার শিক্ষা। বিংশ শতকের রাষ্ট্রনায়কদের মাঝে তিনি অনন্য। তিনি নিজের জীবনে তার বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিশ্বাস ও কাজের মাঝে যে-কোনো ধরনের অমিলকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গান্ধি ছিলেন এমন এক দার্শনিক, যিনি সর্বদাই তার মতাদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চেয়েছেন, হোক সেটা ব্যক্তিগত আত্মোন্নয়ন বা সামাজিক পরিবর্তন। তাই তার আত্মজীবনীর শিরোনাম দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ। 'অসত্য' বা অন্যায় উপায়ে সত্যকে অর্জন করা যায় না। প্রতিপক্ষের ওপর সহিংসতাও অন্যায়। মাধ্যম হতে হবে লক্ষ্যের মতোই মহান। যদি তা না হয়, তাহলে লক্ষ্যও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

পদ্ধতিটি বোঝাতে গান্ধি 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি প্রবর্তন করেন। এর আক্ষরিক অর্থ 'সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখা'। ইংরেজি 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' অনুবাদটা অপছন্দ করতেন তিনি। কারণ, সত্যাগ্রহে সক্রিয়তা লাগে, নিষ্ক্রিয়তা নয়। গান্ধি মনে করেন, সত্যে বিশ্বাস করলে এবং এর প্রতি যথেষ্ট টান থাকলে

---

[২১৯] মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, উদ্ধৃত করেছেন ভেঙ্কট ঢুলিপাল, ক্রিয়েটিং আ নিউ মেদীনা, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬, পৃ. ৪৪৯–৪৫০।

নিষ্ক্রিয় থাকার উপায় নেই। সত্যের জন্য সক্রিয়ভাবে কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অহিংসা ও অসহযোগ মানে শুধুই বিপরীত জিনিসটির প্রত্যাখ্যান নয়। সহিংতার অনুপস্থিতি মানেই অহিংসা নয়। অহিংসা হলো সত্যকে জানার একটা পদ্ধতি, কিন্তু প্রতিপক্ষকে নয়, বরং নিজেকে ব্যথা দিয়ে। নিজের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা বোঝানোর জন্য স্বেচ্ছায় শাস্তি মেনে নেওয়া এখানে আবশ্যক।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধি এই পদ্ধতিটাই প্রয়োগ করেন এবং তাতে কাজও হয়। বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ এবং মধ্যমপন্থি সাংবিধানিক পদ্ধতি উভয়টিই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই গান্ধি স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে যান জনগণের দ্বারে দ্বারে। স্রেফ সঠিক-বেঠিক বেছে নেওয়ার মতো সহজ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন তাদের কাছে। এই কৌশলের কোনো জবাবই ব্রিটিশদের কাছে ছিল না। কাউন্সিল আর মিটিং রুমের সীমানা পেরিয়ে গান্ধি জনগণের মনমানসের দখল নেন। সহিংসতা পরিহার করার কারণে নৈতিকভাবেও এগিয়ে থাকেন মহাত্মা। অহিংস পদ্ধতিতে আইন ভাঙার মাধ্যমে তিনি আইনের অন্যায়গুলো ফাঁস করে দেন। তার ওপর আরোপকৃত শাস্তিগুলো মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দেন, তার শাস্তিদাতারা নিজেরা কতটা পাশবিক। অনশনের মাধ্যমে নিজের ওপর স্বেচ্ছায় কষ্ট আরোপ করে তিনি বুঝিয়ে দেন, সত্যের প্রতিরক্ষায় তিনি কতদূর যেতে প্রস্তুত। অবশেষে তার প্রচেষ্টার কারণে বোঝা যেতে থাকে যে, ব্রিটিশ শাসন চিরস্থায়ী হওয়া অসম্ভব।

তেজস্বী জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায় ১৯০৫ সালে যা বলেছিলেন, গান্ধি যেন তারই মূর্ত রূপ :

> 'ব্রিটিশরা আধ্যাত্মিকতাবাদী জাতি নয়—তারা হয় যোদ্ধা, আর নয়তো বণিক। নৈতিকতা বা ন্যায়ের দোহাই দিয়ে তাদের কাছে আবেদন জানানো মানে শুয়োরের সামনে মুক্তো ছুড়ে মারা। তারা স্বাবলম্বী, উদ্ধত জাতি। তারা এমনকি প্রতিপক্ষের মাঝেও আত্মসম্মান ও স্বনির্ভরতা দেখতে পেলে তার কদর করে।'[২২০] (তা সত্ত্বেও লাজপত রায় ৬৩ বছর বয়সে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ১৯২৮ সালে তিনি এক শান্তিপূর্ণ ও অহিংস প্রতিবাদ মিছিল করছিলেন। পুলিশ সুপার জেইমস এ. স্কট কাঠের লাঠি দিয়ে ক্রমাগত মাথায় আঘাত করে হত্যা করেন তাকে।)

অহিংস ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকগুলোতে জনগণের সহানুভূতি এবং আন্তর্জাতিক মনোযোগ লাভ করতে

---

[২২০] লালা লাজপত রায়, 'দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট', ১৯০৫, উদ্ধৃত করেছেন নেভিনসন, পৃ. ৩০১।

থাকে। সত্যাগ্রহ, অনশন ও সাম্রাজ্যকে বুড়ো আঙুল দেখানো লবণ যাত্রার মাধ্যমে বিশ্বমানসকে দখল করে নেন গান্ধি। ব্রিটিশদের মনে হতে থাকে, এবার স্বায়ত্তশাসনের জন্য আরও উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ব্রিটিশরা প্রণয়ন করে ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আইন, এমনকি তখনো দেশের ১০ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার পায়নি। আর আগের মতো ভারতীয়রা একই দেশের নাগরিক হিসেবে নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ভোট দিতে থাকে। মুসলিম ভোটাররা মুসলিম সদস্যদের বেছে নেয় একটি সংরক্ষিত তালিকা থেকে—ডিভাইড এট ইম্পেরার আরও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এটা ছিল মহাত্মা গান্ধির গণরাজনীতিকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদের আরেকটি চাল। কারণ, এবারই প্রথমবারের মতো সাধারণ জনগণের মাঝে একটা জাতীয় চেতনার জন্ম হয়েছে। গান্ধির নেতৃত্বে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারা; অথচ এতদিন পর্যন্ত সেটা সীমাবদ্ধ ছিল কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাতের ভেতর।

তখন যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীটি 'অস্পৃশ্য' নামে পরিচত ছিল (বর্তমানে বলা হয় দলিত বা আরও সুশীল ভাষায় 'Scheduled Castes'), ব্রিটিশরা তাদের আলাদা প্রতিনিধিত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এরা হবে হিন্দুদের থেকে আলাদা নতুন একটি শ্রেণি, যার নাম 'অবদমিত শ্রেণিসমূহ'। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা একে আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী ফন্দি হিসেবে দেখে। এর মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীটিকে আরও টুকরো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওদিকে দলিতদের কাছে মনে হলো, জাতীয়তাবাদীরা আগের সেই 'উঁচু' শ্রেণির লোক, যারা এতদিন তাদের বঞ্চিত করে এসেছে। দলিত নেতা আম্বেদকার ছিলেন সংবিধানের এক দুর্দান্ত বিশেষজ্ঞ। নিরেট মেধার জোরে তিনি হাভাতে দারিদ্র্য থেকে এই পর্যায়ে উঠে এসেছেন। তার মতো অনেক দলিত নেতাই আলাদা প্রতিনিধিত্বের অধিকার বেছে নেন।

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আগে থেকেই মুসলিম, শিখ ও খ্রিষ্টানদের জন্য আলাদা ভোটের বিরোধী। কারণ, তাদের মতে, এটা এসব সম্প্রদায়ের মাঝে বিভেদের চেতনা রোপণ করার চক্রান্ত। যেন বোঝানো হচ্ছে, ভারতীয় জনগণের চেয়ে তাদের স্বার্থ কোনো-না-কোনোভাবে আলাদা। তারপরও কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের খেপিয়ে তোলার ভয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এর বিরোধিতা করতে পারেনি। ওদিকে ব্রিটিশরা কিন্তু সংখ্যালঘুদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে চলছে যে, ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর হিন্দু আধিপত্য শুরু হয়ে যাবে। কংগ্রেস তাই মূলনীতি ঠিক রাখলেও এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেয়। যদিও নীতির জায়গা থেকে

আলাদা ভোটার-পদ্ধতি অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয়, তবে তা বাতিল করার আগে অবশ্যই সংখ্যালঘুদের সম্মতি নিতে হবে।

কিন্তু অবদমিত শ্রেণিকে আলাদা করার চেষ্টাটা একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এতদিন ব্রিটিশরা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা ভোটার তৈরি করত। এবার সেটা করা হচ্ছে একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভেতরে। এটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের টুকরো টুকরো করে ফেলার ফাঁদ। ভারতীয় জনগণের ঐক্যকে যে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার চক্রান্ত চলছে, তা কংগ্রেস নেতাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। গান্ধি দাবি করেন, অবদমিত শ্রেণির প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতে হবে সর্বসাধারণ ভোটারের ভোটে। সেখানে ভোটাধিকার থাকবে প্রশস্ত এবং, যদি সম্ভব হয়, সর্বজনীন। এই দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩২ সালে আমরণ অনশন শুরু করেন। এবার পুরো জাতি দ্বিধায় পড়ে যায়। ব্রিটিশ ও দলিত নেতৃবর্গ দাবি মানতে বাধ্য হন। পুনা চুক্তির শিরোনামে হয় রাজনৈতিক বোঝাপড়া। ফলে সে বছর অবদমিত শ্রেণির জন্য আলাদা ভোটারের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। তবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভায় বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের জন্য বরাদ্দ আসনের সংখ্যা; প্রাদেশিক পর্যায়ে আসনসংখ্যা ৭১ থেকে বাড়িয়ে করা হয় ১৪৭, আর কেন্দ্রীয় সভায় সেটার পরিমাণ হয় ১৮ শতাংশ।

(গান্ধির সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন যে দলিত নেতা, তিনি ড. বি. আর. আম্বেদকার। মজার ব্যাপার হলো, স্বাধীনতার পর তিনি ভারতের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন পর্ষদের সভাপতি হন। বিশ্বে প্রথমবারের মতো তার দেশই যেন তার সম্প্রদায়ের প্রতি সবচেয়ে বড়সড় ইতিবাচক নীতিমালা গ্রহণ করে, এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করে ছাড়েন তিনি। আলাদা ভোটারের ব্যবস্থা চিরতরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের লোকসভার ৫৪৩ আসনের মধ্যে ৮৫টি বরাদ্দ করা হয় শিডিউল্ড বর্ণ ও গোত্রগুলোর জন্য। সরকারি চাকরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও তাদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করা হয়। তার মানে, শুধু সুযোগই না, ফলাফলও নিশ্চিত করা হয়েছে।)

দলিতরা শেষমেশ আলাদা ভোটারের সুবিধা পায়নি, তাই মুসলিম লীগও প্রথম প্রথম সুবিধা হাসিল করতে পারেনি তাদের থেকে। 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতিভূ' খেতাবটা জিন্নাহর কপালে স্থায়ী হতে পারেনি। গান্ধির জনপ্রিয়তা এবং গণমানুষের কাছে আবেদনকে দুচোখে দেখতে পারতেন না তিনি। জিন্নাহ ফিরে যান ইংল্যান্ডে তার আইন পেশায়। রাজনীতির ময়দানে দীর্ঘকাল মুখ ভার করে চুপ থাকার পর যখন দেশে ফিরে আসেন, ততদিনে তিনি মুসলিম লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদের পানে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর

এক নেতা।

জিন্নাহ দাবি করেন, ভারতের মুসলিমরা এক স্বতন্ত্র জাতি। নিজের পুরো বেড়ে-ওঠা, কর্মজীবন, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত জীবনকে নীরস বদনে অস্বীকার করেন তিনি। ঘোষণা করেন, 'আমরা একেবারেই আলাদা সত্তা। জীবনের একটা দিকেও আমরা পরস্পর সম্পর্কিত নই। আমাদের নাম, আমাদের পোশাক, আমাদের খাবার—সবকিছু আলাদা; আমাদের অর্থনৈতিক জীবন, আমাদের শিক্ষাগত ধ্যানধারণা, নারীদের প্রতি আমাদের আচরণ, প্রাণীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি... কম্পাসের প্রতিটা বিন্দুতে আমরা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে চলি।'[২২১] সেভাল রো কোম্পানির সুট-পরা, সসেজ-খাওয়া এবং হুইস্কি-গেলা জিন্নাহর মুখে পোশাক আর খাবারের প্রসঙ্গ একটু বাড়াবাড়িই বটে, নারীদের প্রতি আচরণের প্রসঙ্গটাও। এই দাবি আসছে এমন এক পুরুষের মুখ থেকে, যিনি কিনা তার তরুণী স্ত্রীর কেলেঙ্কারি-মার্কা 'সাহসী' পোশাক-আশাকের ব্যাপারে খুবই ইতিবাচক।

কিন্তু পার্থক্য বাড়িয়ে তোলার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের এই নেতা এবার এ কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। লীগকে ভারতের মুসলিমদের 'একমাত্র প্রতিনিধি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই তার লক্ষ্য। কিন্তু অস্বস্তির ব্যাপার হলো, মুসলিম ভোটাররা তা মানতে চায়নি। লীগকে ভোট দিয়েছে বটে, কিন্তু সেইসাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মুসলিম প্রার্থীদেরও ভোট দিয়েছে। লীগারদের পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়ে ভোট দিয়েছে কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যদেরও।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আটখানা প্রদেশ শাসনের জন্য নির্বাচিত হয়। যে ৭৩৯টি 'সাধারণ' আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তার ৬১৭-টিতেই পায় চমকে-দেওয়া সাফল্য, এমনকি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত যে ৫৯টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন, তাদের মধ্যেও জিতে যান ২৫ জন। অন্য বেশ কয়েকটি দলও বিভিন্ন আসনে জয়লাভ করে, যেখানে রয়েছেন ৩৮৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও। বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে দ্বিতীয় হয় মুসলিম লীগ। এমনকি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত কোনো আসনে তারা যৌথ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়নি। যে ১,৫৮৫টি আসনে তাদের বাজির ঘোড়া ছিল, এর মধ্যে মাত্র ১০৬টিতে জয়লাভ করে। তাই কোনো প্রদেশের শাসনভারই হস্তগত হয়নি তাদের। মনে হচ্ছে কংগ্রেস নামক অসাম্প্রদায়িক, বহুত্ববাদী ও

[২২১] উদ্ধৃত করেছেন নিসিদ হাজারি, মিডনাইট'স ফিউরিজ: দ্য ডেডলি লেগ্যাসি অব ইন্ডিয়া'জ পার্টিশান, নিউ ইয়র্ক: হাউটন মিফলিন হারকোর্ট, ২০১৫, পৃ. ৯।

বহুজাতিক দলটির দিকেই চূড়ান্তভাবে হেলে গেছে দেশীয় রাজনীতির পাল্লাটা।

কিন্তু যারা এমনটা ভেবেছে, তারা বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। কংগ্রেসের এই বিজয় তখনো কিছুই নির্ধারিত করে দিতে পারেনি। নির্বাচনে প্রায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ভোটার ছিল ঠিকই—প্রতিনিধিত্বপূর্ণ সরকার সৃষ্টির পথে এটা এক বড়সড় অগ্রগতি—কিন্তু আসল ক্ষমতার বেশিরভাগই তখনো ভাইসরয়ের কবজায়। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো নির্বাচন তখনো হয়ইনি। সেটাও ভাইসরয়ই চালাচ্ছেন। এটা ইচ্ছাকৃত। কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে গিয়েই এই পরিকল্পনার ওপর ভরসা করে ব্রিটিশরা। ভাইসরয় লিনলিথগো যেটাকে বলেছেন, 'স্রেফ একটা টোপ। এর উদ্দেশ্য হলো কংগ্রেসের সর্বভারতীয় বিপ্লব ধ্বংস করে দেওয়া।' মানে, দলটির নেতাদের হাতে প্রাদেশিক ক্ষমতার যথেষ্ট দানাপানি খিলানো-পিলানো হবে। ব্রিটিশ রাজের সাথে হালুয়া ভাগাভাগির স্বাদও পাবে তারা। বিনিময়ে সরে আসবে জাতীয় নেতৃত্বের দাবি থেকে। আলাদা ভোটার পদ্ধতির কারণে গ্রাম্য প্রতিনিধিদেরও দারুণভাবে ব্যবহার করা গেছে। কারণ, এর ফলে আরও অনেক জমিদার নির্বাচনে জয় লাভ করেন। কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা যেসব সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, এই জমিদাররা জীবনেও তাতে সায় দেবেন না।

স্বায়ত্তশাসনের এত আলাপ তাই এমনিতেই ফাঁকা বুলি। সেই ফাঁকি চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয় ১৯৩৯ সালে। সে বছর ভারতের হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেন ভাইসরয়, ভারতীয় জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা না। এত গুরুতর একটি বিষয়ে তাদের সাথে কোনো পরামর্শই করা হয়নি। প্রতিবাদে নির্বাচিত কংগ্রেস মন্ত্রীরা ত্বরিত পদত্যাগ করেন। ভারতে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যে ভানটা এতদিন করা হতো, সেটাও চাঙে উঠল এবার। ইয়েটসের অমর পঙ্‌ক্তি অনুযায়ী বললে, অচিরেই ভারতের মুসলিমদের মাঝে এক রুক্ষ পশুর আবির্ভাব ঘটে, যে এক নতুন বেথলেহেমের দিকে বেঁকে আছে জন্ম নেওয়ার জন্য।[২২২]

মহাযুদ্ধের পানে উষ্টাউষ্টি সমর্থক ও সমালোচক উভয় পক্ষকেই হতবাক করে দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা নয়টি প্রদেশে প্রমাণ করে ছাড়েন যে, তারা ব্রিটিশ সরকারের যোগ্য চাকর। জুলুমবাজ ব্রিটিশ আইনকে উৎখাত করতে তেমন

[২২২] ধর্মের ভিত্তিতে নতুন দেশ সৃষ্টির তাড়না বোঝানো হচ্ছে। আইরিশ কবি ডাব্লিও. বি. ইয়েটসের যে পঙ্‌ক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলো হলো "The Second Coming" কবিতার: "And what rough beast, its hour come round at last/Slouches toward Bethlehem to be born?"

কিছুই করেননি তারা। কিছু ক্ষেত্রে তো ব্রিটিশদের চেয়েও বেশি জযবাসহকারে মৌলবাদীদের গ্রেপ্তার করে চলেন।

ওদিকে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ দক্ষ কুশলীর স্বাক্ষর রাখেন। ক্রমেই হার্ড লাইনে যাচ্ছেন মুসলিম লীগের এই নেতা। প্রথমে তার দল নির্বাচনে ব্যর্থ হয়। পরে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে তার জন্য সুযোগের জানালা খুলে দেন। জিন্নাহ এগুলোর দারুণ সদ্ব্যবহার করেন। মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশদ্বয়ে পরাজিত হয়েছিল তার দল। কিন্তু জিন্নাহ সেখানকার বিজয়ী নেতাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন লীগের মঞ্চে (পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট পার্টির স্যার সিকান্দার হায়াত এবং বাংলার কৃষক প্রজা পার্টির এ কে ফজলুল হক)। কংগ্রেস নিজেই অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পর্যুদস্ত। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তারা একদিকে বামপন্থি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আরেক দিকে মুসলিম সংখ্যালঘুর ওপর 'হিন্দু সংখ্যাগুরুর শাসন' চাপিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ রটে, যা অনেকাংশেই বটে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ভাইসরয় সবার আগে এই কংগ্রেসের সমর্থনই পেতে পারতেন। দলটির নেতা জওহরলাল নেহরু ইতঃপূর্বে ঘোষণা করেছেন, গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে যে-কোনো সংঘাতেই 'আমাদের সহানুভূতি থাকা চাই গণতন্ত্রের পক্ষে...। আমি চাই, ভারত সেখানে তার পূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিক নতুন এক ব্যবস্থার সংগ্রামে'। নেহরু ফ্যাসিবাদকে এতটাই ঘৃণা করতেন যে, গণতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষে তিনি স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেও রাজি; কিন্তু সেটা হতে হবে ভারতীয়দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। ব্রিটিশদের চাপানো সিদ্ধান্ত হলে চলবে না। জার্মানি পোল্যান্ডে আক্রমণ করল ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। ব্রিটেন তখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এবার গিয়ে পরিহাসটা ভারতীয়দের চোখে ধরা পড়ে। ইংরেজরা এমন একটা দুর্বল দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে, যেটা শক্তিশালী বিদেশি আগ্রাসনের শিকার। ঠিক এই কাজটাই কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এতদিন ধরে করে আসছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তার মানে, ব্রিটেন নিজে ভারতের সাথে প্রায় ২০০ বছর ধরে যে কাজ করে আসছে, সেই একই কাজ করার দায়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা।

এর আগে ফ্যাসিবাদীদের হাতে স্পেইনের পতন হয়েছে। বেঈমানির মাধ্যমে ইথিওপিয়াকে ইতালীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়া বিক্রি হয়ে গেছে নাৎসিদের হাতে। এই সবকিছুর জন্য নেহরু ব্রিটিশদের লালসাকে দায়ী করেন। ব্রিটিশদের নীতিমালার কোনো দায় তিনি ভারতীয়দের ঘাড়ে

টানতে রাজি নন। কারণ, তার দৃষ্টিতে এসব নীতির উদ্দেশ্যই হলো মুষ্টিমেয় কতিপয় সাম্রাজ্যবাদীর শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করা। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের প্রতি খোলাখুলি ঘৃণা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের কোনো যুক্তিই দেখেন না নেহরু। ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে নিজেদের জীবন কুরবানি করার কোনো মানে হয় না। স্বাধীন পোল্যান্ডের হয়ে পরাধীন ভারত কী করে যুদ্ধ করতে পারে? স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারত হলে একটা কথা ছিল। তখন হাসিমুখেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া যেত।

নেহরুর নির্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই ব্যাপারটি তুলে ধরে একটি প্রস্তাবনা পেশ করে (প্রেসিডেন্ট সুভাষ চন্দ্র বসু তৎক্ষণাৎ অসহযোগ আন্দোলন শুরুর ডাক দিলেন। কমিটি সেটা প্রত্যাখ্যান করল।) নেহরু তার নাৎসিবিরোধী মনোভাবে কোনো লুকোছাপা রাখেননি। তিনি শুধু চাইছিলেন ব্রিটিশ সরকার তার অবস্থানকে একটুখানি সম্মান দেখাক। তাহলেই খুশিমনে ভারত আর ব্রিটেন মিলে 'স্বাধীনতার সংগ্রামে হাত মেলাতে' পারত। কংগ্রেস নেতারা ভাইসরয়ের কাছে স্পষ্টভাবে বলেন যে, তারা বেশি কিছু চান না। শুধু এতটুকু ঘোষণা দিলেই হবে যে, যুদ্ধের পরে ভারত নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করার সুযোগটুকু পাবে। ব্রিটেনের বামপন্থি মহল এই ব্যাপারটাকে বেশ ভালোভাবে নেয়, কিছুটা সমর্থনও জানায় এর পক্ষে। তার মানে কংগ্রেসের মধ্য থেকেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মিত্র খুঁজে পেতে পারতেন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো। সেটা প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে যেমন, তেমনই কেন্দ্রীয় বিধান সভার কংগ্রেস সাংসদদের থেকেও। ভারতের হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়ার আগে ভারতের নির্বাচিত নেতাদের সাথে একটু আলাপ করার ভান করলেও হতো। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের কথা শুনলেন না। তিনি শুনলেন মুসলিম লীগের কথা।

কংগ্রেস কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে লীগের সাথে মিলেই একটা পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাইসরয় ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে যে বিবৃতি দেন, তাতে জোরেশোরে অগ্রাহ্য করা হয় কংগ্রেসের অবস্থান। তাই ওয়ার্কিং কমিটি নেহরুর নেতৃত্বে নির্দেশ জারি করে, যেন সব প্রদেশ থেকে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। যে যুদ্ধে তাদের সম্মানজনক ভূমিকা প্রদান করা হয়নি, সেটাতে সেবক হয়ে থাকার কোনো মানে নেই। সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় নীতিগত অবস্থান থেকে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে সেটা মারাত্মক ভরাডুবির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সরকারের ওপর কংগ্রেসের যতটুকু অধিকার ছিল, তা নস্যাৎ হয়ে যায়। নির্বাচনি সাফল্যের ফলটাও পাওয়া গেল না। স্বর্ণালি একখানা সুযোগ পেয়ে যান জিন্নাহ। কংগ্রেসের সাথে সংলাপ ভেঙে দেন তিনি। কংগ্রেস যেদিন

পদত্যাগ করে, সেই দিনটাকে বলেন 'নাজাতের দিন'। তারপর সংলাপ শুরু করেন ভাইসরয়ের সাথে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে পরাজয়ের পর রাজনীতির মরুপ্রান্তরে দুই বছর বেদিশা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে মুসলিম লীগ। এতে করে তারা আসলেই বদলে গেছে। কংগ্রেসের অজান্তেই তাদের শাসনামলে বেড়ে গেছে মুসলিমদের দুশ্চিন্তা, এমনকি আতঙ্কও। যে দেশের এত এত মানুষ হিন্দু, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিণতি কী হবে—তা মুসলিমদের ভাবনায় ফেলে দেয়। বহু মুসলিমই নিজেদের ভাবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংখ্যালঘু। লীগের কথায় আরও বেড়ে যায় তাদের অনিরাপত্তাবোধ। ক্রমেই জিন্নাহর মনে হতে থাকে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তির একমাত্র কার্যকর জবাব হতে পারে বিচ্ছিন্নতা। দেশভাগ করে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বদিকের মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি করতে হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই দাবি তোলা হবে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লীগের লাহোর প্রস্তাবনায়। পাকিস্তান সৃষ্টির আহ্বান জানানো হবে তাতে। বহু লীগ সদস্যের মাঝে যে এরকম বড়সড় চিন্তার পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, নেহরু ও তার সহনেতারা সে ব্যাপারে প্রায় বেখবর; অথচ তাদের চোখের সামনেই কিন্তু লীগ সদস্যরা আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন শুরু করেছেন (যেমন : জিন্নাহ উর্দু শিখতে শুরু করেছেন মাত্র ১৯৩৯ সালে। আনুষ্ঠানিক আলোকচিত্র তোলার সময় তিনি এখন 'মুসলিমসুলভ' আচকান পরিধান করেন—আজানুলম্বিত, সামনে বোতাম-বিশিষ্ট পোশাক। মনে পড়ে যায়, ১৮৪৮ সালের অস্থিরতা দেখে ফরাসি নেতা আলেক্সান্দ্র ওগুস্ট লাদ্রু-রোলান যা বলেছিলেন, 'আমি তাদের নেতা—আমার উচিত তাদের অনুসরণ করা')।

জিন্নাহ ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে ভাইসরয় লিনলিথগোকে দুটি বিষয়ে রাজি করিয়ে ফেলেন। প্রথমত, লীগের সুপারিশ-ক্ষমতা যেন কংগ্রেসের সমকক্ষ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, লীগকে যেন ভারতের মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। নির্বাচনি ফলাফলের বিচারে কিন্তু এই সুবিধাটা তাদের তখনো পাওনা হয়নি, কিন্তু ভাইসরয় তখন কংগ্রেস-লীগ জোট গঠিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে শঙ্কিত। তাই তিনি সম্মতি দিয়ে দেন। তিনি খেয়াল করলেন, লীগের কাজকারবারই তখন ভারতের স্বাধীনতা আলাপের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা। তাই এর পালে হাওয়া দেওয়া উচিত। সে বছরের নভেম্বরে ঈদ উপলক্ষ্যে মুসলিমদের প্রতি একটি বিশেষ বার্তা প্রচারের জন্য প্রথমবারের মতো আমন্ত্রণ জানানো হয় জিন্নাহকে। তার মানে, লীগের সভাপতি গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন।

নেহরু ও কংগ্রেসের চোখে এই দাবি নিরেট বেআইনি এবং নেহাত গোঁড়ামি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে যে আস্থার সংকট গড়ে উঠছিল, ওই আসল সমস্যাটাকে সামাল দেওয়ার মতো যথেষ্ট তৎপরতা চালায়নি তারা।

কংগ্রেস ১৯৪০ সালের বেশিরভাগ সময়জুড়ে অপেক্ষার খেলা খেলে যায়। আশায় থাকে যে, ব্রিটিশরা কিছু ছাড় দেবে। কিছু কংগ্রেসমেন তো এরচেয়েও আগে বেড়ে যেতে প্রস্তুত। ভারতে যদি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়, তাহলে তারা যুদ্ধে সরাসরি সহযোগিতা দিতে রাজি। কিন্তু লিনলিথগো একজন স্থূল, ঢিমেতেতালা ও কমবুদ্ধির মানুষ—ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝার এক রত্তি যোগ্যতা তার ছিল না। (তিনি ১৯৪০ সালের এপ্রিলে লন্ডনের উদ্দেশে চিঠি লেখেন : 'আমি এমন কোনো যুগ নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নই, যেটার পরে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়ে যাবে। আমার ধারণা, সেই দিন এখনো বহু দূরে। আমার মনে হয়, এটা নিয়ে যত কম কথা বলা হয়, ততই মঙ্গল।' ঠিক ওই বছরেই চার্চিল আত্মবিশ্বাস-সহকারে বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১ হাজার বছর টিকে থাকবে বলে তার বিশ্বাস।[২২৩]) সরকারের আনুষ্ঠানিক জবাব এলো ১৯৪০ সালের আগস্টে, কিন্তু সেটা একটা বিদ্রুপাত্মক প্রস্তাব। ভাইসরয়ের নখদন্তহীন পর্ষদে নাকি অল্প কয়েকজন 'ভারতীয় প্রতিনিধি' নিয়োগ দেওয়া হবে। নেহরু এই প্রস্তাব ছুড়ে ফেলে দেন। অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া মনে হয় আর গতি নেই।

সরকার সিদ্ধান্ত নিল, নেহরু কী করেন বা না করেন, তার জন্য তারা বসে থাকবে না। সোজা গিয়ে সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলে ১৯৪০ সালের ৩০ অক্টোবর। বিচারকার্য চলাকালে আসামি এক ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই বরং বিশ্ব আদালতের কাঠগড়ায় বিচারের জন্য দণ্ডায়মান।' চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাকে।

তার বন্দিত্বের পরিবেশ ছিল অস্বাভাবিক রকমের কঠোর। বেশকিছু ছোটখাটো বিষয়ে তাকে অসম্মান করা হয়, বিশেষ করে চিঠি আদান-প্রদানের অনুমতির ক্ষেত্রে। আপনজনের পত্র পেলে যে শান্তিটা মেলে, তা থেকে বছরের পর বছর বঞ্চিত থাকেন তিনি। কিন্তু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে চার্চিলের বিরোধিতা সত্ত্বেও লন্ডনের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল কারাবন্দি কংগ্রেস সদস্যের মুক্তির আদেশ দেয়।

[২২৩] ব্রিগেডিয়ার এনোক পাওয়েল (হবু রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ) ১৯৪৬ সালের মে মাসে এসেও লিখেছেন যে, 'ভারতের অন্তত আরও ৫০ বছর যাবৎ কোনো-না-কোনো রূপে ব্রিটিশ শাসন প্রয়োজন।'

নেহরু খুব করে আশা করছিলেন, ব্রিটিশরা হয়তো এমন কোনো নীতিগত ঘোষণা করবে, যার ফলে তিনি ভারতকে নিয়ে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল চার্চিল এবং নয়াদিল্লিতে তার ঠুলিপরা প্রতিনিধিরা মিলে সে আশার গুড়ে বালি দেন। চার্চিল স্পষ্ট ঘোষণা করেন, আটলান্টিক চার্টারের নীতিমালা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (স্বাধীনতার দেবদূত বলে পরে তাকে যে খেতাব দেওয়া হয়, সেটা তাই চরম অযৌক্তিক ঠেকে।)

এশিয়াতে ব্রিটিশ বাহিনী যে মারটা খেয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে এই ঘোষণা আরও উদ্ভট হয়ে ধরা দেয়। ফেব্রুয়ারিতে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে, মার্চে বার্মার; জাপানিরা পূর্ব দিক থেকে ভারতের দোরগোড়ায় চলে আসে। ওদিকে ব্রিটিশ ভারত থেকে পালিয়ে-যাওয়া নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪১ সালের মাঝামাঝিতে যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গড়ে তোলেন। জাপানিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত তিনি।

এক সাম্রাজ্যবাদীকে সরিয়ে আরেকটির খপ্পরে পড়ার কোনো ইচ্ছেই নেহরুর ছিল না। তিনি কংগ্রেসকে গুছিয়ে নিতে থাকেন জাপানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য। ওয়ার কেবিনেটে লেবার পার্টির সাথে সাথে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে আমেরিকাও। ক্লেমেন্ট অ্যাটলি তার সহকর্মীদের রাজি করান, যেন ১৯৪২ সালের শুরুতে সমাজতন্ত্রপন্থি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি যুদ্ধের পর ভারতকে ডমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করবেন, সেইসাথে সম্ভাবনা থাকবে দেশভাগেরও।[২২৪]

---

[২২৪] এসব ঘটনা থেকে দেশভাগ পর্যন্ত (পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে) পুরো পরিচ্ছেদটি এসব গ্রন্থের ভিত্তিতে লিখিত: ফিলিপস ট্যালবট, অ্যান আমেরিকান উইটনেস টু ইন্ডিয়া'জ পার্টিশান, নয়াদিল্লি: সেইজ বুকস, ২০০৭; লিওনার্ড গর্ডন, ব্রাদার্স এগেইন্সট দ্য রাজ, নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০; পেন্ডারেল মুন, মার্ক টালি এবং তপন রায় চৌধুরী, ডিভাইড অ্যান্ড কুইট, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮; সুগত বসু, হিজ ম্যাজেস্টি'জ অপোনেন্ট: সুভাষ চন্দ্র বোস অ্যান্ড ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল এগেইন্সট এম্পায়ার, ক্যামব্রিজ, এমএ: হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১; ,মাওলানা আবুল আযাদ খান, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, নয়াদিল্লি: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৪; দুর্গা দাস, ইন্ডিয়া: ফ্রম কার্জন টু নেহরু অ্যান্ড আফটার, নয়াদিল্লি: রুপা পাবলিকেশানস, ১৯৬৭; বিপন চন্দ্র, ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স, নয়াদিল্লি: ভাইকিং, ১৯৮৮; জওহরলাল নেহরু, দ্য ডিসকাভারি অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি: ভাইকিং, ২০১৩; সারভেপল্লি গোপাল, জওহরলাল নেহরু, খণ্ড ১ ও ২, নয়াদিল্লি: ভিন্টেজ, ২০০৫; নিসিদ হাজারি, মিডনাইট'স ফিউরিজ; টুনযেলমান, ইন্ডিয়ান সামার; অ্যালান ক্যাম্পবেল-জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, লন্ডন: ম্যাকমিলান, ১৯৮৫; ল্যারি কলিনস অ্যান্ড ডমিনিক লাপিয়ের, মাউন্টব্যাটেন অ্যান্ড দ্য পার্টিশান অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি: বিকাশ, ১৯৭৫; মাইকেল ব্রেখের, নেহরু: আ পলিটিকাল বায়োগ্রাফি, লন্ডন: বিকন প্রেস, ১৯৬২; স্ট্যানলি ওলপার্ট, নেহরু: আ ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি, নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫; এম.

ক্রিপস ততদিনে ব্রিটিশ রাজনীতির এক কিংবদন্তি। সাবেক সলিসিটর জেনারেল, যিনি ১৯৩৯ সালে লেবার পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন কনজার্ভেটিভদের সাথে যুক্তফ্রন্ট করার পক্ষে কথা বলার দায়ে (সেটা অবশ্য যুদ্ধের সময় আসলেই বাস্তবায়িত হয়)। নিরামিষভোজী কৃচ্ছ্রতা আর দেমাগি জাঁকজমকের সমন্বয় ঘটেছে তার চরিত্রে। ক্রিপস ভারত সফর করেন ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর। বহু ভারতীয় নেতার সাথে পরিচয় ছিল তার। নেহরুকে তিনি বন্ধু বলে মানেন, অথচ ক্রিপসের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান জিন্নাহ, আর বিরোধিতা করে কংগ্রেস। মহাত্মা গান্ধির প্রতিবাদ করার কারণটা ছিল, ব্রিটিশদের প্রস্তাবনায় দেশভাগের ব্যাপারটা যেন মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি প্রস্তাবটার নাম দেন 'মেয়াদোত্তীর্ণ চেক' (জনৈক রসিক সাংবাদিক আরও যোগ করেছেন, 'তাও আবার এমন এক ব্যাংকের, যেটা দেউলিয়া হওয়ার পথে')।

মহাত্মা গান্ধি আবেদন জানান, যেন তা বাতিল করা হয়। কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আযাদ বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের। ব্রিটিশ ভাইসরয়ের নেতৃত্বাধীন কোনো অনির্বাচিত সরকার এ কাজ করতে পারে না। এই বিষয়টাতেই নেহরু একদম আপসহীন। ক্রিপস প্রায় মেনেই নিচ্ছিলেন। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য একটা ভারতীয় জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি, যেখানে ভাইসরয় হবেন নামমাত্র প্রধান (ব্রিটিশ রাজার মতো)। কিন্তু ছোটলোক ভাইসরয় লিনলিথগো এবং প্রায় অসহায় কমান্ডার-ইন-চিফ লর্ড আর্চিবাল্ডের সহযোগিতায় চার্চিল ('ভারতীয়দের আমি দু চোখে দেখতে পারি না। তারা এক ইতর ধর্মের অনুসারী ইতর জাতি।') সমঝোতার আলাপ ভেস্তে দেন।

গান্ধির ব্যাপারে চার্চিলের মনোভাব অত্যন্ত রূঢ়। ভারতের ভাইসরয়ের সাথে ১৯৩১ সালে মহাত্মা একবার সাক্ষাৎ করেন। এই ব্যাপারে চার্চিলের এক কুখ্যাত মন্তব্য রয়েছে: 'জনাব গান্ধি মিড্‌ল টেম্পলের এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আইনজীবী, যিনি কিনা এখন প্রাচ্যের বিখ্যাত ফকিরদের মতো ভং ধরেন।

জে. আকবর, নেহরু, নয়াদিল্লি: ভাইকিং, ১৯৮৮; এইচ. ভি. হডসন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭; ইয়াসমিন খান, দ্য গ্রেট পার্টিশান, নিউ হাভেন: ইয়েইল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮; লুই ফিশার, দ্য লাইফ অব মহাত্মা গান্ধি, নিউ ইয়র্ক: হারপার কলিনস, ১৯৯৭; নিকোলাস ম্যানসার্গ, দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার ১৯৪২–৪৭, লন্ডন: এইচএম স্টেশনারি অফিস, ১৯৮৩; এবং লর্ড আর্চিবাল্ড ওয়াভেল, ভাইসরয়'জ জার্নাল (সম্পা.), পেন্ডারেল মুন, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য আরও দ্রষ্টব্য আমার স্বরচিত নেহরু: দি ইনভেনশান অব ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: আর্কেড বুকস, ২০০৩।

একদিকে তিনি আধা-ল্যাংটা হয়ে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদের সিঁড়ি ভাঙেন, আরেক দিকে সারা দেশে অসহযোগ কার্যক্রম চালিয়ে যান। এই অবস্থায় তিনি কিনা স্বয়ং মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধির সাথে সমানে-সমানে কথা বলবেন। ব্যাপারটা ভাবতেও তো আতঙ্ক আর ঘেন্না লাগে।'[২২৫] (মুসলিম ফকিরদের সাথে কোনো দিক দিয়েই গান্ধির মিল নেই। ভারতের ব্যাপারে চার্চিল এমনিতেও অজ্ঞ।) চার্চিল ঘোষণা করেন, 'আজ হোক বা কাল, গান্ধিবাদ ও তার সব নাম-নিশানার সাথে একটা এসপার-ওসপার করতে হবে। একসময় চূর্ণ করে দিতে হবে এই সবকিছু।' এসব ব্যাপারে আর কোনো ইংরেজই চার্চিলের মতো এত প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। এতই চরমপন্থি সব মতামত, যেগুলোকে ওই যুগের চিন্তাধারা মনে করার জো নেই। সত্যি বলতে, চার্চিলের সামসময়িক মানুষেরাই তার কথাবার্তায় শিউরে উঠতেন, এমনকি আজকের দিনেও তাকে যে ইতিবাচক চেহারা দেওয়া হয়, তাও ক্ষমার অযোগ্য। বোরিস জনসন সম্প্রতি চার্চিলের প্রশংসামূলক জীবনী লিখেছেন। তাতে তিনি বলেন, 'তিনি ছিলেন একদল নাছোড়বান্দা সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নবাজদের নেতা। এরা ব্রিটিশ রাজের জবরদস্ত সেনানী। প্রত্যেকটা গাল-গোলাপি ইংরেজ যে বারান্দায় গা এলিয়ে বসে... ভারতের মালিকানা নিয়ে বড়াই করতে পারে, সেটাকে তারা ভাবতেন আসমানি অধিকার।'[২২৬]

মহাত্মা গান্ধি ব্রিটিশদের আচরণে ক্রমেই ধৈর্য হারাচ্ছেন। তিনি বলেন, নেহরুর মিত্রশক্তি-পন্থি অবস্থান ভারতের কোনো উপকার করেনি। সরকারের প্রতি তার প্রকাশ্য আহ্বান ছিল—'ভারতকে হয় ঈশ্বরের, না হয় নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দিন।' আগাগোড়া হ্যারোভিয়ান[২২৭] ইংরেজপ্রেমী নেহরুও দিলেন ক্রোমওয়েলের উদ্ধৃতি—'এতদিন আসন পেতে বসে থেকেও আপনি বিন্দুমাত্র কাজের কাজ করতে পারেননি। বলি কী, এবার বিদায় হোন এবং আমাদের মুক্তি দিন। আল্লাহর ওয়াস্তে ভাগুন!' (আরেক হ্যারোভিয়ান আমেরি ঠিক এই কথাগুলোই দুই বছর আগে পার্লামেন্টে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে নেভিল চেম্বারলেইনকে পদত্যাগ করানোর উদ্দেশ্যে।) গান্ধির অনুরোধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট মুম্বাইয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করে। এটি প্রথমে উত্থাপিত করেছেন নেহরু এবং তার পরে পাতিল। সেখানে তারা ব্রিটেনকে 'ভারত ছাড়'তে বলেন। প্রস্তাবনায় শব্দটা যে ঠিক এভাবেই ছিল,

---

[২২৫] রামচন্দ্র গুহ, 'স্ট্যাচুজ ইন আ স্কোয়ার', দ্য টেলিগ্রাফ, ২১ মার্চ ২০১৫।

[২২৬] বোরিস জনসন, দ্য চার্চিল ফ্যাক্টর: হাউ ওয়ান ম্যান মেড হিস্ট্রি, নিউ ইয়র্ক: রিভারহেড বুকস, ২০১৪, পৃ. ১৭৮।

[২২৭] ইংল্যান্ডের হ্যারো স্কুলের শিক্ষার্থী।—অনুবাদক।

তা নয়; কিন্তু পত্রপত্রিকায় এভাবেই চাউর হয়েছে। (গান্ধির নিজের ভাষ্য ছিল 'করো না হয় মরো'।) ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্য কংগ্রেস নেতাদের সাথে মিলে গান্ধির একনিষ্ঠ অহিংসা আর কারাবরণ সত্ত্বেও এবার ভারত ছাড় আন্দোলন চলে গেল রক্তগরম তরুণদের হাতে। একটি গুপ্ত আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যারা সক্রিয়ভাবে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে। সাধারণ মানুষ অবর্ণনীয় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সরকারি দালানকোঠায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। ছোকরারা খবরের কাগজের কাটতি করতে গিয়ে চামে দিয়ে স্লোগান ঢুকিয়ে দেয়—'টাইমস অব ইন্ডিয়া। কুইট ইন্ডিয়া! টাইমস অব ইন্ডিয়া। কুইট ইন্ডিয়া!' গ্রেপ্তারের পরের কয়েক হপ্তা এমন একটা দিনও যায়নি, যেদিন আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের খবর আসেনি। ব্রিটিশরা এর জবাব দেয় নির্দয় দমন-পীড়নের মাধ্যমে। দমন-পীড়নের মধ্যে ছিল নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ, প্রতি সপ্তাহে ডজন ডজন মানুষ হত্যা, অমান্যকারীদের চাবুকপেটা এবং জাতীয় পত্রপত্রিকার ওপর নজরদারি (ও বন্ধ করে দেওয়া)। 'ভারত ছাড়' হয়ে ওঠে জাতীয় জাগরণের ঢাকের বোল। কিন্তু এতে করে জাতির পরাধীনতা দীর্ঘায়ত হওয়া ছাড়া কোনো লাভই হয়নি।

চলমান যুদ্ধের প্রভাবে কারাবন্দিদের প্রতিও ব্রিটিশদের মনোভাব শক্ত হয়ে যায়। চার্চিল মন্ত্রীপরিষদকে বলেন, 'স্রেফ অনশনের হুমকিতে ভয় পেয়েই [গান্ধিকে] মুক্ত করে দেওয়া উচিত নয়। তিনি যদি মারা যান, তাহলে আমরা একটা বদ লোক এবং সাম্রাজ্যের এক শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাব।' প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত করতেও বেশ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন তিনি। প্রস্তাব দেন যে, মহাত্মার 'হাত-পা দিল্লির ফটকের সাথে বেঁধে দেওয়া উচিত। তারপর ভাইসরয় একটা বিশাল হাতির পিঠে চড়ে তাকে মাটির সাথে পিষে দেবেন।'[২২৮]

নেহরু এবারে কারাগারে সবচেয়ে লম্বা সময়টা কাটান: মোট ১,০৪০ দিন, বা ৩৪ মাসেরও বেশি, ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে ১৯৪৫ সালের ১৫ জুন। এই পুরো সময়টা জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের অবস্থান সবলতর করে চলে ব্রিটিশরা। দলের ভেতরে যারা জিন্নাহর সমালোচক ছিলেন, তাদের বাধ্য করা হয় তারই নেতৃত্বে লীগে থেকে যাওয়ার জন্য। পাকিস্তান ধারণার বিরোধী মুসলিমদের হয় বুঝিয়ে নিরস্ত করা হয়, আর নয়তো দৃশ্যপটের আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়। বাকি যাদের পাশার দান উলটে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল (যেমন

[২২৮] অ্যালেক্স ফন টুনযেলমান, ইন্ডিয়ান সামার: দ্য সিক্রেট হিস্ট্রি অব দি এন্ড অব অ্যান এম্পায়ার, নিউ ইয়র্ক: হেনরি হোল্ট অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৭।

পাঞ্জাবের স্যার সিকান্দার হায়াত খান এবং সিন্ধুর আল্লাহ বক্স), তারা কিছু করতে পারার আগেই মারা যান। নির্বাচনে লীগ যেসব প্রদেশে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল, সেখানে তারা সরকার গঠন করতে থাকে (প্রায়শ ব্রিটিশ সদস্যদের ভোটে, যখন কংগ্রেস বিধায়করা কারাবন্দি)। এই পুরো প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশরা জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির বছরগুলোতে ব্রিটেনের ভাইসরয় ছিলেন যে লর্ড লিনলিথগো, তিনি জিন্নাহর ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেন, 'তিনি সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি। এমনই সংখ্যালঘু, যারা আমাদের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারবে না।'[২২৯] ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় লীগ পরিপুষ্ট হতে থাকে। এর সদস্য-সংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ১,১২,০০০। সেখান থেকে ১৯৪৪ সালে তা ফুলে ২০ লাখের বেশি হয়ে যায়।[২৩০]

ভারত ছাড় আন্দোলনে কাজের কাজ কিছু হয়নি। স্রেফ জাতীয় বিষয়-আশয় থেকে কংগ্রেসের নাম কাটা গেছে। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে তারা যে প্রথম ভন্ডুলটা করেছিলেন, এবার সেটা আরও গভীর হয়। ময়দান ফাঁকা পেয়ে যায় মুসলিম লীগ। বিশ্বযুদ্ধের পর তারা বেরিয়ে আসে দোর্দণ্ড ক্ষমতা ও প্রতাপসহকারে। বোঝা গেল, ১৯৩৯ সালের পদত্যাগ এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন উভয়ই ছিল চেহারাসর্বস্ব পদক্ষেপ, দূরদর্শী রাজনীতি না। এগুলো মুসলিম লীগের বিজয়ের পথ মসৃণ করে দিয়েছে।

১৫ জুন ১৯৪৫ নেহরু এবং তার কংগ্রেস সহকর্মীরা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন, চোখ পিটপিট করেন সূর্যের আলোতে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ; তারাও মুক্ত। পৃথিবী বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে। এমনই এক পৃথিবীতে এবার তারা স্বাধীনতার জন্য এবং স্বাধীনতার দিকে এক পা এক পা ফেলতে শুরু করবেন।

চূড়ান্ত খেলা: নির্বাচন, বিদ্রোহ, বিভক্তি

ব্রিটিশরা যুদ্ধের সময় গৌরবের চাদর গায়ে চাপায়নি। তারা এমন এক দেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছিল, যেটাকে তারা গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করছে বলে দাবি করে। মানব-ইতিহাসের ভয়াবহতম এক দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তর হয়েছে তাদের নেতৃত্বে। (চার্চিলের ব্যক্তিগত আদেশে) ভুখা-নাঙ্গা নাগরিকদের পরিবর্তে খাবার পাঠানো হয়েছে ভরপেট টমিদের কাছে[২৩১]

[২২৯] হাজারি, মিডনাইট'স ফিউরিজ, পৃ. ৪১।
[২৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
[২৩১] ইংরেজ সৈনিকদের টমি বলা হতো।—অনুবাদক।

(পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আরও কথা হবে)। ভাইসরয় পদে লিনলিথগোর উত্তরসূরি হন লর্ড ওয়াভেল, যিনি সামরিক ব্যর্থতার গৌরবময় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন (উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে যেমন, তেমনই বার্মার বনবাদাড়েও)। সেই তিনিও মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব 'এতটা নির্লিপ্ত, শত্রুতাপূর্ণ ও বিদ্বেষভরা, যা আমি আশা করিনি।'

ব্রিটেনে ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়লাভ করে। তার মানে, শ্রীঘ্রই জঘন্যমনা চার্চিলের বদলে প্রধানমন্ত্রী পদে বসবেন অ্যাটলি। কিন্তু তাতে করে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ওয়াভেল শিমলায় একটি সম্মেলন আয়োজন করেন ১৯৪৫ সালের জুন মাস থেকে। ভাইসরয়ের অনুমতিতে জিন্নাহ সেখানে লাফালাফি করে এসেছেন। এরকম হতাশা ও বিষাদের পরিবেশেই ব্রিটিশরা ভারতে নির্বাচনের ঘোষণা দেয় ১৯৪৫ সালের শেষে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়ে।

কংগ্রেসের তখন এতই বেহাল দশা যে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অবস্থায় নেই। তারা ১৯৩৯ সালে ক্ষমতার লাগাম ছেড়ে দিয়ে একবার ভুল করেছে, আরেকবার ১৯৪২ সালে জেলে গিয়ে নেতৃত্ব ও ক্যাডারদেরও হারিয়েছে। তাই এবারের নির্বাচনি প্রচারণায় তারা ক্লান্ত, নিরুদ্যম ও বিশৃঙ্খল। পক্ষান্তরে লীগ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পাপড়ি মেলেছে। তাদের রাজনৈতিক মেশিনে পৃষ্ঠপোষকতা আর টাকাপয়সা দিয়ে ভালো করে তেল দেওয়া হয়েছে। ওদিকে কংগ্রেসের মেশিন অব্যবহারে জংধরা। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের ফলাফল ভালোভাবে ঘুরে যায়। কংগ্রেসের হাতেই এখনো বেশিরভাগ প্রদেশ। কিন্তু মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোয় তাদের অবস্থা ভালো নয়। শুধু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তারা লীগের ১৭ আসনের বিপরীতে ১৯টি আসন জিতেছে। কিন্তু বাকি সবগুলো সংরক্ষিত আসন ধুয়েমুছে নিয়ে গেছে লীগ, এমনকি মুম্বাই ও মাদ্রাজের মতো যেসব প্রদেশকে সাম্প্রদায়িক বাতাস থেকে সুরক্ষিত মনে হতো, সেগুলোও। নেহরু হয়তো কিছু অজুহাত দিতেও পারতেন, কিন্তু অজুহাত যা-ই হোক, রিয়েলিটি এখন মাইনে নিতে হবে। জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ এবার অখণ্ডতার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারেন। আইনত দাবি করতে পারেন যে, তারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মুখপাত্র।

নেহরু এটাকে মোটেও দেশভাগের ভূমিকা বলে মানতে রাজি নন। তার মতে, এই পুরো বিষয়টাই বাস্তবতাবিবর্জিত। তিনি ১৯৪৫ সালের শেষ থেকে ১৯৪৬-এর শুরু পর্যন্ত নিজের সকল বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধে দাবি করেন, বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর ভারতের মুসলিমরা দেশভাগের

সব দাবি ত্যাগ করবে। লিখেছেন, ভারতের মুসলিমরা 'স্রেফ কাগজে-কলমে সংখ্যালঘু। অন্যান্য দিক দিয়ে তারা সংখ্যায় বিশাল ও শক্তিশালী। এ কারণেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাদের জোর করতে পারবে না...। মূলত স্বার্থ সংরক্ষণের প্রসঙ্গেই এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটা সামনে এসেছে। আর এসব ব্যাপারে ধর্ম সর্বদাই বাজির ঘোড়া হয়ে থেকেছে।'[২৩২] তিনি এও বলেন যে, মুসলিমদের ভয় কাটানোর জন্যই কংগ্রেসের উচিত দেশভাগের অধিকার দিয়ে দেওয়া। কারণ, তার আশা, লীগশাসিত প্রদেশগুলো আসলে শেষমেশ আলাদা হবে না। অনেক ভারতীয় বিশ্লেষকই প্রশ্ন তুলেছেন যে, জিন্নাহ আসলেই আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন, না কংগ্রেসের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য পাকিস্তান পাকিস্তান করেছেন। তবে সে যা-ই হোক, অনুসারীরা জিন্নাহর কথাকে আক্ষরিকভাবেই নিয়েছে। নিজেদের একটা রাষ্ট্র পেতে তারা বদ্ধপরিকর। আর ১৯৪৬ সালের বসন্ত আসতে আসতেই নেহরুর আদর্শবাদকে মনে হতে থাকে অতিসরলতা এবং তা বেশ বিপজ্জনক পর্যায়ের।

ডিভাইড এট ইম্পেরা করুণভাবে সফল হয়ে গেল। ব্রিটিশ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক সেটার আঘাতেই ভারত খণ্ডিত হয়ে গেল ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সময়।

***

ভারতে ব্রিটেনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে; এমনকি ভারতীয় সৈনিক ও পুলিশরাও খোলাখুলি সমর্থন জানাচ্ছে জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতি। তারা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের তোয়াক্কাই করছে না। বিমানবাহিনী এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান নেভিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। পরেরটা ছিল গুরুতর। এতে ৭৮টি জাহাজ এবং ২০টি উপকূলীয় স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়। সশস্ত্র বিদ্রোহে জড়িত ছিল প্রায় ২০,০০০ নৌসেনা। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বম্বেতে এক ব্রিটিশ-বিরোধী দাঙ্গা দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশরা ২৩৩ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে।[২৩৩] স্বাধীনতার দাবি ঢাকা পড়ে যায় দেশভাগের ঝনঝনানিতে।

এমনসময় ব্রিটিশরা বেখেয়ালে এমন এক কাণ্ড করে বসে, যাতে যুদ্ধরত

---

[২৩২] বিপরীত মতটি হলো, সমাজ ও ধর্মে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার শেকড় বেশ গভীরে প্রোথিত। এই মতের প্রবক্তারা প্রমাণ হিসেবে যেসব গ্রন্থ উদ্ধৃত করেন, তার জন্য দ্রষ্টব্য ভেঙ্কট ঢুলিপালা, ক্রিয়েটিং এ নিউ মেদীনা: স্টেইট পাওয়ার, ইসলাম অ্যান্ড দ্য কোয়েস্ট ফর পাকিস্তান ইন কলোনিয়াল নর্থ ইন্ডিয়া, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫।

[২৩৩] শ্রীনাথ রাঘবন, ইন্ডিয়া'জ ওয়ার: দ্য মেইকিং অব মডার্ন সাউথ এশিয়া ১৯৩৯–১৯৪৫, লন্ডন: পেঙ্গুইন, ২০১৬।

দলগুলো আগের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা শেষ সুযোগ পেয়ে যায়। তারা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করার সিদ্ধান্ত নেয়। নেতাজি যুদ্ধের শেষ দিকে ফরমোজায় (তাইওয়ানে) এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাই ব্রিটিশ রাজ তার সহযোদ্ধাদের মাঝে বলির পাঁঠা খুঁজতে শুরু করে। নিরপেক্ষতার ভান করার জন্য ব্রিটিশরা তিনজন আইএনএ সৈনিককে বেছে নেয় : একজন হিন্দু, একজন মুসলিম এবং একজন শিখ। তাদের বিচারের জন্য নিয়ে যায় দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লায়। ফলে এমন এক জাতীয় হুংকার ছড়িয়ে পড়ে, যা সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুছে দেয়। আইএনএ সৈনিকদের ভুলত্রুটি যা-ই হোক (নেহরু বিশ্বাস করতেন যে, বিদেশিদের সাথে হাত মিলিয়ে কখনোই দেশের স্বাধীনতা আসে না। সেই বিদেশি আবার ফ্যাসিবাদী হলে তো কথাই নেই), তারা তাদের মাতৃভূমির সাথে গাদ্দারি করেনি। তিন আসামির প্রত্যেকেই হয়ে ওঠে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গর্বের নিশান। কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই এই ত্রয়ীর পক্ষে গর্জে ওঠে। দীর্ঘ কর্মজীবনে প্রথমবারের মতো একই মঞ্চে ওঠেন নেহরু ও জিন্নাহ। নেহরু শরীরে ব্যারিস্টারের আলখাল্লা চাপান ২৫ বছর পর।

কিন্তু ঘটনার তেজ একসময় ফুরিয়ে আসে। ওই তিন দেশপ্রেমিকের পক্ষ নিলেই সেখান থেকে দেশপ্রেমের কোনো সংজ্ঞার্থ তৈরি করা যাচ্ছে না। দেশজুড়ে যে উত্তেজনা চলছে, এর ভিড়ে সেই মামলার ফলাফল প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। একসময় বাতিল করে দেওয়া হয় বিচারকার্য। কারণ, যতদিনে বিচার শুরু হয়েছে, ততদিনে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রাজদ্রোহের প্রস্তুতি চলছে তার নিজের রাজধানীতেই।

লেবার পার্টির অধীনে লন্ডন এখন যুদ্ধক্লান্ত। তাই ভারতীয় সাম্রাজ্যের বোঝাও ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে চায় তারা। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করেন, ভারতে একটি কেবিনেট মিশন পাঠানো হবে। তাদের কাজ 'একটা ভারতীয় সংবিধান তৈরির ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত জানতে নেতাদের সাথে আলাপ করা'। চূড়ান্ত খেলা হলো শুরু।

এপ্রিল ১৯৪৬-এ নেহরু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। মে-তে শিমলায় কেবিনেট মিশনের সাথে সংলাপ বসার কথা। এর আগেই তৈরি করা হয় একটি অন্তর্বর্তী ভারতীয় সরকার। প্রতিনিধি দলের ত্রিমূর্তি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেটহিক-লরেন্স এবং এ. ভি. আলেক্সান্ডারকে ঘিরে ধরা হয়। ব্রিটিশ রাজের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে উদরপূর্তির জন্য জড়ো হতে থাকে শকুনেরা। সমঝোতা ও গল্পগুজব, ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল চলতে

থাকে নানান পক্ষের সাথে ও মাঝে—যেমন ব্রিটিশ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, ব্রিটিশপন্থি, কমিউনিষ্ট, সরকারি চাকুরে। দিন যত গড়ায়, আলোচনা হয়ে ওঠে তত তীব্র ও জটিল। ওয়াভেলের ডায়ারি এত সাবলীল ভাষায় লেখা, পড়লে চমকে উঠতে হয়। যতজন ভারতীয় রাজনীতিবিদের সাথে তার কথা বলতে হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকের ব্যাপারে তার অনুভূতি একই—বিতৃষ্ণা ও অনাস্থা। (তার চোখে) একজনের চেয়ে আরেকজন পাল্লা দিয়ে অসৎ। ব্রিটিশ প্রশাসনের বেশিরভাগ মানুষের মতো তিনিও কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ এবং সরকারের পোষা লীগের প্রতি সমব্যথী। তারপরও তিনি লীগ নেতাদের মিথ্যাচারের প্রতি, 'হিন্দুদের ব্যাপারে তাদের ঘৃণাসংগীতের' প্রতি রীতিমতো অতিষ্ঠ। (কংগ্রেস নেতারা কেউই ভাইসরয়ের কাছে মুসলিমদের ব্যাপারে বিষোদ্‌গার করেননি।)[২০৪]

এমনকি যারা পাকিস্তান ধারণার প্রবক্তা, স্বয়ং তাদের মাঝেই এ নিয়ে মতপার্থক্য। একেকজনের মানসপটে রাষ্ট্রটির চিত্র একেক রকম। কেউ কেউ সেটাকে দেখছেন ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভেতরেই একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে। কেউ-বা পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাওয়ার বদলে বিভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রীভূত কনফেডারেশানের কথা বলছেন। (আমেরিকান সাংবাদিক ফিলিপস ট্যালবট ১৯৪০ সালে লীগের স্যার আবদুল্লাহ হারুনের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনার পৃথক পৃথক আটটি রূপ তুলে ধরেছেন, যা নিয়ে লীগের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলে।) দেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে জিন্নাহ অনড়। কিন্তু তাতে করে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিমদের নিরাপত্তা কী করে নিশ্চিত হবে, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়াকে এড়িয়ে যান তিনি। ওদিকে নেহরুর একমাত্র দাবি ব্রিটিশদের প্রস্থান। তিনি ঘোষণা করেন, ভারতের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ভারতীয়রাই ঠিক করবে। ব্রিটিশদের কোনো রকম মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে সেটা নির্ধারিত হবে ভারতের নিজস্ব গণপরিষদে।

ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য কী, সে ব্যাপারে নেহরুও হিসাবে বেশ গড়বড় করে ফেলেছিলেন। সেটাও হয়তো সমস্যার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। কারাবন্দি থাকাকালে তিনি বিশ্বপরিক্রমা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে পারেননি। তিনি শিমলায় এসেছিলেন এই বিশ্বাস নিয়ে (ফিলিপস ট্যালবটের কাছে এ ব্যাপারে বিবৃতিও দিয়েছেন) যে, লোভী আলবিয়ন তখনো তার মহামূল্যবান সাম্রাজ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে উদ্‌গ্রীব। এজন্যই ভারতীয়

[২০৪] লর্ড আর্চিবাল্ড ওয়াভেল, ভাইসরয়'জ জার্নাল (সম্পা.), পেন্ডারেল মুন, পৃ. ২৮৩।

রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে তারা; অথচ ব্রিটেন যে ততদিনে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, প্রায় দেউলিয়া, এ ব্যাপারটা নেহরু বুঝতে পারেননি। ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এখানে যে ৬০,০০০ ব্রিটিশ সেনা পাঠানো প্রয়োজন, লন্ডন সরকার তা আর কিছুতেই চাইছে না। লন্ডন বরং কোনোক্রমে কেটে পড়তে চায়। আর যদি পালাবার সময় তারা একটা অখণ্ড ভারত রেখে যেতে না পারে, তাহলে আক্ষরিক অর্থেই 'কেটে' দিয়ে যাবে দেশটাকে। নেহরুর কল্পনায় ব্রিটিশরা তখনো এক মহাশক্তিধর শত্রু, যারা নিজেদের হিজ্যামনি টিকিয়ে রাখতে চাইছে। ভারতীয় মুসলিমদের মাঝে লীগ এখন কী পরিমাণ জনপ্রিয়, সে ব্যাপারেও নেহরুর খবর নেই। এসব ভুল ধারণা মাথায় নিয়েই চাল দিতে থাকেন তিনি। ট্যালবট ভাবেন, 'নেহরু ও তার সহকর্মীরা যদি ব্রিটেনের কথিত শক্তির প্রতি মুগ্ধতা কাটিয়ে তার দুর্বলতাটা টের পেয়ে যেতেন, না জানি তখন কী রকম হতো সমঝোতার আলাপ!' এ প্রশ্ন আজও আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

শিমলা সম্মেলন শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ৯ মে। জিন্নাহ নেহরুর প্রতি শীতল মনোভাব পোষণ করলেও আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখেন। কিন্তু কংগ্রেসের দুই মুসলিম সদস্য মাওলানা আযাদ বা আবদুল গাফফার খানের একজনের সাথেও হাত মেলাননি জিন্নাহ। তিনি মুসলিম ভারতের একমাত্র মুখপাত্র হতে চান। সে যা-ই হোক, কেবিনেট মিশন ভারতের জন্য তিন স্তরের এক পরিকল্পনা ব্যক্ত করে। সেখানে থাকবে একটি দুর্বল কেন্দ্র (যেটার কাজ শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ খাতেই সীমাবদ্ধ), কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ (পাঁচ বছর পর যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে) এবং কয়েকটি গুচ্ছপ্রদেশ (এদের অন্তত একটি হবে মুসলিম-অধ্যুষিত)। লীগ কিন্তু ঠিকই এই প্রস্তাব মেনে নেয়; অথচ এর মানে হলো সার্বভৌম পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা।

কংগ্রেস এই রূপরেখা আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিয়েছে কি না, সেটা জানার জন্য অপেক্ষাই করলেন না ভাইসরয়। তিনি ১৪ জন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানান অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে কাজ করার জন্য। নেতৃস্থানীয় সব মুসলিম লীগার ও কংগ্রেসমেন সেই তালিকায় ছিলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা পক্ষকে—একজন মুসলিম কংগ্রেসম্যানকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কংগ্রেস জবাব দিলো, তারা নীতিগতভাবে এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করে; কিন্তু সরকারের সকল মুসলিম সদস্যই লীগের, এ ব্যাপারটা তারা মেনে নিতে পারছে না। জিন্নাহ স্পষ্ট বলে দিলেন, তিনি অন্য আর কোনো পথে হাঁটবেন না। এর ফলে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়, তাতে আর সামনে-পেছনে কোনো দিকেই যাওয়া যাচ্ছে না। কেবিনেট প্রতিনিধি দল এই পরিকল্পনারই

অনুমোদন দিয়ে লন্ডন রওনা হয়, কিন্তু বিবাদের কোনো সুরাহা করে দিয়ে গেল না। দেশের দায়িত্ব দিয়ে গেল এক তত্ত্বাবধায়ক ভাইসরয়ের পর্ষদের হাতে। আজীব ব্যাপারটা হলো, এই পর্ষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্যটি (বাকি সাতজন ইংরেজ) একজন মুসলিম সরকারি চাকুরে স্যার আকবর হায়দারি। তিনি কিন্তু পাকিস্তান নামক ধারণাটা সমূলে প্রত্যাখ্যান করেন।

কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত সরকার-ব্যবস্থার যে সমস্যা, সেটাও মিটমাট হওয়া বাকি। কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই নীতিগতভাবে এই পরিকল্পনা মেনে নিয়েছে। কিন্তু শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে এখনো একমত হওয়া বাকি। সম্প্রতি পুনরায় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন নেহরু। মুম্বাইতে এআইসিসির এক সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন তিনি। মিশনের প্রস্তাবনা কংগ্রেস কতটুকু মেনে নিয়েছে, তার একটা অস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন তিনি। বলেন যে, 'আমরা স্রেফ গণপরিষদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাস। এর বাইরে আর কোনোকিছুই আমরা মানতে বাধ্য নই।' তার এই বিবৃতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে চলতেই আরেক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। সাথে যোগ করেন, 'আমরা কী করব না-করব, সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।' নির্দিষ্ট করে বলেন যে, অবাধ নির্বাচন হলে গুচ্ছপ্রদেশের ব্যাপারটা হালে পানিই পাবে না; অথচ লীগের কাছে কিন্তু এটা মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ। নেহরুর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন জিন্নাহ। কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা থেকে তিনি লীগের সম্মতি প্রত্যাহার করে নেন।

নেহরু তার হঠকারি কাজের কারণে প্রবল সমালোচিত হলেন। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় সরকারে কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতার যে সাময়িক আশা দেখা দিয়েছিল, সেটা নস্যাৎ হয়ে গেল তার কথার কারণে, এমনকি লীগও এতদিনে সেই আশা দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু নেহরু যদি ১৯৪৬ সালের জুলাইয়ে নিজের মুখ বন্ধও রাখতেন, তাতেও কংগ্রেস-লীগ ঐক্য টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ঐক্য রক্ষার স্বার্থে মাওলানা আযাদ মেনে নিয়েছিলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে কোনো মুসলিম কংগ্রেসম্যান থাকার দরকার নেই। কিন্তু দলীয়ভাবে কংগ্রেস এই ব্যাপারে জিন্নাহর কাছে মাথানত করতে চাইছিল না। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার কোথাও কিন্তু বলা হয়নি যে, গুচ্ছপ্রদেশের শর্তটা আবশ্যক। তাই অর্থের দিক দিয়ে না হলেও আক্ষরিকভাবে নেহরুর বক্তব্য ওই পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণই ছিল। (যদি সাংঘর্ষিক বলে ধরেও নিই, তাহলে একই অভিযোগ লীগের ব্যাপারেও করা যায়। তাদের দাবি, উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তানের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছে।) তাই অখণ্ডতা রক্ষার

শেষ সম্ভাবনাটা ভন্ডুল করে দেওয়ার মূল হোতা হিসেবে নেহরুর ঘাড়ে দায় চাপানো বাড়াবাড়ি। তার জীবনীকার এম. জে. আকবর বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে জিন্নাহর খেয়ালে আর ব্রিটেনের খামখেয়ালে'—নেহরুর বেখেয়ালে নয়।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে কিছু নতুন মুখের সংযোজন ঘটান দলটির নতুন সভাপতি (যাদের দুজন আবার তুলনামূলক তারুণ্যে উদ্দীপ্ত নারী : কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং রাজকুমারী অমৃত কাউর)। এই নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কমিটি ১৯৪৬ সালের ৮ আগস্ট ঘোষণা করে, কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা তারা মেনে নিয়েছে, তবে শাখাগত বিষয়গুলো মেনে নিয়েছে নিজেদের ব্যাখ্যা অনুসারে। কিন্তু জিন্নাহর অভিমান ভাঙিয়ে খেলায় ফিরিয়ে আনার জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়ে একটা সমঝোতায় আসার জন্য নেহরু (মুম্বাইতে জিন্নাহর বাসায়) তার সাথে দেখা করেন। কিন্তু জিন্নাহ একগুঁয়ে : পাকিস্তান আদায় করেই ছাড়বেন তিনি। এই দাবিকে সফল করতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'ডিরেক্ট অ্যাকশান ডে' ঘোষণা করে মুসলিম লীগ। হাজার হাজার মুসলিম লীগার রাস্তায় নেমে এসে সহিংসতা, লুটপাট আর দাঙ্গাহাঙ্গামার রতি উৎসব লাগিয়ে দেয়। সংঘাতে নিহত হয় ১৬,০০০ নিরপরাধ মানুষ, বিশেষত কলকাতায়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী অলস চেয়ে থাকল। মনে হলো যেন ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্যের সাবেক রাজধানী উত্তেজিত জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহরে তিন দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের পর অবশেষে হস্তক্ষেপ করল সেনাবাহিনী। কিন্তু এই হত্যালীলা ও ঘৃণার ফলে জাতির মানসপটেও কিছু একটা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছে। মিলন আর হবে না কোনো দিন।

তবু এক সপ্তাহ পর ওয়াভেল ও নেহরু বসে ভারতের জন্য একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আলাপ করেন। তাতে থাকবেন পাঁচজন 'বর্ণ হিন্দু', পাঁচজন মুসলিম, একজন অবদমিত বর্ণ সদস্য এবং তিনজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। জিন্নাহ নিজের প্রতিনিধিদের মনোনীত করতে পারবেন, কিন্তু কংগ্রেস কাদের মনোনয়ন দেবে, সে ব্যাপারে তার কোনো কথা থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, কোনো জাতীয়তাবাদী মুসলিমকে মনোনয়ন দেওয়া কংগ্রেসের ইখতিয়ার। লীগ যদিও যোগ দেওয়ার ব্যাপারে দোনোমনো করছিল, তবুও একটা অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করা হয়। এর কংগ্রেস সদস্যরা শপথ নেন ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর। ৭ সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত এক ভাষণে নেহরু বলেন, এ এক দীর্ঘ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি : 'বহুকাল আমরা নীরব দর্শক হয়ে ছিলাম, ছিলাম অন্যদের খেলার পুতুল। এখন সামর্থ্য আমাদের জনগণের

হাতে। আমরা ইতিহাস গড়ব নিজেদের পছন্দমতো।'

কিন্তু ব্রিটিশরা লীগের প্রতি এবং বাংলায় লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন অক্ষুণ্ন রাখে। এই সরকারই ডিরেক্ট অ্যাকশান ডে'র নারকীয়তা সংঘটনের জন্য দায়ী। কলকাতায় খুনাখুনির ফলে বাংলার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে ওয়াভেলের উদ্দেশে চিঠি লেখেন নেহরু। বিরক্তিসহকারে বলেন, 'হাজার হাজার মানুষ কচুকাটা হয়ে গেলেও যদি আমাদের অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু না-ই করার থাকে..., তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে লাভটা কী?' কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফরে যাওয়ার বায়না ধরে নেহরু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। প্রদেশটি কংগ্রেস-শাসিত হলেও সেখানে বিপুলসংখ্যক মুসলিমের বসবাস। লীগের আয়োজনে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে পাথর ছুড়ে ক্ষতবিক্ষত করে নেহরুকে। ব্রিটিশরা তা না দেখার ভান করে থাকে। এরচেয়েও গুরুতর ব্যাপার আছে। এই ভরাডুবির মানে হলো, হিন্দু নেহরুকে জীবনেও জাতীয় নেতা হিসেবে মেনে নেবে না এই প্রদেশের মুসলিম জনতা।

ওদিকে লীগ যেন অন্তর্বর্তী সরকারে আসতে রাজি হয়, সে উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা কংগ্রেসকে আরও বেশি মাথা নোয়াতে চাপ দিতে থাকে। এতে করে মুসলিম সদস্য মনোনীত করার অধিকার ত্যাগ করতে রাজি হন গান্ধি ও নেহরু। জিন্নাহ এবার মান ভাঙেন। নেহরুর সাথে সমঝোতা আলাপে বসতে এখন তিনি রাজি। কিন্তু আলাপ এগোনোর পর জিন্নাহ আবারও কংগ্রেসকে চাপাচাপি করতে থাকেন, যেন তারা লীগকেই ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নেহরু তাতে অস্বীকৃতি জানান। বলেন যে, এটা কংগ্রেসের বহু জাতীয়তাবাদী মুসলিমের সাথে বেঈমানি করার শামিল। এই কাজ তার নিজের এবং দেশের আত্মসম্মানের পরিপন্থি। ভাইসরয় তখন কংগ্রেসের চোখের সামনে থেকে সটকে পড়েন, সরাসরি সমঝোতা করেন জিন্নাহর সাথে। তার মনোনীত পাঁচজন মুসলিম এবং একজন অবদমিত বর্ণের সদস্যকে মেনে নেন তিনি। মুসলিম লীগ ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, তারা অন্তর্বর্তী সরকারে আসবে।

আসলে লীগ এই কাজ করেছে সরকারকে ভেতর থেকে ভেঙে দেওয়ার জন্য। মনোনীতরা শপথ নেন ২৬ তারিখে। কিন্তু এর আগেই বিভিন্ন বক্তব্যে তারা ঘোষণা করেন, তাদের আসল উদ্দেশ্য পাকিস্তান সৃষ্টি করা। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক মিটিংয়ের আগে লীগ সদস্যরা নিজেরা আলাদা মিটিং করেন। মন্ত্রিসভায় যখন বসেন, তখন জোটের অংশ হিসেবে কাজ না করে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। তুচ্ছ থেকে গুরুতর প্রতিটা বিষয়ে সরকারের কাজে বাধা দিতে

থাকেন লীগ সদস্যরা। বিরোধিতা করেন কংগ্রেসের প্রত্যেকটা উদ্যোগ ও প্রস্তাবের। ওদিকে দলটির বাকি অংশ সারা দেশে সহিংসতা উসকে দেওয়া অব্যাহত রাখে। নভেম্বরের শুরুর দিকে দাঙ্গা বেঁধে যায় বিহারে (গান্ধি অশান্ত প্রদেশে হেঁটে হেঁটে একাই শান্তি ফিরিয়ে আনেন)। জিন্নাহ ১৪ নভেম্বর ঘোষণা করেন, পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে হত্যাযজ্ঞ থামবে না। ব্রিটিশরা ডিসেম্বরে লন্ডনে সংলাপ করে সিদ্ধান্ত নেয়, কংগ্রেসকে আরও চাপ দিতে হবে। লীগ যেন গণপরিষদে আসতে রাজি হয়, সেজন্য আরও মাথা নোয়াতে হবে কংগ্রেসের। মুম্বাই সংবাদ সম্মেলনের আঘাত থেকে এখনো সেরে না-ওঠা নেহরু যতটা পেরেছেন, নমনীয় হয়েছেন। কিন্তু ব্রিটিশদের কাজকারবার দেখে জিন্নাহ বুঝতে পারেন, তার দলের এখন একাদশে বৃহস্পতি চলছে। তাই দাবিদাওয়া আরও বাড়িয়ে দেন তিনি। নেহরুর মনে হলো, ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপে নতজানু নীতির ব্যর্থতা থেকে ব্রিটিশরা কিছুই শেখেনি।

গণপরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঠিক করা হয় ৯ ডিসেম্বর। লীগ তাতে অংশ নেয়নি। কিন্তু উপস্থিত সদস্যরা সাবধান থাকেন, যেন জিন্নাহকে খেপিয়ে তোলার মতো কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। তবুও ১৯৪৭ সালের ২৯ জানুয়ারি মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাবনা পাশ করে। এতে তারা ব্রিটিশ সরকারকে আহ্বান জানায়, যেন কেবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ঘোষণা করা হয়, এবং গণপরিষদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস সদস্যরা পালটা দাবি করেন, লীগ সদস্যরা যেহেতু পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেহেতু তাদের পদত্যাগ করা উচিত। এরকম মাছবাজারের মতো অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, তারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত থেকে চলে যাবে, যত যা-ই হোক না কেন। আর ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি করার জন্য ওয়াভেলের জায়গায় আরেকজনকে বসানো হবে।

এই অচলাবস্থার মধ্যে আগমন করেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রবাহিনীর বিদায়ি সর্বোচ্চ অধিনায়ক হিজ এক্সিলেন্সি রিয়ার অ্যাডমিরাল রাইট অনারেবল লর্ড লুইস ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ভিক্টোর নিকোলাস, ভিসকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন অব বার্মা, কেসিজি, পিসি, জিএমএসআই, জিএমআইই, জিসিএফও, কেসিবি, ডিএসও। রাজরক্তের অধিকারী কুলীন অভিজাত (রানি ভিক্টোরিয়া তার প্রপিতামহী, সে হিসেবে বর্তমান রাজা তার জ্ঞাতিভাই) মাউন্টব্যাটেনের আরও কিছু গুণ হলো, তিনি অকর্মা, মুগ্ধকর, গা-ছাড়া ও আবেগতাড়িত। তার নিজের চিফ অব স্টাফ জেনারেল ইসমে স্বীকার করেছেন, 'জরুরি ভিত্তিতে তার

সামনের চাকায় ব্রেক লাগানো দরকার।'[২৩৫]

আফসোস, ওই ব্রেকটাই ভারতের তখন দরকার ছিল। কারণ, নাক বরাবর বিপর্যয়ের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে দেশটি।

দুটি আত্মসমর্পণ

ব্রিটিশরা ছেড়ে দেয় এবং নেহরু মেনে নেন এখন, এমনকি নেহরুর কাছেও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কোনো-না-কোনোরূপে পাকিস্তান সৃষ্টি করতেই হবে। কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের কোনো সরকারে কাজ করবে না লীগ। তাও তিনি লীগ নেতাদের গুঁতিয়ে নতুন বন্দোবস্তের ব্যাপারে আলোচনায় বসানোর চেষ্টা করেন। এখনো তার আশা, এই আলোচনার ফলে পুরোপুরি দেশভাগ হওয়াকে কোনোক্রমে ঠেকানো যাবে। কিন্তু সারা উত্তর ভারতজুড়ে যেহেতু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অব্যাহত আছে, সেহেতু মার্চের শুরুতেই এই আশাও ক্ষীণ হয়ে আসে। গান্ধি এখনো দেশভাগের সম্ভাবনা মাথাতেই আনতে চান না। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই পাতিল এবং নেহরু উভয়ই একমত হলেন, কংগ্রেসের সামনে আর উপায় নেই। পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাজন মেনে নিতেই হবে। আরেকটা বিকল্প ছিল অর্ধ-সার্বভৌম পাকিস্তান-সহ একটা ঢিলেঢালা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এই প্রস্তাব যেমন লীগ মানবে না, তেমনই বাকি ভারতের জন্যও সেটা কোনো টেকসই সরকার-ব্যবস্থা হবে না। মাউন্টব্যাটেন এসে পৌঁছান ১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ। ততদিনে গুটির চাল দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি এসে স্রেফ দ্রুতগতিতে খেলাটা শেষ করে দেন।

মাউন্টব্যাটেন পরে দাবি করেছিলেন, তিনি ব্যক্তিত্বের জোরে শাসন করেছেন। আসলেই তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বড়সড় ভূমিকা রাখে এতে। একদিকে তিনি ছিলেন মনোযোগী, উদ্যমী, মুগ্ধকর ও বর্ণবাদমুক্ত, সে হিসেবে প্রায় প্রত্যেক পূর্বসূরির চেয়ে অনন্য, আরেক দিকে তিনি অদ্ভুত রকমের অকর্মা, বিপজ্জনক রকমের অধৈর্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সহজেই বর্তে যাওয়া ব্যক্তি। তার ভাইজরেইন এডুইনা ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ সহচরী। ভারতের বিষয়-আশয়ে সত্যিকার অর্থেই আগ্রহী ছিলেন তিনি। তাদের বিয়েটা না কৌতূহল-জাগানিয়া। এডুইনার ঘনঘন পরকীয়ার খাসলত আছে, যেটা আবার মাউন্টব্যাটেন ক্ষমা করে দেন। বলা হয়, নেহরুর প্রতি এডুইনার আলগা পিরিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের কিছু সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে এই ব্যাপারটা। নেহরু

[২৩৫] হাজারি, মিডনাইট'স ফিউরিজ, পৃ. ১০২।

আর এড্‌উইনার মাঝে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতিতে সেটার থোড়াই প্রভাব পড়েছে।

এরই মাঝে ভারতে সরকারের ভাঙন ত্বরান্বিত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও খুনোখুনি এখন দৈনিক ঘটনা। জিন্নাহও অন্য কোনো শর্তে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করতে পুরোপুরি নারাজ। তার একমাত্র শর্ত, ভারতের হিন্দু ও মুসলিমদের প্রতিনিধি হবে যথাক্রমে কংগ্রেস ও লীগ। ব্রিটিশরা তার এই অবস্থান অর্জনে বেশ উৎসাহ জোগায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো ছিলেন লীগপন্থি। তিনি সেখানকার কংগ্রেস সরকারকে অবিবেচকের মতো চাপ দিতে থাকেন, বলেন এই মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রটি লীগের হাতে ছেড়ে দিতে; অন্যথায় পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব নয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের অচলাবস্থা কাটছেই না। এমতাবস্থায় মাউন্টব্যাটেন ও তার উপদেষ্টারা মিলে 'প্ল্যান বলকানে'র ছক আঁকেন। এই পরিকল্পনামতে, কেন্দ্রীয় সরকারের বদলে বরং প্রদেশগুলোর হাতে আলাদা করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। তারা চাইলে অন্য প্রদেশের সাথে মিলে যেতে পারে, চাইলে আলাদাও থাকতে পারে। লন্ডনে প্ল্যান বলকান নিয়ে পর্যালোচনা (ও সম্পাদনা) চলতে থাকে, কিন্তু নেহরুকে রাখা হয় সম্পূর্ণ অন্ধকারে। চিন্তা করুন, এমন এক সাম্রাজ্য এই কাজ করছে, যারা কিনা ভারতকে অখণ্ডতা ভিক্ষা দেওয়ার দাবি করে। মাউন্টব্যাটেন অবশেষে নেহরুকে লিখিত পরিকল্পনাটা দেখান ১০ মে রাতের বেলা। ক্রোধে অপমানে তেতে-থাকা নেহরু রাত ২টায় তার বন্ধু কৃষ্ণ মেনোনের কক্ষে দৌড়ে যান রাগ ঝাড়ার জন্য। এই পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে জিন্নাহর প্রস্তাবের চেয়েও খারাপ হতো অবস্থা। নেহরু তার লেখালেখিতে যে ভারতের ছবি এত দারুণভাবে এঁকেছেন, সেটা দুই টুকরার বদলে হতো কয়েক টুকরা। বলকানায়ন[২৩৬] হয়ে গেলে অকল্পনীয় আকার ধারণ করত গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা। ব্রিটিশ রাজ চলে যাওয়ার সময় বিভিন্ন প্রদেশ, প্রিন্সলি স্টেইট আর বিচিত্র সব রাজনৈতিক শক্তি যেভাবে ক্ষমতার জন্য ধস্তাধস্তি করছিল, তাতে এমনটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশে এক দীর্ঘ, আবেগঘন এবং কিছু জায়গায় অসংলগ্ন একটি প্রতিবাদলিপি পাঠান নেহরু। এর ফলে পরিকল্পনাটির মৃত্যু ঘটে। মে

---

[২৩৬] বলকান অঞ্চলের রাজনৈতিক ও জাতিভিত্তিক বিভাজনের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। ভারতের ক্ষেত্রেও তেমনটাই হতে যাচ্ছে ধরে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন তার পরিকল্পনার নাম দেন 'প্ল্যান বলকান'। বলকানের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ হলো আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, কসোভো, মন্টেনেগ্রো, উত্তর ম্যাসিডোনিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া, তুর্কিয়ে।—অনুবাদক।

মাসে দেশে যে অস্থিরতা শুরু হয়, নেহরুর চোখে তা ছিল আগ্নেয়গিরিসুলভ। কঠিন ও তিক্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় চলে এসেছে, আর তিনি সেগুলোর জন্য প্রস্তুত। মাউন্টব্যাটেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট জেলায় গণভোটের প্রস্তাব দেন। নেহরু নিতান্ত অনিচ্ছায় তাতে সম্মত হন। সিন্ধুর হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর ব্যাপারে একই পদ্ধতি প্রয়োগের যে পালটা প্রস্তাব কংগ্রেস দিয়েছিল, সেটাও ছেড়ে দেন। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে এতদিন ধরে কংগ্রেস সংগ্রাম করে এলো, সেটার বদলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভেতর ভারতের ডমিনিয়ন মর্যাদা লাভের ব্যাপারেও রাজি হয়ে যান নেহরু।

ব্রিটিশরা যেহেতু জিন্নাহকে তার অপছন্দের প্রতিটি প্রস্তাবে ভিটো প্রদানের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে, সেহেতু দেশভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া নেহরুর তেমন কিছু করার ছিল না। তৎকালীন অন্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে এরচেয়ে ভালো কোনো বুদ্ধি ছিল—এরকম ইঙ্গিত তাদের কোনো লেখা বা স্মৃতিকথা থেকেও পাওয়া যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধি। তিনি মাউন্টব্যাটেনের কাছে গিয়ে পরামর্শ দেন, জিন্নাহর হাতে গোটা দেশের নেতৃত্ব অর্পণ করে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করা হোক। নেহরু ও পাতিল এই বুদ্ধিকে ঠ্যালা মেরে পাশে সরিয়ে দেন, আর মাউন্টব্যাটেনও ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে নেননি।

সন্দেহ নেই, মাউন্টব্যাটেন যেন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কাজ করছিলেন। পরিকল্পনার চেয়ে অনেক আগের একটা তারিখ বেছে নেন—১৫ আগস্ট। এই তারিখটা ইচ্ছা করে বেছে নিয়েছেন তিনি। এই দিনেই জাপানিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ অধিনায়ক মাউন্টব্যাটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভারতীয় নেতারা চোখ বন্ধ করে তা মেনে নেন। নেহরু বুঝে গেছেন যে, জিন্নাহ সারা দেশ ভস্ম করে দিতে সক্ষম। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এতদিনে যা-কিছু অর্জন করেছে, পারলে তার সবই ধ্বংস করে দেবেন তিনি। তাই দেশ ধ্বংস হওয়ার চেয়ে বরং ভাগ হয়ে যাক, সে-ই ভালো। নেহরু তার দলকে বলেন, 'নিরানন্দ মনে আমি এসব প্রস্তাব মেনে নিলাম, যদিও আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই যে, এটাই সঠিক পথ।' মন আর মস্তিষ্কের পার্থক্য বড়ই মর্মস্পর্শী, এবং তা অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

৩ জুন নেহরু, জিন্নাহ এবং শিখ নেতা বলদেব সিংহ ঘোষণা সম্প্রচার করেন, তারা দেশভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে আবারও নেহরুর সর্বোত্তম রূপটা বেরিয়ে আসে। তিনি বলেন, 'আমরা এক মহান উদ্দেশ্যে কাজ-করে-চলা কতিপয় ক্ষুদ্র মানুষ। আজকের পৃথিবীতে ও ভারতে

কিছু প্রতাপশালী শক্তি কাজ করে চলেছে...। [আমি আশা করি] যে, এভাবেই বরং আমরা আরও দ্রুততর সময়ে অখণ্ড ভারত অর্জন করতে পারব। এর ভিত্তি হবে সবলতর ও নিরাপদতর...। যে ভারত ভূগোল, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের, যে ভারত আমাদের অন্তর ও হৃদয়ের, সে ভারত কখনো বদলে যাবে না।' কিন্তু আসলে এগুলোর পরিবর্তন সম্ভব : ভূগোল কর্তিত হয়ে যাবে, ইতিহাসের ভুল পাঠ হবে, ঐতিহ্য অস্বীকার করা হবে, ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যাবে হৃদয়-অন্তর।

লীগের পাকিস্তান দাবির ফলে যেসব দাঙ্গা ও সহিংসতা সারা দেশকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল, নেহরু ভেবেছিলেন দাবিখানা মেনে নিলে সেসব বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তার ভাবনা ভুল। হত্যা ও গণ উচ্ছেদের ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। ব্রিটিশরা তাদের স্বদেশভূমে যে রেখা এঁকে দিতে চলেছে, সেটার 'সঠিক' পাশে থাকবার জন্য উন্মাদের মতো দৌড়াদৌড়ি শুরু করে মানুষ। ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার উদ্‌বোধন করে যেসব হিংস্রতা সংঘটিত হয়, তাতে মারা যায় ১০ লাখের বেশি মানুষ এবং বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। কত সম্পদ যে ধ্বংস আর লুটপাট হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সীমারেখা মানেই জীবনরেখা। নেহরু এটাকে ভেবেছিলেন ভারতের কিছু অংশের সাময়িক বিভাজন, কিন্তু আদতে সেটা হয়ে দাঁড়ায় দুটি পৃথক ও শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি। এরা পরস্পরের সাথে চার চারটে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে, সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত হয়ে স্থবির হয়ে থাকবে কয়েক দশক পর।

প্রতারণার অনুভূতি একা গান্ধিই অনুভব করেননি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস সরকারও তার দলের কাছে বিমাতাসুলভ আচরণ পায়। সেখানকার গণভোট বর্জন করে তারা। পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জয়ী হয় মোট ভোটারের মাত্র ৫০.৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে (কিন্তু যতগুলো ভোট পড়েছে, সেটার প্রায় ৯৯ শতাংশ)। মাউন্টব্যাটেন ভাবতেন, তিনি দুই নতুন ডমিনিয়নের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কিছুকালের জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন, তাই দুই জায়গার গভর্নর-জেনারেল তিনিই থাকবেন। কোনো ভদ্রতার ধার না ধেরে জিন্নাহ তাকে বলেন যে, লীগের নেতা হিসেবে তিনি একাই পাকিস্তানের শাসনভার হাতে নেবেন। বিদায়ি ভাইসরয় যেন শুধু ভারতের নামমাত্র অধিকর্তা হিসেবেই সন্তুষ্ট থাকেন।

উত্তর ভারতের বিশাল অংশে তখনো দাঙ্গা ও রক্তপাত চলছে। এসব ডামাডোলের মাঝেই নেহরু নিশ্চিত করতে চাইলেন, যাতে এই মাহেন্দ্রক্ষণে কোনো সংকীর্ণ মনের কাজকারবার না ঘটে। স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে

ইউনিয়ন জ্যাক[২৩৭] নামিয়ে ফেলার কথা ছিল। ব্রিটিশদের যেন মনঃকষ্ট না হয়, সেজন্য নেহরু এই অংশটা বাদ দিয়ে দেন। ভারতীয় তেরাঙ্গা উত্তোলন করা হয় সূর্যাস্তের ঠিক আগে দিয়ে। পতাকাদণ্ডে যখন তা পতপত করে উড়ছে, বর্ষাশেষের রংধনু উঁকি দিলো তার পেছনে, যেন স্বর্গ থেকে আলোকিত অভিবাদন। মাঝরাতের ঠিক আগে দিয়ে নেহরু গণপরিষদে দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দেন, তা ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত ভাষণ :

বহু বছর আগে আমরা ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছিলাম। আজ সময় এসেছে আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করার। হয়তো পুরোপুরি নয়, কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। কাঁটা যখন মাঝরাত ছুঁবে, যখন পৃথিবী ঘুমিয়ে রবে, ভারত জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার স্পর্শে। এমন এক মুহূর্ত এসেছে, যা ইতিহাসে বিরল। আমরা পুরাতন থেকে নতুনে পদার্পণ করব, একটি যুগের অন্ত হবে, আর বহুকাল অবদমিত এক জাতির আত্মা খুঁজে পাবে কথা বলার ভাষা।

যে ব্রিটিশদের রাজ মধ্যরাতে শেষ হতে চলেছিল, তাদের প্রতি কোনো রূঢ় কথা ছিল না এই ভাষণে। নেহরু আরও যোগ করেন, 'এখন বিদ্বেষ বা দোষারোপের সময় নয়। আমাদের স্বাধীন ভারতের অট্টালিকা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে বসবাসের অধিকার তার সকল সন্তানের।'

ভারত ত্যাগ, পাকিস্তান সৃষ্টি, স্বাধীনতা এবং দেশভাগের দিকে এই চূড়ান্ত উদ্‌ভ্রান্ত দৌড়ে ব্রিটিশদের কৃতিত্ব নেই বললেই চলে। যুদ্ধের আগে তারা ভারতের ক্ষমতা ছাড়ার কথা মাথাতেও আনেনি, তাও আবার এত দ্রুত। ব্রিটিশ রাজের শেষ বছরগুলোতে নির্বাচিত সরকারের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। তাতে বোঝা যায়, ব্রিটিশরা কোনোকালেই তাদের দাবিতে সৎ ছিল না। আদৌ তারা ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের জন্য কোনো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে দিয়ে যেতে চায়নি।

কংগ্রেস মন্ত্রীরা যখন পদত্যাগ করেন, ব্রিটিশরা কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তে তাদের জায়গায় অনির্বাচিত মুসলিম লীগারদের বসিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই এমনসব কাজের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়, যেগুলো কিনা ভারতীয়দের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম লীগ একটা মুসলিম আসনেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়নি, ফলে ব্যর্থ হয় ব্রিটিশদের 'ভাগো আর শাসো' নীতি। তাই ব্রিটিশরা যেসব ক্ষমতা আংশিকভাবে ছেড়ে দিয়েছিল, সেগুলো এই সুযোগে আবার হাত করে নেয়। একইসাথে সব রকমের চেষ্টা-

[২৩৭] যুক্তরাজ্যের পতাকা।—অনুবাদক।

চরিত্র করতে থাকে, যাতে লীগকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আসল বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ফায়দা লুটতে মুসলিম লীগকে যতভাবে সাহায্য করা সম্ভব, তার সবই করেছে তারা। ভোটের মাধ্যমে লীগ যেসব প্রভাব-প্রতিপত্তি আদায় করতে পারেনি, ব্রিটিশরা সেগুলো তাদের মুখে তুলে খাইয়ে দেয়; সমর্থন আদায়ে সাহায্য করে। পুরোটা সময় ধরে তাদের আসল প্রতিদ্বন্দ্বীদের আটকে রাখে কারাগারের প্রকোষ্ঠে।

এই সবই ছিল সরকারি নীতির অংশ। ১৯৪০ সালে এসেও কোনো দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তি ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো বাসনা প্রকাশ করেননি। লন্ডনের কর্তারাও না, নয়াদিল্লির তারাও না। চরকায় কাটা পোশাকপরা একদল জাতীয়তাবাদীর হাতে তারা ভারতকে তুলে দেবেন? উঁহু! কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর এখন বাগ্‌ধারাটির অর্ধেক শুধু সম্ভব : ছয় বছর যাবৎ রক্তাক্ত, বোমাক্রান্ত ও আহত ব্রিটেন এখন শুধু ভাঙতে পারবে, কিন্তু শাসন আর করতে পারবে না।

ব্রিটিশরা জার্মান বোমাবর্ষণে আতঙ্কিত, বহু পরাজয়ের ফলে নিরুদ্যম, অজস্র সেনার কারাবন্দিত্বে হতাশাক্লিষ্ট, ভারতীয় সৈনিকদের দলত্যাগ ও ভারতীয় নাবিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহে প্রকম্পিত, ১৯৪৫-৪৬ সালের রেকর্ড শৈত্যপ্রবাহে কম্পনরত, যুদ্ধপরবর্তী কয়লা-সংকটে বিদ্যুদ্‌বিভ্রাট এবং কারখানা বন্ধে পঙ্গু। ঘরের ভেতর যখন এত চরম সংকট, তখন অত দূরের একখানা সাম্রাজ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো মন-মেজাজই তাদের নেই। তারা এক অর্থে দেউলিয়াও বটে। আমেরিকার দেওয়া ঋণে অর্থনীতি কোনোক্রমে নাক জাগিয়ে রেখেছে। সেসব তো শোধ করতে হবেই, এমনকি ভারতের কাছ থেকেও বড়সড় হাওলাত নেওয়া লেগেছে। বিদেশি ভূমি শাসন এখন আর যুগোপযোগী বা জনপ্রিয় নয়। বেরিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র বাস্তব সমাধান। প্রশ্ন হলো, যাওয়ার সময় পেছনে কী রেখে যাবে—একটা ভারত, না দুই বা ততোধিক টুকরা?

যুদ্ধের আগে ও পরে ব্রিটিশদের কৌশল ছিল, তাদের চলে যাওয়ার সময় আসতে আসতে ভারতের অখণ্ডতার সম্ভাবনা যেন মোটামুটি ক্ষীণ হয়ে যায়। আমরা দেখেছি, এতে আরও শক্তি জুগিয়েছে কংগ্রেসের ভুল পদক্ষেপ। পূর্ণ সুবিধা আদায় করে নেওয়ার বদলে উলটো জেলে চলে গিয়েছিলেন সদস্যরা। ডিভাইড এট ইম্পেরা বেশ ভালোমতো কাজ করেছে : দুইখানা ভারত হবে এবার।

দুই জাতিকে ভাগ করার দায়িত্ব পড়ে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের ঘাড়ে।

এই আইনজীবী আগে কখনো ভারতে আসেননি। এখানকার ইতিহাস, সমাজ বা ঐতিহ্য সম্পর্কে তার জ্ঞান শূন্য। র‍্যাডক্লিফ ৪০ দিনে তার মানচিত্র এঁকে সারেন। রেখা টেনে ভাগ করেন বিভিন্ন প্রদেশ, জেলা, গ্রাম, বাড়ি আর হৃদয়। তারপর হুটহাট বাড়ি চলে যান, আর কখনো ভারতে ফিরে আসেননি। অ্যালেক্স ফন টুনযেলম্যান বলেছেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ঘটেনি, স্রেফ পতন হয়েছে।'[২৩৮] ব্রিটিশরা ত্বরা করে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যেসব প্রাণনাশ হবে, সেগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি তারা।

দেশভাগের করুণ পরিণতি নিয়ে এত এত লেখালেখি হয়ে গেছে যে, এর ধ্বংসাত্মক চিত্র তুলে ধরার জন্য আর একটা শব্দও যোগ করার চেষ্টা বৃথা। শুধু ব্রিটিশ মুসলিম গবেষক ইয়াসমিন খান তার সুপরিচিত ইতিহাস-গ্রন্থ দ্য গ্রেট পার্টিশান : দ্য মেইকিং অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান-এ যা লিখেছেন, সেটা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন, দেশভাগ 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গর্দভগিরির সাক্ষী। এতে গোষ্ঠীগত বিবর্তন থমকে গেছে, ইতিহাসের গতিপথ বিকৃত হয়ে গেছে এবং এমনসব সমাজকে সহিংস রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে, যেগুলো হয়তো অন্যথায় ভিন্নতর ও অজানা কোনো পথে হাঁটতে পারত।'[২৩৯]

তাই ব্রিটেন ভারতকে রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও গণতন্ত্র দান করেছে—এহেন আত্মম্ভরী দাবি গলাধঃকরণ করা বেশ কষ্টকর।

হ্যাঁ, ব্রিটেন হরেক রকমের রাষ্ট্রকে একটা সাধারণ আইন ও প্রশাসনের অধীনে এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু সেইসাথে সাধন করেছে অনেকগুলো বিকৃতিও (আগের অধ্যায়গুলোতে দেখানো হয়েছে)। এসবের পেছনে দায়ী ব্রিটিশ শাসনের ভণ্ডামিপূর্ণ প্রকৃতি। সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক এক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ থেকে ভারতীয়দের যে-কোনো মূল্যে বঞ্চিত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল তারা।

হ্যাঁ, ব্রিটেন কথিত স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের জন্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু এও নিশ্চিত করেছে, যেন সংবাদপত্রের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণের শেকল পরানো থাকে। হ্যাঁ, ব্রিটেন প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় ব্যবস্থার বীজ বপন করেছে বটে, কিন্তু ক্ষমতার সারনির্যাসটুকু ধরে রেখেছিল নিজেদের হাতে।

বহু ব্রিটিশ ভাবতে পছন্দ করে যে, তারা স্বৈরতন্ত্র ও অন্যায় শাসনে নিষ্পেষিত এক দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছে। কিন্তু আসলে তারা এমন এক ভূমিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে, যেটি নানা কিসিমের রাজার

---

[২৩৮] টুনযেলমান, ইন্ডিয়ান সামার, ২০০৭।
[২৩৯] ইয়াসমিন খান, দ্য গ্রেট পার্টিশান, নিউ হাভেন: ইয়েইল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭।

অধীনেও উক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল। আধ্যাত্মিকতা ও প্রশাসনের মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দ্বিমত ও বিতর্ক করাটা ছিল এই ভূমির ঐতিহ্য।[২৪০]

হ্যাঁ, ভারত এক সজীব বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বটে। অবশ্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই কাজে বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। আর পাকিস্তান তো আনুষ্ঠানিকভাবে ও অগণতান্ত্রিকভাবে তার অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যই করে, এমনকি বেসামরিক সরকারের আমলেও। কিন্তু ভারতের সাত দশকের সমৃদ্ধ গণতন্ত্র চর্চার কৃতিত্ব মোটেও ব্রিটিশ শাসনের নয়। অক্সফোর্ড বিতর্কে আমি বলেছি যে, একটা জাতিকে ২০০ বছর ধরে দমন, শোষণ, কারাবন্দি, নিপীড়ন ও পঙ্গু করার পর সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে খুশিতে নিজের পিঠ চাপড়ানো একটু বেমানান।

পরিশেষে, সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেখানে সারাটা সময়জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও ধর্মীয় শত্রুতা সৃষ্টি করল, তার ফলে যখন দেশভাগের ভয়াল ঘটনাটি ঘটল, এরপর আর রাজনৈতিক অখণ্ডতা নিয়ে হই-হুল্লোড় করা কী করে সম্ভব? ভারত নামক একটি একক রাজনৈতিক সত্তা গড়ে তোলাটাই যদি ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় অর্জন হয়ে থাকে, অশোক থেকে আকবর পর্যন্ত সকল দূরদর্শী সম্রাটের স্বপ্ন যদি তারা আসলেই বাস্তবায়িত করে থাকে, তাহলে তাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা নিশ্চয়ই সেই আদি ও অকৃত্রিম ব্রেক্সিট। গোটা একটা ভূমিকে কেটে টুকরো করে তারপর সেখান থেকে দৌড়ে এক্সিট নিয়েছে ব্রিটিশরা। অথচ তাদের সেই ভূমি শাসন করার উদ্দেশ্য নাকি ছিল নেহাত কল্যাণ। দশ লাখ মানুষ মারা পড়েছে, এক কোটি ত্রিশ লাখ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, শত কোটি রুপির সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, আর বিধ্বস্ত ভূমির পুরোটা জুড়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে ঘৃণার তপ্ত আগুন। ব্রিটিশ শাসনের করুণ সমাপ্তিটাই তাদের গোটা শাসনামলের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

---

[২৪০] এই যুক্তির ভিত্তি অমর্ত্য সেন, দি আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান, নিউ ইয়র্ক: ফারার, স্ট্রস অ্যান্ড জিরুক্স, ২০০৫।

০৫

আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের গল্প

কতিপয় ইংরেজপ্রেমী ভারতীয়সহ অনেকের চোখেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মৌলিকভাবে ভালো জিনিসই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের যুগ চলছিল। সেসময় 'আলোকায়িত স্বৈরতন্ত্রে'র একটা ধারণা চাউর হয়। কারও কারও ধারণা, ভারতে ব্রিটিশ শাসন ছিল এই ধাঁচের। অর্থাৎ, ব্রিটিশরা হয়তো ভারতীয়দের গণতন্ত্র ভোগ করতে দেয়নি, কিন্তু প্রজাদের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে মহানুভবতা ও প্রজ্ঞা-সহকারেই শাসন করেছে তারা। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের এক বিখ্যাত উক্তি—'সবকিছুই জনগণের জন্য, কোনোকিছুই জনগণের দ্বারা নয়।' ব্রিটিশরা যেন সেটারই বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য ভারতীয়দের কিছুই করতে দেয়নি, কিন্তু নিজেরাই তাদের হয়ে সব করে দিয়েছে।

এই দাবি অতি-সরলতা নাকি ধান্দাবাজি, তা বোঝা কঠিন। তাই ব্রিটিশরা আসলেই কীভাবে ভারত শাসন করেছে, তার কয়েকটা উদাহরণ নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। কারণ, এসব উদাহরণ থেকেই বয়ানটি ভুল প্রমাণিত হবে। সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো ব্রিটিশদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষগুলো, যেগুলো তারা ঠিকমতো মোকাবিলাও করেনি। তারপর আছে নির্বাসন ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমের মাধ্যমে ভারতীয়দের জোরপূর্বক দেশান্তর করা। আরও আছে ভিন্নমতের ওপর পাশবিক দমন-পীড়ন। আমরা এই প্রতিটি উদাহরণই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

মচ্ছব ও মন্বন্তর

ব্রিটিশ ও 'অনাহারী ভারত' ব্রিটিশদের উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব যতই বাড়তে থাকে, ততই লাখে লাখে ভারতীয় মানুষ একদম বেহুদাই মারা যেতে থাকে দুর্ভিক্ষে। ব্রিটেন নির্দয় হাতে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা চাপিয়ে দিয়েছে, তার ফলে ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটি ভারতীয় অনাহারে মারা যায় একদম বিনা

দোষে। একে বলা চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক হলোকস্ট। লক্ষ-কোটি টন গম ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানি হচ্ছে, ওদিকে দুর্ভিক্ষ কিন্তু থেমে নেই। ত্রাণ কর্মসূচি যদি শুরু হয়ও, তাতেও মানুষ থোড়াই খাবার খায়; মারা যায় প্রায় সকলেই।

অবাক কাণ্ড এই যে, ভারতে সর্বশেষ বড়সড় দুর্ভিক্ষ হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলে; এরপর আর একটাও হয়নি। কারণ, খরা-আক্রান্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত ভারতীয়দের প্রতি ভারতের গণতন্ত্র ত্বরিত সাড়া দেয়। ব্রিটিশ শাসনামলে এমনটা কখনোই ঘটেনি। নোবেলজয়ী বিশেষজ্ঞ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, স্বাধীন গণমাধ্যম-বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশে কখনোই দুর্ভিক্ষ হয়নি।[২৪১] কারণ, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকায় সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। অমর্ত্য সেনের গবেষণা কাজে যেমন সহমর্মিতা ছিল, তেমনই ছিল নিশ্ছিদ্র পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ। এরই মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, দুর্ভিক্ষ প্রায় যে-কোনো ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব। খাদ্যের অভাবে না, বরং মানুষকে খাদ্যের কাছে যেতে না দেওয়ার কারণেই দুর্ভিক্ষ হয়। তাই আসল কথা হলো খাবারের বণ্টন। আর গণতন্ত্র এমন সরকার-ব্যবস্থা, যেখানে ব্যাপকভাবে এবং ন্যায্য উপায়ে খাবার বণ্টিত হয়। অমর্ত্য সেনের এই তত্ত্ব এখন সর্বজনস্বীকৃতও বটে। ওদিকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক এই গণতন্ত্র ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অভাব।

ব্রিটিশ শাসনামলে যেসব বড় মাপের দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তার তালিকা দেখলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে: বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইংরেজি ১৭৭০), মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ (১৭৮২-৮৩), দিল্লি ও আশেপাশের এলাকায় চল্লিশা দুর্ভিক্ষ (১৭৮৩-৮৪), হায়দ্রাবাদ ঘিরে দোজি বারা দুর্ভিক্ষ (১৭৯১-৯২), আগ্রা দুর্ভিক্ষ (১৮৩৭-৩৮), উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬), বিহার দুর্ভিক্ষ (১৮৭৩-৭৪), দক্ষিণ ভারত দুর্ভিক্ষ (১৮৭৬-৭৭), ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (প্রায় ১৮৯৬-১৯০০), মুম্বাই দুর্ভিক্ষ (১৯০৫-০৬) এবং এই সবগুলোর চেয়ে কুখ্যাত বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর (ইংরেজি ১৯৪৩-৪৪)।[২৪২] প্রাণনাশের সংখ্যা রীতিমতো ভয়াল:

---

[২৪১] অমর্ত্য সেন, পোভার্টি অ্যান্ড ফেমাইনস: অ্যান এসে অন এনটাইটেলমেন্টস অ্যান্ড ডেপ্রাইভেশান, অক্সফোর্ড: ক্ল্যারেনডন প্রেস, ১৯৮২।

[২৪২] বিভিন্ন তালিকায় আরও অনেক দুর্ভিক্ষের কথা আছে। ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড-এর ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ সংখ্যায় ব্রিটিশ ভারতে ১৫টি দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে, যা সাত দশকের মধ্যে সংঘটিত হয়: 'ভারতে দুর্ভিক্ষ চলে অহরহ, ১৭৬৬, ১৭৭০ (সেবার বাংলার অর্ধেক অধিবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়), ১৭৮২, ১৭৯২, ১৮০৩, ১৮০৪, ১৮১৯, ১৮২০, ১৮২৪, ১৮২৯, ১৮৩২, ১৮৩৬, ১৮৩৭, এবং এখন ১৮৩৮ সালে।'

১৭৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে দুর্ভিক্ষে আড়াই কোটি ভারতীয় মারা পড়েছে বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচটি দুর্ভিক্ষেই মারা গেছে দেড় কোটি। বিংশ শতাব্দীর সব দুর্ভিক্ষ মিলেও কেড়ে নিয়ে গেছে সাড়ে তিন কোটির চেয়ে অনেক বেশি প্রাণ। উইলিয়াম ডিগবি দেখিয়েছেন, ১৭৯৩ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই ১০৭ বছরে পুরো বিশ্বে যুদ্ধে মানুষ মারা গেছে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। ওদিকে ১৮৯১-১৯০০ এই স্রেফ ১০ বছরেই ভারতে শুধু দুর্ভিক্ষে মারা পড়েছে ১ কোটি ৯০ লাখ।[২৪৩] মানব-মৃত্যু একটার সাথে আরেকটার তুলনা করা খুবই অবিবেচকের মতো কাজ। তারপরও ব্রিটিশ রাজের আমলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে মারা যাওয়া এই সাড়ে ৩ কোটি মানুষ আরও কিছু গণমৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেমন: স্ট্যালিনের সরকারীকরণ কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানে নিহত আড়াই কোটি, মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নিহত সাড়ে ৪ কোটি, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বজুড়ে নিহত সাড়ে ৫ কোটি। আধুনিক জামানায় মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ কতটা অমানুষিক হতে পারে, তার অন্যতম জ্বলন্ত উদাহরণ উপনিবেশ আমলের গণহত্যা।

ভারতে উপনিবেশ যুগের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক গুরুত্বপূর্ণ ময়দান। বারবার যে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, ব্রিটিশরা যে সুশাসনের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, এর ফলে যে ব্যাপক অনাহার দেখা দিচ্ছে, এগুলোকে ধরে ধরে দুর্বার আন্দোলন করে চলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা। উড়িষ্যায় গণমৃত্যু দেখে শিউরে ওঠেন দাদাভাই নওরোজি, কাজ শুরু করেন তার বিখ্যাত 'অর্থনৈতিক শোষণ' তত্ত্ব এবং 'ভারতে অ-ব্রিটিশসুলভ শাসন' নিয়ে। এতদিন পর্যন্ত তিনি ইংরেজপ্রেমী এবং ব্রিটিশ উদারতাবাদের গুণগ্রাহী ছিলেন; কিন্তু এবার আর তিনি নিজের মোহভঙ্গ গোপন রাখতে পারলেন না। নওরোজি লিখেছেন, 'নিঃসন্দেহে এই যুগে আমাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা অনেক বেড়েছে; কিন্তু একটা দুর্ভিক্ষেই ১৫ লক্ষ মানুষ মরে যাওয়া [উড়িষ্যায় ১৮৬৬ সালে মৃতের সংখ্যা] দেখে বোঝা যায়, এই নিরাপত্তার জন্য কী অদ্ভুত চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।'

ব্রিটিশরা দুর্ভিক্ষ নিরসনে পর্যাপ্ত সরকারি পদক্ষেপ নিতে নারাজ। এর পেছনে তাদের যুক্তি তিনটি: মুক্তবাণিজ্য নীতি (বাজারে জোগান ও চাহিদার গতির ওপর হস্তক্ষেপ না করা), ম্যালথুজিয়ান তত্ত্ব (কোনো ভূমির ধারণক্ষমতার চেয়ে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য, তাই 'সঠিক' জনসংখ্যা ফিরিয়ে

---

[২৪৩] ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া।

আনতে হবে) এবং আর্থিক দূরদর্শিতা (যে টাকা বাজেটে নেই, সেটা খরচ না করা)। এই একই যুক্তিতে তারা আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষেও চুপ মেরে থেকেছে। সেখানে জীবনরক্ষা বা আমেরিকায় দেশান্তর প্রতিরোধে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। দিনিয়ার পাতিল দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে 'অর্থনীতির স্বীকার্য ছিল, দুর্ভিক্ষে সরকারের হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকরও। বাজার নিজে থেকেই একটা যথাযথ ভারসাম্য অর্জন করে নেবে। ম্যালথুজীয় নীতি অনুযায়ী, জনসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেলে প্রকৃতি আপন নিয়মেই অতিরিক্ত মৃত্যু ঘটায়'।[২৪৪]

ছেষট্টির উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন স্যার সেসিল বিডন। (তিনি ওই এলাকা ভ্রমণ করে এসে ঘোষণা করেন, 'তাকদীরের এমন লিখনকে প্রতিহত বা প্রতিকার করার সক্ষমতা কোনো সরকারেরই নেই।') খাবারের মূল্য কমানোর জন্য কিছুই না করায় সমালোচনার শিকার হতে হয় তাকে। জবাবে তিনি বলেন, 'এই কাজ যদি আমি করি, তাহলে কোনো চোর-ডাকাতের চেয়ে আমি কোনো অংশে ভালো নই।'[২৪৫] গভর্নর সাহেব অ্যাডাম স্মিথের মুক্ত-বাজার নীতির প্রতি অত্যন্ত মুখলিস। তাই তিনি উড়িষ্যার জনগণকে মরতে দিতে রাজি, কিন্তু অর্থনীতির 'প্রাকৃতিক নিয়মে' হস্তক্ষেপ করতে রাজি নন। এতে তার রাজনৈতিক সুনাম ক্ষুণ্ন হবে।

বলতেই হয়, এতে কতিপয় বিবেকবান ইংরেজও অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় সেক্রেটারি অব স্টেইট ফর ইন্ডিয়া ছিলেন মারকুইস অব স্যালিসবারি। বলা হয়, সংকটের কথা জানার পর থেকে নিয়ে দুই মাস তিনি নিজের ব্যর্থতার কারণে প্রতিদিন নিজেকে ধিক্কার দিতেন। দুর্ভিক্ষে ১০ লাখ প্রাণহানির জন্য তার নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করা হয়। ব্রিটিশরা অন্তত ১৮৬০-এর দশক থেকে মোটাদাগে স্বীকার করতে শুরু করে যে, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের কারণ আসলে খাদ্যসংকট নয়, বরং জনগণের খাবার কেনার অক্ষমতা। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় বললে, 'খরা ও নিষ্ফলনের মাধ্যমে বাজারে যে প্রভাব পড়েছে, তার ফলে উদ্ভূত জটিল অর্থনৈতিক সংকট।'[২৪৬] কিন্তু এই অক্ষমতার যেসব কারণ ব্রিটিশরা উল্লেখ করে, বাস্তবে তার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আর এর দোষটা স্বয়ং ঔপনিবেশিক শাসকদেরই। এই যে

---

[২৪৪] দিনিয়ার পাতিল, 'হাউ ব্রিটেন লেট ওয়ান মিলিয়ন ইন্ডিয়ানস ডাই ইন ফেমাইন', বিবিসি নিউজ, ১১ জুন ২০১৬। www.bbc.com/news/world-asia-india-36339524,

[২৪৫] প্রাগুক্ত।

[২৪৬] মাইক ডেভিস, লেইট ভিক্টোরিয়ান হলোকস্টস: এল নিনো ফেমাইনস অ্যান্ড মেইকিং অব দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড, লন্ডন; নিউ ইয়র্ক: ভারসো বুকস, ২০০১, পৃ. ১৯।

ছেষট্টির উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ স্যালিসবারির আরামের ঘুম হারাম করে দেয়, ১৫ লাখ মানুষ অনাহারে মরে, ঠিক সেই সময়টাতেই ব্রিটিশরা নির্লিপ্ত নয়নে ব্রিটেনে রপ্তানি করেছে ২০ কোটি পাউন্ড চাল।

একদিকে অহরহ দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশদের বয়ানও শক্তিশালী হয়। কারণ, এগুলোর দোহাই দিয়ে দাবি করা যায় যে, ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধান ছাড়া ভারতীয়রা বাঁচবে না। ব্রিটিশ রাজের মহানুভবতা না পেলে তো মরেই সাফ হয়ে যেত তারা। আরেক দিকে ব্রিটিশরা তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনে এসব দুর্ভিক্ষের জন্য নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই দোষ দিতে ভোলেনি—ফুলে-ফেঁপে-ওঠা জনসংখ্যা, ধানের উৎপাদন হ্রাস, আবহাওয়া-সহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত নিয়ামকের ভূমিকা, পরিবহণের অভাব, এমনকি স্থানীয় সংস্কৃতিও। এইসব কারণেই নাকি ভালো মানুষ ব্রিটিশ প্রশাসকদের মহতী সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এত চেষ্টা করেও তাই তারা খাদ্যসংকট রোধ করতে পারেননি; অথচ ঔপনিবেশিক নীতিমালা ও কাজকর্মের কারণেই যে এসব কারণের উদ্ভব হলো, ভারতীয় কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেল কিংবা আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা গেল না, এসব কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়।

এটা শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা নয়, বরং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতিমালার চিরন্তন রূপ। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়েও ব্রিটিশ সরকার যে আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন দাখিল করেছে, তার শেষ অনুচ্ছেদটি এর এক দারুণ উদাহরণ :

দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য আমরা বাংলার সরকারকে নিন্দা করেছি। জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিবারণযোগ্য দুর্যোগ প্রতিহত করা সরকারেরই দায়িত্ব; কিন্তু বাংলার জনগণ বা অন্তত তাদের কিছু অংশও দায়ভার থেকে মুক্ত নয়। আমরা দেখিয়েছি, সেখানে ভীতি ও লোভের একটি পরিবেশ বিরাজমান। একে নিয়ন্ত্রণ না করাটাও দ্রব্যমূল্য হুহু করে বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ। দুর্যোগের সুযোগ লুফে নিয়ে বিরাট মুনাফা অর্জন করেছে অনেকে। কিছু ক্ষেত্রে একের মুনাফা মানে অন্যের মৃত্যু। জনসমাজের বিরাট এক অংশ প্রাচুর্যে ভাসছিল, যেখানে আরেক অংশ মরছিল অনাহারে। এহেন দুর্দশা দেখেও নির্লিপ্ত ছিল অনেকে। গোটা প্রদেশ ও সমাজের বহু শ্রেণির মাঝে দুর্নীতি ছিল ব্যাপক...। সমাজ ও এর অঙ্গসমূহ তাদের দুর্বলতর সদস্যদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসনিক ভাঙনের পাশাপাশি তাই নৈতিক ও সামাজিক ভাঙনের দোষও রয়েছে।[২৪৭]

---

[২৪৭] ফেমাইন ইনকোয়্যারি কমিশন ফাইনাল রিপোর্ট, ফেমাইন ইনকোয়্যারি কমিশন, (জন

দশে মিলে দোষ করা মানে কারোই নাহি লাজ। কিন্তু এরকম আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উইল ডুরান্ট বলেছেন—'ভারতের এসব দুর্ভিক্ষের পেছনে সব নষ্টের গোড়া হিসেবে রয়েছে এমন নির্দয় শোষণ, এমন ভারসাম্যহীন রপ্তানি, এবং দুর্ভিক্ষের মাঝেও এমন পাশবিক মাত্রায় খাজনা-চোষণ, যার ফলে ভুখানাঙ্গা কৃষকরা সেটা পরিশোধ করতে পারেনি...। আমেরিকার দানের টাকায় প্রায়ই ভারতের দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কিনতে হয়েছে, অথচ সরকার ওদিকে মুমূর্ষুদের কাছ থেকে খাজনা নিয়ে বেড়াচ্ছে।'[২৪৮] রমেশ চন্দ্র দত্ত যথার্থই বলেছেন, 'প্রত্যেকটা বছরেই দেশে খাদ্যের জোগান ছিল জনগণের জন্য যথেষ্ট।' আমেরিকান ধর্মতত্ত্ববিদ ড. চার্লস হলের কথায় এরই প্রতিধ্বনি হয়েছে। তাকে উদ্ধৃত করে ডুরান্ট আরও বলেন—'ভারতীয়রা না খেয়ে মরেছে [যাতে] ভারতের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ এক ডলারও না কমে। পুরো জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে, কারণ, ইংল্যান্ডের বৈষম্যপূর্ণ করের হার উৎপাদনের প্রতিটা খাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা জাহাজ ভরতি করে ভারতে শস্য পাঠাই, অথচ খোদ ভারতই শস্যে টইটম্বুর। সমস্যা হলো, মানুষকে পিষতে পিষতে এমন গরীব বানানো হয়েছে, যাতে তারা সেই শস্য কিনতেই না পারে।'

ব্রিটিশরা আসার আগে ভারতীয় শাসকরা খাদ্যসংকটের সময়ে জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। যেমন : খাজনা মওকুফ, শস্যের দাম নির্ধারিত করে দেওয়া এবং মঙ্গা-পীড়িত এলাকা থেকে খাবার রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা। ব্যক্তিগত দান-খয়রাতেরও এক শক্তিশালী ঐতিহ্য ছিল, বিশেষত সংকটকালে। জমিদার-বণিক-সহ সম্পৎশালী ভারতীয়রা কঠিন সময়ে প্রায়ই দায়িত্ব নিতেন গরীবদের সাহায্য করার। তারা তাদের কর্মসংস্থান করতেন, খাবার দান করতেন, এমনকি ভরতুকি দিয়ে বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে শস্যও বিক্রি করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দূর থেকে ভারতীয়দের এই দান-সাদাকা কার্যক্রম দেখে হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে যে, এরকম নির্বোধের মতো দান করলে ভবঘুরে দরিদ্ররা সুযোগ নেয়। এক লেখক এর নাম দিয়েছেন 'কুসংস্কার ও খ্যাতির লোভে স্থানীয়দের নির্বিচারে খয়রাত প্রথা'। তাই ব্রিটিশরা ঘোষণা করে যে, তারা 'সামর্থ্যবানদের চাকরি দেবে' কিন্তু আমজনতাকে 'খয়রাতি ত্রাণ' দেবে না।

কোম্পানির উত্তরসূরি হয় যে ব্রিটিশ রাজ-সরকার, তারাও তেমন ভিন্ন কিছু করেনি। তাই দরিদ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের

উডহেড, চেয়ারম্যান), ভারত, ১৯৪৫, পৃ. ১০৫–১০৬।

[২৪৮] ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৬–৩৭।

খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না; বরং তারা এই আশঙ্কায় তটস্থ থাকত যে, সরকারিভাবে ত্রাণ বিলি করলে না জানি বাঁদর মাথায় উঠে যায়, এবং সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে যায়! তাদের এই ভীতির পেছনে একটা কারণ ছিল আবোল-তাবোল ব্রিটিশ আইন। এগুলোর সংস্কার হয় ১৮৩৪ সালে। অনেকেরই ধারণা, এর ফলে দেশে কাঙালপনা বেড়ে গেছে।

বহু ব্রিটিশ কর্মকর্তা আবার 'সত্যিকারের অভাবী' ও 'ধর্মীয় ভিক্ষু'র মাঝেও পার্থক্যরেখা টেনে দেন। দ্বিতীয় দলটি তাদের চোখে যথাযথ প্রাপক নয়। ভারতীয় দাতাদের কাছে এসবের কোনো ফারাক ছিল না। সহস্র বছর ধরে তারা সাধু-সন্ত ও ফকির-সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে অভ্যস্ত। তারা সসম্মানে দ্বারে দ্বারে ও গ্রামে গ্রামে যেতেন। পথে যেসব ঘরবাড়ি পড়ত, সেসবের অধিবাসীরাই ব্যবস্থা করে দিত তাদের খানাদানার। ব্রিটিশদের কাছে তারা হয়তো 'ভিক্ষু', সহযোগিতা লাভের অযোগ্য সামাজিক জোঁক, কিন্তু ভারতীয়রা তাদের সাহায্য করতে পারলেই বরং খুশি। প্রচলিত ব্রিটিশ রীতিনীতি থেকে ভারতের দানশীলতার ধারণা একেবারেই আলাদা। ধনাঢ্য ভারতীয়রা সাধারণ জনগণকে এমনসব উপায়ে সাহায্য করতেন, যা ব্রিটিশদের স্বাভাবিক জ্ঞানেই ধরা দিত না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্পানি বিপুল সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে গেছে, অথচ বিনিময়ে জনগণের জন্য কিছু করে যায়নি—এ নিয়ে বেশ সমালোচিত হয়েছে তারা। শাসিত জনগণের জন্য কূপ খনন, জলাধার তৈরি, সেতু নির্মাণ বা বৃক্ষরোপণ করে দেওয়াটা আবহমান ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য।

ব্রিটিশ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করার কারণে কুখ্যাত হয়ে আছেন ভাইসরয় লর্ড লিটন। তিনি দুর্ভিক্ষ চলাকালে খাবারের দাম কমানো নিষিদ্ধ করে দেন। ঘোষণা করেন, 'খাদ্যের মূল্যহ্রাসের ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ যেন না করা হয়।' জেলা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন, 'সম্ভাব্য সকল উপায়ে ত্রাণ কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করুন...। স্রেফ জনদুর্ভোগ হওয়াটাই ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করার কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়।'[২৪৯] ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মাইক ডেভিস একটা মজার ব্যাপার দেখিয়েছেন। জনগণের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা এমনিতেও নেই। তাই নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল, তারা যেন 'সস্তা আবেগ'কে কোনোরকম পাত্তা না দেন।

---

[২৪৯] ডেভিস, ২০০১, পৃ. ৩১, ৫২।

ব্রিটিশদের এই বদ্ধমূল ধারণাটাই উঠে এসেছে লিটনের উক্ত ঘোষণায়।[২৫০] (কৌতুক শুনুন! ভাইসরয় হিসেবে রবার্ট বালওয়ার-লিটনের একমাত্র যোগ্যতা হলো, তিনি রানি ভিক্টোরিয়ার প্রিয় কবি।)

অন্য অনেকের তুলনায় লিটন বেশ স্পষ্টভাষী। নিজের সমালোচকদের ব্যাপারে অভিযোগ আনেন যে, তারা 'মানবদরদি উন্মাদনা'য় লিপ্ত। পারলে নিজেরা এসে ভারতীয়দের জীবন বাঁচানোর খরচ বহন করে দেখাক। আর্থিক বিচক্ষণতা ও সরকারি ব্যয় কমানোর নীতির অংশ হিসেবে আরেকটি কাজ করেন লিটন। স্যার রিচার্ড টেম্পল নামক জনৈক কর্মকর্তাকে মাদ্রাজে পাঠান ১৮৭৬-৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময়। তাকে বলে দেন 'মানবতাবাদী কুম্ভিরাশ্রু' দেখে বর্তে না যেতে। ত্রাণ কার্যক্রমের খরচ যেন যথাসম্ভব কমিয়ে আনা হয়। জনগণের দুর্দশা উপেক্ষা করেই অর্জিত হয় এই লক্ষ্য। সরকারি হিসেবখাতা আগে, জনমানুষের দুর্ভোগ পরে। এর আগে ১৮৬৬ সালে যখন উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, টেম্পল সেবার বার্মা থেকে চাল আমদানি করিয়েছিলেন অনাহারী ওড়িয়াদের বাঁচাতে। দি একোনমিস্ট তখন তিক্ত আক্রমণ করে তাকে। তিনি নাকি ভারতীয়দের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন যে, 'তাদের বাঁচিয়ে রাখাটা সরকারের কর্তব্য।'[২৫১] কিন্তু ১৮৭৭ সালের টেম্পল একেবারেই আলাদা এক মানুষ। ব্রিটিশরা এক প্রকারের ত্রাণ কার্যক্রম হিসেবে দুর্ভিক্ষের সময় 'শ্রমশিবির' চালু করেছিল ঠিকই (যাতে অনাহারীরা শ্রমের মাধ্যমে রুটি-রুজি কামাই করে নিতে পারে)। কিন্তু এই কর্তাব্যক্তির রেখে যাওয়া সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ স্মৃতি হলো 'টেম্পল মজুরি'। মাইক ডেভিসের ভাষ্যে, 'কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে নগণ্য মজুরি' দেওয়া হতো এ-সকল ব্রিটিশ শ্রমশিবিরে। এমনকি ৮০ বছর পরের কুখ্যাত বুখেনভাল্ট কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পের[২৫২] বন্দিরাও এরচেয়ে বেশি মজুরি পেত।

তার মানে, ১৮৭৬-৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'হাত গুটিয়ে বসে থাকা'র অভিযোগ আনা সম্ভব নয়; বরং তারা অবস্থার অবনতি ঘটানোর জন্য কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেনি। ভারতের শস্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি হতে থাকে। রাশিয়া ও ইউক্রেনে ১৯৩০-এর দশকে যে 'সরকারীকরণ দুর্ভিক্ষ' দেখা দিয়েছিল, সেসময় স্ট্যালিনও ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। মাইক ডেভিস যথার্থই লিখেছেন, ভারতীয়রা যখন মঙ্গায় মরছে, 'লন্ডন তখন ভারতের রুটি

---

[২৫০] প্রাগুক্ত।

[২৫১] জোয়ান হারি, 'দ্য ট্রুথ? আওয়ার এম্পায়ার কিল্‌ড মিলিয়নস', দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১৯ জুন ২০০৬।

[২৫২] নাৎসিদের প্রতিষ্ঠিত একটি বন্দিশিবির।—অনুবাদক।

খাচ্ছে'। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে ব্রিটিশরা কৃষকদের ওপর খাজনা বাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধার চোটে যারা পরিশ্রম করতে অক্ষম, তাদের দেওয়া হয় 'অলস' ও 'শ্রমবিমুখ' তকমা। কিছু বিবেকবান ইংরেজ যখন আপত্তি করতেন এবং স্ব-উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করতেন, তাদের দেওয়া হতো গ্রেপ্তারের হুমকি। জনৈক মিস্টার ম্যাকমিন নিজের পকেটের টাকা খরচ করে অনাহারীদের মাঝে শস্য বিতরণ করেন। তাকে 'চরমভাবে ধমকানো হয়, এবং কালবিলম্ব না করে ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়'।[২৫৩]

এসব ঘটনার এক চাক্ষুস সাক্ষী লেফটেন্যান্ট কর্নেল রোনাল্ড অজবর্ন। তিনি ১৮৭৭-এর বিভীষিকা সম্পর্কে মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছেন—'অগণিত লাশ গড়াগড়ি খেতে থাকে পরিত্যক্ত কুয়ায়। মৃতের সংখ্যা এত বেশি যে, বেচারা আত্মীয়দের শেষকৃত্য করার সামর্থ্যটাও নেই। মায়েরা শিশুদের বিক্রি করে দিত একবেলার একমুঠো খাবারের বিনিময়ে। স্বামীরা স্ত্রীদের পুকুরে চুবিয়ে মারত। অন্তত ক্ষুধায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখতে হবে না। এহেন মৃত্যুলীলার মাঝে ভারত সরকার তার সৌম্য চেহারা ও হাসিখুশি ভাব অক্ষুণ্ন রাখে। [সংবাদপত্রকে] জোর করে চুপ রাখা হয়। খিদেয় মানুষ মারা যাচ্ছে—এরকম ভান যেন কিছুতেই না করা হয়, সে ব্যাপারে কড়া আদেশ দেওয়া হয় নাগরিকদের।'[২৫৪]

দক্ষিণ ভারতে ১৮৭৭-৭৮ সালের দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ সরকার একইভাবে খরচের লাগাম টেনে ধরে রাখে। কিন্তু ওতেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। অনাহারীদের কাছে মানবিক সাহায্য পাঠানোর পথও বন্ধ করে দেয়, পাছে লোকে ভাবে সরকার বুঝি দান-দক্ষিণা ছাড়া মানুষের প্রাণ বাঁচাতে অক্ষম। জর্জিনা ব্রুইস বর্ণনা করেন—'ভারতীয়-ইউরোপীয় নির্বিশেষে মাদ্রাজের গণ্যমান্য নাগরিকরা ১৮৭৭ সালের আগস্টে ত্রাণ তহবিলের জন্য ব্রিটেনের কাছে আবেদন জানান। এই কাজকে অবাধ্যতা হিসেবে দেখেন লিটন। সাথে সাথে তিনি তহবিল আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা নেন। একটি সাংকেতিক টেলিগ্রাম বার্তা পাঠান বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের কাছে বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। খবরের কাগজে বলা হয় যে, লিটনের বিরোধিতার ফলে সকল দাতার মুখে চুনকালি পড়ে গেছে। ভারতের নবনিযুক্ত "সম্রাজ্ঞী" এবং একদল সাবেক গভর্নর-জেনারেলও ব্রিটেনে নাম লিখিয়েছিলেন দানকারীদের খাতায়। দ্য টাইমস-এ জনৈক নেতা লিখেছিলেন "ব্যক্তিগত দানশীলতার আবেগকে ভাইসরয় এমনভাবে দমন

[২৫৩] প্রাগুক্ত।
[২৫৪] প্রাগুক্ত।

করবেন" তা বড়ই দুঃখজনক। "স্রেফ অর্থনৈতিক স্বার্থ মাথায় রেখে" ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর নিন্দা করেন তিনি। লর্ড লিটন একসময় ত্রাণ তহবিলকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। নিজেও তাতে দান করেন ১০,০০০ রুপি (১,০০০ পাউন্ড)। পরে নিজেরা নিজেরা আলাপ করার সময় স্বীকার করেন যে, ওটা "নিতান্ত অনিচ্ছায়" দান করেছিলেন। তহবিলে একসময় ৮,২০,০০০ পাউন্ড উঠে যায়। তাতে অবদান রাখে সারা ব্রিটিশ দুনিয়ার নানান ব্যক্তি, বিদ্যালয়, গির্জা এবং সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আসা লাখ লাখ ছোট অনুদান। কিন্তু ১৮৭৭-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত লিটন একে "নিরেট আপদ" বলে আখ্যা দিয়ে চলেন। কঠিন সতর্কবার্তা দিতে থাকেন যে, এক দায়িত্বজ্ঞানহীন কমিটি পুরো টাকাটাই জলে ঢালবে।'[২৫৫]

এই ঘটনার পর ভারতের ব্রিটিশ সরকার আরও আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ কার্যক্রমের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়। দাতব্য কার্যক্রমের 'বৈধ' লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করে দেয় তারা। আন্তর্জাতিক আবেদন মঞ্জুর করা বা না-করা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর তদারকি করার ক্ষমতা থাকে সরকারের হাতে। অক্টোবর ১৮৯৬-তে যখন নতুন আরেকটা দুর্ভিক্ষ শুরু হয় (ততদিনে লিটন আল্লাহর ওয়াস্তে বিদায় হয়েছেন), সরকার তখন জনদুর্ভোগের প্রতি সাড়া দেওয়ার বদলে উলটো নিয়মকানুন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ইংল্যান্ডের জনমতকে আর উপেক্ষা করা যাচ্ছিল না। তাই অবশেষে ১৮৯৭-এর জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। ততদিনে দুর্ভিক্ষের বয়স চার মাস, প্রাণহানি অসংখ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'সভ্যকরণ অভিযান' যখন পুরোদমে চলমান, তখনো ব্রিটিশদের এসব অপকর্মের উদাহরণ ভূরিভূরি; অথচ কেউ কেউ এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। লরেন্স জেইমস যেমন হাসতে হাসতে সব প্রমাণ অস্বীকার করে লিখেছেন যে, ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ছিলেন 'মানবতাবাদী মানুষ। অপর্যাপ্ত প্রশাসনিক সুবিধা এবং সীমিত সম্পদের কারণে বেশ বাধাবিপত্তি এসেছে। তারপরও তারা ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন' ১৮৭০ ও ১৮৯০-এর দশকের দুর্ভিক্ষের সময়।[২৫৬] এই দাবির পক্ষে তার প্রমাণ একটাই যে, ১৮৭১-১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষকালে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ৩ কোটি। ভারত একটা বিশাল দেশ। আর দুর্ভিক্ষ সবখানে হয়নি।

---

[২৫৫] জর্জিনা ব্রুইস, 'ফিল ফুল দ্য মাউথ অব ফেমাইন: ভলান্টারি অ্যাকশান ইন ফেমাইন রিলিফ ইন ইন্ডিয়া ১৮৭৭–১৯০০', রবিনস, ডি. প্রমুখ (সম্পা.), ইয়ারবুক ২ চলমান পিএইচডি গবেষণা, লন্ডন: ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন, ২০০৭, পৃ. ৩২–৫০।

[২৫৬] প্রাগুক্ত।

যেসব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সেখানকার অবস্থা হয়ে পড়ে শোচনীয়। মারা যায় কোটি মানুষ। অন্যান্য জায়গায় জীবন চলতে থাকে জীবনের মতো। ফলে ভারতের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, মঙ্গাপীড়িত এলাকায় লাখে লাখে প্রাণহানি হয়নি। মাও আর স্ট্যালিনের আমলেও তো চীন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যা বেড়েছে। জেইমসের যুক্তিমতে সেসব দেশে অনাহারে মানুষ মরার গল্পও উড়িয়ে দেওয়া যায়। বরং এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত সূচক হলো দুর্ভিক্ষপীড়িত বছরগুলোতে মৃত্যু ও অপুষ্টির হার, অথচ সেই হিসেবগুলো জেইমস ঠিকই এড়িয়ে গেলেন।

ব্রিটিশ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে শুধু মানুষই ভুক্তভোগী হয়নি, গবাদি পশুরাও মরেছে। অবাক করা ব্যাপার হলো, ১৮৫৯ সালে চামড়া রপ্তানি ব্যাবসা থেকে আয় হতো ৫০ লক্ষ রুপি, আর ১৯০১ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ। এই বৃদ্ধি চমকে দেওয়ার মতো, বিশেষ করে এমন এক সংস্কৃতিতে, যেখানে একটা গরুর মৃত্যু মানে সর্বনাশ। শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, কৃষিকাজ, পরিবহণ এবং গ্রাম্য সমাজে মর্যাদার নিদর্শন হিসেবেও গরুর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেখানে এতগুলো গরুর মৃত্যু নিশ্চয়ই গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক দুর্দশা সৃষ্টি করেছে। গবাদি পশুর মৃত্যুর চেয়ে দুঃখের ব্যাপার কৃষকের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। এটা তাদের বর্তমান সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের আশার ওপর বিশাল বড় আঘাত। কিছু কর্মকর্তা কিন্তু আসলেই মানুষের মৃত্যুর চেয়ে গরুর মৃত্যুকে বেশি খারাপ মনে করতেন। দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কৃষিকাজে প্রভাব বিবেচনা করলে [গবাদি পশুর মৃত্যু] হয়তো জনসংখ্যা হ্রাসের চেয়েও গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। সাধারণত বৃদ্ধ বা অক্ষমরাই অনাহারে মারা পড়ে, ওদিকে শারীরিক সামর্থ্যবানরা বেঁচে যায়। কিন্তু গবাদি পশু যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে চাষবাসই অসম্ভব হয়ে পড়বে।'[২৫৭]

গবাদি পশুর মৃত্যু সরাসরি প্রভাব ফেলে কৃষিজ উৎপাদনের ওপর। উৎপাদের পরিমাণ আগের অবস্থায় ফিরে আসতে কয়েক দশক না হলেও বহু বছর সময় তো লাগবেই। দরিদ্রতম কৃষকেরা সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী।

---

[২৫৭] জে. সি. গেডেনস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেরিয়েন্স রেকর্ডেড ফরমার ফেমাইনস, কলকাতা, ১৮৭৪, পৃ. ৩৫০। আরেক কর্মকর্তা লিখেছেন, 'মানবীয় শ্রমশক্তি হারানোর ক্ষতি সাময়িক। কৃষকদের ওপর আপতিত এরচেয়েও ভারি বিপদ হলো ষাঁড়ের মৃত্যু, যেগুলো কিনা তাদের হালচাষের লাঙল।' ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বাণিজ্যিক অবস্থা এবং সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রতি কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথের প্রতিবেদন, পার্লামেন্টারি পেপারস, ৮ মে ১৮৬১, পৃ. ২৯; এবং একই প্রদেশের সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রতি একই কর্মকর্তার প্রতিবেদন, হাউজ অব কমন্স, ১৮৬২, পৃ. ৩৯।

কারণ, এমনিতেই তাদের অবস্থান অর্থনৈতিক বিকাশের একদম কিনারায়, অথচ তাদের প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে কিছুই বলা নেই সরকারি ত্রাণ নীতিমালায়। সরকারের লক্ষ্য থাকত 'স্বাস্থ্যবান' গবাদি পশুর যত্ন-আত্তি। মানে, সাধারণত যে মালিকেরা গবাদি পশুকে ভালো করে খাওয়াতে পারবে, তাদের সাহায্য করা। এমনকি দুর্ভিক্ষের সময় যখন 'গবাদি পশু শিবির' স্থাপন করা হতো, সেটারও লক্ষ্য থাকত যথাসম্ভব খরচ কমানো এবং দাতব্য কার্যক্রমে যা-কিছু ব্যয় হয়ে গিয়েছে, যথাসম্ভব সেগুলোর ক্ষতিপূরণ তোলা। যেমন—১৮৯৯-১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বম্বে প্রেসিডেন্সিতে স্থাপিত হয়েছিল নয়টি শিবির। সেটা পরিচালনা করতে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে, তার ৭৫ শতাংশই পরে উসুল করে ফেলেছে সরকার। আর্থিক বিচক্ষণতা প্রতিবারই হারিয়ে দেয় 'মানবতাবাদী কুম্ভীরাশ্রু'কে। যে ভারতীয়রা নিজেরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়নি, তারাই বরং ব্রিটিশ সরকারের চেয়ে বেশি মহানুভবতা দেখায়। গবাদি পশুকে বাঁচাতে 'দেশীয় দান-দখিনা' পাওয়া যেত সহজেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দাতারা গ্রাম্য জমিদার। সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ দেওয়া এবং জনগণের গবাদি পশু রক্ষা করার এক সামাজিক দায়িত্ববোধ অনুভব করতেন তারা।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতে,

> দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ অবকাঠামো ও পরিবহণের স্বল্পতা। এর ফলে প্রাচুর্যশালী এলাকা থেকে অভাবী এলাকায় খাবার স্থানান্তর কঠিন হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই অসুবিধা প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে হয়তো ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে রেলপথ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় এই বিষয়টি, অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বাজে দুর্ভিক্ষগুলো যখন আঘাত হানে, ততদিনে হাজার হাজার মাইল রেলপথ তৈরি হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের দায় যে কর্তৃপক্ষ এবং তাদের বানানো আইন-কানুনের ঘাড়েই পড়ে, সেটা বোঝার জন্য এরচেয়ে প্রকট প্রমাণ আর হতেই পারে না।

ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষ যখন ভারতীয়দের অকূল পাথারে ছেড়ে দিচ্ছে, ব্রিটেনের কতিপয় মহাশয় তখন ভাসছেন কল্পনার সাগরে। তাদের ধারণা, তারা ভারতের ভিক্ষার থালায় চকচকে মুদ্রা ঢালতে-থাকা মহানুভব দাতা। ডেইলি মেইল ১৮৯৭ সালে লেখে, 'ক্ষুধা-যন্ত্রণার ভূতুড়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব... আমাদের অস্ত্র হবে সৎ হালাল ব্রিটিশ টাকা।'[২৫৮] এই দাবি করা মানে কিন্তু ভারতীয়দের

[২৫৮] উদ্ধৃত করেছেন চন্দ্রিকা কাউল, রিপোর্টিং দ্য রাজ: দ্য ব্রিটিশ প্রেস অ্যান্ড ইন্ডিয়া ১৮৮০–১৯২২, ম্যানচেস্টার: ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২২, পৃ. ৭৫।

দানশীলতাকেও অস্বীকার করে বসা। ব্রিটিশরা যা-ই ভাবুক, বাস্তবতা হলো—দুর্ভিক্ষকালে বেশিরভাগ ত্রাণ কার্যক্রম ভারতীয়রাই সামাল দিয়েছে। সরকার তো একদিকে নিষ্কর্মা, তাতে আরও জ্বালানি ঢেলেছে কর্মকর্তাদের কিপটেমি। বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে অবস্থানরত ভারতীয়রা বড় বড় অঙ্ক পাঠিয়েছেন তহবিলে। যেমন—১৮৯৭ ও ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে খুব গুছিয়ে টাকা সংগ্রহ করেছেন। ভারতে অমনোযোগী বা অসহযোগী ব্রিটিশ সরকার যে শূন্যস্থান তৈরি করেছিল, তা পূরণ করার জন্য গড়ে ওঠে অনেকগুলো ভারতীয় ত্রাণ সংস্থা। দুর্ভিক্ষের সময় রান্নাঘর, অনাথালয়, দরিদ্রদের জন্য সস্তা খাবারের দোকান এবং দুস্থদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন ভারতীয় দাতাবৃন্দ। বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা, সমিতি ও সভা নিজ উদ্যোগে সেবামূলক কাজ করে চলে। এগিয়ে আসে সংস্কারপন্থি ধর্মীয় সমাজগুলোও, যেমন—আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। সরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে যা-কিছু ঘাটতি ছিল, তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে কাজ করতে থাকে সকলে।

মানব ভুক্তভোগীদের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্লিপ্ততা তো ছিলই, সেইসাথে তাদের আরও একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে যায় ত্রাণ কার্যক্রমের সময়—নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে অনীহা এবং অব্যবস্থাপনাকে দূরদর্শিতা বলে চালিয়ে দেওয়ার দক্ষতা। অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতা ঢাকার জন্য ব্রিটিশরা ঢাকঢোল পিটিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিসংখ্যানের হিসাব তুলে ধরত। যেন বোঝাতে চাইত, নখদর্পণে গাণিতিক হিসাব আছে বলেই বাস্তব ময়দানের পরিস্থিতিও তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারটির নাম দিয়েছেন 'সংখ্যার বাগাড়ম্বর'। দুর্ভিক্ষ-বিতর্কে এই কৌশল ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ লিওপোল্ড অ্যামেরির একটি উক্তি। তিনি ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রসচিব। হাউজ অব কমন্সের সদস্যদের উদ্দেশে মহাশয় এই উক্তিটি করেন। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর ততদিনে ৩০ লাখ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য উৎপাদন হার সার্বিকভাবে হ্রাস পাওয়ার মাঝে তুলনা করে অ্যামেরি বলেন, 'গত ১২ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ৬ কোটি। পক্ষান্তরে, গত ৩০ বছরে বাংলায় বার্ষিক মাথাপিছু ধান উৎপাদন ৩৮৪ পাউন্ড থেকে কমে হয়েছে ২৮৩ পাউন্ড।'[২৫৯] ব্রিটিশরা নাকি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও ম্যালথুজীয় বিপর্যয় প্রতিহত করতে পারেনি। হাউজ অব কমন্সে প্রায়ই এভাবে সংখ্যার আশ্রয়

[২৫৯] সিডনি মর্নিং হেরাল্ড, ৬ নভেম্বর ১৯৪৩।

নিতেন অ্যামেরি। ডিসেম্বরে একবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর হিসাব পেশ করেন। সন্তর্পণে যোগ করে দেন যে, কিছু মৃত্যু হয়তো অনাহারের ফল নয়। সরকার যেসব সূক্ষ্ম হিসাব পরিবেশন করত, তাদের কথিত ত্রাণ কার্যক্রমের সফলতা ছিল প্রায়শ তার ব্যস্তানুপাতিক।

বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর যখন শেষ হয়, ততদিনে প্রায় ৪০ লাখ বাঙালি অনাহারে মারা গেছে। উইন্সটন চার্চিলের জঘন্য আচরণকে কোনো অজুহাতেই ক্ষমা করা যায় না। তিনি ইচ্ছে করে আদেশ দেন, অনাহারী ভারতীয় জনগণের বদলে সব খাবার যেন সরবরাহ করা হয় ভরপেট ব্রিটিশ সৈনিকদের কাছে। এমনকি ইউরোপের পুরো রসদের ভান্ডার স্তূপ করে রাখতে বলেন গ্রিস-সহ বিভিন্ন স্থানে। তার যুক্তি—'বাঙালিরা এমনিতেই আধপেটা'। তারা অনাহারে মরলে মরুক, কিন্তু 'শক্তপোক্ত গ্রিকদের' দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না।

চার্চিলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো টমিদের জন্য শস্য, স্বদেশি ব্রিটিশদের জন্য রুটি, এবং ইউরোপের জন্য বিপুল পরিমাণ আপৎকালীন মজুদ। তাই শস্য আমদানি করা হয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড, যা বীভৎস রকমের বিশাল একটা পরিমাণ। আর ইউরোপ বলতেও তিনি বোঝাচ্ছেন তৎকালীন পরাধীন গ্রিক ও ইয়ুগোস্লাভদের। ভারতীয় প্রজারা বাঁচল কি মরল, তা তার কাছে ধর্তব্যই না। তার এসব নীতিমালার ভুক্তভোগীদের কথা যখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটার এক চার্চিলীয় জবাব প্রদান করেন তিনি। বলেন, দুর্ভিক্ষ তাদের নিজেদের দোষ। কারণ, তারা 'খরগোশের মতো বাচ্চা বিয়ায়'। কতিপয় বিবেকবান কর্মকর্তা একটা টেলিগ্রাম বার্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন, তার সিদ্ধান্তের কী করুণ পরিণাম ঘটে চলেছে। চার্চিল স্রেফ জানোয়ারের মতো প্রশ্ন করে বসেন, 'তো গান্ধি মরল না কেন এখনো?'

মধুশ্রী মুখার্জি বাংলার মন্বন্তরের বর্ণনা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নথিবদ্ধ করেছেন।[২৬০] তাতে দেখা যায়, ভারতের নিজস্ব উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানি হয়ে যাচ্ছিল সিলোনে। অস্ট্রেলিয়ার গম বহনকারী জাহাজ ভারতীয় শহরের সামনে দিয়ে ং্ঢং করে পার হয়ে চলে যেত (এসব শহরের রাস্তাঘাট অনাহারীদের লাশে ভরতি হয়ে ছিল)। কিন্তু ওসব জাহাজের গন্তব্য ভূমধ্যসাগরীয় ও বলকান অঞ্চলের গুদামঘর। উদ্দেশ্য যুদ্ধ-পরবর্তী ব্রিটেনের ওপর চাপ কমানো। আমেরিকা ও ক্যানাডা থেকে ভারতের জন্য খাদ্য সহায়তার প্রস্তাব এলেও তা নাকচ করে দেওয়া হয়। উপনিবেশ যে খাদ্য আমদানি করবে, সেজন্য তার

---

[২৬০] মধুশ্রী মুখার্জি, চার্চিল'স সিক্রেট ওয়ার: দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার অ্যান্ড দ্য র‍্যাভেইজিং অব ইন্ডিয়া ডিউরিং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, নিউ ইয়র্ক: বেইসিক বুকস, ২০১০, পৃ. ৩৩২।

নিজস্ব স্টার্লিং মজুদ খরচ করার, এমনকি নিজের জাহাজগুলো পর্যন্ত ব্যবহার করার অনুমতি নেই। চাহিদা ও জোগানের নীতিও এখানে কোনো সাহায্য করতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য জায়গায় তার সেনাবাহিনীর কাছে খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করার জন্য ভারতের মুক্ত বাজারে মারাত্মক চড়া দামে শস্য বিক্রি করতে থাকে। ফলে সাধারণ ভারতীয়দের নাগালের বাইরে চলে যায় সেসব।

বাংলার মন্বন্তরের সময় ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা যে আচরণ দেখিয়েছেন, তাতে করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গা থেকে নৈতিক বৈধতার শেষ সুতোটাও খসে পড়ে গেল। এই দুর্ভিক্ষের পেছনে দায়ী ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন আর্থিক ব্যবস্থাপনা। নিজেরা না খেয়ে যুদ্ধে রসদ জুগিয়েছে ভারত। রাষ্ট্রসচিব অ্যামেরি ও দাম্ভিক চার্চিল যুদ্ধকে এতই ভালোবাসতেন যে, 'উপনিবেশের অর্থনীতির মতো নীরস বিষয়' তারা উপেক্ষা করে গেছেন। চার্চিলের বদমাশ সহকারী পেমাস্টার জেনারেল লর্ড শেরওয়েল এমনই বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন যে, তিনি ভারতে ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে দেননি। রসদ-সরঞ্জাম-সংক্রান্ত বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত তারই দেওয়া। এগুলোরই ফলে ঝরে গেছে অগণিত তাজা প্রাণ। এই সবগুলো বিষয় দুই শতকের ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুরতার পরিণাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরকালে ব্রিটিশরা যেসব নির্মমতা ও বর্ণবাদী আচরণ করেছে, সেগুলোর খতিয়ান বেশ ভালোভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এর আগে যে আরও ডজন ডজন কুৎসিত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সেগুলোর তথ্য এত গোছালো নয়। পার্থক্য কেবল এতটুকুই।

দুর্ভিক্ষ নিয়ে এত লম্বা-চওড়া আলাপ করলাম, কারণ এগুলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অপকর্মের অনন্য উদাহরণ। মহামারি-রোগ-বালাইয়ের কথাও উল্লেখ করা যেত। ওগুলোর ফলেও ভারতীয়রা নিঃশেষ হচ্ছিল। অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করেনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। শুধু বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটে বছরের হিসাব নিলেই মাথা ঘুরে যায়। ডুরান্ট দেখিয়েছেন : ১৯০১ সালে মহামারিতে মারা গেছে ২,৭২,০০০ জন, ১৯০২ সালে ৫,০০,০০০ জন, ১৯০৩ সালে ৮,০০,০০০ জন, আর ১৯০৪ সালে ১০ লাখ।[২৬১] প্রতিবছর মৃত্যুর পরিমাণ বেড়েছে। ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় ১২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ 'ফ্লু আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় (মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশি)। ভারতের মৃত্যুহার

[২৬১] ডুরান্ট, পৃ. ৩৬। সার্বিকভাবে দুর্ভিক্ষ এবং বিশেষভাবে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে জানতে আরও দ্রষ্টব্য করকম্যাক ও গ্রেডা, ইটিং পিপল ইজ রং, অ্যান্ড আদার এসেজ অন ফেমাইন, ইটস পাস্ট, অ্যান্ড ইটস ফিউচার, প্রিন্সটন, এন. জে.: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫০।

ছিল যে-কোনো পশ্চিমা দেশের চেয়ে বেশি : মারা যায় ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষ। আমেরিকান রাষ্ট্রনায়ক (এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ থেকে তিনবারের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী) উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান দেখিয়েছেন যে, বহু ব্রিটিশ সেসময় মহামারির ফলে সংঘটিত মৃত্যুকে 'অতিরিক্ত জনসংখ্যার আসমানি প্রতিকার' বলে বিশ্বাস করত।[২৬২] পরিহাসটা কোন জায়গায়, সেটা তুলে ধরেছেন ব্রায়ান। ব্রিটিশ শাসনের সাফাই গাওয়া হয় এই অজুহাতে যে, 'একে অপরকে হত্যা করা থেকে এটি মানুষকে বিরত রেখেছে। ওদিকে ব্রিটিশ সরকার যাদের খুনাখুনি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তাদের মেরে ফেলার কারণে মহামারির প্রশংসা করা হয়!'

তবে ঔপনিবেশিক আমলের আগেও মহামারি ছিল। ব্রিটিশদের নীতিমালার ফলে এগুলো সৃষ্টি বা গুরুতর হয়ে গেছে, এমনটা বলা যায় না। তাই আমার যুক্তিতর্কের জন্য দুর্ভিক্ষ যেভাবে প্রাসঙ্গিক, মহামারি ততটা নয়। কিন্তু তবুও বলতে হয়, মহামারির প্রাদুর্ভাব এবং এতবেশি মৃত্যুহার ব্রিটিশ রাজের নির্লিপ্ততার আরও একটি নিদর্শন; অথচ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফাই-গায়করা প্রায়শ যুক্তি দেন যে, এ সময় 'গণস্বাস্থ্যে বেশ লক্ষণীয় উন্নয়ন ঘটেছে'। এই দাবির পক্ষে যে অল্প কয়েকটা প্রমাণ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো হলো ম্যালেরিয়ার ঔষধ হিসেবে কুইনাইন প্রবর্তন (যদিও এর আসল ব্যবহার ছিল জংলা অঞ্চলে অবস্থিত ব্রিটিশ ঘাঁটিতে মদ হিসেবে গলাধঃকরণ), গুটিবসন্ত টিকার গণকর্মসূচি (এতই অপ্রতুল যে, স্বাধীনতার অনেক পরে গিয়ে ভারত থেকে এই রোগ অবশেষে দূর হয়) এবং পানি সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতি (এতই অব্যবস্থাপনায় ভরতি যে, পুরো ব্রিটিশ শাসনামলে কলেরা ইত্যাদি পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব চলতে থাকে)।[২৬৩]

এও বড় অদ্ভুত যে, গোটা শাসনামলে ব্রিটিশ রাজ দেশের কোনো জায়গায় একটাও বড়সড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রধান প্রধান আধুনিক চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটাই স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় দানবীরদের বদান্যতায়। এমনকি এই ভারতীয় দাতারাও প্রায় হাসপাতালের নামকরণ করেছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রুই-কাতলাদের নামে। সে যাকগে, কারণটা বোধগম্য।

---

[২৬২] উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, পুনর্মুদ্রিত করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি, লন্ডন, ১৯০৬, পৃ. ২।

[২৬৩] এসব দাবি করেছেন ফারগুসন, এম্পায়ার, পৃ. ২১৫।

জোরপূর্বক দেশান্তর : নির্বাসন ও চুক্তিভিত্তিক শ্রম

ইংল্যান্ডের কারাগারগুলোতে সেসময় কয়েদিদের সংকুলান হচ্ছিল না, আবার সাম্রাজ্যের কিছু উপনিবেশে ছিল জনবলের খুব অভাব। তাই ব্রিটিশরা একটা বুদ্ধি বের করল। কিছু উপনিবেশকে বানাল শাস্তির জায়গা। অপরাধীদের ধরে ধরে পাঠিয়ে দিতে থাকল সেখানে। এই সশ্রম আসামিদের ব্যবস্থাপনা করত সরকার। ওদিকে আবার ব্যক্তিমালিকানায় ক্যারিবিয়ান ও আমেরিকান উপনিবেশগুলোর মধ্যে চলত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের ব্যাবসা। এই দুটো বিষয়কে একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়। একই নীতি প্রয়োগ করা হয় ভারতের ওপরও।

ভারতীয় আসামিদের দেশান্তর করানো শুরু হয় ১৭৮৭ সাল থেকে।[২৬৪] প্রথম প্রথম পাঠানো হতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শাস্তিমূলক উপনিবেশগুলোয়, বিশেষ করে সুমাত্রার বেনকুলেন, (১৭৮৭-১৮২৫, যে সময়টায় ব্রিটিশ ও ওলন্দাজরা নিজেদের মধ্যে বেনকুলেন ও মালাক্কা অঞ্চল দুটো বদলাবদলি করে নেয়। উদ্দেশ্য ছিল যথাক্রমে মালয়শিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় নিজেদের অবস্থান পোক্ত করা), পেনাং ওরফে প্রিন্স অব ওয়েইলস আইল্যান্ড (১৭৯০-১৮৬০), মরিশাস (১৮১৫-৫৩), মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর (১৮২৫-৬০), এবং বার্মিজ প্রদেশ আরাকান ও তেনাসেরিম (১৮২৮-৬২)। ভারতীয় আসামিদের মূলত অবকাঠামো-নির্মাণ প্রকল্পে নিযুক্ত করা হতো, তাই তাদের চাহিদাও ছিল ব্যাপক, বিশেষ করে স্ট্রেইটস সেটলমেন্টসের[২৬৫] দ্রুততম বর্ধনশীল এলাকা সিঙ্গাপুরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যখন সবচেয়ে রমরমা যুগ চলছিল, তখন এই জায়গাগুলোকে ডাকা হতো 'ভারতের বোটানি বে'[২৬৬]। ভারতীয় আসামি শ্রমিকদের যে-কোনো প্রকল্পে সস্তা শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা যেত, তাই পেনাং-এর সফল উপনিবেশায়নে তাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ওই এলাকায় ১৮৫২ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে শ্রমিকের খরচ প্রায় ৩০

---

[২৬৪] এই তথ্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন জি. এস. ভি. প্রসাদ এবং এন. কনকারাথনম, 'কলোনিয়াল ইন্ডিয়া অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশান: ইন্ডিয়ান কনভিক্টস ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড এলসহোয়্যার', ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ, খণ্ড ১ (১৩), ২০১৫, পৃ. ৫–৮।

[২৬৫] ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল পেনাং, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ও ডিনডিং-কে একত্রে স্ট্রেইটস সেটলমেন্টস বলা হতো।

[২৬৬] বোটানি বে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েইলসে অবস্থিত। ব্রিটিশ আসামিবাহী প্রথম জাহাজ এখানেই এসে ভিড়েছিল। এর মাধ্যমে ইউরোপের হাতে অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশায়ন শুরু হয়। উদ্ভিদবিদ জোসেফ ব্যাংকস এবং ড্যানিয়েল সোল্যান্ডার প্রথমবারের মতো এই অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করেন বলে তাদের পেশার নামে জায়গাটির নাম। পক্ষান্তরে ভারতের আসামিদের নিয়ে যাওয়া হতো স্ট্রেইটস সেটলমেন্টসে, তাই সেগুলোর নাম হয়ে যায় 'ভারতের বোটানি বে'।—অনুবাদক।

শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। তাই স্ট্রেইটস সেটলমেন্টে কোম্পানির সরকার প্রায় পুরোপুরিই নির্ভরশীল ছিল ভারতীয় আসামি শ্রমিকদের ওপর। এদের মাধ্যমেই করানো হতো সকল নির্মাণকাজ। সিঙ্গাপুরে ১৮২৫ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে যত সরকারি প্রকল্প হয়েছে, তার বেশিরভাগ শ্রমশক্তি ছিল এই ভারতীয় আসামিরা।[২৬৭]

ভারতীয় আসামি কথাটার মধ্যে কিন্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনেক অপরাধের দোষীরাও ছিল। চুরি থেকে ঋণের দায় পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর ফরাসিদের হাত থেকে মরিশাস দ্বীপের দখল ছিনিয়ে নেয় ব্রিটিশরা। তখন থেকে ভারতীয় আসামিদের পাঠানো হতে থাকে মরিশাসে। অবশ্য ১৮২৯ সালে তাদের প্রথমবার প্রেরণ করাটা সাফল্যের মুখ দেখেনি। মরিশাসের প্ল্যান্টেশান অর্থনীতি চলত মূলত দাসদের ওপর দিয়ে। কিন্তু দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার পর শ্রমিক-সংকট দেখা দেয়। ফলে ভারত থেকে শ্রমিক আনানোর প্রয়োজন পড়ে। ব্রিটিশরা তাই নতুন করে আসামি প্রেরণ শুরু করে ১৮৩৯ সাল থেকে। ২৫,০০০ ভারতীয় এসে পৌঁছায় ১৮৩৮ সালের মধ্যে। দাসপ্রথা-বিরোধী প্রচারকদের চাপে কিছুকাল নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। ফলে ১৮৩৯-৪২ বছরগুলোতে বন্ধ থাকে ভারতীয় আসামি স্থানান্তর; কিন্তু পরে এই পরিস্থিতি পালটে যায়। কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৮৪৩ সালে ৩০,২১৮ জন পুরুষ এবং ৪,৩০৭ জন নারী শ্রমিক মরিশাসে প্রবেশ করে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যেন শ্রমিকেরা সেখানে থেকে যায়, সেজন্য নারীদের দরকার ছিল। এরপর ১৮৬৮ সালের মধ্যে আইন করে নারী অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ানো হয়। প্রতি ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে কমপক্ষে চল্লিশ জন নারী থাকতেই হবে।

চুক্তিভিত্তিক শ্রমব্যবস্থার অধীনে মরিশাসে স্থানান্তরিত হয় প্রায় ৫,০০,০০০ ভারতীয়। অনেকেই আসামি, কিন্তু বাকিরা এসেছে স্বেচ্ছায়। অবশ্য তাদের ওই স্বেচ্ছাটাও কিছু ক্ষেত্রে জোর করে আদায় করা। জনৈক বিশেষজ্ঞের ভাষ্যে, 'এই শ্রমিকদের আপনি দাস, শিক্ষানবিস বা চুক্তিবদ্ধ—যে নামেই ডাকেন না কেন, সবাইকে বন্দি করেই নিয়ে যাওয়া হতো। ঔপনিবেশিক শ্রমিকদের যে বেসরকারি থেকে সরকারি খাতে নিয়ে যাওয়া হলো, বন্দিত্ব সেই প্রক্রিয়ারই একটা অংশ।'[২৬৮]

ভারতের মূল ভূখণ্ডের আরেকটু কাছাকাছি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও একটা

[২৬৭] প্রাগুক্ত।

[২৬৮] ক্লেয়ার অ্যান্ডারসন, কনভিক্টস অব দি ইন্ডিয়ান ওশান, লন্ডন: প্যালগ্রেইভ ম্যাকমিলান, ২০০০, পৃ. ১০৪–১০৬।

শাস্তিমূলক উপনিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রথম চেষ্টাটা সফল হয়নি। আন্দামান থেকে ৭০০ আসামিকে পেনাং-এ সরিয়ে নেওয়া হয় ১৭৯৬ সালে। তবে ১৮৬০-এর দশকে স্ট্রেইটস সেটলমেন্টগুলোকে ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। তখন আর উপায়ান্তর রইল না ব্রিটিশদের। এখন যদি ভারতীয় আসামিদের স্থানান্তরিত করতেই হয়, তাহলে ওই আন্দামানেই করা লাগবে। তাই সেখানে ১৮৫৮ সালের পর পুনরায় গড়ে তোলা হয় শাস্তিমূলক উপনিবেশ। ব্রিটিশদের চোখে যে ভারতীয়রা রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জই হয়ে ওঠে তাদের শাস্তির ঠিকানা।

স্ট্রেইটস সেটলমেন্টস আর মরিশাস তো ছিলই, বিশ্বের অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশেও ঠাঁই হতো বহু দুর্ভাগা ভারতীয়ের। গায়ানা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা বা প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজিতে তাদের জাহাজযোগে নিয়ে যাওয়া হতো চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে। প্রায় ১৯ থেকে ৩৫ লক্ষ ভারতীয় (কাকে গোনায় ধরা হচ্ছে, এর ভিত্তিতে সংখ্যার তারতম্য হয়) চরম অনিচ্ছায় ঔপনিবেশিক প্রকল্প সফল করতে বিশ্বগোলকের অর্ধেকটা পার হয়ে যায় স্বদেশ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রদানবের চাকায় নাট-বোলটু হিসেবে কাজ করে তারা। চিনি প্ল্যান্টেশানে ঘাম ঝরায়, রাস্তা আর দালান নির্মাণ করে, জঙ্গল সাফ করে। অসহ্য যাত্রায় ভয়াবহ কষ্টের শিকার হয় অনেকে; কেউ-বা পথেই মারা যায়। বাকিদের জীবন কাটে কষ্টে-ক্লেশে।

অধ্যাপক ক্লেয়ার অ্যান্ডারসনের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এসব বিভীষিকার আসল মাত্রা উঠে এসেছে। ১৮৫৬-১৮৫৭ মাত্র এক বছরে কলকাতা থেকে ত্রিনিদাদের একটিমাত্র পথের হিসাব শুনলেই মাথা ঘুরে যায়। জাহাজে করে যতজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, পথিমধ্যে মারা যায় ১২.৩ শতাংশ পুরুষ, ১৮.৫ শতাংশ নারী, ২৮ শতাংশ বালক এবং ৩৬ শতাংশ বালিকা। আরও আছে ৫৫ শতাংশ দুধের শিশুর করুণ মৃত্যু। আবারও স্বীকার করি, মৃত্যুর তুলনা কোনো বিবেকবান মানুষের কাজ নয়, তবুও বলতে হয়, কুখ্যাত 'মিডল প্যাসেজে'ই[২৬৯] দাসমৃত্যুর হার ছিল মোটে ১২.৫ শতাংশ। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক হিসেবে ব্রিটিশ জাহাজে করে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে রওনা হওয়া মানে জীবন-মৃত্যুর লটারি। শেকলবন্দি আফ্রিকান দাসের চেয়েও আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কম।

---

[২৬৯] আফ্রিকান দাসদের আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। এই পথটিকে বলা হতো মিডল প্যাসেজ। মূলত একটি ত্রিমুখী ব্যাবসা-পথের মাঝের অংশ হওয়ার কারণে এর এই নাম; এই পথে ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় পণ্য সরবরাহ, আফ্রিকা থেকে আমেরিকাদ্বয়ে দাস সরবরাহ, এবং আমেরিকাদ্বয় থেকে ইউরোপে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো।

অবশ্য এই করুণ অভিজ্ঞতার সাংস্কৃতিক ফলাফল হিসেবে জন্ম নেয় এক দুঃখে গাঁথা বন্ধন। দাস-শ্রমিকরা হয়ে যায় 'জাহাজি ভাই'। এই ভ্রাতৃত্ব কবিতা, লোকগল্প, সর্বোপরি গানের উপজীব্য হয়ে ওঠে, যেগুলো আজও টিকে রয়েছে।[২৭০]

তাই যতজন দেশান্তরী হয়েছে, তাদের আর ভারতে ফিরে আসার কোনো আশা ছিল না। স্বদেশে যে পরিবারকে ফেলে এসেছে, তাদের সাথে বন্ধন চিরতরে কেটে গেল। চুক্তির পাঁচ বছর শেষ হয়ে গেলে দেশে ফেরার দাবি করার অধিকার অবশ্য অনেকেরই ছিল, কিন্তু সেই অধিকার স্রেফ কাগজে-কলমে। বাস্তব উদাহরণ যদি থেকেও থাকে, একদম হাতেগোনা। (আইন-কানুনের চালাকির মাধ্যমেও অনেককে নিরুৎসাহিত করে ফেলা হতো। যেমন—মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে দাবি না করলে দেশে ফেরার অধিকার বাতিল, কিংবা যাত্রার সাধ্যাতীত খরচ নিজের পকেট থেকে দিতে হবে।) একদম নগণ্য-সংখ্যক ভারতীয় সফলভাবে দেশে ফিরে এসেছে বলে শোনা যায়। কিন্তু আমি এরকম একটা ঘটনারই কেবল হদিস পেয়েছি। জাহাজভরতি একদল দুর্ভাগাকে ১৮৬৮ সালে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট ক্রোইক্স দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ জাহাজেই মারা যায়। তাদের মধ্য থেকেই বেঁচে যাওয়া কয়েকজন ভারতীয় ফিরে আসে স্বদেশে।

ব্রিটিশরা ১৫১৯-১৯৩৯ বছরগুলোর মধ্যে প্রায় ৫৩,০০,০০০ মানুষকে জাহাজযোগে দেশান্তরী করিয়েছে। গবেষকরা খুব সাবধানে এদের নাম দিয়েছেন 'পরাধীন অভিবাসী'। এদের মাঝে ৫৮ শতাংশ দাস, প্রধানত আফ্রিকার; ৩৬ শতাংশ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, প্রধানত ভারতীয়; আর ৬ শতাংশ আসামি, ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশের।[২৭১] যথারীতি এগুলোর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে জরুরি লোকবল সরবরাহ করা, তাদের ঔপনিবেশিক প্রয়োজন পূরণ করা। আর কিছু না হোক, এসবের কারণে কয়েক ডজন দেশের জনসংখ্যার মানচিত্রই পালটে গিয়েছে। এর পরিণাম আজও দৃশ্যমান।

আসামি না হয়েও যারা কথিত স্বেচ্ছায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমের জন্য নাম লিখিয়েছে, তাদের অভিবাসনও কোম্পানি শাসনের অত্যাচারের ফল। হাজারো ভারতীয় কৃষককে তাদের উর্বর জমিজমা থেকে ঘাড় ধরে বের করে আনা

[২৭০] 'জাহাজি ভাই, ব্রাদারহুড অব দ্য বোট' এই গানটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ১৯৭০-এর দশকে রচিত হয়: www.youtu.be/DOh4fsIaTH8.

[২৭১] জি. এস. ভি. প্রসাদ এবং এন. কনকারাথনম, 'কলোনিয়াল ইন্ডিয়া অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশান: ইন্ডিয়ান কনভিক্টস ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড এলসহোয়্যার', ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ, খণ্ড ১ (১৩), ২০১৫।

হয় এবং আফিম চাষ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিদেশ-বিভুঁইয়ে। কেউ-বা ছিল সাবেক সিপাহি, যারা ১৮৫৭ সালের 'সিপাহি বিদ্রোহে'র পর ব্রিটিশদের নির্মম শাস্তি থেকে পালিয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব। (ব্রিটিশদের কাছে অবশ্য এগুলোর কোনো পার্থক্য নেই। তাদের চোখে বিদ্রোহী, 'অপরাধী', এবং দারিদ্র্য থেকে পালাতে-চাওয়া মানুষ সকলেই একই।) এই চরম বেদনাময় এবং শেকড়-কাটা দেশান্তরকে তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিয়েছেন নায়াল ফারগুসন। তার মতে, এর মাধ্যমে 'এশিয়ার সস্তা ও সম্ভবত বেকার শ্রমিকদের রাবার উৎপাদন ও স্বর্ণ খননের মতো কাজ জুটিয়ে দেওয়া' হয়েছে মাত্র। হয়তো আরেকটু মানবীয় দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখেছেন ভারতীয় ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষ। গাঙ্গেয় সমতল ভূমি থেকে কৃষকদের এই জোরপূর্বক দেশান্তরকে তিনি বলেছেন 'যেন ভাগ্য তার মুষ্টির আঘাতে এই ভূমির মাংস ছিন্ন করে ফেলেছে, কেটে নিয়ে গেছে এর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের একটা টুকরোকে'।[২৭২] চারিদিকে নির্জনতা ও নিরাশার এক চিত্র। এরই মাঝে মানুষকে উপড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের আপন আবাসস্থল থেকে। এ এমন এক জঘন্য অপরাধ, যা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাড়িয়ে বেড়াবে।

বর্বর রাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল নিজের সাফাই গেয়েছে এই বলে যে, তারা ছিল আলোকিত স্বৈরাচারী। শাসিতের কল্যাণের জন্যই শাসন করত তারা। চার্চিল ১৯৪৩-এর গ্রীষ্ম ও শরতে যে আচরণ করেছেন, তাতে এই মিথ্যার বেসাতি ভেঙে পড়ে যায়। কিন্তু এর আগেও দুই শতক যাবৎ এই বয়ান মার খেয়ে এসেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে তো মহাজাগতিক মাত্রায় জবরদখল ও ধোঁকাবাজি করেছেই, আরেক দিকে নির্দয়ভাবে দ্বিমতকারীদের দমন করেছে, বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং মিহি কাপড়ের তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছে, যাদের মুনশিয়ানার সামনে ব্রিটেনের তৈরি কাপড় ছিল জবরজং ন্যাকড়ার মতো। চরম বর্বরতাসহকারে ১৮৫৭ সালের 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' দমন করা হয়। হাজারো বিদ্রোহীকে কামানের মুখে বেঁধে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয় বা ফাঁসিতে ঝোলানো হয় জনসমক্ষে। নারী ও শিশুদের গণহত্যা করা হয় (তবে স্বীকার করতেই হয়, সেটা ছিল ব্রিটিশ নারী ও শিশুদের হত্যার প্রতিশোধ), ঝরিয়ে দেওয়া হয় ১,০০,০০০-এরও বেশি প্রাণ।

'ব্রিটিশ ব্রুটালিটি' কথাটা অনেকের কাছে স্ববিরোধী লাগে: হাজার হোক, ব্রিটিশরা ভদ্রতা ও পরিমিতবোধেরই নামান্তর। তারা বন্দুকের মাধ্যমে নয়, বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিজয়ী হয়। রক্তপিপাসু বেলজিয়ানরা কঙ্গোতে যা

---

[২৭২] ঘোষ, সী অব পপিজ, পৃ. ৩৬৭।

করেছে, ব্রিটিশরা নিশ্চয়ই ভারতে সেরকম আচরণ করতেই পারে না?

আলবত করেছে; সব সময় না। আবার রাজা লিওপোল্ডের নীতিহীন খুনি বাহিনী যেরকম নিয়মিত অমানবিক পাশবিকতা করেছে, সেরকমটাও নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যে পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়, এই মূলনীতির কোনো ব্যতিক্রম করতে পারেনি ব্রিটিশরা। ইতিহাসবিদ জন উইলসন বলেছেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের বেশিরভাগ কাজের পেছনে কোনো হিসাবি পরিকল্পনা নয়, বরং অযৌক্তিক আবেগ কাজ করত, বলপ্রয়োগ করা হতো এলোপাতাড়ি। কোনো ব্যাবসায়িক বা রাজনৈতিক দাবি হাসিলের জন্য যতটুকু দরকার, সহিংসতার মাত্রা সাধারণত সেটাকে ছাড়িয়ে চলে যেত।'[২৭৩]

বর্বরতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সকল সামরিক অভিযানের আদি বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশদের শুরুর দিকের এসব নিষ্ঠুরতার কারণ হিসেবে ইতিহাসবিদরা বলেছেন, 'স্থানীয় সমাজের সাথে তাদের মজবুত সম্পর্ক ছিল না, তাই তাদের মাঝে একটা দুর্বলতা ও অক্ষমতার অনুভূতি কাজ করত, তাই ছোটখাটো বিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় অপমানজনক আচরণের মাধ্যমে ক্ষমতা দেখাত তারা।'[২৭৪] (এরকম কদাচারের ফলে ১৭২১ সালের আঞ্জেঙ্গো গণহত্যা সংঘটিত হয়। বারেবারে অসম্মানের শিকার হওয়ার পর ক্ষুব্ধ নাইয়ার যোদ্ধারা বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ সেনা এবং কোম্পানির কর্মীকে কতল করে।) ঘটনার মূল হোতাদের খুঁজে খুঁজে শাস্তি দেওয়া হতো। নিজেদের উন্নততর শক্তিমত্তা নিয়ে দ্বিগুণ সহিংসতায় ঝাঁপিয়ে পড়ত ব্রিটিশরা। সারাক্ষণ আতঙ্কের ভেতরে থাকার কারণে সমঝোতার বদলে শক্তিপ্রয়োগই বেশি পছন্দ ছিল তাদের। আর এর অজুহাত হিসেবে ব্রিটিশরা সর্বদাই পরিস্থিতির দোহাই দিত।

তারা ১৭৯০-এর দশকে তঞ্জোরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা তখন কোম্পানি পর্ষদের সামনে বলেন, 'প্রতিশোধ ছাড়া আর কোনো উপায়ে [বিদ্রোহ দমন] করা অসম্ভব। এর জন্য আমাকে বাধ্য হয়েই গ্রাম লুটপাট ও জ্বালাও-পোড়াও করতে হবে। প্রত্যেকটা পুরুষকে হত্যা করতে হবে। বন্দি করতে হবে নারী ও শিশুদের। এই যুদ্ধের যে ধরন, তাতে এসব কাজ না করে উপায় নেই।'[২৭৫]

একবার কোম্পানির ভারতীয় সিপাহিদের উর্দিতে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয়, যাতে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। ফলে

[২৭৩] উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ৫।

[২৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫–৭৭।

[২৭৫] হাউইট, পৃ. ২১।

১৮০৬ সালে ছড়িয়ে পড়ে ভেলুর বিদ্রোহ। ব্রিটিশরা পাশবিক হিংস্রতায় এই বিদ্রোহ দমন করে। ৩০০ (কিছু বর্ণনামতে ৩৫০) বিদ্রোহীকে একসাথে বাঁধা হয়। লাইন ধরে দাঁড় করানো হয় ফাইভস খেলার কোর্টের দেওয়ালের সাথে। তারপর ৩০ গজ দূরত্ব থেকে গুলি করে মারা হয় সবাইকে। কোনো সংক্ষিপ্ত বিচারপ্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয়নি এতে। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাকিদের আরেকটু আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। ছয় বিদ্রোহীকে কামানের মুখে বেঁধে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়, পাঁচ জনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করা হয়, আট জনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং পাঁচ জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শাস্তিমূলক উপনিবেশে।

হাজারো বিদ্রোহীকে অনুরূপভাবে হত্যা করা হয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়। উভয় লিঙ্গের বিপুলসংখ্যক বেসামরিক নাগরিকেরও একই পরিণতি ঘটে। এলাহাবাদ ও কানপুরের জেনারেল জেইমস জর্জ স্মিথ নিল ছিলেন বিশেষ রকমের রক্তপিপাসু। ঝাঁসির স্যার হিউ রসের ক্ষেত্রেও একই কথা। সেখানে গণহত্যা করা হয় প্রায় ৫,০০০ বেসামরিক ব্যক্তিকে। দুর্ধর্ষ বিদ্রোহিণী রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের শহরের একটা অধিবাসীকেও দয়ামায়া দেখানো হয়নি। পুনরায় দিল্লি দখলের পর সেখানে যে বন্য আচরণ করা হয়, তা একদম মর্মন্তুদ। কুচ চেলান নামক একটা এলাকাতেই গণহত্যা করা হয় প্রায় ১,৪০০ নিরস্ত্র নাগরিককে। এক তরুণ অফিসারের বর্ণনা, 'প্রতিটা জীবিতকে গুলি করার আদেশ আসে। আক্ষরিক অর্থেই গণহত্যা।' এত এত বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয় যে, এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'প্রত্যেকটা রাস্তায় লাশ পড়ে ছিল, পচে যাচ্ছিল রোদের উত্তাপে।' মসজিদে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের টেনেহিঁচড়ে বের করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গণহারে ফাঁসিতে ঝোলানোটা হয়ে যায় নিয়ম। মুঘলদের রাজধানী হিসেবে দিল্লি ছিল ৫ লাখ অধিবাসীর এক গমগমে শহর। সেটাই এখন হয়ে যায় সুনসান ধ্বংসস্তূপ।[২৭৬]

চলতে-ফিরতে খুন করে ফেলাও বিরল ছিল না। কারণ, ভারতীয়দের হত্যা করলে ব্রিটিশদের বিচার-আচারের ভয় নেই। ডেনিস জাড এরকম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক ব্রিটিশ সৈনিকের কানে এলো, দুজন ভারতীয় ব্যক্তি একটা ঠ্যালাগাড়িতে বসে কানপুর নিয়ে আলাপ করছে। এই জায়গায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে বেশ ভয়াবহ সহিংসতা হয়েছিল। সৈনিকটির নিজের ভাষ্যে: 'আমি জাইনতাম এডার অর্থ কী। গিয়া ডাইকা আনলাম টম ওয়াকাররে। হ্যায়ও শুনল তারা "কওনপোর" নিয়া কথা কইতাছে। হ্যায়ও বুজ্জে এডার

[২৭৬] ফার্ডিনান্ড মাউন্ট, টিয়ারস অব দ্য রাজাস।

মানে কী। দিলাম দুইওডারে সাফ কইরা।'[২৭৭]

এরকম কিছু হত্যার অজুহাত না হলেও অন্তত ব্যাখ্যা হিসেবে হয়তো যুদ্ধ-পরিস্থিতির প্রসঙ্গ পাড়া হবে, বিশেষ করে বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। কিন্তু কিছু প্রতিশোধ ছিল একদম ঠান্ডা মাথার খুন। দিল্লি দখলকারী ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের পরিবার; কিন্তু বিশ্রী রকমের আচরণ করা হয় তাদের সাথে। সম্রাটের ১৬ জন পুত্রের মধ্যে বেশিরভাগকেই বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। কয়েকজনকে গুলি করা হয় ঠান্ডা মাথায়; কিন্তু তার আগে তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অতি অবশ্যই পরনের দামি অলংকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বেসামরিক শাসনাধীনেও নৃশংসতা কম হয়নি। সরকারি আদেশে সহিংসতা ঘটে বেসামরিক ব্যক্তিদের ওপর। পাঞ্জাবের মালেরকোটলায় ১৮৭২ সালে প্রায় ৬৫ জন নামধারী শিখকে কামানের মুখে বেঁধে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়। ১৯৩০ সালে পেশোয়ারের কিসসা খানি বাজারে ৪০০ ভারতীয়কে জবাই করা হয়। আর মারধর, চাবকানো, বর্ণবাদী গালাগালি, আক্রমণ, গুলিবর্ষণ, ফাঁসি এবং নানা অভিযোগে দেশান্তরী করার ছোটখাটো ঘটনা তো অসংখ্য। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসে এগুলো ছোট কয়েকটি রক্তবিন্দুমাত্র।

বর্বরতার এসব উদাহরণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনামলের অথবা রাজশাসনের শুরুর দিকের ঘটনা। তাই অজুহাত হিসেবে প্রায়ই বলা হয় যে, তখন যুগ আরেক রকম ছিল, নীতি-নৈতিকতাও ছিল সেরকম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসেও এসব ঘটনা থেমে যায়নি। নানা রকম পাশবিক কৌশল ব্যবহার করা হয় ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন দমন করার জন্য। স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারের মতেই, যদি 'এসব জিনিস [দিনের] আলোয় নিয়ে আসা হয়, তাহলে মুখ দেখানোর জো থাকবে না'। পুলিশের হাতে গণধর্ষণের ঘটনা নেহাত কম নয়। সত্যাগ্রহীদের ভড়কে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় ৭৩ জন নারীর শ্লীলতাহানি করা হয়। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বরফের চাঁইয়ের ওপর নগ্ন করে শুইয়ে রাখা হয় বন্দিদের। কারাগারে মারধর করা হয় হাজারো মানুষকে; এমনকি আকাশ থেকেও বেসামরিক বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণের অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়। শতাব্দীর শুরুতে রাসকিন ঘোষণা করেন, 'আমাদের ভারতীয় শাসনাঞ্চলের অধীনে বা বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ, যত বিপদ, যত সন্ত্রাস, যত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, সবগুলোর কারণ একটাই; আর তা হলো ভারতীয় লুটের মালের প্রতি আমাদের জাতিগত

[২৭৭] ডেনিস জাড, দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার: দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য ব্রিটিশ রাজ, ১৬০০–১৯৪৭, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫, পৃ. ১৩২।

লোভ।'[২৭৮] তিনি দেখিয়ে দেন যে, যে ভারতীয়রা ব্রিটিশ শোষণকে চ্যালেঞ্জ জানায়, তাদের ওপর প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। তারপরও এগুলো থেমে যায়নি।

বিংশ শতকের একটি ঘটনা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদী আচরণের স্বরূপ উঠে এসেছে এখানে। আমি যে বিষয়ে যুক্তিতর্ক করছি, সেটাও পরিষ্কার হবে। ঘটনাটি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপর (উড্রো উইলসনের মধুর ভাষ্যে যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল 'পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করা')। বুঝতেই পারছেন, আমি বলছি জালিয়ানওয়ালা বাগের কথা।

সময়টা ১৯১৯ সাল। উসমানীয় ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যদ্বয় ভেঙে গেছে। তাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে নতুন নতুন জাতিরাষ্ট্র। স্বায়ত্তশাসনের আলোচনা বাতাসে বয়ে বেড়াচ্ছে। ভারত এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের তরে বিপুল পরিমাণ আত্মত্যাগ করেছে। মনে আশা ছিল, এর বিনিময়ে হয়তো একটুখানি স্বায়ত্তশাসনের দক্ষিণা মিলবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সেসব আশাকে কীভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের কপালে জুটেছে কেবল অসাধু মন্টেগু-চেমসফোর্ড 'সংস্কার' এবং শাস্তিমূলক রাওলাট আইন।

এরপর যা ঘটল, তা এরকম—

ভারতীয়রা ১৯১৯ সালের মার্চ ও এপ্রিলে পাঞ্জাবজুড়ে মিছিল করে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। অমৃতসরসহ বহু শহরে স্বাভাবিক ব্যাবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় তারা। হরতাল করে ৩০ মার্চ ও ৬ এপ্রিল। সুনসান সড়ক ও কপাটবদ্ধ দোকানগুলো বুঝিয়ে দেয়, ব্রিটিশদের প্রতারণার প্রতি জনগণ কতটা ক্ষুব্ধ। এটা একধরনের গান্ধিবাদী অহিংস অসহযোগ। হরতালের সময় কোনো সহিংসতা বা বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৯ এপ্রিল পাঞ্জাবের ব্রিটিশ সরকার একেবারে বিনা উসকানিতে গ্রেপ্তার করে দুজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে। তারা হলেন ড. সাইফুদ্দীন কিশলু এবং ড. সত্যপাল। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন এই দুজন। গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অমৃতসরের জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ কার্যালয়ের দিকে। পুলিশ তাদের বাধা দেয়। কিছু ইট-পাথর ছুড়ে মারে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ এর প্রতিশোধ নেয় গুলিবর্ষণের মাধ্যমে। নিহত হয় ১০জন বিক্ষোভকারী। এবারে জনতা ফুঁসে

[২৭৮] জন রাসকিন, দ্য প্লেজারস অব ইংল্যান্ড: লেকচারস গিভেন ইন অক্সফোর্ড, লন্ডন: জি. অ্যালেন, ১৮৮৪, পৃ. ১১১।

ওঠে। তারা চোখের সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যত দৃশ্যমান নিশানা দেখতে পায়, সবগুলোর ওপর আক্রোশ ঝাড়তে শুরু করে। এর সূত্র ধরে যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, তাতে নিহত হয় পাঁচজন ইংরেজ। একজন মিশনারি নারীকেও হামলা করা হয় (যদিও স্বয়ং ভারতীয়রাই পরে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় তাকে)।

ব্রিটিশরা ত্বরিত সেনাদল পাঠায় অমৃতসরের শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করার জন্য। ১১ এপ্রিলের মধ্যে এসে পৌঁছায় ৬০০ সেনা। পরের দিন আসেন তাদের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার। ততদিনে শহর শান্ত হয়ে গেছে। যা-কিছু মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হচ্ছিল, সবই একদম শান্তিপূর্ণ। তারপরও ডায়ার স্রেফ নিজের হম্বিতম্বি দেখানোর জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। ১৩ তারিখে ঘোষণা করেন যে, পাশ ব্যতীত কেউ শহর থেকে বের হতে পারবে না, কোনো বিক্ষোভ বা মিছিল করতে পারবে না, এমনকি তিন জনের বেশি মানুষ এক জায়গায় জড়োও হতে পারবে না। ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে সারা শহর, কিন্তু কোনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ হয়নি। তবে আশেপাশের কিছু জেলার মানুষ এসব নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানতই না। পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করার জন্য একই দিনে শহরে চলে আসে প্রায় ১০-১৫ হাজার মানুষ। জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক একটি দেওয়ালঘেরা বাগানে তারা জড়ো হয়। এটি অমৃতসরের একটি বিখ্যাত জায়গা, যেখানে মানুষ নানা উপলক্ষ্য উদ্‌যাপন করে। কিন্তু এখানে ঢুকতে হয় পাঁচটি সরু রাস্তা দিয়ে।

ডায়ার সমাবেশের কথা জানতে পারেন। কিন্তু উপস্থিত জনতা তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে এসেছে কি না, এ ব্যাপারে কিছু না জেনে এবং যাচাই করার চেষ্টাও না করে ডায়ার সশস্ত্র সামরিক যানে মেশিন গান-সজ্জিত হয়ে সেনাদল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন; এসে গাড়ি থামান বাগানের ফটকের সামনে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বলা বা সতর্কবার্তাটা পর্যন্ত তিনি দেননি। দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, এটা নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ। কিন্তু বাগানঘেরা ইটের দেওয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে ডায়ার তার সেনাদের আদেশ দিয়ে দেন গুলি চালানোর জন্য, তাও মাত্র প্রায় ১৫০ গজ দূর থেকে। হাজারো নিরস্ত্র, নিরীহ পুরুষ, নারী ও শিশুর এই সমাবেশ প্রাণভয়ে চিৎকার করতে থাকে। আতঙ্কে ধাক্কাধাক্কি করতে শুরু করে বদ্ধ ফটকে। কিন্তু ডায়ার তার সেনাদের আদেশ দেন, গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে। সেনাদল যখন গুলিবর্ষণ শেষ করে, ততক্ষণে ছোড়া হয়ে গেছে ১,৬৫০ রাউন্ড। মারা গেছে ৩৭৯ জন (ব্রিটিশরা এই পর্যন্তই স্বীকার করেছে)। আহত হয়েছে আরও

১,১৩৭।[২৭৯] ডায়ার তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলেছেন, খুব কম গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

কোনো সতর্কবার্তাই দেওয়া হয়নি যে, সমাবেশ বেআইনি। কোনো ঘোষণাই করা হয়নি যে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে সরে যাওয়ার কোনো নির্দেশনাই দেওয়া হয়নি। একদম কিচ্ছু না। ডায়ার তার সেনাদলকে ফাঁকা বা পায়ের দিকেও গুলিও ছুড়তে বলেননি। তার আদেশে সেনারা গুলি করেছে নিরস্ত্র ও অসহায় জনতার বুকে মুখে গর্ভে।

ইতিহাসে ঘটনাটি জালিয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যা নামে খ্যাত। নামটা শুনে মনে হয় যেন কত উত্তপ্ত হত্যালীলা হয়েছে, বন্দুকহীন প্রতিপক্ষের ওপর কসাইগিরি চালিয়েছে রক্তপায়ী মারকুটের দল। কিন্তু না, জালিয়ানওয়ালা বাগে এসবের কিছুই হয়নি। ডায়ারের সেনারা শান্তভাবে, প্রায় দৈনন্দিন কাজের মতো শান্তভাবে সারি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। জনতা তাদের না হুমকি দিয়েছে, না আক্রমণ করেছে। যেন সাধারণ একটা কর্মদিবস, তাও কোনো এক দিক দিয়ে অসাধারণ। ঠান্ডা মেজাজে, কৌতুকভরে তারা রাইফেলে গুলি ভরে ফায়ার করেছে। না ছিল কোনো তাড়া, না কোনো অস্থিরতা, ঘাম বা আক্রোশ। চিৎকাররত, হাউমাউরত, পদপিষ্ট জনতার ওপর তারা ম্যাগাজিন খালি করেছে সুপ্রশিক্ষিত দক্ষতায়। বিভীষণ থেকে পালাতে একটামাত্র বেরোবার পথের দিকে যখন তারা দৌড়ে যায়, বৃষ্টির মতো গুলি ছেঁকে ধরে তাদের। ১,৬৫০টা গুলি ছোড়া হয়েছে সেদিন নিরস্ত্র মানবঝাঁকের ওপর। মাত্র ১০ মিনিট পর যখন কাজ শেষ হয়, তখন শত শত মানুষ মরে পড়ে আছে, আরও হাজারো মানুষ পড়ে আছে আহত অবস্থায়, আজীবনের জন্য বিশ্রী রকমের পঙ্গু হয়ে।

জালিয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যা কোনো উন্মত্ত মাদকতা ছিল না, বরং তা ছিল এক সচেতন ও ইচ্ছেকৃত ঔপনিবেশিক আদেশের বাস্তবায়ন। ডায়ারও ছিলেন না কোনো খ্যাপাটে উন্মাদ, বরং ছিলেন এক দক্ষ খুনিমাত্র। নীরস সামরিক কর্তাব্যক্তির মতোই তিনি নিজের কাজ করে গেছেন; কিন্তু তিনি একটি শয়তানি শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধি, যার হয়ে এবং যার প্রতিরক্ষায় তিনি চাকুরিরত। সেদিন পয়লা বৈশাখে তিনি ওই ব্যবস্থার পক্ষ থেকেই এই গণহত্যা করেছেন। এই ব্যাপারটাই তখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে সর্বস্তরের ভারতীয়

---

[২৭৯] ভারতীয়দের অনানুষ্ঠানিক হিসাবে নিহতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১,৪৯৯ পর্যন্তও বলা হয়ে থাকে। তবে ১,৬৫০ রাউন্ড গুলি এবং কমপক্ষে ১,১৩৭ জনের আহত হওয়া নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সঠিক সংখ্যাটা হয়তো এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু একটা। সরকারি হিসাবের ৩৭৯ হলো সর্বনিম্ন। এমনকি সরকারি হিসাবকে যদি সঠিক ধরেও নিই, তাও ১৬৫০টি গুলিতে ১,৫১৬ জন হতাহত হওয়া থেকেই বোঝা যায় ডায়ারের পদক্ষেপ কী পরিমাণ নৃশংস ছিল।

জনগণ। জালিয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যার তাৎপর্যটা এখানেই। উপনিবেশবাদের কদর্যতম চেহারাটা সেদিন বেরিয়ে আসে। যে-কোনো অসম সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে দাস-মালিক উভয় পক্ষকেই একটা সীমারেখা সমঝে চলতে হয়। এই রেখা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মানুষ মনে মনে সেটা ঠিকই বোঝে। ব্রিটিশরা সেদিন ওই সীমাটাই অতিক্রম করে ফেলে। সেখান থেকে আর ফিরে আসার কোনো উপায় নেই।

সেই করাল রবিবারের আগ পর্যন্ত ভারতীয়রা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে সচেতনভাবে চিন্তা করেনি। কিন্তু ওই একটা গণহত্যার ঘটনা লাখো-কোটি ভারতীয়কে পালটে দেয়। সরকার-অনুগতরা হয়ে যায় জাতীয়তাবাদী, সংবিধানপন্থিরা হয়ে যায় আন্দোলনপন্থি। নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নাইট উপাধি ফিরিয়ে দেন রাজার সমীপে। ব্রিটিশ দপ্তরে নিযুক্ত একদল ভারতীয় পদত্যাগ করে সরে আসে। সর্বোপরি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নৈতিক বৈধতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় মহাত্মা গান্ধির মনে। তার চোখে এখন সত্য ও স্বাধীনতার মাঝে কোনো ফারাক নেই। এই সাম্রাজ্য যে মন্দ, এমনকি শয়তানিও বটে, এর যে কোনো আরোগ্য সম্ভব নয়, ভারতকে যে এর থাবা থেকে মুক্ত করতেই হবে—সে ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহই রইল না তার।

ইতিহাসবিদ এ. জে. পি. টেলর এই গণহত্যাকে বলেছেন 'ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুগান্তকারী মুহূর্ত'। আইন-শৃঙ্খলার নামে প্রদত্ত আর কোনো 'শাস্তিই' এতটা হতাহতের কারণ হয়নি। 'পিটারলু গণহত্যায় প্রায় ১১টি প্রাণ ঝরে গেছে। অতলান্তিকের ওপাড়ে ব্রিটিশ সৈনিকেরা উত্তেজিত হয়ে বোস্টনের জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে পাঁচ জনকে হত্যা করে। ইচ্ছেকৃত গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাদের। ডাবলিনে ১৯১৬ সালে যে স্বঘোষিত ইস্টার বিদ্রোহ হয়, তার জবাবে ব্রিটিশরা হত্যা করেছিল ১৬জন আইরিশকে।'[২৮০] জালিয়ানওয়ালা থেকে বোঝা হয়ে গেল, ব্রিটিশদের কাছে ভারতীয়দের জীবন কতটা মূল্যহীন।

সরকারিভাবে এই ঘটনার তদন্ত করে হান্টার কমিশন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ডায়ার অনুশোচনার লেশমাত্র দেখাননি। কখনোই ইতস্তত করেননি নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে। তিনি দাবি করেন, সেখানে 'বিদ্রোহীদের বৈঠক' চলছিল। এটা তার আদেশের লঙ্ঘন, যেটাকে শায়েস্তা না করে উপায়

[২৮০] হেলেন ফাইন, ইম্পেরিয়াল ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট, হনোলুলু: দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস অব হাওয়াই, ১৯৭৭, পৃ. ১২।

ছিল না। 'প্রশ্নটা আর স্রেফ সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার মধ্যে আটকে থাকেনি।' বরং এমন একটা 'নৈতিক শিক্ষা' দেওয়ার দরকার পড়ে যায়, যাতে ভারতীয়রা মাথা নত করতে বাধ্য হবে। ফাঁকা গুলি ছুড়ে কোনো লাভ হতো না, কারণ সেক্ষেত্রে মানুষ 'আবার নিজ জায়গায় ফিরে আসত এবং আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত'। ডায়ার বলেছেন, বেরোবার পথ লক্ষ্য করে গুলি করার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি (অর্থাৎ, প্রধান ফটক ও পাঁচটি সরু প্রবেশপথ)। কারণ, ওসব জায়গাতেই ভিড় ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি দম্ভভরে বলেন, 'নিশানার সংখ্যা বেশ ভালোই ছিল।' গণহত্যা স্থায়ী হয়েছিল ১০ মিনিট, কিন্তু মৃত্যুহার ছিল অবিশ্বাস্য। পাখির মতো গুলি করা বলতে যা বোঝায় আরকি। কাজ যখন শেষ হয়, মৃত আর অর্ধমৃতরা যখন রক্তের বন্যায় শুয়ে গোঙাচ্ছে, ডায়ার তখন তার সেনাদের বলে দেন, আহতদের যেন কোনো সাহায্য না করা হয়। অমৃতসরের সকল ভারতীয়কে আদেশ দেন ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাস্তার ধারেকাছে না আসতে। তাই আত্মীয়-বন্ধুরা একটা পেয়ালা জলও এনে দিতে পারেনি আহতদের মুখে। শরীর মুচড়ে তড়পাতে তড়পাতে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে সাহায্যের নিষ্ফল আবেদন জানিয়ে চলে তারা।

এরপর কিছুকাল চলে ঔপনিবেশিক ত্রাসের রাজত্ব। সালমান রুশদির মতে, নারী মিশনারির ওপর হামলার ঘটনাটাও হয়তো ডায়ারের আক্রোশের একটা কারণ হয়ে থাকতে পারে। 'কোমল-পেলব ইংরেজ গোলাপেরা কামোন্মত্ত কাইল্যাদের হাতে যৌন নিপীড়নের হুমকিতে আছে... এই চিন্তা' তাকে হয়তো অস্থির করে রেখেছিল।[২৮১] সে যা-ই হোক, ধরে নিচ্ছি কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এই গণহত্যার ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠভাবে লেখালেখি করা অসম্ভব। তাই আমরা আমেরিকান বিশেষজ্ঞ উইল ডুরান্টেরই দ্বারস্থ হই না হয়। তার দেওয়া দুর্বিষহ বর্ণনা এরকম :

জেনারেল ডায়ার একটা আদেশ জারি করেন যে, যে রাস্তায় মিশনারি মহিলাটিকে মারধর করা হয়েছে, হিন্দুরা সেই রাস্তা উপুড় হয়ে পার হতে হবে। কেউ হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করলেও সৈনিকরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তাদের। তিনি ৫০০ জন অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেন। সকল শিক্ষার্থীকে বাধ্য করেন প্রতিদিন এসে রোল কলে হাজিরা দেওয়ার জন্য; অথচ এর জন্য অনেককে দিনে ১৬ মাইল করেও হাঁটতে হয়েছে। কোনো অপরাধই করেনি, এরকম শত শত নাগরিক এবং কিছু স্কুল-বালককে জনসমক্ষে চাবুকপেটা করেন তিনি। গ্রেপ্তারকৃতদের বন্দি রাখার জন্য তিনি

---

[২৮১] সালমান রুশদি, 'আউটসাইড দ্য হোয়েইল'।

একটা উন্মুক্ত খাঁচা বানান। তাতে রোদ আটকানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য বন্দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে খোলা ট্রাকে ফেলে রাখেন ১৫ ঘণ্টা যাবৎ। সাধুদের উলঙ্গ দেহে তিনি চুন ঢেলে দেন। তারপর তাদের রোদে উন্মুক্ত করে রাখেন, যেন চুন শুকিয়ে তাদের চামড়া ফেটে যায়। সকল ভারতীয়ের ঘরের বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। আদেশ দেন, [ভারতীয়দের] কাছে থাকা সব বৈদ্যুতিক পাখা তার কাছে এনে জমা দেওয়ার জন্য। এগুলো সব বিনা মূল্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে ব্রিটিশদের মাঝে। সবশেষে, খেতে কর্মরত পুরুষ ও নারীদের ওপর বোমাবর্ষণের জন্য তিনি পাঠান উড়োজাহাজ।[২৮২]

সরকারি তদন্ত পরিষদ মোটাদাগে ডায়ারকে পার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ওদিকে কংগ্রেস মতিলাল নেহরুকে নিয়োগ দেয় এই দুষ্কর্মের একটি খোলাখুলি তদন্ত করার জন্য। তিনি সরেজমিনে তথ্য আদায় করতে তার ছেলে জওহরলালকে অমৃতসরে পাঠান। জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিকথায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে তার অনুসন্ধানের ফল। একটা দেওয়ালে তিনি ৭৭টা পর্যন্ত বুলেটের দাগ দেখেছেন। যে রাস্তা ভারতীয়দের উপুড় হয়ে পার হতে আদেশ করা হয়েছিল, সেখানেও ঘুরে দেখেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, এই উপুড় হওয়া মানে একদম পেটে ভর দিয়ে চলা—'সাপ-কেঁচো যেভাবে চলে'। হাত আর হাঁটুতেও ভর দিতে দেওয়া হতো না। রেলগাড়িতে করে দিল্লি ফেরার পথে তিনি দেখলেন, একই কামরায় ভ্রমণ করছেন স্বয়ং ডায়ার ও একদল ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা। নেহরুর নিজের ভাষ্যমতে, ডায়ার দম্ভভরে জানান দিচ্ছিলেন 'গোটা শহর তার করুণার ভিখারি হয়ে গেছে। তার ইচ্ছে করছে বিদ্রোহী শহরটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে। নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে তিনি সেটা থেকে বিরত আছেন...। তার কথাবার্তা শুনে এবং উন্নাসিক আচরণ দেখে দারুণ হতভম্ব হয়ে গেছি আমি।'

সুমতির অধিকারী কিছু ইংরেজ হয়তো বলবেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার একটা উচ্ছিষ্ট। স্বয়ং সেনাবাহিনীই যাদের সময়ে সময়ে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সেরকমই এক রাক্ষস। এমনিতে ব্রিটিশ রাজের চাকুরিতে নিয়োজিত উর্দিধারীরা সবাই আলোকিত মানুষই। এহেন অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। ডায়ারকে যে রশিছেঁড়া পশুর মতো ছোটাছুটি করতে দেওয়া হয়েছে, এখানেই শেষ নয়, বরং তার বর্বরতার খবরকে ছয় মাস ধরে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল ব্রিটিশরা। তার বাড়াবাড়ির অভিযোগের স্তূপ যখন বিশাল হয়ে যায়, তখন তার গুনাহ-খাতা সাফ করার উদ্দেশ্যে গঠন করা

[২৮২] ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩৪–১৩৫।

হয় হান্টার কমিশন। এই সরকারি তদন্ত কমিশন অনুসন্ধান চালিয়ে স্রেফ এতটুকুই জেনেছে যে, ডায়ার 'মারাত্মক ভুল' করেছেন। অবশেষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসন্ধানী দল যখন একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন তৈরি করে ফেলে, তখন গিয়ে ব্রিটিশরা স্বীকার করে ঘটনা। ডায়ারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাকে তিরস্কার করে হাউজ অব কমন্স। কিন্তু হাউজ অব লর্ডস সেটার ত্বরিত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়। তাকে অবসরে পাঠায় মোটা অঙ্কের অবসর-ভাতাসহ। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবিকণ্ঠ রুডইয়ার্ড কিপলিং তাকে খেতাব দেন 'ভারতের ত্রাণকর্তা পুরুষ' হিসেবে।

এমনকি এতেও তার ভারতবাসী ব্রিটিশ বন্ধুদের মন ভরেনি। গৌরবময় গণহত্যার যথার্থ প্রতিদান হিসেবে আরও কিছু পাওনা আছে তার। তার নিষ্ঠুরতাকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ঘটা করে টাকা উত্তোলন করে তারা, সংগ্রহ করে ২৬,৩১৭ পাউন্ডের এক ঝলমলে অঙ্ক। ওই সময়কার হিসেবে এটা বেশ বড় অঙ্ক এবং এখনকার হিসেবে আড়াই লাখ পাউন্ডের বেশি হবে। তার হাতে এই টাকা তুলে দেওয়া হয় রত্নখচিত একটা তরবারি-সহকারে। ওদিকে মাসের পর মাস ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করার পর জালিয়ানওয়ালা বাগে নিহতদের পরিবার পায় ৫০০ রুপি করে সরকারি ক্ষতিপূরণ। তার মানে, তৎকালীন হিসেবে একেকটা মানবজীবনের দাম ছিল ৩৭ পাউন্ড (বর্তমানের হিসেবে ১৪৫০ পাউন্ড)।

জওহরলাল নেহরু গণহত্যা দেখে যতটা না ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তারচেয়ে বেশি হয়েছেন এ ব্যাপারে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রকাশ্যে ডায়ারকে মাথায় তোলা দেখে। পরে তিনি লিখেছেন, 'এই ঠান্ডা মাথার স্বীকৃতি আমাকে দারুণভাবে স্তম্ভিত করে। এ তো সম্পূর্ণই অন্যায়, অনৈতিক; সরকারি স্কুলের শেখানো ভাষায় বললে, এটা খারাপ আচরণের একশেষ। অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে স্পষ্ট করে বুঝলাম, সাম্রাজ্যবাদ কতটা পাশবিক ও নীতিহীন। কীভাবে তা কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে উঁচু শ্রেণির ব্রিটিশদের আত্মাকে।'

এই দাবি আর করা সম্ভব নয় যে, ডায়ার ভারতবাসী ব্রিটিশদের প্রতিনিধি নন : তারা তো নিজেরাই তাকে আপন করে নিয়েছে—বানিয়েছে নিজেদের ত্রাণকর্তা।

দুর্ভিক্ষ, জোরপূর্বক দেশান্তর ও বর্বরতা

এই তিনটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্বৈরাচারী হলেও আলোকায়িত ছিল না। কিন্তু এতে অবাক হওয়ারই-বা কী আছে? প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বল্ডুইনের কনজারভেটিভ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার উইলিয়াম হিকস তো সেই ১৯২৮ সালেই চাঁছাছোলা ভাষায় এই কথা বলে দিয়েছেন—'আমি জানি অনেক মিশনারি বৈঠকেই বলা হয়ে থাকে, আমরা নাকি ভারত জয় করেছি ভারতীয়দের মানোন্নয়নের জন্য। একদম ভুয়া কথা। আমরা ভারত জয় করেছি ব্রিটিশ পণ্যের দোকান বাড়াতে। আমরা তরবারি দিয়ে ভারত জয় করেছি, এবং তরবারি দিয়েই একে ধরে রাখব। ভণ্ডদের মতো দাবি করব না যে, ভারতের স্বার্থেই ভারত দখলে রাখা উচিত। আমরা সেখানে গিয়েছি একহাতে গজকাঠি এবং আরেক হাতে তরবারি নিয়ে। দ্বিতীয়টা দিয়ে আমরা তাদের অসহায় করে রাখব এবং প্রথমটা ভরতে থাকব তাদের গলার ভেতর।'[২৮৩]

ডায়ারের তরবারিটা তো মণিরত্নে মোড়ানো ছিল। গজকাঠি দিয়ে মাপা হয়েছে ব্রিটিশ কোষাগারের গভীরতা। একটা সরকারের হর্তাকর্তারাই যখন অকপটে এতকিছু বলে দেন, তখন আর তাদের নিন্দা করার জো থাকে না।

---

[২৮৩] উদ্ধৃত হয়েছে ব্রিটিশ রুল কনডেমড, পৃ. ৩৬-এ।

৬

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট যত অজুহাত

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোন কোন অজুহাত বাকি রইল তাহলে?

অ্যালেক্স ফন টুনযেলম্যান তার ইন্ডিয়ান সামার বইয়ের শুরুতে[২৮৪] যে দুষ্টুমিটা করেছেন, তাতে আমার বক্তব্য বেশ জোরালো সমর্থন পায় :

আদিতে দুইটি জাতি ছিল। একটি ছিল সুবিশাল, শক্তিশালী ও নজরকাড়া সাম্রাজ্য, দুর্দান্তভাবে সজ্জিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে অখণ্ড। ইহা ধরণির বিশাল পরিমাণ জমি শাসন করিত। অপরটি ছিল অনুন্নত, আধা-সামন্ততান্ত্রিক জগৎ, ধর্মীয় রেষারেষিতে পর্যুদস্ত এবং নিরক্ষরদের খাবার জোগাইতে অক্ষম, রোগাক্রান্ত ও দুর্গন্ধময় জনগণে ভরতি। প্রথম জাতিটি ভারত, দ্বিতীয়টি ইংল্যান্ড।[২৮৫]

ইতিহাসবিদ অ্যান্ড্রু রবার্টস উত্তেজনার বশে বলে বসেছেন,

'উপমহাদেশের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, সুরক্ষা, কৃষিজ অগ্রগতি, ভাষাগত ঐক্য, সর্বোপরি গণতন্ত্রায়ণ' হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের ফলেই।[২৮৬]

অবশ্য তিনি যেখান থেকে উঠে এসেছেন, তাতে তার এই দাবি করাই সাজে। ভারত তার রাজনৈতিক অখণ্ডতা এবং গণতন্ত্রের জন্য ব্রিটেনের কাছে ঋণী কি না, সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দেখিয়েছি এ দেশে ব্রিটিশদের আইনের শাসন প্রয়োগ কী পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ। ভারতে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং জমিজমা লুণ্ঠনের ফিরিস্তি ফকফকা আলোয় মেলে ধরেছি। রবার্টের 'আধুনিকায়ন, উন্নয়ন [ও] কৃষিজ অগ্রগতি'র দাবি সেখানেই নাঙ্গা হয়ে যায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন উপকারী ও আলোকায়িত ছিল, এই ধারণাকেও ছুড়ে ফেলে দিয়েছি নর্দমায়।

---

[২৮৪] টুনযেলম্যান, ইন্ডিয়ান সামার, পৃ. ৬।

[২৮৫] বাইবেলের সূচনার ভঙ্গি অনুকরণে লিখেছেন।—অনুবাদক।

[২৮৬] অমিত সিংহ, 'থিংক ইন্ডিয়া শুড বি গ্রেইটফুল ফর কলোনিয়ালিজম? হিয়ার আর ফাইভ রিজনস হোয়াই ইউ আর আনবিলিভেবলি ইগনোর‍্যান্ট', দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১০ নভেম্বর ২০১৫।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিনে এই আধুনিকায়ন সম্ভবই ছিল না—এই দাবিটা বিশেষভাবে বিরক্তিকর। যে ভারত তার ইতিহাসজুড়ে বিশ্বের মহত্তম (এবং স্ব স্ব যুগের আধুনিকতম) কিছু সভ্যতার জন্ম দিলো, সেই ভারত কেন নিজে নিজে আজকের উন্নত ও আধুনিক জাতির মতো হতে পারবে না? আমি ইতোমধ্যে দেখিয়েছি, ভারতের ইতিহাস সহস্র বছরের পুরোনো। আর এই গোটা ইতিহাস ভরতি হয়ে আছে ঝলমলে সব অর্জন দিয়ে। অসাধারণ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিজ নিজ যুগে বিশ্বের যে-কোনো জায়গার চেয়ে এগিয়ে থাকা চমৎকার সব শহর, যুগান্তকারী উদ্ভাবন, বিশ্বমানের উৎপাদন শিল্প, সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার উচ্চ মান, সমৃদ্ধি আনয়নকারী অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং উন্নয়নের প্রাচুর্য।

মোটকথা, আজকের সফল 'আধুনিকতা'র যত সূচক রয়েছে, তার সবকটাই ছিল ভারতে। এরপরে তো দেশের সব সম্পদ চুষে নিয়ে গেল ব্রিটিশরা। সেটা যদি না হতো, তাহলে আবারও ভারতের এরকম উন্নতির শিখরে না পৌঁছানোর কোনো জাগতিক কারণই নেই। জনৈক ইংরেজ লেখক ১৯০৭ সালে ইউরোপীয় সামাজিক গণতান্ত্রিক পাঠকদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে লিখেছেন : 'যখনই তাদের নিজের মতো কাজ করতে দেওয়া হয়, তখনই তারা [ভারতীয়রা] সর্বোচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা দেখিয়ে ছাড়ে। এই মহান রাষ্ট্রগুলো হাজার বছর ধরে নিজেদের বিষয়-আশয় নিজেরা খুব ভালোভাবে সামাল দিয়েছে। এমনসব আক্রমণ ও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে এসেছে, যেগুলো হয়তো অন্য কোনো স্বল্পতেজি জাতিকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিত। তাই আজকে কয়েকজন হাতেগোনা সহমর্মী বিদেশিকে সরিয়ে নিলে বা তাড়িয়ে দিলে তারা নিজেদের দেখেশুনে রাখতে পারবে না, এই দাবি উদ্ভট বটে।'[২৮৭]

আমাদের এই যুক্তির পক্ষে সবচেয়ে শক্ত প্রমাণটা চোখের সামনেই আছে। উপনিবেশবাদ ভারতকে এত গভীর আর্থ-সামাজিক ডোবায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসতে হয়েছে তাকে। স্বাধীনতার পরপর ভারত নিজেও কম ভুল করেনি, কিন্তু ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার মাত্র সাত দশক পরেই ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি। ভারতের ঝুলিতে যেসব 'আধুনিক' অর্জন জমা পড়েছে, তার তালিকাটাও বেশ চোখ-ধাঁধানো। প্রথম চেষ্টাতেই মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে মহাকাশযান পাঠাতে সফল-হওয়া প্রথম দেশ ভারত (যে কাজ স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রও করতে পারেনি এবং চীন ও জাপান তা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে)। বিশ দশক

[২৮৭] এইচ. এম. হাইন্ডম্যান, রুইন অব ইন্ডিয়া বাই ব্রিটিশ, পৃ. ৫১৩–৩৩।

ধরে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খুঁটিতে বাঁধা পড়ে থাকতে না হতো, তাহলে আজ কোথায় চলে যেত ভারত?

সাফাই-গায়করা আরও কিছু উপকারের ফর্দ দেয়, যেগুলো নাকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতকে দান করে গেছে। সবার আগে আসে রেলপথের কথা; তারপর ইংরেজি ভাষা, শিক্ষাপদ্ধতি এবং কাঠামোবদ্ধ ক্রীড়া, বিশেষত ক্রিকেট, যে খেলায় সম্প্রতি ভারত দুইবার বিশ্ব-শিরোপা জয় করেছে। এই দাবিগুলো একে একে পর্যালোচনা করা যাক।

কাণ্ড সাফাই-গায়করা প্রায়ই রেলপথ নির্মাণের কথা বলে মনে করিয়ে দেন, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ এই উপমহাদেশকে কত দয়া করে গেছে। অথচ পরাধীন হওয়ার বিপদ এবং খরচ ভোগ না করেই নিজেরা রেলপথ নির্মাণ করে নিয়েছে বহু দেশ। কিন্তু বাস্তবতা আরও বেশি মারাত্মক।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সব হিসাবনিকাশই ছিল নিজেদের সুবিধার কথা ভেবে। রেলপথ নির্মাণও এর ব্যতিক্রম নয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৩ সালে কথা তোলেন যে, রেলপথ নির্মাণ করলে 'বাণিজ্য এবং দেশের প্রশাসন ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ' সহজতর হবে। ১০ বছর পর তার উত্তরসূরি লর্ড ডালহৌসি তুলে ধরেন আরেকটি বিষয়। 'ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসেবে এবং কৃষিজ কাঁচামালের উৎস হিসেবে ভারত... গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।' ভারতের বিশাল জমিনে ব্রিটিশ পণ্য বেচতে চাইলে একটাই উপায়—রেলপথ নির্মাণ। এতে করে শ্রমিকদেরও আনা-নেওয়া করা যাবে যেখানে যখন দরকার। ভারতের খেতখামার আর খনি খুঁড়ে তুলে আনা যাবে এমনসব সম্পদ, যেগুলো পরে পাঠানো হবে ইংল্যান্ডের 'শয়তানি কারখানা'র খাবার হিসেবে।

ভারতীয় রেলপথের পুরো ধারণা আর নির্মাণকাজটাই ছিল একটা ঔপনিবেশিক ধাপ্পাবাজি। ব্রিটিশ শেয়ারহোল্ডাররা রেলপথে বিনিয়োগ করে অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা কামিয়েছেন। বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দিয়েছিল সরকার। আর কোনো নিরাপদ বিনিয়োগে এতটা লভ্যাংশ পাওয়া সম্ভব নয়। সে যুগের হিসেবে এই লাভের হার রীতিমতো আকাশছোঁয়া। এটা সম্ভব হওয়ার একমাত্র কারণ হলো, ব্রিটিশরা ভারতীয় রাজস্বের টাকা থেকে নিজেদের সব ঘাটতি মিটিয়েছে। একটা টাকাও ব্রিটিশ কর থেকে খরচ হয়নি। এহেন নিশ্চিত লাভের প্রণোদনার ফলে বেসরকারি কোম্পানিগুলো মিতব্যয়িতার কোনো চেষ্টাই করেনি। রেলপথ বানাতে আসল খরচ যত বাড়বে, ততই বাড়বে নিরাপদ সুদের হার। ফলে ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে

ভারতে প্রতি মাইল রেলপথ নির্মাণের খরচ পড়েছে গড়ে ১৮,০০০ পাউন্ড; অথচ যুক্তরাষ্ট্রে একই কাজে খরচ হয় মাত্র ২,০০০ পাউন্ড সমমূল্যের ডলার। পুঁজির বিপরীতে ৫ শতাংশ লাভ আদায় করতে করতে রেল কর্তৃপক্ষের বিশ বা তারও বেশি বছর সময় লেগে গেছে। সরকার এই নির্মাণকাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ১৮৮০-এর দশকে। কিন্তু বেসরকারি ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর বদান্যতায় তখনো ভারতে এক মাইল রেলপথ নির্মাণের খরচ ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিগুণ। অথচ ভারতের তুলনায় ওসব দেশের পথঘাটও বেশি দুর্গম, জনসংখ্যাও কম।

শুধু ভারতীয় করদাতা ছাড়া বাকি সকল পক্ষের জন্যই এই ধান্দা ছিল আলাউদ্দীনের চেরাগের মতো। ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব পুঁজিবাজারে যত মুনাফা পাওয়ায় যায়, ভারতীয় রেলপথে শেয়ার কিনলে তার দ্বিগুণ লাভ নিশ্চিত। প্রথম রেলপথ চালু হয় ১৮৫৩ সালে। এর পর ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই বিশ বছরে ব্রিটিশরা যত বিনিয়োগ করেছে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই হয়েছে ভারতীয় রেলপথে। কিন্তু সেই একই রেলপথে ভারতীয় বিনিয়োগকর্তাদের অবদান মাত্র ১ শতাংশ। ব্রিটিশরা টাকা কামাত, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করত এবং সব যন্ত্রপাতিও জোগান দিত। তার মানে, এখানেও মুনাফা ফেরত যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। এই স্কিমটাকে বলা হতো 'সরকারি ঝুঁকিতে বেসরকারি উদ্যোগ'। পুরো লোকসানের ভার ভারতীয় জনগণের ঘাড়ে, আর পুরো মুনাফা ব্রিটিশ বণিকের পকেটে; অথচ এই রেলপথ দিয়েই সে ভারতীয় অর্থনীতির গভীরে ঢুকে পড়তে পেরেছে।

ইংল্যান্ডের ইস্পাত শিল্পের উৎপাদিত জিনিসগুলো ছিল অতিরিক্ত ব্যয়বহুল। এগুলো বেচার জন্য তারা বাজার পাচ্ছিল না। সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত বাজারটা তারা এবার পেয়ে যায় ভারতে। কারণ, রেলপথের জন্য যা-কিছু দরকার, তার প্রায় সবকিছুই ইংল্যান্ড থেকে আসে : রেলের পাত, এঞ্জিন, বগি, যন্ত্রপাতি আর স্থাপনা। তাই ব্রিটিশরা ভারতের কল্যাণে কাজ করেছে—এই দাবিকে রেলপথের যুক্তি দিয়ে ঠেকনা দেওয়া অসম্ভব; বরং এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশরা তাদের সবচেয়ে চমৎকার উপনিবেশটাকে যত না দিয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি কেড়ে নিয়েছে।

ভারতীয়রা পাতিলের তলানি থেকেও খুব একটা খেতে পায়নি। রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কয়লা, লোহার আকরিক, তুলা ইত্যাদি আহৃত সম্পদ পরিবহণ করা। খেত-খনি থেকে তুলে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হতো বন্দরে। সেখানে ব্রিটিশ জাহাজে সব মালামাল বোঝাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের দেশের কলকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য। মানুষ

যাতায়াত করত কালেভদ্রে। উপনিবেশের কোনো স্বার্থ জড়িত থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। ভারতীয়দের ঠেসে ঢোকানো হতো তৃতীয় শ্রেণির বগিতে, যেখানে আসনগুলো কাঠের এবং সুযোগ-সুবিধা একেবারেই নেই। এমনকি ওই যুগেও মানুষ আঁতকে উঠত এসব বগি দেখে। (আর নখদন্তহীন আইনসভায় এগুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতো। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর আইনসভার অধিবেশনে ১৪টি করে প্রশ্ন আসে এ ব্যাপারে। রাষ্ট্রীয় পর্ষদেও আসে বার্ষিক আরও ১৮টি করে প্রশ্ন। অবস্থা যতই খারাপ হয়, ততই বাড়ে উদ্‌বেগ। ১৯৩৭-১৯৪১ সময়কালে প্রশ্নের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬ ও ২৫।[২৮৮] মহাত্মা গান্ধি ভারতে ফিরে আসার পর তার প্রথম জিহাদটা করেন এই তৃতীয় শ্রেণির রেলযাত্রীদের পক্ষে।) তারপরও তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীরা হয়ে ওঠে রেল কর্তৃপক্ষের মুনাফার উৎস। পণ্য পরিবহণের ভাড়া যেন কমিয়ে রাখা হয়, তা নিশ্চিত করে ব্রিটিশ বণিকরা (সত্যি বলতে, বিশ্বের সর্বনিম্ন)। পক্ষান্তরে, রেল কর্তৃপক্ষের আয়ের আসল উৎস ছিল তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের ভাড়া। মানুষ যাতায়াতের যে পরিমাণ চাহিদা, সে অনুযায়ী জোগান নিশ্চিত করার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি রেলপথ নির্মাণের সময়।

আর বর্ণবাদের রাজত্ব তো চলছিলই। অর্থনৈতিক লাভের কথা চিন্তা করে শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত বগি বাতিল করে দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু ভারতীয়দের নাগালে যতগুলো আসন ছিল, তাদের সংখ্যার তুলনায় সেগুলো বিশ্রীভাবে অপর্যাপ্ত। (স্বাধীনতা-পরবর্তী এক দুর্দান্ত কার্টুনে এই ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে। তাতে দেখা যায় একটি অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই ট্রেন। মানুষ তাতে ঝুলে আছে, জানালা আঁকড়ে ধরে আছে, খুব কষ্ট করে ছাদে বসে আছে, তৃতীয় শ্রেণির বগি থেকে উপচে পড়ে যাচ্ছে। আর ওদিকে সোলা টুপি পরিহিত দুজন ব্রিটিশ প্রথম শ্রেণির বগিতে বসে বসে গল্প করছে, 'কী রে ভাই, ট্রেন দেখি পুরাই খালি!')

ডুরান্ট যথার্থই বলেছেন,

> যত যা-ই হোক, রেলপথ নির্মিত হয়েছে 'ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও ব্রিটিশ বণিকদের জন্য...। আমেরিকায় যেরকম পণ্য পরিবহণ থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে, এক্ষেত্রে তেমনটা হয় না (কারণ, ব্রিটিশ বণিকরাই ভাড়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে)। বরং তাদের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীরা—হিন্দুরা। কিন্তু প্রায় খালি গাড়িতেও এসব যাত্রীদের এমনভাবে ঠেসে ঢোকানো হয়, যেন কসাইখানায় গমনরত পশু—এক বগিতে বিশজন বা

[২৮৮] প্রশ্নসংখ্যার এই হিসাবের উৎস অম্ব প্রসাদ, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ: আ স্টাডি ইন পাবলিক ইউটিলিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, মুম্বাই: এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬০।

তারও বেশি...।'

রেল খাতে চাকরিও পেত না ভারতীয়রা। ভারতীয় রেলে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের মানে হলো, ভারতীয় ব্যক্তিরা এই খাতের দক্ষতাগুলো শিখতেও পারছে না; অথচ শিখতে পারলে তাদের কত লাভ হতো। ব্রিটিশরা ভাবত, 'বিনিয়োগ সুরক্ষিত রাখা'র জন্য রেলের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী অবশ্যই ইউরোপীয় হতে হবে। সিগনালম্যান, এবং বাষ্পচালিত ট্রেনের নিয়ন্ত্রক ও মেরামতকারীদের ক্ষেত্রে হয়তো কথাটা ঠিক আছে, কিন্তু সেটাকে টেনে নিয়ে সকল পদের ক্ষেত্রে একই অদ্ভুত নিয়ম করে দেওয়া হয়। এমনকি বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও রেলওয়ে বোর্ডের পরিচালক থেকে শুরু করে টিকিট-সংগ্রাহক পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রধান পদ ছিল সাদা লোকদের অধিকারে। তাদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধাও ভারতীয় মানদণ্ডে না, দেওয়া হতো ইউরোপীয় মানদণ্ডে। মোটাদাগে সেসব টাকা ইংল্যান্ডেই ফেরত যেত।

উপরন্তু এসব নীতিমালা যখন শিথিল হয়, ব্যয়বহুল ইউরোপীয় শ্রমিকদের সংখ্যা যখন কমে আসে, তখনো সবচেয়ে 'ব্রিটিশসুলভ' কর্মীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলমান থাকে। এজন্যই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে রেলওয়েতে চাকরির নাম। কারণ, এককালে যে কাজ ইউরোপীয়রা করত, পরবর্তীকালে এই ইউরেশিয়ানদেরই ভাবা হতো সেই কাজের একমাত্র যোগ্য উত্তরসূরি। তারা কেউ কেউ উঠে এসেছে সামরিক ইয়াতিমখানা থেকে, সকলেই ব্রিটিশ 'আদার র‍্যাংকস'[২৮৯] ও স্থানীয় ভারতীয় নারীদের সন্তান। (তবে এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গোষ্ঠী সংখ্যায় বেশি বড় নয়। তাই দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে এসব চাকরিতে জায়গা পেতে থাকে 'যুদ্ধবাজ' শিখ এবং ফরসা চামড়ার পারসিরা। এতে করে প্রজনন তত্ত্বের ব্যাপারে ব্রিটিশদের ধ্যানধারণাও অক্ষুণ্ণ থাকে। অবশ্য এই লোকেরা চাকরি পেত সীমিত কিছু পরিসরে। যেমন: স্টেশন এলাকার ভেতরে এঞ্জিন চালক হিসেবে এবং কম যাত্রীবিশিষ্ট স্টেশনে।)

রেলসংক্রান্ত বিষয়-আশয়ে ব্রিটিশদের বর্ণবাদ তত্ত্ব পুরোদমে প্রযুক্ত হতে থাকে। ধরে নেওয়া হতো যে, ভারতীয়দের জরুরি অবস্থা সামাল দেওয়ার মতো 'বিবেচনাবোধ ও মনোযোগ' নেই। আর রেলের নিয়মকানুন 'প্রয়োগ এবং কঠোরভাবে মান্য করার মতো অভ্যাস তাদের মাঝে বিরল'। আর্থিক কারণে ১৮৭০-এর দশকে ভারতীয়করণের চেষ্টা শুরু হয়। তখন রেল কর্মকর্তারা তর্ক জুড়ে দেন যে, একজন ইউরোপীয়র সমপরিমাণ কাজ করতে তিন জন করে

---

[২৮৯] নন-কমিশনড অফিসার ও সৈনিক।

ভারতীয় দরকার। ভারতীয় কর্মীদের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ এতই প্রকট ছিল যে, তিন বছর পরীক্ষামূলকভাবে চলার পর নতুন চালকদের প্রশিক্ষণের প্রকল্প বাতিল করে দেওয়া হয়। যেসব চালককে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে, তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মাঠ পর্যায়ের কাজে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচারের যে দ্বিমুখিতা আগেই তুলে ধরেছিলাম, এখানেও তা একদম স্পষ্ট। ১৮৬১ সালে বাংলার কন্নগর ও বালির মাঝে যাতায়াতরত একটি ডাকবাহী এবং একটি মালবাহী ট্রেনের মাঝে সংঘর্ষ হয়। মালবাহী ট্রেনের ইউরোপীয় চালক ও পাহারাদার দুজনেই মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ট্রেনের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল ফায়ারম্যানের হাতে। বেচারার নিজের যে কাজ কয়লা জোগানো, সেটাতেই ব্যস্ত ছিল সে। ফলে ট্রেনটি গিয়ে ডাকবাহী ট্রেনে ধাক্কা মেরে বসে। বিষয়টির তদন্তশেষে ঘুমকাতুরে ইউরোপীয়রা পার পেয়ে যায়, দায়ী করা হয় বাঙালি স্টেশন মাস্টারের অনুপস্থিতিকে।

দ্বিমুখিতা অন্যান্য জায়গায়ও ছিল। ব্রিটেনে প্রচলিত রীতি ছিল মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি। ফায়ারম্যান থেকে চালক হওয়া, ছোট স্টেশন থেকে বড় স্টেশনের স্টেশন মাস্টার হওয়া, সব ক্ষেত্রেই। ভারতে সেটা হয়নি। কারণ, এখানে ছোট পদগুলোতে আছে ভারতীয়রা। তারা পদোন্নতি পেলে ইউরোপীয়দের দখলে থাকা পদগুলো পেয়ে যাবে। বেতন, পদোন্নতি, চাকরির স্থায়িত্ববিষয়ক যেসব নিয়মকানুন ছিল (বর্তমানে যেগুলোকে আমরা মানবসম্পদ নীতি বলে আখ্যায়িত করি), তাতে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসে ১৯০০ সালের মধ্যে। কর্মীদের কয়েকটা শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলা হয়। এগুলো হলো 'ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, বিশুদ্ধ বা মিশ্র নিগ্রো জাতের ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, অ-ভারতীয় এশিয়াটিক ও ভারতীয়। নিয়োগের সময় প্রার্থীর জাতীয়তা ও বর্ণপরিচয় নিশ্চিত করেন একজন মেডিক্যাল কর্মকর্তা এবং প্রার্থীর অতীতবিষয়ক তথ্যে লিপিবদ্ধ করেন সেগুলো। এতেই নির্ধারিত হয়ে যায় ভবিষ্যতে সে কত বেতন, কয়টা ছুটি, কী কী ভাতা এবং কী ধরনের পদোন্নতি পাবে।

লন্ডনের নিকটে কুপার'স হিলে ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রয়াল ইন্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, উদ্দেশ্য ভারতের জন্য প্রকৌশলী তৈরি করা। গণিত, বিজ্ঞান, ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান, ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে যারা উত্তীর্ণ হবে, তারাও ভর্তি হতে পারবে উক্ত কলেজে। এমনভাবে নিয়ম করা হয়েছে, যেন ভারতীয় প্রার্থীরা আগেই বাদ পড়ে যায়। এসব নিয়ম তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও পেয়ে যায়। ১৮৮৬ সালে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের (পিডাব্লিওডি) ১,০১৫ জন প্রকৌশলীর মাঝে মাত্র ৮৬ জন ছিল ভারতীয়।

বর্ণবাদের সাথে যখন যোগ হয় ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ, তখন তার প্রভাব পড়ে কাজের দক্ষতার ওপর। বাংলার জামালপুরে এবং রাজপুতানার আজমিরে দুটি রেল কারখানা স্থাপিত হয় ১৮২৬ সালে। এর উদ্দেশ্য ট্রেনের যত্ন-আত্তি। কিন্তু সেখানকার ভারতীয় কারিগররা এতই দক্ষ হয়ে ওঠে যে, ১৮৭৮ সালে তারা নিজেরাই রেলগাড়ির নকশা ও নির্মাণ শুরু করে দেয়। তাদের সাফল্য ক্রমেই চিন্তার ভাঁজ ফেলে ব্রিটিশদের কপালে। কারণ, ভারতীয়দের বানানো রেলগাড়ি গুণে-মানে ব্রিটিশদের সমান, কিন্তু দামে বেশ সস্তা। তাই ১৯১২ সালে ব্রিটিশরা একটি সংসদীয় আইন পাশ করে, যার ফলে কারখানায় ভারতীয়দের রেলগাড়ি নকশা ও তৈরি করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিন দশক ধরে ভারতীয় কারখানায় যে কাজ সফলভাবে করা হয়ে আসছিল, এই আইনের বলে সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর বদলে তারা এখন থেকে শুধু ব্রিটেন ও শিল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানিকৃত ট্রেনের যত্ন-আত্তি করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ভারত ১৮৫৪ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে ১৪,৪০০ (ব্রিটিশদের মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ) এবং ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি থেকে আরও ৩,০০০ রেলগাড়ি আমদানি করে। অথচ ১৯১২ সালের পর আর একটাও রেলগাড়ি তৈরি হয়নি ভারতে। এর ৩৫ বছর পর যখন স্বাধীনতা আসে, ততদিনে ট্রেন বানানোর কারিগরি জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে গেছে ভারতীয়দের মাথা থেকে। তাই ভারতীয় রেলওয়ে অনুরোধের থালা নিয়ে সেই ব্রিটিশদেরই দ্বারস্থ হয়। আরও একবার ভারতে রেল কারখানা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে বলে তাদের।

তবে এই নাটকের শেষে একটা জুতসই বিশেষ দ্রষ্টব্য রয়েছে। ব্রিটিশ রেলওয়েরের প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা লন্ডনভিত্তিক রেন্ডেল পামার অ্যান্ড ট্রিটোন কোম্পানি। বর্তমানে তারা কারিগরি দক্ষতার জন্য প্রায় পুরোপুরি ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের অঙ্গসংস্থা RITES তাদের এই সেবা প্রদান করে থাকে।

মনে হতে পারে, আমি হয়তো একবিংশ শতাব্দীর আরামকেদারায় বসা একজন নিষ্কর্মা ইতিহাস-সমালোচক। না, বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়রাও এসব ব্যাপার সম্পর্কে খুব ভালো করে ওয়াকিফহাল ছিল, জানত তাদের দেশের নগ্ন শোষণে রেলওয়ে কতটা ঘৃণ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলা পত্রিকা সমাচার তাদের ৩০ এপ্রিল ১৮৮৪ সংখ্যায় লিখেছে, ভারতের জন্য 'লোহার রাস্তাগুলো লোহার শেকল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিদেশি পণ্য চলাচল করছে ফুরফুর করে; কিন্তু উলটো দিকে মারা পড়ছে ভারতীয় শিল্পখাত, বাড়ছে

গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও দাদাভাই দারিদ্র্য। জি. ভি. যোশি, জি. এস. ইয়ের, নেতারা ১৮৯০-এর দশকে সরব হয়ে ওঠেন নওরোজির মতো জাতীয়তাবাদী ঘোষণা করেন, ভারত রেলপথ থেকে কত কম এ ব্যাপারে। স্পষ্ট ভাষায় চলে যাচ্ছে বিদেশে, আর এর জন্য কতটা উপকৃত হচ্ছে, কীভাবে সব মুনাফা বোঝা। তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভারী হয়ে গেছে ভারতের ব্যয়ের আসা টাকাগুলো ভারতে বিনিয়োগ দেন, প্রতিবছর সুদ হিসেবে ইংল্যান্ডে খাত ও সেচকার্যের মতো অবকাঠামো করলে কত উপকার হতে পারত। শিল্প নির্মাণে ব্যয় করা যেত এসব টাকা। (সেচের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হলো, এতে ভারতীয় কৃষকরা উপকৃত হতো; অথচ এই খাতে সরকারি জোগান রেলওয়ের ৯ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।) আর কিছু না হোক, অন্তত ভারতের স্থানীয় অর্থনীতি তো চাঙা হতোই।

গোখেল বলেছেন, 'ভারতীয় জনগণের কাছে যেন মনে হচ্ছে [রেলপথ] নির্মাণ করা হয়েছে মূলত ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক ও ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। আর এতে করে আরও বেশি শোষণের শিকার হচ্ছে আমাদের সম্পদ।' তখনো দাবি করা হতো, রেলপথ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কাজে লাগবে, জনগণের সার্বিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। তখনই ভারতীয়রা বুঝে গিয়েছিল এসব দাবি যে ভুয়া।[২৯০] বরং রেলপথ নির্মাণের পরও অব্যাহত থাকে দুর্ভিক্ষ। কারণ, রেলপথ দিয়ে আরও সহজে শস্য ও কৃষিজ উৎপাদ রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। যে উদ্বৃত্ত খাবার দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হতে পারত, সেগুলো চলে যাচ্ছিল বিদেশের ভোগে।

সমালোচনা আরও আছে। গান্ধি বলেছেন, রেলপথের কারণে বিউবোনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। রেলপথ নির্মাণের পরিবেশগত পরিণাম নিয়ে সেই যুগেও দুশ্চিন্তা ছিল। বাংলা বদ্বীপে যখন সারা সিরাজগঞ্জ রেললাইন তৈরি হয়, তখন ভরাট করে ফেলা হয় অসংখ্য জলপথ, উদ্দেশ্য ছিল সেতু নির্মাণের খরচ কমানো এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে রেলপথকে বাঁচানো। এই করতে গিয়ে জলাবদ্ধ হয়ে যায় উত্তর-পশ্চিমের বিশাল আবাদি এলাকা, ধ্বংস হয়ে যায় সেগুলোর কৃষিজ সম্ভাবনা। এরপর ১৯১৮ সালে বন্যা হয়। রেলওয়ের কারণে আটকে যায় পানির স্বাভাবিক গতিপথ। ভয়াবহ বন্যা হয় এর ফলে।

রেলপথ উন্নয়নের সাথে সাথে বাজারেও বিকৃতি আসে, যেমন চালের দাম আচমকা অনেক বেড়ে যাওয়ার পেছনেও রেলপথ দায়ী। অতীতে জলপথে

---

[২৯০] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য হোরেইস বেল, রেলওয়ে পলিসি ইন ইন্ডিয়া, রিভিংটন, পারসিভাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৮৯৪ এবং এডওয়ার্ড ডেভিডসন, দ্য রেলওয়েইজ অব ইন্ডিয়া: উইথ অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দেয়ার রাইজ, প্রগ্রেস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশান, ই. অ্যান্ড এফ. এন., স্পন, ১৮৬৮।

ধীরগতিতে চাল পরিবহণ হতো। তাই আশেপাশের এলাকায় বিক্রি হতো সেগুলো। সেসব অঞ্চলে চালের দামও থাকত সহনীয় পর্যায়ে। কিন্তু রেলপথের বদৌলতে এখন উদ্‌বৃত্ত ধান সমূলে উপড়ে নেওয়া সম্ভব। তাই ধান-উৎপাদন অঞ্চলের কৃষকেরা (যারা এতদিন অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতেও অংশ নিত) এখন শহুরে ভারতীয় এবং চাল-রপ্তানিকারকদের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়। মাছ বাজারের ক্ষেত্রেও একই কথা।

রেল কর্তৃপক্ষ যে কোনোকালেই ভারতীয়দের স্বার্থের তোয়াক্কা করেনি, তার আরও উদাহরণ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বেশ কয়েকটি রেলপথ খুলে ফেলা হয়। জাহাজযোগে রেলপথগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেসোপটেমিয়ায় মিত্রবাহিনীর যুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য!

মোটকথা, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপন চন্দ্রের কথাটাই ঠিক। তিনি লিখেছেন, ভারতে ব্রিটিশদের রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল 'জঘন্য ও স্বার্থপর...। এতে কেবল ব্রিটিশ বণিক, উৎপাদক ও বিনিয়োগকর্তাদেরই লাভ হয়েছে... আর ঝুঁকি ও খরচের বোঝাটা এসেছে ভারতীয় রাজস্বের ঘাড়ে'; ব্রিটিশদের 'আসল মনোবাসনা' ছিল 'ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে ব্রিটিশ ব্যাবসায়িক উদ্যোগে হাওয়া জোগানো।'[২৯১] অতএব, উপপাদ্য প্রমাণিত।

শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষা

আমার অক্সফোর্ড বক্তৃতার জবাবে একটি ভারতীয় ওয়েবসাইটে জনৈক ব্রিটিশ ব্লগার লিখেছেন, 'ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতার জন্য দরকারি সব জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্র, সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তাসহকারে একটি স্বায়ত্তশাসিত দেশের গোটা ধারণাটাই ভারতে এসেছে বিদেশে-শিক্ষিত ভারতীয়দের হাত ধরে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। স্বাধীনতায় তার অবদান খুব একটা কম নয়। ইংরেজি ভাষার কথাও ভুললে চলবে না। এই জিনিস না থাকলে সর্বভারতীয় আন্দোলন, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি স্রেফ অকল্পনীয়ই রয়ে যেত।'[২৯২]

অনেকেই এই যুক্তিটা সরল মনে বিশ্বাস করেই দিয়ে থাকেন, বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নয়। বলাবাহুল্য, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে মহাত্মা গান্ধির

[২৯১] বিপন চন্দ্র, দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব একোনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া: একোনমিক পলিসিজ অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিডারশিপ, ১৮৮০–১৯০৫, নয়াদিল্লি: হর-আনন্দ পাবলিকেশানস, ২০১০।

[২৯২] জোনাথন ওল্ড, 'হোয়াই আই থিংক শশী থারুর'স স্পিচ ইজ পপুলিস্ট, ওভারসিমপ্লিফায়েড অ্যান্ড ইগনোরস দ্য প্রবলেমস', www.youthkiawaaz.com, ২৮ জুলাই ২০১৫।

ধারণাগুলো জন্ম নিয়েছে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা থেকে; সমর্থন থেকে নয়। তবে ইংরেজি ভাষার উপহারটা অস্বীকারের নয়। হাজার হোক, আমি এই বইখানা এই ভাষাতেই লিখছি। শিক্ষাব্যবস্থাটাও অগ্রাহ্য করা অসম্ভব, এখানেও আমি নিজে জিনিসটার সুফলভোগী। তাই আসুন, দুটো জিনিসকেই কাছ থেকে পরখ করি।

ব্রিটিশরা ভারতকে ১৬ শতাংশ সাক্ষরতার হার দান করে গেছে, নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৮ শতাংশ। ১৯৪৭ সালে প্রতি ১২ জনে মাত্র ১ জন ভারতীয় নারী লিখতে-পড়তে জানত।[২৯৩] খুব আহামরি অর্জন তো মনে হচ্ছে না এটাকে; আর জনগণকে শিক্ষিত করাটা ব্রিটিশদের মাথাব্যথাও ছিল না। উইল ডুরান্ট বলেছেন, 'ব্রিটিশরা যখন আসে, তখন সারা ভারতজুড়ে সামাজিক বিদ্যালয়ের একটা ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ জনসমাজ এসব বিদ্যালয়ের দেখভাল ও পরিচালনা করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা এসব গ্রাম্য সমাজকে ধ্বংস করে দেন, এবং নতুন স্কুল গড়ার কোনো পদক্ষেপই তারা নেননি; ১০০ বছর আগে যতগুলো স্কুল ছিল, এমনকি আজও [১৯৩০]... তার সংখ্যা অতীতের ৬৬ শতাংশ মাত্র। এখন ভারতে ৭,৩০,০০০টি গ্রাম আছে, অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ১,৬২,০১৫ টি। মাত্র ৭ শতাংশ ছেলে এবং ১ শতাংশ মেয়ে স্কুলে পা রাখে, অর্থাৎ মোট জনগোষ্ঠীর ৪ শতাংশ। সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো যে চাঁদা রাখে... তা অনাহারী পরিবারগুলোর সাধ্যে কুলোয় না।'[২৯৪]

মোটকথা, ব্রিটিশদের শিক্ষানীতিতে প্রশংসনীয় তেমন কিছুই ছিল না। ভারতে একসময় গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের গৃহেই অবস্থান করত। তার থেকে শিখে নিত চিন্তার এক গোটা পদ্ধতি। বহু মঠও একইভাবে হয়ে ওঠে শিক্ষার কেন্দ্র। দূরদূরান্তের ভূমি থেকে শিক্ষার্থী আসত সেখানে, এমনকি সুদূর চীন ও তুর্কিয়ে থেকেও। পাল শাসনামলে [অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দী] এসব মঠের আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে যে অঞ্চলগুলো বাংলা ও বিহার নামে পরিচিত, সেখানে মঠগুলো গড়ে ওঠে। এর মধ্যে পাঁচটি ছিল প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বিক্রমশিল, নালন্দা, সোমপুর মহাবিহার, উদন্তপুরি ও জগদ্দল। ভারতীয় শাসকদের অধীনে নিজেদের মধ্যে এক সমন্বিত নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে তারা। ব্রিটিশরা এসে শিক্ষার এসব আদি ও অকৃত্রিম ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দেয়।

---

[২৯৩] ভারতের জনশুমারি, ১৯৫১, নয়াদিল্লি: প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৫২।
[২৯৪] ডুরান্ট, দ্য কেইস ফর ইন্ডিয়া, পৃ. ৩১–৩৫।

অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের প্রতিষ্ঠাতারা যখন এগুলোর চিন্তাও মাথায় আনেননি, তখনো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগদ্‌বিখ্যাত। এতে কর্মরত ছিলেন ২,০০০ শিক্ষক এবং বাস করত ১০,০০০ আবাসিক শিক্ষার্থী। চোখধাঁধানো ক্যাম্পাসে ছিল নয় তলার সমান উঁচু এক গ্রন্থাগার। বলা হয়, সন্ন্যাসীরা হাতে লিখে নথিপত্র ও বইপত্রের অনুলিপি করতেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে সেগুলো সংরক্ষণ করতেন গবেষকরা। বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য খোলা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। পূর্ব দিকের কোরিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত ও ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমের পারস্য ও তুর্কিয়ে থেকে আগত ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করত চারুকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি ও সমরবিদ্যা। সপ্তম শতাব্দীতে কিছু বিখ্যাত চীনা বিশেষজ্ঞ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন ও পড়িয়েছেন। সুয়ানৎ সাং (তাং রাজবংশের) এখানে অধ্যয়নশেষে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন। নালন্দায় অতিবাহিত সময়টুকুর বিস্তারিত বর্ণনা লিখে গেছেন তিনি।

মুসলিম শাসনামলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত ধর্মীয় শিক্ষালয় মাদ্রাসা তো ছিলই, আরও ছিল মক্তব নামক লোকায়ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ফারসি ও ইসলামি শিক্ষা প্রদান করা হতো, সাধারণত উর্দু ভাষায় (যদিও আরবি বা ফারসিও শেখানো হতো)। ব্রিটিশরা দেশ দখলের আগে মুঘলদের দরবারি ভাষা ছিল ফারসি। জনগণের মুসলিম অংশটি কথা বলত উর্দুতে—এটি ফারসি, আরবি ও হিন্দির মিশ্রণ। উত্তর ভারতের বহু হিন্দুও পড়াশোনা করত উর্দু বা ফারসিতে। (দক্ষিণে প্রচলিত ছিল বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা।) মক্তব হলো ১৮৫০-এর দশকের আগেকার একধরনের প্রাথমিক (কিছু ক্ষেত্রে মাধ্যমিক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এগুলো ছিল জাগতিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, যেমন জনপ্রশাসন, বাণিজ্য এবং কাব্যশাস্ত্র-সহ নানান রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি। মক্তবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা যেতে পারত (কিছু জায়গায় বরং হিন্দুদের সংখ্যাই ছিল বেশি)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে বহু মক্তব বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ততদিনে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় ঔপনিবেশিক স্কুলের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে অভিজাত ছাত্ররা।

ব্রিটিশদের চোখে রাজা রামমোহন রায় একজন প্রগতিশীল ও আধুনিকমনা সংস্কারক। তিনিও তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু করেছেন গ্রাম্য পাঠশালা থেকে। সেখানে তিনি শিখেছেন বাংলা, কিছুটা সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা। পরে নয় বছর বয়সে পাটনার এক মাদ্রাসায় শিখেছেন ফারসি ও আরবি। দুই বছর পর তিনি বেনারসে (কাশী) যান সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষত বেদ

ও উপনিষদ, অধ্যয়নের জন্য। এসব এই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ/উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর ঘটনা। তারপর তিনি ভারতের ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ার জন্য ইংরেজি শিখতে শুরু করেন, দারুণ মুনশিয়ানা দেখান এখানেও। কিন্তু এভাবে প্রথমে আদি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন করার ব্যাপারটা ততদিনে বেশ দুর্লভ হয়ে গেছে।

এই তো গেল মঠ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা। এসবের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার নানান প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল ভারতে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মৌখিক শিক্ষা চিরকালই মর্যাদার আসনে আসীন। পাঠ্যপুস্তকের ডামাডোলের ভেতরেই মহাত্মা গান্ধি মৌখিক শিক্ষার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বলেছেন, 'পাঠ্যপুস্তকের প্রতি... আমি কখনোই তেমন একটা টান অনুভব করি না। শিক্ষার্থীর আসল পাঠ্যপুস্তক তার শিক্ষক।' তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্ম নামে তিনি যে ছোট্ট আশ্রমটি স্থাপন করেছিলেন, সেখানে মৌখিক পদ্ধতিতেই নিজের ধ্যানধারণা শিক্ষা দেন তিনি। ছকেবাঁধা লিখিত উপাদানের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি একেবারেই অগ্রাহ্য করেন। এই কাজের পেছনে গান্ধির অনুপ্রেরণা ছিল বেদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের মতো অন্যান্য হিন্দু পাঠ্য। এগুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়েছে মুখে মুখেই। এভাবেই বেঁচে ছিল এ-সকল প্রাচীন জ্ঞান।

আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হওয়ার জন্য ভারতীয় শিক্ষার ঐতিহ্য জরুরি বটে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আধুনিক ভারত যে এর অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে, সেই রূঢ় বাস্তবতা থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে মাত্র ১৬ শতাংশ সাক্ষরতা নিয়ে। এখনো পর্যন্ত বেগ পেতে হচ্ছে বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের ফলে যেসব সুযোগের দুয়ার খুলে গেছে, সেগুলো এখনো আমরা ঠিকমতো ধরতেই পারছি না। এর দায় অন্তত আংশিকভাবে হলেও কিন্তু ব্রিটিশদের চাপানো শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বর্তায়। মাইসুরু ও মারাঠা যুদ্ধের বীর প্রখ্যাত মেজর জেনারেল স্যার টমাস মানরো যথার্থই বলেছেন, 'আমরা এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছি, যার বৈশিষ্ট্যই হলো গোটা জনগোষ্ঠীর চরিত্রের অবক্ষয় ঘটানো। অথচ এই করতে গিয়েই আবার ভান করছি, যেন শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই চরিত্রকে উন্নত করতে কতটা উদ্‌গ্রীব'।[২৯৫] 'ভান করা' কথাটা থেকেই বোঝা যায়, কোম্পানির

[২৯৫] স্যার টমাস মানরো, 'হিজ লাইফ', খণ্ড ৩, উদ্ধৃত হয়েছে ব্রিটিশ রুল কনডেমড বাই ব্রিটিশ দেমসেলভস-এ, পৃ. ১৬।

উদ্দেশ্যের সততার ব্যাপারে এই প্রখ্যাত সেনানায়ক কতটা সন্দিহান।

অবশ্য ব্রিটিশরা তো ভারতকে ইংরেজি ভাষা দান করে গেছে, যেটার উপকার আজও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। আসলেই কি তা-ই? ইংরেজি ভাষা ভারতের প্রতি কোনো উপহার ছিল না, বরং এটাও উপনিবশায়নের এক হাতিয়ার। ভারতীয়দের ইংরেজি দান করা হয়েছে, যাতে করে ইংরেজদের কাজ সহজ হয়। লর্ড ম্যাকাউলি ১৮৩৫ সালে তার কুখ্যাত মিনিট অন এডুকেশান লেখাটি পেশ করেন। সেখানে ইংরেজি শেখানোর ধ্রুপদি কারণখানা তুলে ধরেন তিনি। অবশ্য সেটা শেখানো হবে অল্প কিছু ভারতীয়কে। কারণটা এই—'আমাদের এমন একটা শ্রেণি তৈরি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যারা আমাদের এবং আমাদের শাসিত কোটি মানুষের মাঝে দোভাষী হিসেবে কাজ করবে। এই শ্রেণির মানুষগুলো রক্ত আর ত্বকের দিক দিয়ে ভারতীয় হবে ঠিকই; কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি আর বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে ইংরেজ।' শাসক আর শাসিতের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার জন্য অল্প কয়েকজনকে শেখানো হয়েছিল এই ভাষা। ভারতীয়রা এই সুযোগে ভাষাটাকে নিজেদের মুক্তির হাতিয়ারে পরিণত করে ফেলে—একে ব্যবহার করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচারের জন্য। ঊনবিংশ শতকে আর. সি. দত্ত, দিনশ ওয়াচা, দাদাভাই নওরোজি এবং বিংশ শতকে জওহরলাল নেহরু এ কাজটিই করেছেন। এটা তাদের কৃতিত্ব, ব্রিটিশদের নয়।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগ্রহ শুরু হয় ১৭৯২ সালে। কোম্পানির ইভ্যাঞ্জেলিস্ট চার্লস গ্র্যান্ট সে বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে আশা প্রকাশ করা হয়, 'নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত সমাজ পশ্চিমা শিক্ষা এবং খ্রিষ্টধর্মের সাথে পরিচিতি লাভ করলে একেবারেই পালটে যাবে।' মিশনারি স্কুল স্থাপনের বৈধতা দেওয়া হয় ১৮১৩ সালের সংশোধিত চার্টার আইনে। কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ তখন বাংলার সরকারের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আইনটির ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলা। সেইসাথে আরও বলে দেওয়া হয় যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে 'ইউরোপীয় ও নেটিভদের মাঝে যোগাযোগ উন্নত হবে'। 'ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে পারস্পরিক সম্মানের যে অনুভূতি সৃষ্টি করা দরকার, সেটাও তৈরি হবে।' মোটকথা, এখানে শুধু মিশনারি জযবাই নয়, কোম্পানির স্বার্থও জড়িত। 'আমাদের রাজত্বের নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত না হয়', তখনই কেবল নেটিভদের পছন্দ-অপছন্দকে গ্রাহ্য করা হবে।

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের কাছে ইংরেজি শিক্ষাটা ছিল 'হিন্দু ও মোহামেডান শিক্ষা'র ক্ষতিকর প্রভাবকে বিদূরিত করার একটি মাধ্যম। কিন্তু দার্শনিক

জেইমস মিল ও তার অনুসারীরা পশ্চিমা জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের দাবি তুলতেন পার্থিব ফায়দার জন্য।[২৯৬] অবশ্য মিল সেই কাজটা ইংরেজিতে করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন পাঠ্যগুলো স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে পড়ানো হোক। চার্টার আইনে কিন্তু এই ব্যাপারটারও সমর্থন রয়েছে। 'ভারতের নেটিভদের সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও উন্নয়ন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষায় উৎসাহিত করার' কথা বলা আছে সেখানে।

আপাত সাংঘর্ষিক এই দুটি মতের মাঝে সমন্বয় সাধন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের দায়িত্ব যাদের ঘাড়ে ছিল, তারা দ্রুতই বুঝতে পারলেন, যে-কোনো একটাকে বাদ দিতে হবে। দুই ঘরানার চিন্তকদের মাঝে শুরু হয় বিতর্ক। কিন্তু কোম্পানির স্বার্থ কোনদিকে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ভারতীয়দের সংস্কৃত বা আরবি শেখালে তাতে কোম্পানির ব্যাবসার তেমন কোনো ফায়দা নেই। কিন্তু যে ভারতীয়রা ইংরেজিতে পড়তে ও লিখতে জানে, বলার সময় যত ভুলভালই করুক না কেন, তারা ব্রিটিশদের জন্য উপকারী।

'প্রাচ্যবিদ' ও 'ইংরেজিবিদ'দের মধ্যকার এই বিতর্কে ইংরেজিবিদরা জয়ী হন। এর কৃতিত্বটা দেওয়া লর্ড ম্যাকাউলিকে। তিনি ছিলেন কমিটি অন পাবলিক ইন্সট্রাকশানের সভাপতি। কারও কারও দাবি, ম্যাকাউলির অবদানকে একটু বেশিই ফুলিয়ে দেখানো হয়। তিনি যে পক্ষে ছিলেন, তারা এমনিতেই জিতত। গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক ছিলেন ইংরেজিবিদদের প্রকাশ্য সমর্থক। ম্যাকাউলির কাজ ছিল স্রেফ এই নীতির পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো, নতুন কোনো নীতি বানানো না। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংরেজিবিদদের পক্ষে তার মতো করে স্পষ্ট ভাষায় বিবৃতি আর কেউ দিতে পারেননি। এর প্রভাবও ছিল সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী। শিক্ষাক্ষেত্রে উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য কী, সেটা তিনিই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। প্রাচ্যের শিক্ষাধারাকে তিনি যেরকম ঘোরতর বিদ্বেষ-সহকারে বাতিল করে দিয়েছেন, তার জন্য ভারতে তার এই বক্তব্য সবচেয়ে কুখ্যাতও বটে। যারা এই গোটা কার্যক্রমের সমালোচক, তারাও সঠিক বা ভুলভাবে ম্যাকাউলিকেই সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করেন। (আজও পর্যন্ত ইংরেজি-অপ্রেমী সমালোচকগণ ইংরেজিভাষী ভারতীয়দের 'ম্যাকাউলিপুত্র' বলে খোঁটা মারেন—তাদের সমালোচনাও অবশ্য ইংরেজিতেই।)

ম্যাকাউলি তার মিনিট অন এডুকেশান[২৯৭]-এ স্বজাতিকেন্দ্রিক অবস্থান

[২৯৬] জেইমস মিল, হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, লন্ডন: বল্ডউইন, ক্র্যাডক অ্যান্ড জয়, ১৮১৭, পৃ. ১৫৬।

[২৯৭] জনৈক অনুপ্রাসপ্রেমী ভারতীয় কাইল্যা এটির নাম দিয়েছেন 'ম্যাকাউলির মাতলামি-মার্কা

নিয়েছেন। অর্থাৎ, অন্যের সংস্কৃতিকে বিচার করেছেন নিজেরটার মানদণ্ডে। আর এই কাজ তিনি করেছেন একদম আপসহীনভাবে (সদম্ভে বললেও ভুল হবে না)। সংস্কারপন্থি গভর্নর জেনারেলের সাথে তার দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায়। তাদের মতে, 'বর্তমানে যেসব শ্রেণির মানুষের পক্ষে উচ্চশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের জন্য এমন কোনো ভাষাই ব্যবহার করতে হবে, যেটা তাদের স্বজাতীয় নয়।' প্রাচ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও তার আত্মবিশ্বাস কিছুমাত্র কমেনি। 'কোনো ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটা তাকই ভারত ও আরবের গোটা রচনা-ভান্ডারের সমান মূল্যবান।' এই কুখ্যাত ঘোষণা করতে গিয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, আরব-ভারতের একটা রচনাও তিনি জীবনে পড়ে দেখেননি। 'আমাদের এমন এক জাতিকে শিক্ষিত করতে হবে, যাদের বর্তমানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়।

আমাদের নিজেদের ভাষার গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই, এমনকি পশ্চিমের ভাষাসমূহের মাঝেও এর অবস্থান সকলের ঊর্ধ্বে। ভারতে ইংরেজি হলো শাসক শ্রেণির মুখের ভাষা। সরকারি আসনে বসা উঁচু শ্রেণির নেটিভরাও এ ভাষাতেই কথা বলে... সব বিদেশি ভাষার মধ্যে একমাত্র ইংরেজিই হতে পারে আমাদের নেটিভ প্রজাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী...। মোর ও অ্যাশামের[২৯৮] সামসময়িকদের কাছে গ্রিক আর ল্যাটিনের গুরুত্ব যেরকম ছিল, ভারতের জনগণের কাছে আমাদের ভাষাও সেরকমই...। পশ্চিম ইউরোপের ভাষাগুলো রাশিয়াকে সভ্য বানিয়েছে। তাতারদের ক্ষেত্রে ইংরেজি যা করেছে, হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না বলেই আমার বিশ্বাস...।'

কিন্তু এই বিদেশি জনগোষ্ঠীটা (ভারতীয়রা) এতদিন যাবৎ যেসব নিজস্ব রীতিনীতি ও আইন-কানুন অনুসরণ করে আসছে, সেগুলোর কী হবে? এখানে ম্যাকাউলির জবাব :

> 'অনেকেই জোরাজুরি করছেন যে, হিন্দু আইন মূলত সংস্কৃত বইপত্র থেকে আর মুহাম্মাদীয় আইন আরবি কিতাবাদি থেকে শিখতে হয়। কিন্তু সেটা এখানে মোটেও প্রাসঙ্গিক নয়। পার্লামেন্ট থেকে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে ভারতের একটা প্রামাণ্য সংবিধান তৈরি করার জন্য। সেজন্য ল কমিশন আমাদের সাহায্য করছে। যখন এই [নতুন, ব্রিটিশ-প্রণীত] সংবিধান জারি করা হয়ে যাবে, তখন আর অন্য কোনো আইনের দরকার পড়বে না। মুনসিফ বা সদর আমীনের কাছে শাস্ত্র বা হিদায়া হয়ে পড়বে অপ্রয়োজনীয়। আমি আশা ও বিশ্বাস করি যে, এখন যে ছেলেরা মাদ্রাসা বা সংস্কৃত কলেজে

মিনিট'।

[২৯৮] টমাস মোর এবং রজার অ্যাশাম, ষোড়শ শতকের দুজন ইংরেজ মানবতাবাদী।—অনুবাদক।

ভর্তি হচ্ছে, তারা পড়াশোনা শেষ করার আগেই এই মহান কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এই উদীয়মান প্রজন্মটি সাবালক হওয়ার আগেই আমরা যে জিনিসটা পালটে ফেলব, সেই জিনিস এখন তাদের পড়ানোর কোনো হেতুই আমি দেখি না।'[২৯৯]

(দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাকে বাতিল করে দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তি এখানে দেওয়া হলো, তাতে একটা পরিহাস রয়ে গেছে। ম্যাকাউলি ১৮৩০-এর দশকে যে দণ্ডবিধি তৈয়ার করেন, ব্রিটিশরা সেটা কার্যকর করেছে পুরো এক প্রজন্ম পরে, ১৮৬১ সালে গিয়ে।)

ইংরেজিবিদদের কৃতিত্ব দিতে হয় যে, তারা দেশীয় ভাষাগুলোকে পুরোদমে বাতিল করে দেয়নি। তাদের মতে, পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক জ্ঞান প্রথমে ইংরেজি-জানা অভিজাত শ্রেণির ভারতীয়দের কাছে যাবে। তারপর তাদের মাধ্যমে সেটা সাধারণ জনগণের হাতে পৌঁছাবে দেশীয় ভাষায়। ম্যাকাউলি বলেছেন, 'আমাদের যে সীমিত সামর্থ্য, সেটা ব্যবহার করে জনগণকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা অসম্ভব।' তাই এই অভিজাত, দোভাষী শ্রেণির কাছেই 'আমরা দায়িত্বটি ছেড়ে দিতে পারি। তারা দেশের প্রচলিত উপভাষাগুলোর সংস্কার সাধন করবে। পশ্চিমা নামশাস্ত্র থেকে বিজ্ঞানের পরিভাষা ধার করে সমৃদ্ধ করে তুলবে এসব উপভাষাকে। তারপর আপামর জনসাধারণের কাছে পরিমিত মাত্রায় একটু একটু করে এর জ্ঞান সরবরাহ করতে থাকবে।' আরেক ইংরেজিবিদ 'পুরোপুরি স্বীকার করেছেন যে, আপামর জনগণকে আলোকিত করতে হবে তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে। আর তাই এ-সকল ভাষাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে তোলার গুরুত্ব সর্বাধিক, যাতে এই ভাষাগুলো সকল চিন্তা ও জ্ঞানের ধারক হয়ে উঠতে পারে।'[৩০০] অতএব, ইংরেজি ভাষাকে গণশিক্ষায় পরিণত করাটা কোনোকালেই ব্রিটিশদের নীতি ছিল না। ভারতীয়দের কাছে 'ইউরোপীয়' বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সরবরাহ করার মাধ্যম বলেও মনে করা হয়নি একে। শিক্ষিত ভারতীয়দের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাকি কাজটা নিজেদের ভাষায় করার জন্য।

বাস্তবেও কিছুদূর পর্যন্ত এমনটাই হয়েছিল। আংশিক এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ১৮২৫ সালে দিল্লি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৪০-এর দশকে তৈরি করা হয় ভার্নাকুলার ট্রান্সলেশান সোসাইটি। ইতিহাস, আইন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিষয়ক ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক উর্দুতে অনুবাদ করা হয় এখানে। কাজে

[২৯৯] ম্যাকাউলির মিনিট অন এডুকেশান, ২ ফেব্রু. ১৮৩৫, প্রকাশস্থল হেনরি শার্প, সিলেকশানস ফ্রম দি এডুকেশনাল রেকর্ডস, ব্যুরো অব এডুকেশান, ইন্ডিয়া, ১, কলকাতা, ১৯২০।
[৩০০] উদ্ধৃত করেছেন যাস্টোউপিল এবং ময়র, (১৯৯৯), পৃ. ১৪০–১৪১।

সহযোগিতা করেন পশ্চিমা শিক্ষিত ভারতীয় ও অন্যান্য কলেজ-কর্মকর্তৃবৃন্দ। এভাবেই 'আধুনিক' বিষয়াদির ওপর প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তকগুলো রচিত হয়। হালের পশ্চিমা পাঠ্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়া হয় সেগুলোর মাধ্যমে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে এ-সকল বই স্থানীয় ভাষায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু ভারতে ইংরেজি শিক্ষার যে পরিমাণ প্রসার ও প্রভাব ছিল, এসব দেশীয় ভাষার বই সেটার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পেরেছে কি না সন্দেহ।[৩০১] আজও পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে ইংরেজি শিক্ষাকেই ধরা হয় সাফল্য ও প্রতিপত্তির পাসপোর্ট। ইংরেজি শিক্ষিত বেশিরভাগ ভারতীয় এই ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন কর্মজীবনে এগিয়ে যাওয়ার বাহন হিসেবে। গণমানুষের জন্য অনুবাদক হওয়াটা তাদের কারও লক্ষ্য ছিল না। স্বদেশি ভাষার শিক্ষা এক ইয়াতিম পেশা হয়ে পড়ে থাকে। যাদের ইংরেজি দক্ষতা ঔপনিবেশিক চাকরির জন্য যথেষ্ট ভালো নয়, তাদের জন্যই বরাদ্দ থাকে অনুবাদকের পেশা। ইংরেজিবিদদের উদ্দেশ্য তাই পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এই অবস্থায় আদৌ তা পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।

ব্রিটিশ শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয় মূলত পরীক্ষা গ্রহণকারীর ভূমিকা পালনেই সীমাবদ্ধ থাকে। সত্যিকারের উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম চলত বরং অধিভুক্ত কলেজগুলোতে। সেখানে দুই বছরের একটি বিএ কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ দেওয়া হতো (উচ্চবিদ্যালয় পার হওয়ার পর এক বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে)। ভারতের ব্রিটিশ স্কুলগুলোর মতো কলেজেও প্রচণ্ড জোরারোপ করা হতো মুখস্থবিদ্যার ওপর। পরীক্ষার খাতায়ও সেগুলোই উগরে দিয়ে আসতে হতো। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার হার এতই বেশি ছিল যে, বহু ভারতীয় সগর্বে নামের শেষে লিখত 'বিএ(এফ)'। এফ মানে ফেইল। অর্থাৎ, অতদূর পর্যন্ত যেতে পারাটাই বিশাল কৃতিত্ব, পাশ-ফেল কথা নয়। ঝরে পড়ার হার ছিল সবসময়ই বেশি। কেউ সফলভাবে স্নাতক সম্পন্ন করতে পারলে চারিদিকে হইহই রব পড়ে যেত তাকে নিয়ে। এ এক দুর্লভ অর্জন।

ব্রিটিশ উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশ্লেষণক্ষমতা বা সৃজনশীল চিন্তা শেখানোর মতো কোনো বিষয় ছিল না, মুক্তচিন্তা শেখানো তো দূর কি বাত। শুধু এমন একদল স্নাতক বেরিয়ে আসে, যাদের ইংরেজি ভাষার জ্ঞান সাধারণের চেয়ে একটু ওপরে। তাদের মাঝে ৯০ শতাংশেরই কোনো ইংরেজের সাথে কথোপকথন চালানোর মতো যথেষ্ট জ্ঞান নেই। কিন্তু নিচের দিকের সরকারি চাকরিতে কেরানির পদ পাওয়া কিংবা ইশকুলের মাষ্টার হওয়ার জন্য আবার

[৩০১] মারগ্রিট পেরনাউ (সম্পা.), ডেলহি কলেজ: ট্র্যাডিশনাল এলিটস, দ্য কলোনিয়াল স্টেইট অ্যান্ড এডুকেশান বিফোর ১৮৫৭, নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬।

অতটুকুই যথেষ্ট। (বাকি ১০ শতাংশ মানুষ এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাফল্যের অধিকারী হয়, কেউ-বা ইংল্যান্ডে চলে যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য।) অবশ্য এরচেয়েও খারাপ ব্যাপার ছিল। প্রত্যেকটা স্নাতক তার চিন্তা ও মননে পর্যাপ্ত পরিমাণে পশ্চিমা হয়ে ওঠে—প্রত্যেকটা। ফলে আপন ভারতীয় সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা। জনৈক জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা ১৯১৩ সালে মন্তব্য করেছেন, এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ভারতীয়রা 'সংকর জাতের হয়ে গেছে। কারণ, এদের ইংরেজ মনিবদের ধারণা, কাউকে "শিক্ষিত" করে তোলার একমাত্র উপায় হলো তাকে সাদা রঙের প্রলেপ মেরে ইংরেজ বানিয়ে তোলা।'[৩০২]

পুরো ব্রিটিশ শাসনামল-জুড়ে এই সমস্যা চলমান থাকে। লন্ডনে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত এক বইয়ে একটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দল ঘোষণা করে:

> ভারতীয়দের সকল আকাঙ্ক্ষা এবং শক্ত চরিত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় মানস থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সকল স্বকীয়তা। ইচ্ছে করে অজ্ঞতায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে...। জনগণকে এমন একটা ঘোরের মধ্যে রাখা হয়, যেন তারা ব্রিটিশ শাসনকে চুপ করে সহ্য করে। মানুষের চরিত্র ইচ্ছে করে নীচ করে দেওয়া হয়েছে, চিন্তাচেতনাকে করে দেওয়া হয়েছে বিজাতীয়। ইংল্যান্ডের মহত্ত্ব আর বিশ্বব্যাপী তাদের 'মিশনে'র গল্পই সারাক্ষণ গেলানো হয়...।[৩০৩]

পঙ্কজ মিশ্র যথার্থই বলেছেন:

> ইউরোপের হাতে এশিয়ার পদানত হওয়াটা কেবলই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ছিল না, বরং এই পরাধীনতা একইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এরকম বিজয় অভূতপূর্ব। বিজিতরা বিজেতাদের শুধু ঘৃণা করার বদলে ঈর্ষাও করতে শুরু করে। একসময় বিজেতাদের আপাত জাদুকরী ক্ষমতার রহস্যে হারিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে বিজিতরা।[৩০৪]

পরাধীন ভারতীয় মনের এক কৌতূহল-জাগানিয়া উদাহরণ হলেন কুখ্যাত ইংরেজপ্রেমী নীরদ সি. চৌধুরী। ইনি একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং বহুল বিক্রীত বই অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননৌন ইন্ডিয়ান-এর রচয়িতা। ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতি বইটিকে উৎসর্গ করে তিনি বিদঘুটে ভাষায় লিখেছেন:

---

[৩০২] ফিল্ডিং-হল, পাসিং অব দি এম্পায়ার, পৃ. ২৯৮।

[৩০৩] ব্রিটিশ রুল কনডেমড, পৃ. ৯।

[৩০৪] পঙ্কজ মিশ্র, ফ্রম দ্য রুইনস অব দি এম্পায়ার: দ্য রিভল্ট এগেইনস্ট দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড দ্য রিমেইকিং অব এশিয়া, লন্ডন: অ্যালেন লেইন, ২০১২।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্মৃতির প্রতি, যা আমাদের প্রজাত্ব দান করলেও নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। তবুও আমরা প্রত্যেকেই তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলি 'সিভিস ব্রিটানিকাস সাম',[৩০৫] কারণ আমাদের যা-কিছু উত্তম আর সজীব, তার সবই আকৃতি ও গতি পেয়েছে সেই একই ব্রিটিশ শাসনামলে।[৩০৬]

বাদামি লোক হয়েও নীরদ যেভাবে ঔপনিবেশিক ঈমান-আকীদার ঘেটুবালক হয়ে গেছেন, তাতে করে বিশেষজ্ঞ গবেষণার আদর্শ নমুনা হয়ে উঠেছেন তিনি।[৩০৭] দখলদার সাম্রাজ্য এরকম কিছু 'দেশীয় রাজাকার' তৈরি করে, যারা নিজেদের সংস্কৃতি ও সমাজ থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, বরং সেটার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী। নীরদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি এতই মুগ্ধ যে, ভারতীয়দের প্রকাশ্যে মলত্যাগ বন্ধ করানোর কৃতিত্বও তিনি ব্রিটিশদেরই দিয়ে থাকেন। বাস্তবে ব্রিটিশরা এই কাজ নিয়ন্ত্রণই করতে পারেনি, বন্ধ করানো তো দূরের কথা। বড় বড় শহরের খোলামেলা জায়গায় এই জিনিস কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল মাত্র। এখান থেকে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণা এবং বিদেশি শাসনের প্রতি বাসনার মাঝে একটা দারুণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়।

গবেষক ইয়ান অ্যালমন্ড বলেছেন, 'নিজেকে অপর বানিয়ে দেওয়ার এ দুটি প্রক্রিয়া জোড়া বেঁধে কাজ করে। উপনিবেশায়িত ও ঔপনিবেশিক, বাবু ও নেটিভ, মন ও শরীরের মাঝে যে দূরত্ব, তারই প্রতিফলন এটি।'[৩০৮] ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি ফল হলো নীরদের এই বিজাতি-পূজা। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি একজন 'স্থানচ্যুত ইউরোপীয়/আর্য, যে বর্তমানে তার (সহস্র বছর পূর্বের) পূর্বপুরুষের ভুলের মাশুল দিচ্ছে। ওই পূর্বপুরুষ আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ভুল পথে চলে এসেছিলেন, বসতি গড়েছিলেন অনুপযোগী এক আবহাওয়ায়'। নীরদ তাই ৭৩ বছর বয়সে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নেন। অক্সফোর্ডে চলে গিয়ে সেখানেই অতিবাহিত করেন শতবর্ষী জীবনের বাকি বছরগুলো। মনে মনে অবশ্য তিনি চিরকালই সেখানে বাস করে এসেছেন।[৩০৯]

নীরদ তার জ্ঞান-গরিমাকে একদমই হালকা করে দেখেননি। কথায় কথায়

---

[৩০৫] অর্থ: "আমি ব্রিটিশ নাগরিক"। এটি একটি বিখ্যাত ল্যাটিন স্লোগান "সিভিস রোমানাস সাম" (আমি রোমান নাগরিক)-এর অনুকরণে বলা হয়েছে।—অনুবাদক।

[৩০৬] নীরদ সি. চৌধুরী, অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননৌন ইন্ডিয়ান, লন্ডন: ম্যাকমিলান, ১৯৫১।

[৩০৭] ইয়ান অ্যালমন্ড, দ্য থট অব নীরদ সি. চৌধুরী: ইসলাম, এম্পায়ার অ্যান্ড দ্য লস, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫।

[৩০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

[৩০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

এমনভাবে ধ্রুপদি গ্রিক আর ল্যাটিন উদ্ধৃতি ও ইঙ্গিত দিতে থাকেন, যা তার সোলা টুপির সাথে খুব করে মানিয়ে যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সকল মন্দিরের ওপর সর্ববিধ্বংসী হামলা করে তিনি বই লিখেছেন দ্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, একটা রূপকের জন্যও তিনি সেই পশ্চিমা পৌরাণিক শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হয়েছেন।[৩১০] নীরদ যদিও ভারতের বেশিরভাগ ব্রিটিশ ইতিহাসকে 'সাম্রাজ্যবাদী হম্বিতম্বি' আখ্যা দিয়ে খারিজ করে দিয়েছেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাজের প্রতি তার কামভাব তাতে কিছুমাত্র কমেনি; এমনকি ক্লাইভের চুরি-চামারিও তার কাছে মহান সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের 'ঝলমলে বিপরীত চেহারা'।[৩১১] ডেভিড লেলিভেল্ড একপর্যালোচনায় প্রশ্রয়ের ভাষায় বলেছেন, 'নীরদ চৌধুরী হলেন একই নামধারী ভারতীয় লেখকের তৈরি করা এক কাল্পনিক চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যে বাঙালি বাবু নামে যে গৎবাঁধা চরিত্রটি রয়েছে, তারই এক উদ্ভট, লাগামছাড়া ও জাদুকরি রূপ।'[৩১২] বাঙালি বাবু যে তার ঔপনিবেশিক প্রভুদের অনুকরণের আধখেঁচড়া চেষ্টা-কসরত করে, তা দেখে ভারতের ব্রিটিশরা হাসে। ওদিকে সাম্রাজ্য-পরবর্তী ব্রিটেনকে নীরদ বাবু দেখাতে চেয়েছেন যে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা একদম অসম্ভব। কিন্তু পরিপাটি বাঙালি ধুতি-পরিহিত, উশকোখুশকো একটা লোক অক্সফোর্ডের রাস্তায় বুক উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ব্রিটিশ সভ্যতার অবক্ষয় নিয়ে হা-হুতাশ করছে—এই দৃশ্যটা যে কী পরিমাণ হাস্যকর, তা নীরদ বাবুর মাথাতেই ধরেনি।

তবুও ইংরেজিপ্রেমীর সুন্দর মোজার ভেতর একটা চোখা নুড়িপাথর ঠিকই আটকে গিয়েছিল। স্বয়ং নীরদ চৌধুরীও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে ব্রিটিশদের বর্ণবাদ, নাক-উঁচামি আর কৈবল্যের বড়সড় ভূমিকা ছিল (তার নিজের ভাষায়, 'ইন্দো-ব্রিটিশ ব্যক্তিগত সম্পর্কের নোংরা ইতিহাস')।[৩১৩] ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের আচরণে যে 'অসহ্য অপমান' এবং 'জাতীয় ও ব্যক্তিগত অপদস্থতা' ছিল, তা নিয়ে ঝাল ঝেড়েছেন তিনি। ইয়ান অ্যালমন্ড বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বারবার বর্ণবাদের শিকার হয়ে 'রাজাকার বুদ্ধিজীবী টের পেয়েছেন, তার চুক্তির সীমানা আসলে কোন জায়গায়'। নিজের

[৩১০] সার্সি গ্রিক পুরাণের একজন নারী জাদুকর। সে মানুষকে নেকড়ে, সিংহ ও শূকরে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।—অনুবাদক।

[৩১১] চৌধুরী, অটোবায়োগ্রাফি, পৃ. ৩; চৌধুরী, ক্লাইভ অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১১।

[৩১২] ডেভিড লেলিভেল্ড, 'দ্য নোটোরিয়াস আননৌন ইন্ডিয়ান', নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৩ নভেম্বর, ১৯৮৮।

[৩১৩] চৌধুরী, অটোবায়োগ্রাফি, পৃ. ১৫।

লেখালেখিতে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথিত উদারতাকে ধন্য ধন্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ ব্যাটনের বাড়ি আর শ্বেতাঙ্গ লোকের টিটকারিমাখা চাহনিতে বারবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন গদ্যময় বাস্তবতায়।

পাঠ্য হয়রানি

ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলার শিক্ষা খাতের জন্য ১০,৩২,০২১ রুপি বরাদ্দ করে। সে বছর আর্মি ব্যারাক মেরামত করতেও ব্যয় করা হয়েছে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ। পুরো ব্রিটিশ শাসনামলজুড়েই শিক্ষা খাতে টাকা ঢালার ব্যাপারটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে থাকে। ডুরান্ট ১৯৩০ সালে খেয়াল করলেন, যে অল্প কয়টা টাকা শিক্ষায় বরাদ্দ করা হয়, ব্রিটিশ সরকার সেগুলো নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় ব্যয় করে। 'এমনসব বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ব্যবহৃত ভাষা ইংরেজি, যেখানে শেখানো হয় ইংরেজদের ইতিহাস, সাহিত্য, রীতি ও নৈতিকতা। তরুণরা [ভারতীয়রা] টের পেল, তারা এক নির্দয় প্রক্রিয়ার জাঁতাকলে ঢুকে পড়েছে। এখানে তাদের পিষে বিজাতীয়করণ ও বিভারতীয়করণ করা হচ্ছে, বানানো হচ্ছে নকল ইংরেজ।' সম্ভাব্য সর্বনিম্ন অর্থটুকু ব্যয় করে এই কাজ করা হতো।

ডুরান্টের পর্যবেক্ষণমতে, (১৯৩০ সালে) গোটা ভারতের শিক্ষা খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, একা নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রেই ব্যয় করা হয় তার দ্বিগুণের বেশি। ১৫ বছরের ব্যবধানে ১৮৮২ থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী গণশিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। অথচ এই একই সময়ে ভারতে শিক্ষা খাতে ব্যয় যত বেড়েছে, সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় বেড়েছে তার সাড়ে ২১ গুণ। ডুরান্ট সিদ্ধান্তে আসেন, 'ভারতের নিরক্ষরতার পেছনে যে ব্রিটিশরাই দায়ী, তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই।'

তারপরও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ব্রিটিশদের আচরণের একটা অনিচ্ছাকৃত উপকার ছিল। ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলাটা যেহেতু ব্রিটিশদের নীতিমালায় নেই, সেহেতু বিশিষ্ট ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা ভারতে আসার টান অনুভব করেননি। তাই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ভারতীয়দের অগ্রগতির একমাত্র রাস্তা হয়ে ওঠে শিক্ষা খাত। অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে ১৮৯০-এর দশকের পর থেকে প্রধান প্রধান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে থাকেন ভারতীয়রা। অবশ্য জানা কথা, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ঘোরতর সমর্থক।

ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজিতে পাঠদান ব্যাপক হয়ে ওঠে। যদিও সেটার

প্রাপক ছিল সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় অভিজাত লোকেরা, তারপরও অন্য যেসব বিষয় ইংরেজিতে পড়ানো হতো, তাতে ব্রিটিশদের চিন্তাচেতনা ঢুকে পড়ে—বিশেষ করে ইতিহাসে। ব্রিটিশদের চোখে প্রাক-ঔপনিবেশিক মুঘল ইতিহাস ছিল সরলরৈখিক, নিতান্ত কিছু ধারাবাহিক ঘটনা, যেগুলোর কোনো প্রেক্ষাপট বা বিশ্লেষণ জানার দরকার নেই। আর প্রাক-মুঘল রচনাগুলো তো জন স্টুয়ার্ট মিল এই বলে খারিজ করে দেন যে, '[এসব] পৌরাণিক ইতিহাস... যেগুলো তথ্যের বদলে রূপকথা দিয়ে ঠাসা।'[৩১৪] এগুলোর বদলে ব্রিটিশরা নিজেদের সংস্করণ এনে হাজির করে। ভারতীয় ইতিহাসের 'বাস্তবসম্মত' বর্ণনা দাঁড় করায় তারা। কাঠামোবদ্ধ 'ইউরোপীয়' ঢঙে তাতে যুক্ত করে প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ। কিন্তু এসব কাজের পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বৈধতা দান করা।

ভারতের ইংরেজ-নির্মিত ইতিহাসের স্বরূপ আমরা আগেই দেখেছি। ধর্মের ভিত্তিতে কয়েকটা 'যুগে' ভাগ করা হয়েছে ভারতের অতীতকে। ফলে একদিকে ডিভাইড এট ইম্পেরার শক্তি বেড়েছে, আরেক দিকে ভারতকে এমন এক জাতি বানিয়ে তোলা হয়েছে, যারা নাকি ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে সভ্য হওয়ার জন্য এতদিন উন্মুখ হয়ে ছিল। ব্রিটিশদের যুক্তি, ঐতিহাসিক রচনা হতে হবে 'বাস্তব তথ্যভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ পাঠক্রমের উপযোগী'। তাই ধর্মীয় ও পৌরাণিক রচনাবলি বাদ দিয়ে দেয় তারা। ভারতের কালজয়ী মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণও এই খড়্গে কাটা পড়ে যায়। অথচ ব্রিটিশ স্কুলগুলোতে ইলিয়াড ও ওডিসির মর্যাদা যেরকম, ভারতে মহাভারত-রামায়ণ অন্তত সেরকম একটা জায়গা হলেও পেতে পারত। ধ্রুপদি রচনার প্রতি সেকুলার তাচ্ছিল্যের এই ধারা স্বাধীন ভারতেও অব্যাহত থাকে। তাই এই নিয়ে হাউকাউ করার সুযোগ পেয়ে গেছে হাল জামানার হিন্দুত্ববাদী সরকারও। ব্রিটিশ এবং তাদের ম্যাকাউলিপুত্ররা যে ভারতীয় শিশুদের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ডাকাতি করে গেছে, এই বিষয়টা সামনে তুলে আনে তারা।

ইতিহাস শেখানোর উদ্দেশ্যটা ছিল খোলাখুলি, কিন্তু সাহিত্য শেখানোটা ছিল আরও ছলনাময়। পরাধীন ভারতে ইংরেজি সাহিত্য কী ভূমিকা পালন করেছে, এই বিষয়ে সেরা গবেষণা করেছেন অধ্যাপক গৌরি বিশ্বনাথন।[৩১৫] তিনি দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমেই

[৩১৪] জাভেদ মাজীদ, আনগভার্নড ইম্যাজিনিংস: জেইমস মিল'স দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওরিয়েন্টালিজম, ক্ল্যারেনডন প্রেস, ১৯৯২।

[৩১৫] গৌরী বিশ্বনাথন, মাস্কস অব কনকোয়েস্ট: লিটেরেরি স্টাডি অ্যান্ড ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯।

ভারতীয় অভিজাত শ্রেণিকে পোষ মানানো হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। ভারতে ইংরেজি সাহিত্যকে আলাদা একটা বিষয় হিসেবে পড়ানোর বুদ্ধিটাই এসেছে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। একদিকে ব্রিটিশদের কাছে মনে হতে থাকে যে, ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর মাধ্যমে তারা পরাধীন ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রতি সমীহ ও শ্রদ্ধা তৈরি করতে পারবে, আরেক দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের ধারণা, ভারতীয় সাহিত্যের বড় বড় কাজ 'চরমতম অশ্লীলতা ও অপবিত্রতায় ভরা'। কালীদাসের শকুন্তলাও এই নিন্দাবাদ থেকে বাদ যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ হোরেইস উইলসনের মতে, এটি ভারতীয় সাহিত্যের শিরোমণি, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের স্কুল-কলেজে পড়ানোর অনুপযোগী।

এভাবে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা ম্যাকাউলি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলেন। ইংরেজি সাহিত্যই যে বিশ্বসেরা, এ ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। এই ম্যাকাউলিই তো তার মিনিট-এ বলেছেন 'বিশ্বের সব ভাষা মিলিয়ে ৩০০ বছর আগে থেকে যত সাহিত্য আছে, শুধু বর্তমানের [ইংরেজি] সাহিত্যের মূল্য ওই সবগুলোর চাইতে বেশি...। ইংল্যান্ডের এখনকার সাহিত্যের মূল্য ক্লাসিক্যাল যুগের সাহিত্যের চাইতেও অধিক।' চার্লস ট্রেভেলিয়ান অন দি এডুকেশান অব দ্য পিপল অব ইন্ডিয়া (১৯৩৮) বইয়ে স্বীকার করেছেন যে, এসব কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর পক্ষে যত যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আসলে ম্যাকাউলীয় ধ্যানধারণার পরিণাম।[৩১৬] ম্যাকাউলির ধারণা, প্রাচ্যের জ্ঞানের ওপর ইউরোপীয় জ্ঞানের 'শ্রেষ্ঠত্ব' একদম স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু এ-সকল স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও ম্যাকাউলির প্রচারিত ধারণা কাজে লেগে গেছে। ইংরেজি সাহিত্য পড়ে শিক্ষিত হয়েছে যেসব ভারতীয় ছাত্র, তাদের মুখের ইংরেজি আরও চোস্ত। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যও তাদের বেশি।

ইতিহাস শিক্ষা তো এমনিতেই ছিল ইংরেজ-কেন্দ্রিক, তার ওপর সেটাকে ইচ্ছা করে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেন ব্রিটিশদের সবকিছুর প্রতিই ছাত্রদের মনে মুগ্ধতা তৈরি হয়ে যায়। ব্রিটিশ মানেই সেরা। আর এত বিশাল এক সাম্রাজ্যের প্রজা হতে পারা মানেই সাত জনমের সৌভাগ্য। পুরো মানচিত্রের এত বড় অংশজুড়ে তার লাল রেখা বিস্তৃত, যেখানে সূর্য কখনো অস্তই যায় না। (পরবর্তীকালে জনৈক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ব্যঙ্গ করে

[৩১৬] চার্লস ই. ট্রেবেলিয়ান, অন দি এডুকেশান অব দ্য পিপল অব ইন্ডিয়া, লন্ডন: লংম্যান, ওরম, ব্রাউন, গ্রীন অ্যান্ড লংম্যানস, ১৮৩৮।

বলেছেন, আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য না ডোবার কারণ হলো, স্বয়ং ঈশ্বরও অন্ধকারে ইংরেজদের বিশ্বাস করতে পারেন না।)

ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর দ্বারাও অনুরূপ উদ্দেশ্য হাসিল হয়। যেসব পাঠ্য বাধ্যতামূলক, সেগুলোর মাঝে রয়েছে আর্থার স্ট্যানলির দেশপ্রেমমূলক ইংরেজি কবিতা সংকলন। তাতে কবিতার গুরুত্ব নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন কলকাতার লর্ড বিশোপ (ভাবগাম্ভীর্যসহকারে মন্তব্য করেছেন, 'কারণ একটা সাম্রাজ্য কেবল রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে না'।) বইটি শুরু হয়েছে টেনিসনের বিখ্যাত চরণ দিয়ে, 'যে গানে জাতির হৃদয় শক্তি পায়/তা নিজেই এক কীর্তি।' বলাবাহুল্য, সব কবিতাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণগানসমৃদ্ধ। কবি জি. ফ্ল্যাভেল হেওয়ার্ড স্তবগীতি লিখেছেন, 'গৌরব না হয় মৃত্যু, সত্য-সাহসী হৃদয়ের পাওনা/সসম্মানে বাঁচো, নয়তো কবরে চলে যাও না।' 'নিয়ম মেনে খেলা'র ইংরেজ চেতনাকে ধারণ করে নিউবোল্ট লিখেছেন 'প্লে আপ! প্লে আপ! অ্যান্ড প্লে দ্য গেইম'। আর শ্বেতমানবের দায়িত্বের বোঝা পালনের স্তুতি গেয়ে কিপলিং যেসব কোবতে লিখেছেন, তা পড়ে আপ্লুত হয়ে যায় বিধর্মী প্রজারা। বুকে-মুখে ঔপনিবেশিক গামবুটের সিলছাপ্পড় খেয়ে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে। ('ইস্ট ইজ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট/অ্যান্ড নেভার দ্য টোয়াইন শ্যাল মীট' কলেজে থাকাকালে এই চরণদ্বয় পড়ার পর আমি রাগের মাথায় লিখেছিলাম, 'এক্সেপ্ট অফ কোর্স হোয়েন ইউ লাই ক্রাশড/আন্ডার দ্য ব্রিটিশ'স ফীট!'[৩১৭])

তখনো টেলিভিশন আবিষ্কৃত হয়নি, তাই ইংরেজি শিক্ষিত দিশেহারা পাঠকদের উপনিবেশবাদের ফযীলত গেলানোর আরেকটি মাধ্যম ছিল গল্প-কাহিনি। জর্জ অ্যালফ্রেড হেনটি, হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড এবং খোদ কিপলিং-এর দুর্ধর্ষ বেস্টসেলার বইগুলো এই তালিকায় সবার ওপরে। তাতে রয়েছে এমনসব সাম্রাজ্যবাদী কীর্তিকলাপের আখ্যান, যেখানে নির্ভীক ইংরেজ সর্বদাই অসভ্য প্রতারক কাল্লুদের পরাজিত করে ছাড়ে। কিপলিং তার কুখ্যাত কবিতায় ইংরেজদের (এবং সেইসাথে আমেরিকানদেরও, যারা তখন ফিলিপাইনস জয় করতে ব্যস্ত) আহ্বান জানিয়েছেন 'Take up the White Man's Burden, Send forth the best ye breed/Go bind your sons to exile, to serve your captive's need'. অবশ্য তাদের শাসিত বিজাতীয়রা এতে একটুও কৃতজ্ঞতা দেখাবে না। প্রতিদানের আশা ছাড়াই শ্বেত মানবকে এই দায়িত্বের বোঝা বইতে হবে। 'his old reward :/the blame of those ye better,/The hate of those ye guard'.

[৩১৭] কিপলিং: প্রাচ্য তো প্রাচ্যই আর পশ্চিম পশ্চিম/এ দুয়ের কভু হবে না মিলন। থারুর: যদি না তব মুখ ভোঁতা করে/পাড়া দিয়ে রাখে কোনো ব্রিটিশ। — অনুবাদক।

মহানুভবতাপূর্ণ স্বৈরশাসনের মাধ্যমে শ্বেত মানব এমনসব জাতির অভিভাবকত্ব করবে, যারা 'sullen peoples, Half-devil and half-child'. (কাব্যের মাধ্যমেই এর এক দুর্দান্ত জবাব দিয়েছেন সামসময়িক উদারপন্থি এমপি ও থিয়েটার পরিচালক হেনরি লাবুশিয়ার। তার লেখা 'দ্য ব্রাউন ম্যান'স বার্ডেন' অধিকতর পরিচিতি লাভের দাবিদার। তাই এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমি কবিতাটা উদ্ধৃত করেছি।)

বিংশ শতকের শুরুর দিকের কিছু তুমুল জনপ্রিয় শিশুতোষ গল্পের নায়ক ছিল বিলি বান্টার। বালকদের জন্য প্রকাশিত সস্তা ম্যাগাজিনে তার গল্পগুলো ছাপা হতো। সেখানেও এক ভারতীয় চরিত্র সেঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রজারা এই চরিত্রের মাধ্যমে এমন এক অনুভূতি পাবে, যেন তারাও সাদা প্রভুদের সব দুষ্টুমির সহযোগী। ভারতীয় বালকটি কিন্তু আবার অভিজাত শ্রেণির, নাম হরি জামসেত রাম সিংহ, যে নাম বাস্তবে কারও হওয়ার কথা নয়। তার রাজকীয় রক্তের সাথে যুক্ত হয়েছে ক্রিকেটের মুনশিয়ানা (তার মেধাবী স্বদেশি রঞ্জি যেরকম)। এতসব গুণ সত্ত্বেও তার ইংরেজ সহপাঠীরা তাকে ডাকে 'ইংকি' (কাইল্যা)। সব ছবিতেই সে বন্ধুদের চেয়ে কয়েক পরত বেশি কালো। আর বান্টারের গল্পগুলোতে সর্বদাই সে গুরত্বহীন পার্শ্বচরিত্র। আসল নায়ক ইংরেজ বালকেরাই।

সালমান রুশদি দেখিয়েছেন যে, এভাবে প্রাচ্যের একটা মিথ্যে চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এই প্রাচ্য 'রূঢ়ভাষী রাজকুমার এবং তামাটে ত্বকের সরু নিতম্বের নারীতে ভরা, স্বভাবে অধার্মিক। আগুন আর তরবারিই' তার বৈশিষ্ট্য। এডওয়ার্ড সাইদ তার যুগান্তকারী বই ওরিয়েন্টালিজম-এ বলেছেন, 'এহেন মিথ্যে চিত্রায়ণের উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের পক্ষে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক বৈধতা দাঁড় করানো এবং এশিয়াটিকদের ওপর ককেশিয়ানদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অজুহাত তৈরি করা।' রুশদির মতে, এরকম চিত্রায়ণ শুধু সাম্রাজ্যবাদী অতীতের বৈশিষ্ট্য নয়। 'বর্তমানেও ব্রিটিশ রাজের প্রতি নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেটার একটা নিদর্শন হলো এইসব গল্পের তুমুল সাফল্য। এগুলো যেন আধুনিক ব্রিটেনে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করা রক্ষণশীল মতাদর্শেরই শৈল্পিক প্রতিচ্ছবি'।[৩১৮]

প্রাচ্যবিদদের এতশত চেষ্টা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে এমন ধুমধাড়াক্কা

---

[৩১৮] রুশদি, 'আউটসাইড দ্য হোয়েইল'; আরও দ্রষ্টব্য ক্যাথলিন উইলসন (সম্পা.), আ নিউ ইম্পেরিয়াল হিস্ট্রি: কালচার, আইডেন্টিটি অ্যান্ড মডার্নিটি ইন ব্রিটেন অ্যান্ড দি এম্পায়ার ১৬৬০–১৮৪০ (২০০৪); অ্যান্টোয়নেট বারটন, এম্পায়ার ইন কোয়েশ্চেন: রিডিং, রাইটিং, অ্যান্ড টিচিং ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম, ডারহাম: ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১।

প্রচারণার পরও একটা সমস্যা রয়েই যায় : একজন ভারতীয়কে লিখতে পড়তে বুঝতে শিখিয়ে দেওয়ার পর তার মনের ওপর লাগাম পরানো বেশ দুরূহ। দূরদর্শী উইলিয়াম হাউইট ১৮৩৯ সালে মন্তব্য করেছেন, 'ইংরেজিকে মুখের ভাষা বানিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেইসাথে একটা চিন্তাবিপ্লব ঘটে যাবে না— এমনটা অসম্ভব। ইংরেজি ভাষার হাত ধরে আবশ্যিকভাবেই চলে আসবে ইংরেজ ধ্যানধারণা, ইংরেজ রুচি, ইংরেজি সাহিত্য ও ধর্ম...।'[৩১৯] ইংরেজ রাজনৈতিক ধ্যানধারণার কথা তিনি উল্লেখ না করলেও সেটাও এই তালিকায় আছে। সাম্রাজ্যবাদের কুখ্যাত সাফাই-গায়ক জে. ডি. রিজ ১৯০৮ সালের মধ্যে ব্যাপারটা টের পেতে শুরু করেন। তিনি ঘ্যানঘ্যান শুরু করেন, 'আমাদের স্কুলগুলোতে ছাত্ররা তাদের দৈনিক পাঠের সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদের বুদ্ধিও পান করে।

রুশো, ম্যাকাউলি এবং এমনসব দার্শনিকের রচনা তাদের গেলানো হয়, যেগুলো অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থীদের মনকেও বিকৃত করে দেয়; সমাজতান্ত্রিক ও অবাস্তব স্বপ্ন ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাদের ভেতর। আর ভারতে এই ধাক্কাটা আরও জোরেশোরে অনুভূত হয়, কারণ সেখানকার তরুণদের মন স্বভাবতই আধ্যাত্মিকতাপ্রবণ। মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে তারা দ্রুত শিখে ফেলে। বেশিরভাগই কপর্দকশূন্য। শাসকদের অধীনে করণিকের পদ পাওয়া ছাড়া তাদের জীবিকা নির্বাহের আর কোনো পথ নেই। বেতন হাতে না পেলে সেই শাসকদের অত্যাচারী তকমা দিয়ে দেয় তারা। এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যেসব নিমকহারাম বেরিয়ে আসে, তারা ভারত সরকারকে না সম্মান করে, না ভয় পায়। এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। স্কুলে তারা যেসব সাহিত্য পড়ে বড় হয়, সেগুলোতে যে-কোনো কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারব্যবস্থাকেই তুলোধুনো করা হয়...।'[৩২০]

রিজ ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে অনুনয় করেন, 'লর্ড কার্জনের সাহসী নেতৃত্ব অনুসরণ করুন। আধখেঁচড়া ব্যাচেলর অব আর্টস এবং পুরোদস্তুর বিদ্রোহীদের উৎপাদনে কোনো ধরনের ভরতুকি দেবেন না। এখন হয়তো আর অতীতে ফিরে গিয়ে ইংরেজিবিদদের সিদ্ধান্তকে পালটে দিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ধরুন, হারবার্ট স্পেনসারকে কেন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এত বড় জায়গা দিতে হবে? ভারতীয় ছাত্রদের মাথাকে দর্শন দিয়ে ভরতি করানোর কি আসলেই কোনো দরকার আছে? এটা তো অক্সফোর্ডেও ঝামেলা পাকায়। অসার কাল্পনিক স্বপ্ন এবং সমাজবাদী কচকচানির প্রবণতা তৈরি করে, যা বড়ই

[৩১৯] হাউইট, পৃ. ৮৮।
[৩২০] জে. ডি. রিজ, দ্য রিয়েল ইন্ডিয়া, লন্ডন: মেথুয়ান, ১৯০৮, পৃ. ১৬২–১৬৩।

আফসোসের ব্যাপার।'[৩২১]

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে হতে আসলেই ইংরেজি শিক্ষার বদৌলতে একশ্রেণির ইংরেজিভাষী ভারতীয় গড়ে ওঠে। ব্রিটিশদের সাহিত্য, দর্শন ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ওপর তাদের দখল বেশ ভালোই। কিন্তু যখন তারা অধিকারের জন্য ঝনঝনানি শুরু করে, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দাবি করতে শুরু করে, তখনই প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় তারা।

অবশ্য আরেক দল মানুষ তো চিরকালই ছিল, যাদের দাবিমতে আসল সমস্যাটা ভারতীয়দের আচরণে, বিশেষত বর্ণসংক্রান্ত ব্যাপারে। একই শ্রেণিকক্ষে নানা জাতপাতের ছেলে একসাথে মিশবে, এটা চিন্তা করেই ভয়ে শিউরে উঠত সনাতনী ভাবধারার বহু ভারতীয়। ভারতীয়রা স্কুলে ভিন্ন বর্ণের সাথে মিশতে চায় না—এই আপত্তির জবাব দিয়ে দিয়েছেন ডুরান্ট। তিনি দেখিয়েছেন 'রেলওয়ে কোচ, ট্রামগাড়ি ও কলকারখানায়' আগে থেকেই অবাধে মেলামেশা করে আসছে সব বর্ণের মানুষ। 'বর্ণপ্রথাকে জয় করার সেরা জায়গাই ছিল স্কুল।' কিন্তু ব্রিটিশরা সনাতনীদের কাল্পনিক আপত্তিকে ঢাল বানানোর চেষ্টা করে। কারণ, এতে করে তারা শিক্ষা খাতে আরও টাকা ঢালার হ্যাঁপা থেকে বেঁচে যাবে।

তারপরও স্মরণীয় কিছু ব্যতিক্রম ছিল। দলিত সংস্কারকদের পথিকৃৎ জ্যোতিবা ফুলের জন্ম বাগানমালীদের 'নিম্নতর' বর্ণে। তা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজি স্কুলে ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর বর্ণের বন্ধুদের সাথে পড়াশোনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে শক্তিশালী করে তুলেছেন বিশ্বের নানা প্রান্তের সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজের সমাজকে পালটে দিয়ে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার পাত্র হয়ে উঠেছেন। অনেকেই তাকে ডাকত মহাত্মা ফুলে। তিনি যে শুধু দলিতদের ক্ষমতায়ন এবং নারীশিক্ষারই অগ্রপথিক হয়েছেন, তা-ই নয়, সাম্যের পক্ষে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মুখপাত্রও হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার কৃতজ্ঞতা হিসেবে নিজের লেখা গুলামগিরি (১৮৭৩) বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'যুক্তরাষ্ট্রের সুহৃদ জনগণে'র প্রতি। অল্প কয়েক দশক পর তার পদচিহ্ন অনুসরণ করেন ড. বি. আর. আম্বেদকার। অবশ্য ভারতে স্কুলশিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন বিদেশে—ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় স্থানেই।

দাবি করা হয়, ব্রিটিশরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাছবিচার করেনি। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও ব্রিটিশরা সকল বর্ণের জন্যই শিক্ষার দুয়ার খোলা

[৩২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

রেখেছিল। পক্ষান্তরে ভারতীয় নেতারাই তর্কাতর্কি করছিলেন যে, সবাইকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত কি না। 'মধ্যমপন্থি' কংগ্রেস নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল কিন্তু ১৯১১ সালে গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদে একটা প্রস্তাবনা তুলেছিলেন সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার। ভিটালভাই পাতিলও একই কাজ করেন ১৯১৬ সালে। কিন্তু দুটো প্রস্তাবনাই বাতিল হয়ে যায় ব্রিটিশ ও সরকার-নিযুক্ত সদস্যদের ভোটে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধি ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো কড়া জাতীয়তাবাদী দুজন নেতাও যে এই প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেছিলেন, তা অনেকেই জানে না। গান্ধিজি তার হিন্দ স্বরাজ-এ লিখেছেন, 'শিক্ষা বলতে সাধারণত বোঝানো হয় অক্ষরজ্ঞান। ছেলেদের পঠন, লিখন ও গণিত শেখানোর নাম প্রাথমিক শিক্ষা। একজন কৃষক সদ্‌ভাবে তার জীবিকা উপার্জন করে। পৃথিবীর ব্যাপারে সাধারণ জ্ঞান আছে তার। কিন্তু সে নিজের নামটাও লিখতে জানে না। তাকে অক্ষরজ্ঞান শিখিয়ে আপনি করবেনটা কী? এতে কি তার সুখ এক ইঞ্চিও বাড়বে? শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কোনো দরকারই নেই। আমাদের প্রাচীন পাঠশালাব্যবস্থাই যথেষ্ট। আমাদের মতে, আপনাদের আধুনিক স্কুল বেহুদা।'

সৌভাগ্যবশত, এই ব্যাপারে গান্ধিজির আপাত অদ্ভুত মতের জয় হয়নি; কিন্তু তার আসল আপত্তিটা সাক্ষরতা ও শিক্ষা নিয়ে নয়, বরং ব্রিটিশ শিক্ষা নিয়ে। কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে আটটি প্রদেশে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আসে ভারতীয়দের হাতে। গান্ধি তখন বর্ধা স্কিম ফর এডুকেশান নামক একটি পরিকল্পনা তুলে ধরেন। গ্রাম্য শিশুদের জন্য সাত বছরের মৌলিক শিক্ষার ছক কাটা হয় এখানে। এর মধ্যে গ্রাম্য হাতের কাজের ওপর কারিগরি প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টা কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি বটে, কিন্তু এতে হস্তশিল্পের পাশাপাশি মাতৃভাষায় সাক্ষরতা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শারীরিক শিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। ভারতের গ্রামে যে যৎসামান্য ঔপনিবেশিক শিক্ষার সুযোগ ছিল, বর্ধা স্কিম সেটাকে বহুগুণে উন্নত করে দিতে পারত।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার একটা পরিণাম ছিল মন-মগজের পরাধীনতা। নীরদ চৌধুরীর ক্ষেত্রে তো আমরা সেটা চাক্ষুস দেখলাম। পশ্চিম তার নিজের ভাষা, দৃষ্টান্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো এনে সেঁধিয়ে দিয়েছে আমাদের ভারতীয়দের জীবনে। অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা নিজেদের সমাজকে বিচার করতে শুরু করে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ও নান্দনিক মাপকাঠিতে (আশীষ নন্দী খুব তুখোড়ভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীরা একটা 'অ-পশ্চিম' ধারণা নির্মাণ করে, 'যেটা আবার স্বয়ং পশ্চিমেরই নির্মিত ধারণা')। একটা পরাধীন

জাতি নিজেদের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে কীভাবে দেখবে, সেটাকেও বদলে ফেলে উপনিবেশবাদ। জাতীয়তাবাদীরা এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে। আপন সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে চায় তারা। কিন্তু তারা নিজেরা যেহেতু ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্র, সেহেতু তাদের কাজকর্মও স্বভাবত ওই শিক্ষার রঙেই রঙিন রয়ে যায়। অবশেষে ভারত যখন পরাধীনতার দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে স্বাধীন হয়, তখন বুঝে আসে আসল ব্যাপার। ভারতীয়রা টের পায়, সাম্রাজ্যবাদী শাসন তাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও কতটা পঙ্গু ও বিকৃত করে দিয়ে গেছে। আস্তে-ধীরে আসছে এই পরিবর্তন। ভারতীয়রা বুঝতে পারছে যে, নিজের পরিচয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা ছাড়া উন্নয়ন আসবে না। এই তাদের পরিচয়, এই তাদের গর্বের জায়গা, এই রকমই তারা হতে চায়। আজকে একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর কাজ হলো তার সংস্কৃতিকে প্রকাশ করার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করা (এবং পুরোনো উপায়গুলোকে পুনর্জীবিত করা)। একইসাথে তার সমাজও চেষ্টা করতে থাকবে, উপনিবেশবাদ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এখন তার বর্তমান ও বর্ধমান পরিচয়কে কীভাবে নতুন করে তুলে ধরা যায়।

ইংরেজি এখন বিশ্বায়নের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের যতটা না অবদান, তারচেয়ে বেশি অবদান বিংশ শতকে আমেরিকার দাপটের। ভারতও এখন এই ভাষার সুবিধাভোগী। কিন্তু এড্রিয়ান লেস্টার বলেছেন, বিশ্বজুড়ে ইংরেজি আত্তীকরণের ফলে '[ভারত-সহ] সর্বত্র ইংরেজিভাষীদের মাঝে বৈশ্বিক আদানপ্রদান এবং ব্যাবসায়িক লেনদেন গতিশীল হয়েছে বটে, কিন্তু অ-ইংরেজিভাষী প্রজা ও নারীদের বঞ্চনা তাতে বেড়েছে বই কমেনি। ইংরেজিভাষী বিশ্বজুড়ে যে মুনাফা এবং রাজনৈতিক সুবিধার স্রোত বয়ে চলেছে, তারা এ থেকে আরও বেশি বঞ্চিত।'

স্বদেশি ভাষায় সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার একক জোরেই ভারত বাকি বিশ্বের সাথে পাল্লা দিতে পারত—এরকম দাবি আমি করি না। ভারতকে সাক্ষর করে তোলার চ্যালেঞ্জও হয়তো পুরোপুরি মোকাবিলা করা সম্ভব হতো না ওই এক পদ্ধতিতে। কিন্তু জাপানের মতো দেশগুলোকে দেখুন। তাদের সংস্কৃতি হলো নিজেদের ভাষায় শিক্ষিত হওয়া। ভারতও সেরকম করতে পারলে অন্তত একটা মৌলিক সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারত। এমন একটা ভিত্তি দাঁড় করাতে পারত, যার ওপর গড়ে উঠত নালন্দা ধাঁচের অসাধারণ সব স্কুল আর কলেজ। ভারত যদি উপনিবেশবাদের ছোবলমুক্ত থাকতে পারত, তাহলে দরকারের সময় যে-কোনো স্থান থেকে নিমন্ত্রণ করে আনাতে পারত বিশ্বসেরা শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তি ও ইংরেজি শিক্ষকদের, বিশ্বায়নের জগতে সংযোগ তৈরি

করে নিতে পারত নিজেদের মতো করে। অন্তত সেগুলো করার মতো জাতীয় সম্পদটুকু থাকত ভারতের হাতে; অথচ বাস্তবে সেই সম্পদ দুই শতক ধরে ব্রিটিশদের কাছে চালান হয়ে গেছে।

ব্রিটিশ শাসনের আরেকটি দুঃখজনক পরিণতি ছিল ভারতের চিরন্তন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী চেতনার মৃত্যু। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, উপনিবেশবাদ এই চেতনার পুনরুজ্জীবনকে গলা টিপে মেরেছে। পোশাক ও ইস্পাত শিল্প ধ্বংসের আলোচনা তো আগেই করা হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কীভাবে ধ্বংস হলো, তার আলোচনা এখনো বকেয়া আছে। এই সভ্যতা শূন্য সংখ্যাটা আবিষ্কার করেছে, আর্যভট্ট (যিনি গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস ও কেপলারের কয়েক শতাব্দী আগে এবং সঠিকতরভাবে তাদের আবিষ্কারগুলো করে গেছেন) ও সুশ্রুত (আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক)-এর মতো মানুষদের জন্ম দিয়েছে, অথচ প্যাক্স ব্রিটানিকার কথিত সদাশয় ও স্থিতিশীল শাসনামলেও ভারতীয় বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি তেমন কোনো উদ্ভাবনই করে দেখাতে পারল না। গণিতের কিংবদন্তি রামানুজানকে ক্যামব্রিজ পর্যন্ত ভ্রমণ করতে হয়েছে নিজের মেধার স্বীকৃতি লাভের জন্য। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন অবশ্য ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে দেখিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও সেটা পাওনা ছিল (অথচ তার নামে নামকৃত বোসন কণা নিয়ে কাজ করার কারণে ২০১৩ সালে অন্য দুজন বিজ্ঞানী ঠিকই নোবেল পেয়েছেন)।

বসুর মিতা জগদীশ চন্দ্র বসুও ছিলেন চোখধাঁধানো মেধার অধিকারী। একাধারে পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী, জৈবপদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ ও নৃবিজ্ঞানী (সেইসাথে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিরও স্রষ্টা); অথচ দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে বলার মতো কোনো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আসেনি। অদ্ভুত ব্যাপার, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশরা নিজেরা কিন্তু ঠিকই সমৃদ্ধ হয়েছে এই ময়দানে, কিন্তু ভারতে বড়সড় কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন করেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতীয় মেধার যে অমিত সম্ভাবনা ছিল, সেগুলোকে চরম অবহেলা করেছে। তাই পরে ভারতকে এই ময়দানের জমি প্রস্তুত করতে কিছুটা সময় নিতে হয়েছে। এরপর আসতে শুরু করেছে অগ্রগতি। ঘরে যেহেতু সুযোগ-সুবিধা নেই, সেহেতু অনেক মেধা চলে গেছে বাইরে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানে সেরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বেশ কয়েকজন ভারতীয়। বিদেশি পতাকাতলে নোবেল জিতেছেন তিন জন। আর ভারতের ভাঙাচোরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো ডানা ঝাপটানোর চেষ্টারত, মেধাবী ভারতীয় মন-মগজের যোগ্য আবাস হয়ে উঠতে ব্যতিব্যস্ত। (অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে এগিয়ে চলছে, তার কিছু নমুনা চোখে পড়ছে, বিশেষ করে

মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির উদ্ভাবনে। এখানে ঔপনিবেশিক যুগের কোনো কৃতিত্বই নেই। এই সবই স্বাধীন ভারতের নিজস্ব চেষ্টার ফল।)

তাও একটা ব্যাপারে আমি বেখবর নই। এই যে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের অপরাধে আমি ইংরেজি ভাষাতেই ব্রিটিশদের পিণ্ডি চটকাচ্ছি, এটা একটা পরিহাস বটে। তবে পরিহাস একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত। আমি যখন ইংরেজি শিখেছি, তখন আমার গদ্যের ভুল ধরার জন্য মাথার ওপর ছায়া হয়ে কোনো ইংলিশম্যান দাঁড়িয়ে ছিলেন না। স্বেচ্ছায়, সানন্দে, সর্ব-ভারতীয় ভাষা হিসেবে আমি ইংরেজি শিখেছি, ঔপনিবেশিক অত্যাচারের কোনো নিদর্শন হিসেবে নয়। সে যা-ই হোক, আমি-সহ কোনো ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়ই শেইকসপিয়ার বা পি. জি. উডহাউজকে প্রত্যাখ্যান করি না। স্বীকার করতেই হয়, ইংরেজি না শিখলে আমরা তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মগুলোর স্বাদই বুঝতাম না।

এক ব্রিটিশ-ভারতীয় বন্ধুর কাছে শুনলাম, ২০১৫ সালে লন্ডনে এক গণবিতর্ক আয়োজিত হয়েছিল। আমি তখন ভারতে। মনকাড়া সেই বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল আমার অক্সফোর্ড বিতর্কের ভালো-মন্দ। একাধিক বিতার্কিক সেখানে আমার ভুল ধরেছেন এই যুক্তিতে যে, আমি উডহাউজ এবং ইংরেজি ভাষার গভীর অনুরাগী, এমনকি সেন্ট স্টিফেন'স কলেজের উডহাউজ সোসাইটিকেও পুনরায় চাঙা করে তোলা আমারই কৃতিত্ব। সারা বিশ্বে এরকম সংগঠন ওটাই প্রথম। তা ছাড়া, বৈশ্বিক উডহাউজ সোসাইটিরও আমি একজন পৃষ্ঠপোষক (যেটার প্রধান কার্যালয় লন্ডনে)। মানে, তাদের কথার অর্থ হলো, একইসাথে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সমালোচনা করা এবং ইংরেজ রসিক-চূড়ামণির অনুরাগী হওয়া সম্ভব নয়।

আমার নিন্দুকদের বক্তব্য চূড়ান্ত ভুল। হ্যাঁ, উডহাউজের খ্যাতিকে অনেকে ব্রিটিশ রাজের প্রতি স্মৃতিকাতরতা বলে মনে করে। সাংবাদিক রিচার্ড ওয়েস্ট ১৯৮৮ সালে লিখেছেন যে, ভারতের উডহাউজ-উপাসকরা পঞ্চাশ বছর আগের (অর্থাৎ, ১৯৩০-এর দশকের) ইংল্যান্ডের জন্য লালায়িত। 'সেটা ছিল এমন যুগ, যখন ইংরেজরা নিজেদের ভাষাকে অমূল্য জেনে ভালোবাসত। স্কুলের বাচ্চারা শেইকসপিয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর রচনাবলি পর্যন্ত পড়ত...। ম্যালকম মাগারিজ মন্তব্য করেছেন, ভারতীয়রাই আজকের সর্বশেষ ইংরেজ। এজন্যই হয়তো তারা এমন আগাগোড়া ইংরেজ লেখকের ভক্ত।'[৩২২]

স্বয়ং উডহাউজও মনে হয় এত হাস্যকর কথা লিখতে পারতেন না।

[৩২২] রিচার্ড ওয়েস্ট, 'উডহাউজ সাহেব', হারপারস অ্যান্ড কুইন, ১৯৮৮, পৃ. ১১৪–১১৫।

যে ভারতীয়রা উডহাউজকে ভালোবাসে, তারা কিপলিংকে দু-চোখে দেখতে পারে না; ব্রিটিশ রাজ এবং এর সকল কাণ্ডকীর্তিকে মন থেকে ঘৃণা করে। হংকং সৈকতে অল্পকাল অবস্থান করা ছাড়া উপনিবেশবাদের সাথে উডহাউজের দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিল না। ব্রিটিশ রাজের কথা তার বইগুলোতে নেই বললেই চলে। (খালি একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আমার মনে পড়ে। 'দ্য জ্যুস অব অ্যান অরেঞ্জ' নামক ছোটগল্পটি ১৯৩৫ সালে লেখা। সে গল্পের তিনটে বাক্য : 'ভারতে অস্থিরতা চলছে কেন? কারণ, এখানকার অধিবাসীরা কালেভদ্রে একমুঠো ভাত খায়। মহাত্মা গান্ধি যেদিন আরামসে বসে এক টুকরো ঝোলমাখা মাংস এবং তারপর একখানা গোলগাপ্পা পুডিং এবং একচিমটি স্টিলটন পনির মুখে দিতে পারবেন, সেদিনই এসব অসহযোগ নামক ছাতামাথার সমাপ্তি ঘটবে।' কিন্তু ভারতীয়রা বোঝে, এটা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যমাত্র।)

(মহাত্মা গান্ধি নিজেও কিছু রসিকতা করতে ভোলেননি। তিনি ১৯৪৭ সালে রাজার জ্ঞাতিভাই এবং সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে ভোজ খেতে বসেন। মাংস তো দূর কি বাত, ভাইসরয়কে তিনি খেতে দিয়েছেন ঘরে বানানো একগামলা ছাগদুগ্ধের দই, তাও সম্ভবত সেই ছাগলেরই, যেটা নিয়ে তিনি নেংটি পরে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন রাজার সাথে দেখা করতে! আমার রম্যরচনা দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নভেল-এ আমি এই ঘটনাটাই নকল করেছি, শুধু দইয়ের জায়গায় আম বসিয়ে।)

আর কিছু না হোক, উডহাউজই একমাত্র ব্রিটিশ লেখক, যাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রশংসা করতে পারত কোনো পলিটিক্যাল ইনকারেক্টনেসের আশঙ্কা ছাড়াই। জনৈক বিশিষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদের কন্যা সরোজ মুখার্জি ওরফে কাটজু। তিনি ১৯৪৮ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে উডহাউজের রচনাবলির সাথে পরিচিত করিয়ে দেন। দেখুন কাণ্ড! স্বয়ং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তাব্যক্তিই 'আগাগোড়া ইংরেজ' লেখককে চেনেন না, অথচ ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাটা ঠিকই চেনেন।

আসলে উডহাউজের লেখায় যে কোনো রাজনীতি নেই, বা অন্য কোনো সামাজিক বা দার্শনিক জিনিসপাতি নেই, এজন্যই সেগুলো আগাগোড়া বা আধো-আধো সব রকমের ইংরেজপনা থেকে মুক্ত। তাই তো ইভলিন ওয়াহ সেগুলোকে বলেছেন উডহাউজের 'রূপকথার জগৎ'। অন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকরা তাদের চরিত্রদের জীবনের খুঁটিনাটির চাপে পাঠকদের ভর্তা করে দেন; বিপরীতে উডহাউজের বসবাস এক স্বপ্নপুরীতে। সেটা ইংরেজ পাঠকদের কাছে যতটা অবাস্তব, ভারতীয়দের কাছেও ততটাই। পাছে স্বজাতির

সাথে বেঈমানি হয়ে যায়, এই ভয় ছাড়াই ভারতীয়রা উডহাউজকে উপভোগ করতে পারে। লন্ডনের ড্রোনস ক্লাব থেকে শুরু করে ম্যাচহ্যাম স্ক্যাচিংস পর্যন্ত হাস্যরস আর কল্পনার যে বিশাল দুনিয়া তিনি বিস্তার করেছেন, সেখানে যেতে ভারতীয়দের কোনো ভিসা লাগে না।

তবে পাসপোর্ট অবশ্যই লাগবে, আর সেই পাসপোর্ট হলো ইংরেজি ভাষা। এটি ভারতের কাছে ব্রিটেনের সবচেয়ে মূল্যবান ও স্থায়ী উত্তরাধিকার। যে ভারতীয়রা বহুভাষিতার কারণে রীতিমতো বিখ্যাত, তাদের শিক্ষিত অংশটা দ্রুতগতিতে ও মনের আনন্দে ভাষাটা শিখে নেয়। ইংরেজি নিজেও একটা লক্ষ্য, সেইসাথে আরও বিভিন্ন লক্ষ্যের মাধ্যম। রাজনৈতিক লক্ষ্য যেমন আছে (যেহেতু ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষাকেই জাতীয়তাবাদের ভাষায় পরিণত করেছে), তেমনই আছে বিনোদনমূলক লক্ষ্য (যেহেতু ইংরেজির বদৌলতে সংস্কৃতি ও বিনোদনের নতুন এক জগতের সাথে পরিচিত হওয়া যায়)। তাই উডহাউজ যেভাবে ভাষার ব্যবহার করেছেন, ভারতীয়দের পক্ষে তাকেই লেখক হিসেবে পছন্দ করা স্বাভাবিক। তিনি অতীতের বিশাল ধ্রুপদি ভান্ডার নিয়ে খেলা করতে জানেন।

উপনিবেশবাদ যেসব রচনাকে নমঃ নমঃ করতে বলে, উডহাউজ সেগুলোকেই ঠাট্টাচ্ছলে উড়িয়ে দেন। (উডহাউজ লিখেছেন: 'পুরুষ কডমাছ যখন আচমকা আবিষ্কার করে সে ৩০ লক্ষ ৫ হাজার পিচ্চি পিচ্চি কডমাছের জনক, তখন খুশিতে ডগমগ হয়ে সবকটাকে ভালোবাসতে উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু বনেদি ব্রিটিশরা সেরকম নয়। তারা তাদের ছোট ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকে চোখ লাল করে।' যে দেশকে দুই দুটি শতাব্দী জুড়ে শাসন করেছে অভিজাত ব্রিটিশদের ফেলনা ভাইয়েরা, সেই দেশের মানুষদের কাছে এরকম লেখা পড়তে পারাটা কী যে সুস্বাদু!)

মোটকথা, ইংরেজি ভাষা আমাকে যে আনন্দগুলো দিয়েছে, সেগুলোর পক্ষে আছি। কিন্তু আমার স্বদেশিদের এই ভাষা শিখতে গিয়ে যত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে, সেগুলোর পক্ষে নই।

বেদরদি চা গণতন্ত্র, 'আইনের শাসন' আর রেলপথকে ধুয়ে দেওয়া তো শেষ। সম্ভবত একই কাজ করা যাবে আরও দুটো ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ওপরও : চা ও ক্রিকেট। নিঃসংকোচে স্বীকার করি, দুটোই আমার নেশা। যান, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে সালাম ঠুকে দিলাম।

প্রয়াত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ১৯৮৫ সালে ইউএস কংগ্রেসের সাথে এক যৌথ আয়োজনে অংশ নেন। চোখের তারায় ঝিলিক-সহকারে তিনি

স্মরণ করেন যে, আমেরিকান বিপ্লব এবং ভারতের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মাঝে কত মধুর মিল রয়েছে। কর্নওয়ালিস ইয়োর্কটাউনে আত্মসমর্পণ করার পর বাংলায় গিয়ে বিজয় অর্জন করেন। তারপর রাজীব দুষ্টুমি করে বলেন, 'ভারতের চা আপনাদের বিপ্লবী চেতনাকে চাঙা করে দিয়েছিল।'

বোস্টন টি পার্টির[৩২৩] প্রতি এই ইঙ্গিতটা দিয়ে তিনি শ্রোতাদের মাঝে একচোট হাসির রোল ফেলে দেন, কিন্তু তার কথা ছিল ভুল। ভারতীয় চা নামক কোনো বস্তু ১৭৭৩ সালে ছিলই না, অন্তত ঠিকমতো চাষবাস ও বিক্রি হয়, এরকম না। চা তখন চীনাদের একচেটিয়া। ঔপনিবেশিকরা বোস্টন বে-তে যে চা ফেলে দিয়েছিল, সেটা আসাম থেকে নয়, চীনের আমোয় থেকে আগত। হয়তো সেই চা ভারতীয় হলে আমেরিকান বিপ্লবীরা প্রতিবাদের অন্য কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিত, যেখানে এতবড় অপচয় করতে হয় না।

ভারতীয় চা চাষ ও বিক্রির বন্দোবস্ত করেছে ব্রিটিশরাই। গল্পটা মজার আছে, এবং আরও একবার দেখা যাবে বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রাধান্য। ভারত ব্রিটিশদের কবজায় থাকলেও চীন তা নয়। তাই ব্রিটিশরা ভাবল, চীনকে অত টাকা না দিয়ে ভারতে চা চাষ করলে কেমন হয়? চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার তাড়নায় ব্রিটিশরা কৃষি গোয়েন্দাগিরি উদ্ভাবন করে। এক গুপ্তচরকে অবাস্তব একখানা নাম দেয়—রবার্ট ফরচুন। তাকে চীনে ঢুকিয়ে দেয় ১৮৪০-এর দশকে। তখন আফিমযুদ্ধ চলমান থাকায় সে দেশের পরিস্থিতি একেবারে যাচ্ছেতাই ও বিশৃঙ্খল। গুপ্তচরের কাজ হলো চা-গাছ চুরি করে আনা, যাতে করে ভারতীয় হিমালয়ে সেগুলো রোপণ করা যায়। তিনি ব্রিটিশ ভারতে হাজার হাজার নমুনা পাঠাতে সক্ষম হলেও এর বেশিরভাগই মরে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দল বেঁধে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। সমাধানটা চলে আসে দুর্ঘটনাক্রমে। আসামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জনৈক ব্রিটিশ। আচমকা তার চোখে পড়ল, প্রাকৃতিকভাবেই সেখানে এক প্রকরণের চা গাছ রয়েছে। তিনি সেটা ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে চেখে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, স্বর্ণের খনি মিলে গেছে। চা বানিয়ে ফেলেছেন তিনি।

সেই থেকে ভারতে ব্রিটিশদের নিজস্ব চা শিল্প শুরু। আমদানিকৃত চীনা চায়ের চেয়ে আসামের চা বেশ উন্নত, ব্রিটিশ গৃহিণীদের কাছে অধিকতর সুস্বাদু। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩০-এর দশকে প্রতিবছর ৩ কোটি ১৫

---

[৩২৩] এটি ১৬ ডিসেম্বর ১৭৭৩-এর একটি ঘটনা, যখন আমেরিকা ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। ব্যাবসায়িক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলে আমেরিকায় বসবাসরত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ চা বোস্টন হারবারে ফেলে দেয়। এরই জের ধরে একসময় শুরু হয় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকান বিপ্লব।—অনুবাদক।

লক্ষ পাউন্ড চীনা চায়ের ব্যাবসা করত। এখন একা ভারতেই উৎপাদিত হয় প্রায় ৩০ কোটি কেজি। কিন্তু এই চা-ও রক্ষা পায়নি ঔপনিবেশিক ধান্দাবাজি থেকে : শ্রমিকরা মানবেতর পরিস্থিতিতে গতর খাটে সামান্য কয়েকটা টাকা মজুরির জন্য, আর পুরো মুনাফা যায় যথারীতি ব্রিটিশ কোম্পানিতে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তুখোড় লেখক স্যার ওয়াল্টার স্ট্রিকল্যান্ড বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে লিখেছেন দ্য ব্ল্যাক স্পট ইন দি ইস্ট। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না অবশ্য। এর ভূমিকায় তিনি তিক্ত ভঙ্গিতে লিখেছেন : 'যে ইংরেজরা স্বদেশে বসে বইটি পড়ছেন, তারা জেনে রাখুন। আপনারা যখন কষ পাতা সিদ্ধ করে ক্ষতিকর পানীয়টা পান করছেন, তখন আপনারাও কিছু মাত্রায় মানুষের রক্ত-মাংস ভক্ষণ করছেন। এ কেবল চা নয়, বরং দরিদ্র দাসদের রক্ত। শুধু জীবনীশক্তির লাল রংটা উধাও হয়ে গেছে সেখান থেকে।'[৩২৪]

ব্রিটিশরা নিজেরাই ভারতে চা উৎপাদন করত, কিন্তু সেটা স্থানীয়দের জন্য নয়। দার্জিলিং চা হালকা ও সুগন্ধি, আসামের চা কড়া, নীলগিরির চা উত্তেজক। ভারতের যে যে অংশ থেকে এগুলো পাওয়া যায়, সে সে অঞ্চলের মাটি, জলবায়ু ও ভূমিপ্রকৃতি অনুযায়ী চায়ের নাম হয়েছে। কিন্তু সেগুলো উৎপাদন করাত স্কটিশ ঔপনিবেশিকরা (আর বাগান থেকে পাতা তুলত মারাত্মক নিম্ন মজুরিভোগী ভারতীয় শ্রমিকরা), তারপর জাহাজযোগে সেগুলো পাঠিয়ে দিত স্বদেশে। সেখানে এগুলোর ধুন্ধুমার চাহিদা। খানিকটা রেখে দেওয়া হতো ভারতবাসী ব্রিটিশদের কাছে বেচার জন্য। ভারতীয়রা নিজেদের চাষকৃত চা নিজেরা পান করতে পারত না। পরে যখন ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দা শুরু হয়, তখন ব্রিটেনে ধপ করে পড়ে যায় চায়ের চাহিদা। ব্রিটিশ বণিকরা তাদের চালান নামিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। এরপর গিয়ে তারা সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শতবর্ষের অবহেলিত ভারতীয়দের দিকে। ভারতীয়রা মজা করে চা পান করতে শুরু করে। এর স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে মহামন্দা ও বিশ্বযুদ্ধের সবকটা বছরজুড়ে। আজ ভারতের সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামটিতেও চায়ের দেখা মেলে। বাকি বিশ্ব মিলে যতটুকু ব্ল্যাক টি পান করে, ভারতীয়রা একাই পান করে তারচেয়ে বেশি।

অতএব, পূর্ণ কৃতিত্ব ব্রিটিশদের। এবারে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তর্ক করা কঠিন। উপনিবেশবাদ ছাড়া এত বড় আকারে চা চাষ এবং এর বিশাল বাজার তৈরি করা হয়তো অসম্ভবই ছিল। এই যে দেখেন না, ব্রিটিশদের আগে একটা ভারতীয়ের মাথাতেও ব্যাপারটা আসেনি! এমনকি এর নামটাও ঔপনিবেশিক

[৩২৪] ব্রিটিশ রুল কনডেমড থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ১৯।

উত্তরাধিকার। বেশিরভাগ ইউরোপীয় ভাষায় 'টি' শব্দটি আছে, যা একটি আমোয় উপভাষা থেকে আগত। ওই অঞ্চল থেকেই জাহাজযোগে ব্রিটেনে বেশিরভাগ চা আসত। কিন্তু পর্তুগিজদের মতো যারা ক্যান্টোন থেকে চা পেত, আর ভারতীয় ও আরবদের মতো যারা তা পেত স্থলপথে, তারা ব্যবহার করে ক্যান্টোনিজ শব্দ 'চা'। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটা ভাষায় এই শব্দের কোনো-না-কোনো প্রকরণ রয়েছে, যেমন 'চায়', 'চায়া' ইত্যাদি। শুধু ইংরেজিভাষী ভারতীয়রাই বলে 'টি'।

কিন্তু চা নিয়ে এই পরিচ্ছেদটি শেষ করার আগে সংক্ষেপে ভিন্ন প্রসঙ্গ আনি। ব্রিটিশরা আমাদের চা দান করতে গিয়ে আরও কিছু জিনিস ঠিকই ধ্বংস করে দিয়েছে। মুনাফার আশায় নির্মমভাবে জমি শোষণ করেছে তারা। মাটির সর্বনাশ তো করেছেই, সেখানে বসবাসরত বন্য প্রাণীদেরও ব্রিটিশরা নিঃশেষ করে ছেড়েছে। উপনিবেশবাদ গাপুসগুপুস করে ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী সাবাড় করে দেয়। বন ধ্বংস করা হয়েছে তিনটি প্রধান কারণে: জমিকে বাণিজ্যিক প্ল্যান্টেশানে পরিণত করা, বিশেষত চা চাষ করার জন্য; রেলপথ বানানো, এবং ইংরেজদের ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র বানাতে ইংল্যান্ডে কাঠ সরবরাহ করা।

ব্রিটিশরা চা চাষের জন্য নীলগিরি ও আসামের বন উজাড় করেছে। কুরগের বন তছনছ করেছে কফি চাষের জন্য। নীলগিরির বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের পেছনে চা-ই একমাত্র খলনায়ক নয়। ব্রিটিশরা ভিসকোজ উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটা বিদেশি প্রজাতির গাছও নিয়ে এসেছে। যেমন : ইউক্যালিপ্টাস, পাইন ও ওয়াটল। এই ভিসকোজ যুক্তরাজ্যে পাঠানো হতো কাপড় তৈরির জন্য। দুঃখের ব্যাপার হলো, ইউক্যালিপ্টাসের মতো গাছগুলো চোঁ চোঁ করে পানি শুষে নেয়। যে নীলগিরি এককালে ছিল সমৃদ্ধ নাতিশীতোষ্ণ রেইনফরেস্ট, ব্রিটিশদের পোদ্দারিতে সেখানে পানির অভাব দেখা দেয়।

আফিম আহরণের জন্য ব্রিটিশরা যখন ভারতীয় চাষিদের পপি চাষে বাধ্য করে, তখনো ঘটে একই ঘটনা। উত্তর ভারতের কিছু অংশে ব্যাপক বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয় এই উদ্দেশ্যে। যেমন—ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আসামে বিপুলসংখ্যক গাছ কর্তন করা হয়। কারণ, এগুলোর ছায়ায় আফিম-পপি ঠিকমতো পাকে না, এবং ফুল ধরে না।[৩২৫] পপি বাঁচাতে এভাবে বৃক্ষ জবাই করার একটি পরোক্ষ পরিণাম হলো ভারতের চমৎকার সব শিকারি প্রাণী

---

[৩২৫] অরূপজ্যোতি সাইকিয়া, 'স্টেইট, পিজেন্টস অ্যান্ড ল্যান্ড রিক্লেইমেশান: দ্য প্রেডিক্যামেন্ট অব ফরেস্ট কনজারভেশান ইন আসাম, ১৮৫০স–১৯৮০স', ইন্ডিয়ান একোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ২০০৮, পৃ. ৮১–৮২।

প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। অর্থকরী ফসলের জন্য ব্রিটিশদের চাই আরও বেশি জমি। তাহলেই আসবে টাকা। তাই তারা শিকারি প্রাণী হত্যার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করে। ফলে ভারতের বিশাল অংশ থেকে মুছে যায় বাঘ, চিতাবাঘ, লেপার্ড আর সিংহ। বাঘ ও চিতাবাঘ টিকে গেছে, কারণ তারা গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সিংহের প্রয়োজন খোলা প্রান্তর। তাই দেশের এক কোনায় গুজরাট ছাড়া আর কোথাও তারা টিকতে পারেনি। সেখানকার এক ভারতীয় রাজকুমার জংদার নবাব ব্যক্তিগতভাবে সিংহের একটি অভয়ারণ্য বানিয়েছিলেন। তার নিমন্ত্রণ ছাড়া আর কেউ সেখানে শিকার করতে যেতে পারে না। এতে করে এশিয়াটিক সিংহ একটুখানি নিস্তার পেয়েছে বটে, কিন্তু ব্রিটিশদের আসার আগে এই রাজকীয় প্রাণীটির সংখ্যা ছিল হাজারে হাজার। সাম্রাজ্যের যখন পতন হয়, তখন তাদের সংখ্যা একশরও নিচে নেমে এসেছে।

বন উজাড় করার মাধ্যমে ব্রিটিশরা আদিবাসী তথা 'গোত্রীয়' জাতিগুলোরও মনোবল ভেঙে দেয়। তারা বনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেই জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করত। দুর্ভাগ্যবশত, বনের ওপর তাদের এই মালিকানার ধরনটা নথিভিত্তিক নয়, বরং পরম্পরাভিত্তিক। ব্রিটিশরা বোঝে কাগজ। কে কীসের মালিক, সেটার পক্ষে কাগজ দেখাতে হবে; নচেৎ তারা মালিকানা মানে না। তাই বেচারা আদিবাসীরা উৎখাত ও স্থানচ্যুত হয়ে যায়। তাদের জীবনধারা শিকারি-সংগ্রাহক ধাঁচের। ফলে ব্রিটিশ সরকারের চোখে তারা হয়ে যায় অবৈধ শিকারি তথা আসামি।

ওদিকে ব্রিটিশরা বন্য প্রাণী শিকারকে একটা বনেদি ক্রীড়ায় পরিণত করে, যেটা শুধু শ্বেতাঙ্গ ও অভিজাত ভারতীয়দের জন্যই সংরক্ষিত। এরই মাধ্যমে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসক মহলেও প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় (বর্তমানে পোলো খেলায় যেমনটা হয়)। ফলে আরও বেড়ে যায় কাজটির শান-শওকত। ব্রিটিশ আমলে প্রাণিশিকার এক রাক্ষুসে খেলায় পরিণত হয়। খুন করা হয় অসংখ্য প্রাণীকে। চিরতরে পালটে যায় বহু এলাকার বাস্তুতন্ত্র। যেমন—মাদ্রাজকে একসময় বলা হতো পুলিয়ুর, অর্থাৎ বাঘ ও চিতাবাঘের নগরী (তামিল শব্দ 'পুলি' দিয়ে বাঘ ও চিতাবাঘ উভয়টিই বোঝানো হয়)। ব্রিটিশরা ওই এলাকার প্রত্যেকটা বাঘ আর চিতা মেরে ফেলে। ফলে মাদ্রাজে বা তামিল নাড়ুর সমতলে এসব প্রাণী এখন আর একটাও নেই। পুলিয়ুর নামটা তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে।[৩২৬]

---

[৩২৬] ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের পরিবেশ ধ্বংসের বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য মহেশ রঙ্গরঞ্জন, ইন্ডিয়া'জ ওয়াইল্ডলাইফ হিস্ট্রি, নয়াদিল্লি: পারমানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০১; মাধব গাড়গিল এবং রামচন্দ্র গুহ, ইকোলজি অ্যান্ড ইকুইটি: দ্য ইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউজ অব নেচার ইন কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া,

উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গায় ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকলেও পুলিয়ুরে এখন আর বাঘ নেই। ওদিকে ব্রিটিশরা এখনো ভারতীয় চা পান করে, তাও আবার একাধিক উপায়ে। বর্তমানে সমীহ-উদ্রেককারী ব্রিটিশ চা কোম্পানি টেটলির বর্তমান মালিক ভারতীয় ব্যাবসা-সংস্থা টাটা। তাই দেশের সর্বত্র ভারতীয়রা অতিথিদের মুখে যে দুধেল মিষ্টি পানীয়ের পেয়ালা ঠুসে দেয়, সেটা আমরাই নিজেদের করে নিয়েছি; ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে করে নিয়েছি একান্তই আপন।

গল্প আরও জটিল। অন্যান্য পণ্যের মতো চায়েরও দরপতন হচ্ছে, কমে যাচ্ছে রপ্তানি। মজুরি বৃদ্ধি এবং মুনাফা কমে যাওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পড়ে গেছে বহু চা-বাগান। সবচেয়ে দামি ভারতীয় চা ক্যাস্‌লটন ১৯৯১ সালে প্রতি কেজি ৬,০০০ রুপিতে বিক্রি হতো (তৎকালীন বিনিময় হারের হিসেবে ২৩১ পাউন্ড)। ক্রেতারা ছিল জাপানি। নতুন রেকর্ড হয় ২০১২ সালে, যখন প্রতি কেজির মূল্য দাঁড়ায় ৭,২০০ রুপি (তবে পাউন্ডের হিসেবে সেটা নেমে গেছে ১২০-এ, যেহেতু রুপি ততদিনে দুর্বল হয়ে গেছে)। মদের মাঝে যেমন শ্যাম্পেইন, চায়ের মাঝে তেমনই ক্যাস্‌লটন। অন্যান্য ভারতীয় চায়ের দাম এর ভগ্নাংশের সমানও নয়। আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে ভারতের চা আরও অনেক নিম্নমানের চায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। আর্জেন্টিনা, কেনিয়া ও মালাওয়ির মতো জায়গা থেকেও আসছে চা। কিন্তু তবু কথা থাকে—আর্জেন্টিনা যদি ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের আগেই নিজেরা চা উৎপাদন করতে পারে, তাহলে ভারতও কি সেটা পারত না?

চা-ওয়ালা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (এক রেলস্টেশানে তিনি চা-বিক্রেতা বাবাকে সাহায্য করতেন)। তিনি যখন ২০১৬ সালে ইউএস কংগ্রেসের উদ্দেশে ভাষণ দেন, তাতে ছিটিয়ে দিয়েছেন রসিকতার বহু উপাদান। কিন্তু তার ৩১ বছর আগেকার পূর্বসূরির উলটো পথে হেঁটে চায়ের ব্যাপারে একটা কথাও বলেননি তিনি। বৈশ্বিক পণ্যবাজার যখন বেহাল এবং ভারতীয় চা উৎপাদকেরা যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বোঝা উচিত ছিল যে, চা এখন আর কৌতুকের বিষয় নয়।

ভারতীয় খেলা ক্রিকেট

দুনিয়াতে ক্রিকেটই একমাত্র খেলা, যেখানে চা পানের বিরতি দেওয়া হয়।

নয়াদিল্লি: রুটলেজ, ১৯৯৫।

সমাজবিজ্ঞানী আশীষ নন্দীর মতো আমারও প্রায়ই মনে হয়, ক্রিকেট একটা ভারতীয় খেলা যেটা ব্রিটিশরা দুর্ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করে ফেলেছে।[৩২৭] খেলাটার প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্রের সাথে মিলে যায় : জটিলতার সমাহার, প্রত্যেক বলে বলে অমিত সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য বৈচিত্র্য, আউট হওয়ার ডজন ডজন উপায়, সবই যেন ধ্রুপদি ভারতীয় সংগীতের মতো। দুই জায়গাতেই মৌলিক নিয়মগুলো নির্ধারিত, কিন্তু কলাকার সেটাকে নিজের মতো করে অসাধারণ বানিয়ে নেন; লিখিত স্বরলিপির আটপৌরে বাঁধনে তিনি আটকে থাকেন না। খেলাটির গৌরবময় অনিশ্চয়তা যেন প্রাচীন ভারতীয় চিন্তারই প্রতিধ্বনি : আপনি বলের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং ব্যাটের কোনা থেকে একটা মিষ্টি চার মারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক এমনই সময় এক অব্যর্থ গোলা আপনাকে বোল্ড করে দিতে সক্ষম। ভাগ্যবাদী ভারতীয় চিন্তকরা অবচেতনেই এ ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। ভিক্টোরিয়ান ইংলিশ নৈতিক নাটকের ছদ্মবেশে যেমন ভগবদ্‌গীতা অভিনয় করা হতো, ক্রিকেটও যেন তেমনই এক অবসরের বিনোদন।

যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ এখনো জ্যোতিষীদের দ্বারস্থ হয় এবং গ্রহ-নক্ষত্রের খামখেয়ালি প্রভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে ক্রিকেটের মতো দারুণ খেলা আর হয় না। এখানে একটা অসময়ের ঝুমবৃষ্টি, বাজেভাবে বানানো পিচ, মুদ্রা ছোড়ায় পরাজয় কিংবা ফিল্ডারের চোখে রোদের ঝলক পুরো খেলার ফলাফল পালটে দিতে পারে। পাঁচ দিনের কপালে-ভাঁজ-ফেলা, টানটান উত্তেজনাপূর্ণ, হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার পরও যে শেষমেষ ড্র হতে পারে, এই সিদ্ধান্তও যেন ভারতীয় দর্শন থেকেই উদ্ভূত। গন্তব্যের চেয়ে যাত্রাপথের গুরুত্ব যে কোনো অংশে কম নয়, তা ভারতীয় দর্শনের এক গভীর উপলব্ধি।

শোভনীয় ইংরেজ ভদ্দরনোকদের অলস অবসর যাপনের মাধ্যম হিসেবে প্রথমবারের মতো ভারতে আসে ক্রিকেট। 'নেটিভ'দের এই খেলা শিখতে সময় লেগেছে প্রায় এক শতাব্দী। এরপর তারা তা খেলতে শুরু করেছে একেবারে অ-ইংরেজ ঢঙে। আমার মনে আছে, বাবার সাথে জীবনে প্রথম টেস্ট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম ১৯৬৩ সালে মুম্বাইয়ে। একটা দুর্বল ইংল্যান্ড দল সেবার সফরে এসেছিল। ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও উইকেট কিপার বুধি কুন্দেরানের খেলা দেখার সে কী শিহরন, আমি জীবনে ভুলব না। তিনি প্রথমে মিডউইকেটের ওপর দিয়ে ধড়াম করে একটা ছক্কা হাঁকান। একটু পরেই আরেকটা বাড়ি মারেন, যেটা একটুর জন্য বাউন্ডারি ছোঁয়নি। তারপর মিড-

[৩২৭] আশীষ নন্দী, দ্য তাও অব ক্রিকেট: অন গেইমস অব ডেস্টিনি অ্যান্ড দ্য ডেস্টিনি অব গেইমস, নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০, পৃ. ১।

অনের ওপর দিয়ে আকাশে তুলে দেন আরও এক দৈত্যাকার শট। বল যখন ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে, তখন রান নিতে শুরু করেন কুন্দেরান। বলটি এক ইংলিশ ফিল্ডারের মুঠোবন্দি হয়। কুন্দেরান তখন নিজের ব্যাটটা হাওয়ায় ছুড়ে মেরে দৌড় অব্যাহত রাখেন। ব্যাট নিচে নেমে এলে ওই দৌড়ানো অবস্থাতেই সেটা লুফে নেন, তারপর ওই এক দৌড়েই ঢুকে যান প্যাভিলিয়নে। আমি আজীবনের জন্য দিওয়ানা হয়ে গেলাম।

কুন্দেরানরা চিরকালই ভারতে ছিল। তবে সেইসাথে আরও ছিল কারিগর, মেহনতি, নৈরাজ্যবাদী ও নির্বিকার লোকেরা। যে সমাজ সব ধরনের মানুষের অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়, সে সমাজ তার ক্রিকেট দলেও বিচিত্রতার মূল্য বোঝে। ক্রিকেট ভারতের বৈচিত্র্য ও একতার প্রতিফলন। প্রতিটা প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী—হিন্দু, মুসলিম, পারসি, খ্রিষ্টান এবং এক রংচঙে শিখ—থেকেই এখন পর্যন্ত কেউ-না-কেউ ভারতের ক্যাপ্টেন হয়েছেন। বর্ণ, ধর্ম, জাত, জাতি, খাদ্য, বাদ্য, রীতি আর নীতিতে বিভক্ত এক দেশ এক দারুণ দর্শনে কঠোর বিশ্বাসী : ক্রিকেট।

হ্যাঁ, ব্রিটিশরা একে আমাদের কাছে এনে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একদিন আমরা তাদেরই খেলায় তাদের পরাজিত করব, এরকম প্রত্যাশা ছিল না তাদের মনে। ক্রিকেটের এক অসম্ভব কাল্পনিক গল্প (লগান, ২০০৩) বলে অস্কার মনোনয়নও জিতে নিয়েছেন আমাদের চলচ্চিত্র-নির্মাতারা। সেখানে নানান চেহারার একগুচ্ছ নিরক্ষর গ্রামবাসী ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের এই ক্রিকেট খেলায় বাজিমাত করে দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে ক্রীড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে এখানে, যেমন : পেশিবহুল খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ান ধ্যানধারণা, দূরদেশের মাটিতে তাগড়া টগবগে যুবকদের কসরত, এবং ইটোনের মাঠে তৈরি-হওয়া নিয়মতান্ত্রিক এক ক্রীড়াকে উচ্ছৃঙ্খল প্রাচ্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের সভ্যতা শেখানোর বাসনা।

সাম্রাজ্যবাদ যদি হয় খেলার মাঠ, তাহলে পরাধীন জাতির খেলার নিয়ম শিখে শাসকদের পরাজিত করার ইচ্ছেটা যেন জাতীয়তাবাদী চেতনারই আরেক রূপ। বাঙালি সমাজে ১৮৮০ থেকে ১৯৪৭ সালের মাঝে ক্রিকেট এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার একটি কারণ দেখিয়েছেন গবেষকরা।[৩২৮] বাঙালি পুরুষদের ব্যাপারে মেয়েলি কোমল স্বভাবের অভিযোগ ছিল। এই অপবাদ অপনোদনের

---

[৩২৮] লেখক অজানা, 'ক্রিকেট ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল (১৮৮০–১৯৪৭): আ লস্ট হিস্ট্রি অব ন্যাশনালিজম', দি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব দ্য হিস্ট্রি অব স্পোর্ট, খণ্ড ২৩ (৬), ২০০৬।

তাড়নায় তারা ইংরেজদেরকে ইংরেজদের খেলায় পরাজিত করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজ নাটোর, কোচ বিহার, ময়মনসিংহ এবং অন্যান্য স্বদেশি রাষ্ট্রের মহারাজার সাথে হাত মেলায়। ঔপনিবেশিক প্রভুদের থেকে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে ক্রিকেটকে সমাজজীবনের অংশে পরিণত করতে তৎপরতা শুরু করে তারা। ওদিকে ব্রিটিশদের চোখেও তো ক্রিকেট খেলা সভ্যকরণ মিশনেরই হাতিয়ার। তাই প্রদেশের স্কুলগুলোতে তারা খেলাটির পৃষ্ঠপোষকতা করে চলে। মুম্বাইয়ের পারসি ক্রিকেটারদের লক্ষ্য ছিল আবার কিছুটা ভিন্ন। ঔপনিবেশিক কাঠামোর ভেতর সমাজের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে তারা একে ব্যবহার করে। আশীষ নন্দী দেখিয়েছেন, মহারাজাবৃন্দ, ধনাঢ্য সমাজ এবং অ্যাংলিকাইজড ভারতীয়দের 'চোখে ক্রিকেট ছিল সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন এবং ব্রিটিশ রাজের ক্ষমতাধর অভিজাত চক্রে ঢোকার মাধ্যম। ভারতীয় মানদণ্ডে ক্রিকেট যে একটা ব্যয়বহুল খেলা, এই ব্যাপারটাও উক্ত ধারণার পালে আরও হাওয়া জোগায়।'[৩২৯]

মজার ব্যাপার হলো, একই জিনিস দেখা যেতে থাকে পুরো দেশজুড়েই। শুধু ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সিতেই নয়, বরং প্রিন্সলি স্টেইটগুলোতেও। বেশ কয়েকটা রাষ্ট্রে গড়ে ওঠে বলার মতো দল, স্বদেশি শাসকরা যাদের টাকাপয়সার ব্যাপারটা দেখভাল করেন। এই ভদ্রলোকদের কেউ কেউ বেশ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাফল্যও অর্জন করেছেন। কুমার শ্রী রঞ্জিতসিংজি নামক এক ব্যক্তিকে বাছাই করা হয় ১৮৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য (বিশ্বজোড়া যিনি 'রঞ্জি' নামে এবং ঈর্ষাকারীদের কাছে 'রান-গেট-সিন-জি' নামে পরিচিত)। প্রথম ম্যাচেই শত রান হাঁকিয়ে ভারতীয় জনতার কাছে তিনি নায়ক বনে যান। অস্কার ওয়াইল্ড ও বেঞ্জামিন ডিজরায়েলির মতোই রঞ্জি ইংরেজ না হয়েও ইংরেজ বীরে পরিণত হন। (জনৈক ইংরেজ গুণগ্রাহী অবিশ্বাসের স্বরে বলেছেন, 'তিনি জীবনে একটাও খ্রিষ্টান শট খেলেননি।') রঞ্জির নিজের ভাষ্যে তিনি 'একজন ইংরেজ ক্রিকেটার এবং ভারতীয় রাজকুমার'। তবে বুরুমার মন্তব্য—'ইংরেজ ক্রিকেটার হিসেবে তার আচরণ ছিল ভারতীয় রাজকুমারের মতো, আর ভারতীয় রাজকুমার হিসেবে ইংরেজ ক্রিকেটারের মতো।'[৩৩০]

ক্রিকেটের বিস্ময়, বেপরোয়া অপব্যয়ী, বেহায়া ইংরেজপ্রেমী রঞ্জি ছিলেন জেন্টলম্যান ও রাজকুমার উভয় শ্রেণির গুণ ও দোষের এক অপরূপ মিশ্রণ। তার ভাতিজা কুমার শ্রী দুলীপসিংজি এবং আরেক রাজকুমার পতৌদির নবাব যথাক্রমে ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সালে রঞ্জির উত্তরসূরি হন। অবশ্য ততদিনে

[৩২৯] নন্দী, পৃ. ৫৩।
[৩৩০] বুরুমা, পৃ. ২৩৪।

ভারতীয়রা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে যে, তারা তাদের মেধাকে কেন ইংরেজদের হয়ে কাজে লাগাচ্ছেন। কেন উদীয়মান ভারতীয় টেস্ট দলের জন্য ব্যবহার করছেন না? (পতৌদি যদিও ১৯৪৬ সালে ভারত দলে এসেছেন, কিন্তু ততদিনে তার সেরা সময়টা পেরিয়ে গেছে।)

ভারতীয়রা যখন ক্রিকেটে জেতার মতো ভালো দল হয়ে ওঠে, তখন ব্রিটিশরা তাদের বিভক্ত করার দায়িত্বে মন দেয়। তারা আয়োজন করে একটি 'চতুর্দলীয় টুর্নামেন্ট', যেখানে হিন্দু, মুসলিম, পারসি এবং 'বাকিরা' একে অপরের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে। ঔপনিবেশিক শাসনে যেসব ভেদাভেদকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে, খেলার মাঠেও তারা ভারতীয়দের সেগুলো মনে করিয়ে দিতে এক পায়ে খাড়া।

সমাজবিজ্ঞানী রিচার্ড ক্যাশম্যানের মতে,

> সাংস্কৃতিক বিচারে আইরিশ জাতীয়তাবাদের মতো ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অতটা কট্টর ছিল না। আয়ারল্যান্ডে জাতীয়তাবাদী এবং হোম রুল আন্দোলনকারীরা ক্রিকেটের বিরুদ্ধেও কথা বলেছে। তাদের মতে এটি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিরই এক ঘৃণ্য উপাদান। এর বদলে 'গ্যালিক খেলাধুলা'র প্রচারণা চালায় তারা। পক্ষান্তরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃগণ 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোকে আক্রমণ করলেও ইংরেজ সংস্কৃতির কিছু অংশের প্রতি অনুরাগ লালন করেন'।[৩৩১] কাবাডির মতো ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো ঔপনিবেশিক যুগে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পোলো খেলা নতুন করে জেগে ওঠে মূলত ব্রিটিশ এবং খুবই সংখ্যালঘু অভিজাত ভারতীয়দের খেলা হিসেবে। কিন্তু ক্রিকেট হয়ে ওঠে এমন এক খেলা, যেখানে ভারতীয়রা ইংরেজদের সাথে পাঙ্গা নিতে সক্ষম। (এ থেকেই বোঝা যায়, আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেট দল কেন এখনো সাদামাটা পর্যায়ে আছে, যারা এখনো 'টেস্ট' মর্যাদাও পায়নি। ওদিকে ভারত একবিংশ শতকে ক্রিকেট বিশ্বের দানব।[৩৩২])

ক্রিকেট যে ১৯১০-এর দশকে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ ছিল, তার প্রমাণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রীড়া ইতিহাস। কলকাতায় এটি ভারতীয়দের ইংরেজি-ভিত্তিক উচ্চশিক্ষার প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে জিমন্যাস্টিকস ও ক্রিকেটের মতো খেলাগুলো বাধ্যতামূলক ছিল, যাতে বাঙালি ছেলেরা শারীরিকভাবে পোক্ত হয়ে উঠতে পারে। 'পুরুষালি' ব্রিটিশ এবং

---

[৩৩১] রিচার্ড ক্যাশম্যান, প্যাট্রনস, প্লেয়ারস, অ্যান্ড দ্য ক্রাউড: দ্য ফেনোমেনন অব ইন্ডিয়ান ক্রিকেট, লন্ডন: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮০, পৃ. ২২–৩।

[৩৩২] বইটি ২০১৬ সালে লিখিত। আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তান ২০১৭ সালের ২২শে জুন টেস্ট মর্যাদা লাভ করে।—অনুবাদক।

মেয়েলি বাঙালির গৎবাঁধা ধারণাটি যাতে ভেঙে দেওয়া যায়।[৩৩৩] বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন গতিশীল হয়ে উঠছে, তখনই প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৯১৪ সালে একটা ম্যাচে হেরে বসে। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল লা মার্টিনিয়ার কলেজের এক সর্ব-ইউরোপীয় দল। এই প্রতিষ্ঠানটি আবার উপনিবেশবাদের অকুণ্ঠ সমর্থক। ছাত্ররা যেসব 'হাউজে' বিভক্ত, সেগুলোর নামও চারনক ও ম্যাকাউলির মতো মানুষদের নামে। এই পরাজয় অনেক হা-হুতাশ আর মাতমের কারণ হয়েছে। দলটির খেলোয়াড়দের প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন ঘোষণা করে, 'লা মার্টিনিয়ার কলেজের কাছে আমাদের দলের এই পরাজয় ক্ষমার অযোগ্য।'[৩৩৪]

এক গবেষক লিখেছেন, 'যারা দাবি করেন ঔপনিবেশিকদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমেই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্ম, তারা বাংলায় এই খেলাটির বিকাশের ইতিহাস ঠিকমতো বুঝতে পারেননি।' তাই ক্রিকেটেও অতি অবশ্যই তারস্বরে বেজেছে জাতীয়তাবাদী চেতনা। ব্রিটিশরা আমাদের এই খেলা দান করেছে স্বীকার করে নিলেও বলতে হয়, আজ আমরা যে-কোনো দলের বিরুদ্ধে এই খেলায় জিততে সক্ষম।

---

[৩৩৩] মৃণালিনী সিংহ, কলোনিয়াল ম্যাসকুলিনিটি: দ্য 'ম্যানলি ইংলিশম্যান' অ্যান্ড দি 'ইফেমিনেইট বেঙ্গলি' ইন দ্য লেইট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি, ম্যানচেস্টার: ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫।

[৩৩৪] আমার ছেলে আবার ফুটবল-পাগল। তার কাছ থেকে জেনেছি, ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের বিজয়ের সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনাটা ক্রিকেটের নয়, বরং ফুটবলের। মোহন বাগান সেবার ইস্ট ইয়োর্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতে নেয় ১৯১১ সালে, তাও আবার খালি পায়ে!

০৭

(বে)হিসাব খাতা সমাপনী

বিতর্ক শেষ করার আগে সেগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অধ্যায়ে হালকা আলাপ করে যাই। তবে তারও আগে বলে নিই, ভারতে ব্রিটিশদের প্রত্যেকটা কৃতকর্মকে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে-কোনো মানবীয় কর্মের মতোই উপনিবেশবাদও নিয়ে এসেছে নানান ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়। ভারতের সকল ব্রিটিশ কর্মকর্তাই ক্লাইভের মতো লোলুপ, ম্যাকাউলির মতো বিদ্বেষী বেকুব, কার্জনের মতো দাম্ভিক একগুঁয়ে, ডায়ারের মতো নৃশংস বা চার্চিলের মতো বর্ণবাদী ছিলেন না; এমন ভালো মানুষেরাও ছিলেন, যারা সে যুগের সব কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয়দের সাথে দয়ালু, কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করেছেন। ছিলেন বহু মানবিক বিচারক, বিবেকবান কর্মকর্তা, দূরদর্শী ভাইসরয় ও প্রশাসক। গাত্রবর্ণের বাধা ডিঙিয়ে ভারতীয়দের সত্যিকারের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে অনেক ব্রিটিশ।

ব্রিটিশ রাজের শাসনামলজুড়ে এমন মানুষ ছিলেন, যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন ভারতের সেবায়। হয়তো মূল আনুগত্যটা নিজেদের দেশ ও ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রতিই ছিল, কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা উন্নয়নের চেষ্টাও করেছেন। তারা যে ভারতীয়দের জীবনকে পালটে দিয়ে গেছেন, ভারতীয়রা তাদের কীর্তিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। যেমন—গোদাবেরী নদীর ওপর স্যার আর্থার কটন যে বাঁধ নির্মাণ করেছেন, তার ফলে ১৫ লক্ষ একর জমির সেচকাজ সম্ভব হয়েছে; অথচ দক্ষিণ ভারতের এই জমিটি ইতঃপূর্বে ছিল নিষ্ফলা। অন্ধ্র প্রদেশের ওই দুটি জেলার কৃতজ্ঞ কৃষক-সমাজ আজ পর্যন্ত তার স্মরণে প্রায় তিন হাজার মূর্তি বানিয়েছে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীরাও অংশ নিয়েছেন তার জন্মবার্ষিকী স্মরণসভায়। এরকম মানুষদের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু যে দানবীয় অপরাধ-ব্যবস্থাটি তাদের অস্তিত্বের অনুমতি দিয়েছে, সেই অপরাধকে তারা প্রশমিত করেছেন মাত্র। 'সুঠাম ব্রিটিশ বুটে'র তলায় পুরো একটা জাতিকে নিষ্পেষিত করার যে

অপরাধ, তা তাতে জায়িয হয়ে যায়নি।

লর্ড কার্জনের সাথে সহমত পোষণের মতো মানুষ আজ কমই। তিনি বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য খোদা তাআলার ইচ্ছায় বিশ্বের সর্বকালের সর্বসেরা কল্যাণের মাধ্যম।' পরিহাসের লেশমাত্র না করে লেখার দাবি করেছেন 'ইতিহাসের সবচেয়ে স্বার্থহীন পৃষ্ঠাটি...। এসে পেয়েছি নৈরাজ্য, তারপর এনে দিয়েছি শৃঙ্খলা।' বলেছেন, ব্রিটেন ভারত শাসন করেছে 'মানবজাতির কোটি সদস্যের চিরন্তন কল্যাণের জন্য'।

সহমত পোষণকারী কম বলেছি; কিন্তু একেবারেই যে নেই, তা নয়। এখনো ফারগুসনের মতো সাম্রাজ্যবাদের সাফাই-গায়করা আছেন। আছেন স্বল্প-পরিচিত হলেও বিস্ময়কর রকমের সফল লরেন্স জেইমস, যার ভাষ্যে সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রম 'কল্যাণকর স্বৈরতন্ত্রের এক চর্চা এবং পরার্থপরতার এক নীরিক্ষা'।[৩৩৫] আজকের যুগেও কেউ এসব বকোয়াসে বিশ্বাস করবে, এমন ভাবাটা অযৌক্তিক। হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো মুক্তবাণিজ্যের ফযীলত ছিটানো, গানবোটের মাধ্যমে পশ্চিমা ধাঁচের সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরার্থবাদী বীজ বপন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আসলেই বিজাতিদের অন্ধকার দেশে আলোর ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু এখনো কিছু স্মৃতিপাগল আছে, যারা সরলমনাদের সামনে এসব কুযুক্তি তুলে ধরে। এদের অবশ্যই খণ্ডন করা উচিত, যা আমি পুরো বইজুড়ে করে গিয়েছি।

সাম্রাজ্যবাদী অভিনয়, ঔপনিবেশিক পরিণাম

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটা ব্যাপার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যেটাকে গবেষক পল গিলরয় নাম দিয়েছেন 'উত্তর-ঔপনিবেশিক বিষাদ'।[৩৩৬] মানে পতিত সাম্রাজ্যের অতীত জৌলুসের প্রতি আকুলতা। খাবার-পানীয়ের নামের মাঝেও সেগুলোর উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন—ওল্ড কলোনিয়াল নামক বার্গার, দ্য প্ল্যান্টেশান নামে লন্ডনের একটি বার এবং কলোনিয়াল কামব্যাক নামে অক্সফোর্ডের একটি ককটেল (আমি যে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলাম, ওই সময়েই চালুকৃত)। ইউগভ-এ ২০১৪ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'গর্ব করার মতো বিষয়'। মাত্র ১৯ শতাংশ ভোটদাতা এর কুকীর্তির ব্যাপারে 'লজ্জিত'। প্রায় অর্ধেকই মনে

[৩৩৫] দ্রষ্টব্য www.adrewlownie.co.uk/authors/lawrence-james/books/raj-the-making-and-unmaking-of-british-empire.

[৩৩৬] পল গিলরয়, পোস্টকলোনিয়াল মেলাংকলিয়া, নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫।

করে যে, উপনিবেশায়িত হয়ে দেশগুলোর জন্য 'ভালোই হয়েছে'। 'এখনো ব্রিটেনের অধীনে একটা সাম্রাজ্য থাকলে খুশি হতেন'—এমন ভোটারের সংখ্যা চমকে দেওয়ার মতো ৩৪ শতাংশ।[৩৩৭]

উদাহরণস্বরূপ নায়াল ফারগুসনের দাবি, ব্রিটেন সাম্রাজ্য 'সারা বিশ্বে শ্রম, পুঁজি ও পণ্যের যথাযথ বণ্টন [নিশ্চিত করেছে]... ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের শুরুর দিকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্যতীত ইতিহাসে আর কোনো সংগঠনই পণ্য, পুঁজি ও শ্রমের এতটা মুক্ত চলাচল নিশ্চিত করেনি। বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা আইন, শৃঙ্খলা ও সরকার-ব্যবস্থা আরোপের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই সবচেয়ে এগিয়ে। ইতিহাসের বেশিরভাগ (যদিও সবটা না)-জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তুলনামূলক দুর্নীতিহীন সরকার হিসেবে কাজ করেছে। প্রথমে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী নীতি অনুযায়ী বলতে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বৈশ্বিক কল্যাণ বাড়িয়েছে বই কমায়নি, অর্থাৎ জিনিসটা ভালোই ছিল।'[৩৩৮]

'ভালো জিনিস' আখ্যা দিয়ে এই প্রচারণা চালানো হয় একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, যখন বিশ্বায়ন রীতিমতো তুঙ্গে। তাই ফারগুসনেরও সুবিধা হয়ে গেল। তিনি বুক চাপড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথিকৃৎ হিসেবে তুলে ধরেন, ভিনদেশে আক্রমণকে বানিয়ে দেন বৈদেশিক বিনিয়োগ, আর সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লালসার নাম দেন মুক্তবাণিজ্য। সামসময়িক বিশ্বায়নপন্থিরা ঠিক এই জিনিসগুলোকেই সকলের সমৃদ্ধির মাধ্যম বলে দাবি করেন। এহেন যুক্তি নিয়ে অবশ্য বেশ কথা আছে। ফারগুসন যেটাকে সম্পদের 'সুষম বণ্টন' বলে উল্লাস করেন, ঔপনিবেশিক ভুক্তভোগীদের কাছে সেটাই জমি-হারানো, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, রোগ, স্থানচ্যুতি ও দাসত্ব।

ব্রিটিশরা মুক্তবাণিজ্যের ঢাকঢোল পেটায়, অথচ জল ও স্থল উভয় পথে ভারতীয়দের শতবর্ষ পুরাতন মুক্তবাণিজ্যকে তারাই ধ্বংস করেছে। মুক্তবাণিজ্যের স্লোগান ব্রিটিশদের স্বার্থের পক্ষেই বেশি করে যায়। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখান থেকে মুনাফা হাসিলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অবস্থানে ছিল তারাই। স্থানীয়রা যা একটু দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম ছিল, ব্রিটিশ কামান ও কানুন দিয়ে সেগুলো সহজেই দমনযোগ্য। সমানভাবে বিশ্বায়ন অবশ্যই উদ্‌যাপনযোগ্য বিষয় হতো, কিন্তু সাম্রাজ্যের হাতে যে বিশ্বায়ন হয়, উপনিবেশবাদীরাই এর কারিগর এবং সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী।

[৩৩৭] www.yougov.co.uk/news/2014/07/26/britain-proud-its-empire/
[৩৩৮] ফারগুসন, এম্পায়ার, পৃ. ২০।

উপনিবেশায়িত জাতির তাতে কোনো লাভ নেই।

ফারগুসন আরও দাবি করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভুক্তভোগীরা দীর্ঘমেয়াদে ঠিকই লাভবান বলে প্রমাণিত হবে। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গতকাল তাদের প্রয়োজনীয় ভিত্তিটা গড়ে দিয়ে গেছে। তাই আগামীকালের বিশ্বায়নে তারা এর সুফল ভোগ করতে শুরু করবে। কিন্তু মানুষ তো আর দীর্ঘমেয়াদে বাঁচে না। তারা ৬০-৭০ বছর বাঁচে আর ভোগে। ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন মানে কোটি মানুষের শোষণ ও সর্বনাশ, সমৃদ্ধ শিল্প খাতের ধ্বংস, প্রতিযোগিতার সুযোগ নিয়মতান্ত্রিকভাবে নষ্ট করে দেওয়া, দেশীয় সরকারব্যবস্থার উৎখাত, স্মরণাতীতকাল থেকে বেড়ে উঠতে থাকা জীবনধারার কৃত্রিম পরিবর্তন, এবং পরাধীনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ তার পরিচয় ও আত্মসম্মানের বিনাশ।[৩৩৯]

পরিহাসের ব্যাপার হলো, এই ক্ষেত্রে ফারগুসন যেন কার্ল মার্ক্সেরই উত্তরসূরি—ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জ্ঞাত ইতিহাস নেই। যেটাকে আমরা ভারতের ইতিহাস বলি, তা আসলে একের পর এক আসা হানাদারের কীর্তি। তারা সেই প্রতিরোধহীন ও অপরিবর্তনশীল সমাজের পরোক্ষ সুবিধা নিয়েই নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই প্রশ্ন এটা নয় যে, ইংরেজদের ভারত দখল করার অধিকার ছিল কি না, বরং প্রশ্ন হলো, কার হাতে ভারত দখলকে আমরা সমর্থন করব। পশ্চাৎপদ তুর্কি, পশ্চাৎপদ ফারসি, রাশান, নাকি ব্রিটিশ?...ভারতে ইংল্যান্ডকে দ্বৈত অভিযান সম্পন্ন করতে হবে: একটা ধ্বংসাত্মক, আরেকটা পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত এশিয়াটিক সমাজের পুনরুজ্জীবন; এশিয়াতে পশ্চিমা সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা।[৩৪০]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারে আরও ভারসাম্যপূর্ণ একটা বর্ণনা পাওয়া যায় ডেনিস জাডের দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার বইতে। লেখক ব্রিটিশ রাজের প্রতি মোটাদাগে সহানুভূতিশীল হলেও এর অত্যাচারী চরিত্রকে অস্বীকার করেননি। তার উপসংহার, 'এই সবকিছুর ফল কি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে না খারাপ, সেটা বলা প্রায় অসম্ভব।'[৩৪১] জন উইলসন তার সাম্প্রতিক ইন্ডিয়া

---

[৩৩৯] এই যুক্তিগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন লিন্ডা কলি, 'ইনটু দ্য বেলি অব দ্য বিস্ট', দ্য গার্ডিয়ান, ১৮ জানুয়ারি ২০০৩, এবং ফিলিপ পমপার, 'দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি অব এম্পায়ারস', হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি, খণ্ড ৪৪ (৪), ডিসেম্বর ২০০৫, ওয়াইলি ফর ওয়েজলিয়ান ইউনিভার্সিটি, পৃ. ১–২৭।

[৩৪০] কার্ল মার্ক্স, 'দ্য ফিউচার রেজাল্টস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', ডেভিড ম্যাকলেলান, সম্পা., কার্ল মার্ক্স: সিলেক্টেড রাইটিংস, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২, পৃ. ৩৬২।

[৩৪১] ডেনিস জাড, দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার: দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য ব্রিটিশ রাজ, ১৬০০–

কনকোয়্যারড-এও একই রকম কথা বলেছেন। সাম্রাজ্যবাদের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—এই দাবিকে খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। তার মতে, 'বরং এর কার্যক্রমের পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সংকীর্ণ স্বার্থ ও পেটের দায়। তারচেয়েও বড় উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থেই ভারতে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা।'[৩৪২] মোটকথা, নিজেকে টিকিয়ে রাখা ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য কোনো লক্ষ্যই ছিল না। তাই তাতে যে ভারতের থোড়াই লাভ হয়েছে, সে তো স্বাভাবিক।

দুই শতাব্দীর উপনিবেশবাদের পর আমরা ভারতীয়রা নিজেদের দেশকে যে অবস্থায় পেয়েছি, তা আমরা কখনোই ভুলতে পারব না। যে দেশ একসময় বিশ্বের শীর্ষ ধনাঢ্য এবং সবচেয়ে শিল্পায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল ছিল, চীনের সাথে মিলে যে দেশ ১৭৫০ সালে বিশ্বের প্রায় ৭৫ শতাংশ শিল্পজাত পণ্য জোগান দিয়েছে, সে দেশ কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে বিশ্বের দরিদ্রতম, সবচেয়ে পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর ও রোগাক্রান্ত সমাজে পরিণত হয়ে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেল, তা আমরা চোখের সামনে দেখেছি।

১৬০০ সালে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রিটেন তখন বিশ্বের জিডিপির মাত্র ১.৮ শতাংশ উৎপাদন করত, আর ভারতের অবদান ছিল ২৩ শতাংশ। প্রায় দুই শতকের ব্রিটিশ রাজের পর বৈশ্বিক জিডিপিতে ব্রিটেনের অংশ দাঁড়ায় প্রায় ১০ শতাংশ। ওদিকে ভারত নেমে গেছে গরীব 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশের কাতারে—বিপর্যস্ত ও অনাহারী, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের এক বৈশ্বিক নমুনা। ফারগুসন স্বীকার করেছেন, '১৭৫৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ব্রিটিশদের মাথাপিছু মোট দেশীয় উৎপাদন ৩৪৭ শতাংশ বেড়েছে। ভারতের বেড়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ।'[৩৪৩] এমনকি এই সংখ্যাগুলোও ব্রিটিশ রাজের কর্মদক্ষতার ক্রমাবনতিকে ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে না: ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশেরও নিচে। বিপরীতে জনসংখ্যা ৩.৫ শতাংশের চেয়েও বেশি হারে ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছিল। সেটা প্রশমিত হয়েছে নবজাতক ও শিশুদের উচ্চ মৃত্যুহারের কারণে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়। মোট প্রবৃদ্ধির হার হয় শূন্যের কাছাকাছি।

ব্রিটেনের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এসব সংখ্যার হিসাব ভারতের পক্ষে ঘুরে যায়। মোট মাথাপিছু আয় ১৯০০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত শূন্য ছিল

১৯৪৭, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫, পৃ. ২০০।

[৩৪২] উইলসন, ইন্ডিয়া কনকোয়্যারড, পৃ. ৫০০।

[৩৪৩] ফারগুসন, এম্পায়ার, পৃ. ২১৬।

(অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ০.৮ শতাংশ, সেটা থেকে বিয়োগ হয়েছে সমমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি)। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে তা বেড়ে ১.৩ শতাংশে পৌঁছায় (প্রবৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ বিয়োগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ)। এরপর ১৯৮১-৯০ সালে ৩.৫ শতাংশ এবং ১৯৯১-২০০০ সালে ৪.৪ শতাংশ। পরবর্তী দশকে ২০০১-১০ সালে তা গড়ে ৭.৮ শতাংশে থাকলেও দুইবার ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি অন্যান্য প্রধান সূচকও অসাধারণভাবে বেড়ে যায়, তাও আবার স্বাধীনতার পরে মাত্র সাত দশকে (আমি বইটি লেখা পর্যন্ত); অথচ বিশ দশকের ব্রিটিশ শাসনে এরকম বৃদ্ধি কল্পনাও করা যায়নি।

ব্রিটিশরা এমন এক সমাজ বানিয়ে রেখে গেছে, যার সাক্ষরতার হার ১৬ শতাংশ, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২৭ বছর, কার্যত কোনো দেশীয় শিল্প খাত নেই এবং ৯০ শতাংশ মানুষের বসবাস আজকের হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে সাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে ৭২ শতাংশ, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বাইবেলীয় তিন কুড়ি দশ ছুঁইছুঁই,[৩৪৪] এবং ২৮ কোটি মানুষকে টেনে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিদ্যুতের মতো সাধারণ একটি উদাহরণের কথাই ধরুন। এটিও ভারতের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এক কথিত আশীর্বাদ। প্রথম বৈদ্যুতিক সংযোগ আসে ১৮৯০-এর দশকে। এরপর ব্রিটেন পাঁচ দশক যাবৎ ভারত শাসন করেছে। ওই সময় থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত ব্রিটেন-সহ গোটা ইউরোপ ও আমেরিকা বিদ্যুদায়িত হয়ে গেছে, অথচ ভারতের ৬,৪০,০০০ গ্রামের মধ্যে মোটে ১,৫০০ গ্রামকে বৈদ্যুতিক সংযোগ সরবরাহ করেছে ব্রিটিশ রাজ। কিন্তু স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সরকার যতগুলো গ্রামকে বৈদ্যুতিক সংযোগের আওতায় এনেছে, তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের চেয়ে প্রায় ৩২০ গুণ বেশি।[৩৪৫]

কারণটা সহজ। ভারতীয় জনগণের কল্যাণ নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। গবেষক আচেমোগ্লু এবং রবিনসন তাদের যুগান্তকারী বই হোয়াই নেশানস ফেইল-এ যেটাকে 'আহরণীয় উপনিবেশ'

---

[৩৪৪] বাইবেলের এক জায়গায় বনি ইসরাঈলের উদ্দেশে মূসা নবি বলেন, "আমাদের আয়ু বড়জোর তিন কুড়ি দশ বছর, সবল হলে আশি বৎসরও হতে পারে। কিন্তু সারা জীবনজুড়ে শুধু দুঃখ আর কষ্ট। বড় দ্রুত কেটে যায় বছরগুলো।" (গীতসংহিতা ৯০:১০)—অনুবাদক।

[৩৪৫] পল কটেরিল 'নায়াল ফারগুসন'স ইগনর‍্যান্ট ডিফেন্স অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', নিউ স্টেইটসম্যান, ১৬ আগস্ট ২০১২।

বলেছেন, ভারত ঠিক তা-ই।[৩৪৬] এখান থেকে খনির মতো শুধু সম্পদ আহরণ করা হয়, পালটা কিছু দেওয়া হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে ভারতীয় রাষ্ট্রের এবং এর বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, শিল্পগত ও সভ্যতাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি, অথচ ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে সেটা পুরোদমেই হয়েছে। আর ভারতে হয়েছে ঔপনিবেশিক শোষণ।[৩৪৭]

বিশ্ব এই জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী কীর্তিনামা বহু আগে থেকেই জানত। এরই মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা পাঁচ দশকের এই কলঙ্কজনক অধ্যায় পার করেছে, যখন ভারতের মাথাপিছু আয় একটা পয়সাও বাড়েনি। কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড নামে একটি ম্যাগাজিন বের হতো। সেটার সম্পাদক ১৯০৬ সালে একটি কথা বলেন, যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান: 'ইংরেজরা যখন ভারতে আসে, এই দেশটি তখন এশীয় সভ্যতার নেতা এবং এশীয় বিশ্বের অবিসংবাদিত কেন্দ্রীয় তারকা। জাপানের তখন পাত্তাই ছিল না। আর আজ ৫০ বছরের মধ্যে জাপান আধুনিক অগ্রগতির শিল্প দিয়ে তার ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে; অথচ ভারত ১৫০ বছরের ইংরেজ শাসনের অধীন দাস।'[৩৪৮] জাপান মেইজি পুনরুদ্ধারের পর চল্লিশ বছরের মধ্যে ৯০ শতাংশ সাক্ষরতার হার অর্জন করে। ওদিকে ভারত ১৫০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর ১০ শতাংশেই আটকে আছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাদবাকি সব সূচকও ভারতের প্রতিকূলে।

জন উইলসন বলেছেন,

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্বকে সমৃদ্ধ করার বদলে উলটো গরীব বানিয়ে দিয়েছে। 'সাম্রাজ্য সস্তার কারবারি করত। শাসিত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য কোনো বিনিয়োগ করত না ব্রিটিশরা; বরং স্থানীয় অভিজাতদের সাথে এমনসব চুক্তি করত, যাতে পানির দরে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখা যায়...। ভারতের বিহার রাষ্ট্রে বর্তমানে যে সামন্তপ্রভুরা গ্রামবাসীকে গণহত্যা করছে, তাদের জন্মই হয়েছে ব্রিটিশ ভূমিনীতির ফলে।'[৩৪৯]

---

[৩৪৬] ড্যারন আচেমোগলু এবং জেইমস রবিনসন, হোয়াই নেশানস ফেইল, নিউ ইয়র্ক: ক্রাউন বিজনেস, ২০১২।

[৩৪৭] দ্রষ্টব্য কটেরিল 'নায়াল ফারগুসন'স ইগনর‍্যান্ট ডিফেন্স' এবং 'দি ইনকমপ্লিট স্টেইট: চার্লস টিলি অ্যান্ড দ্য ডিফেন্স অব এইড টু ইন্ডিয়া', www.thoughcowardsflinch.com/2012/02/07/the-incomplete-state-charles-tilly-and-the-defence-of-aid-to-india/, ৭ ফেব্রু. ২০১২।

[৩৪৮] উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, ওয়েস্টমিনস্টার: ব্রিটিশ কমিটি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৯০৬, পৃ. ১৯।

[৩৪৯] জন উইলসন, 'ফলস অ্যান্ড ডেইঞ্জারাস', দ্য গার্ডিয়ান, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

ব্রিটিশ রাজের এই হাড়কিপটেমিকে লরেন্স জেইমস যেভাবে সাধু সাধু করেছেন, তা দেখে শিউরে না উঠে পারা যায় না। 'বিশ্বমঞ্চে মহত্ত্ব ফিরে পাওয়ার বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজ ভারতকে দিয়েছে ব্রিটিশ ধাঁচের পুনর্জাগরণ। ব্রিটেন বৃহত্তর অর্থে পুরো মানবজাতির প্রতি যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে, তার নিখুঁততম বহিঃপ্রকাশ ভারত। তার আদর্শ হলো ১৮শ শতাব্দীর শেষ এবং ১৯শ শতাব্দীর শুরুর দিকের ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল এনলাইটেনমেন্টের চেতনা। এই চেতনার স্বপ্ন হলো খ্রিষ্টধর্ম ও যুক্তিবোধের নিরিখে বিশ্বকে কল্যাণময় তরিকায় পালটে দেওয়া। খ্রিষ্টধর্ম ভারতে খুব একটা এগোতে পারেনি বটে, কিন্তু পশ্চিমা শিক্ষা এবং এর শাস্ত্রীয় প্রয়োগের মাধ্যমে যুক্তিবুদ্ধি ঠিকই সফল হয়েছে সেখানে।'[৩৫০]

যে ভারত বেদ ও উপনিষদের ভূমি, আকবরের রাজদরবারে আলেম-ওলামাদের ইলমি বাহাসের দেশ, 'তর্কবাগীশ ভারতীয়ে'র নিবাস, সেখানে 'যুক্তিবোধে'র ভিত্তিতে 'পুনর্জাগরণে'র জন্য কি আসলেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের দরকার ছিল? এহেন দাবি রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর। একে এবার ফারগুসনের দাবির সাথে মেলান। তার মতে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কল্যাণেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। ব্রিটিশ রাজের এই সাফাই-গায়রকরা যেন ভারতীয় হাতসাফাই জাদুকরদের মতো: নিজেদের দড়িতে নিজেরাই চড়ে বসেছেন। তাই তো অধ্যাপক রিচার্ড পর্টার বলেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত নিজের মতো করে অর্থনৈতিকভাবে বিবর্তিত হতে অক্ষম ছিল—এরকমটা মনে করার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? তখন হয়তো পুঁজি, শ্রম ও পণ্যের "সুষম" বণ্টন হতো ভারতীয় অভিজাতদের মাপকাঠি অনুযায়ী, চাই সেটা উদারতাবাদী পশ্চিমা রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের মাপকাঠি থেকে যত আলাদাই হোক না কেন।'[৩৫১] আধুনিকতাকে যারা পশ্চিমের দেওয়া উপহার বলে মনে করে, পর্টার তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের বিস্তারিত কাজের উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতের 'পশ্চাৎপদতা'র ধারণাটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তিনি।

ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্রিটিশরা প্রথমবার এসে যে ভারতে ঢুকেছিল, তা ছিল এক ধনবান, বর্ধনশীল ও বাণিজ্যময় সমাজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগ্রহী হয়েছিলই তো এই কারণে। ইউরোপের পক্ষ থেকে প্রথমবারের

---

[৩৫০] লরেন্স জেইমস, রাজ: দ্য মেইকিং অ্যান্ড আনমেইকিং অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: সেন্ট মার্টিন'স গ্রিফিন, ১৯৯৭।

[৩৫১] এম্পায়ার: হাউ ব্রিটেন মেড দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড-এর ওপর অধ্যাপক অ্যান্ড্রু পটারের পর্যালোচনা (হিস্ট্রি পর্যালোচনা নং ৩২৫) www.history.ac.uk/reviews/review/325.

মতো ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করেন পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো দ্য গামা। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এসে তিনি কালিকটে (কোহড়িকোড়) পদার্পণ করেন। পর্তুগালের রাজা প্রথম মানুয়েলের কাছে তিনি রুদ্ধশ্বাসে বর্ণনা দেন তার দেখে-আসা বিশাল সব শহর, প্রকাণ্ড দালান, প্রশস্ত নদী ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের ব্যাপারে। মসলা ও রত্ন, মূল্যবান জহরত ও 'স্বর্ণের খনি'র ব্যাপারে ভাস্কো দ্য গামা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যান। কালিকটের রাজা সামুদিরির কাছে তিনি যে সামান্য উপঢৌকন পেশ করেন, রাজার শানশওকতের সামনে তা ছিল নিতান্তই বেমানান। দ্য গামার মাল-সামানা নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রুপ ও তিরস্কার করেন বণিক ও সভাসদরা, যারা এরচেয়ে বহুগুণে উন্নত পণ্য দেখে অভ্যস্ত।[৩৫২]

পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত হওয়া তো দূরের কথা, ভারত উন্নত মানের সব তৈরি পণ্য রপ্তানি করত, যেগুলোর জন্য ব্রিটেনের কেতারদুরস্ত সমাজ রীতিমতো লালায়িত। বনেদি ব্রিটিশদের পরনে থাকত ভারতীয় লিনেন ও রেশম। ব্রিটিশরা ঘর সাজাত ভারতীয় ছাপা ও নকশাদার কাপড় দিয়ে। তারা ভারতের মসলাপাতির জন্য ছিল পাগল। (এমন কাহিনিও আছে যে, সপ্তদশ শতকের ব্রিটিশ উৎপাদকরা নিম্নমানের নকল ব্রিটিশ কাপড়কে 'ভারতীয়' বলে চালাত ক্রেতা আকর্ষণের উদ্দেশ্যে।) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬১৮-১৭০৭) আমলে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল বেঢপ। কর রাজস্বের কথা তো এই বইয়ে আগেই আলাপ করেছি। আরও বলা হয়ে থাকে, সেসময় তার মোট আয় নাকি ছিল ৪৫,০০,০০,০০০ মার্কিন ডলার, তার সামসময়িক ফরাসি রাজা ষোড়শ লুইয়ের চেয়ে ১০ গুণেরও বেশি।[৩৫৩]

ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল দারুণ উন্নত। ব্যবসায়ী, প্রতিনিধি, দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাণচঞ্চল নেটওয়ার্কে গমগম করত রাজধানী। রপ্তানি-বাণিজ্য আর মূলধনের কারবারি করা হতো অসাধারণ মেধাসহকারে। এসব জটিল জটিল ব্যবসায়ী নেটওয়ার্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণের জগৎ শেঠ গোষ্ঠী, চেটিয়ার গোষ্ঠী এবং পশ্চিমের গুজরাটি বেনিয়াগণ। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা এতই বিশাল ও বিস্তৃত এবং এত বেশি পরিমাণ টাকার কারবার করত, যা ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সমান।

এই সেই দেশ, যা ব্রিটিশদের আক্রমণের পর গরীব হয়ে গেছে। যে

[৩৫২] সঞ্জয় সুব্রাহ্মণ্যম, দ্য ক্যারিয়ার অ্যান্ড লেজেন্ড অব ভাস্কো দ্য গামা, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭।

[৩৫৩] জন কটস্কি, দ্য পলিটিকস অব অ্যারিস্টোক্রেটিক এম্পায়ারস, চ্যাপেল হিল: ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা প্রেস, ১৯৮২, পৃ. ১৮৮।

ভারত ব্রিটিশ শাসনের কাছে পরাস্ত হয়েছে, তার উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল বিশাল, ছিল সুদক্ষ কারিগর শ্রেণি। বিপুল বৈশ্বিক চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করত উন্নত মানের পণ্য। ছিল অপরিসীম আবাদি জমি। কৃষিজ ভিত্তি ছিল সমৃদ্ধ। দারিদ্র্য বা ভূমিহীনতা ছাড়াই এখানে খেয়ে-পরে বাঁচত ১০ কি ১৫ কোটি মানুষ।[৩৫৪] ব্রিটিশ শাসন এসে এই সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। উইলসন বলেন, '১৭৫০ সালে ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান ছিল ব্রিটেনের জনগণের সমান। এখন বাস্তব ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে গড়পড়তা ভারতীয়ের উপার্জন একজন ব্রিটিশের মাত্র এক-দশমাংশ। ঠিক এই ২০০ বছরই যে ব্রিটিশরা ভারত শাসন করেছে, তা নেহাত কাকতাল নয়।'[৩৫৫]

ভারতকে নিজের মতো ছেড়ে দিলে সে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আরও সমৃদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও আধুনিকায়নরত শক্তিতে পরিণত হতে পারত না—এমনটা মনে করার কোনো কারণই নেই। পুরো বইয়ে বারেবারে এটা দেখিয়েছি আমি। বহু অর্থনীতিবিদ প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতাকে দোষ দেন, অথচ নিজেদের শাসনামলে ভারতের অর্থনীতির ব্যর্থতার দিকে ব্রিটিশরা যে ফিরেও চায়নি, সে ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। কিন্তু প্রযুক্তির অভাবই যদি ভারতীয় অর্থনীতির একমাত্র এবং সবচেয়ে বড় ত্রুটি হতো, তাহলে স্বাধীন ভারত চাইলেই প্রয়োজনীয় সব প্রযুক্তি আমদানি করে নিতে পারত, ঠিক যেমনটি করেছে জাপান। ব্রিটিশরা এই কাজটা করতে দেয়নি ভারতীয়দের, বিংশ শতাব্দীতেও না। যে দেশ শতাব্দী যাবৎ পারস্য থেকে শিল্পী ও ইতিহাসবিদ আমদানি করছে, মধ্য এশিয়া থেকে স্থপতি ও পূর্ব আফ্রিকা থেকে সৈনিক আমদানি করছে, সেই দেশ ইউরোপ থেকে আধুনিকতার উপাদান আমদানি করতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করত না, হোক সেটা রেলওয়ে বা শিল্প খাতের প্রযুক্তি (যেমনটা বর্তমানে চীন করছে)।

ভারতীয় সভ্যতার পুরো ইতিহাসজুড়ে মূল তাড়না ছিল মহত্ত্ব অর্জনের পানে। হ্যাঁ, সময়ে সময়ে তাতে কালক্ষেপণ করেছে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি ও দ্বন্দ্ব; কিন্তু এসব নেই কোন দেশে? আক্রমণের বদলে বাণিজ্যও পারত ভারতকে পালটে দিতে। মেইজি পুনরুদ্ধারের[৩৫৬] মতো কোনো ঘটনা এ ভারতেও ঘটতে পারত ব্রিটিশ শাসনের বাধা ছাড়াই। এতটুকু দাবি তো করাই যায় যে,

---

[৩৫৪] চন্দ্র দত্ত, একোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৫।

[৩৫৫] উইলসন, 'ফলস অ্যান্ড ডেইঞ্জারাস'।

[৩৫৬] জাপানে সম্রাট মেইজির অধীনে ১৮৬৮ সালে কার্যকর সাম্রাজ্যবাদী শাসন ফিরে আসার ঘটনাকে মেইজি রেস্টোরেশান বলা হয়। মেইজির আগেও বিভিন্ন সম্রাট ছিলেন। কিন্তু উক্ত ঘটনার পর সত্যিকার অর্থে জাপানের রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল হয়ে আসে।—অনুবাদক।

ভারত তার প্রয়োজনমতো পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা থেকে সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলো ধার (ও ক্রয়) করে নিয়ে এসে আধুনিক হয়ে উঠত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে পদানত ও অপদস্থ হওয়া ছাড়া ভারত আজকের জায়গায় আসতে পারত না—এই দাবির চেয়ে আমাদের দাবিটা বেশি না হলেও অন্তত সমপরিমাণের যৌক্তিক তো বটেই।

জোসেফ কনরাড নিজে কোনো কট্টরপন্থি নন। তার মতে, উপনিবেশবাদ হলো 'এক লোভাতুর ও নির্দয় পাপাচারী, পেটুক, অভিনয়বাজ, চোখ-ঘোলা শয়তান'। তিনি ১৯০২ সালে লিখেছেন, 'পৃথিবী জয় করার মানে আসলে আমাদের চেয়ে ভিন্নরঙা ত্বকবিশিষ্ট বা একটু কম উঁচু নাকবিশিষ্ট মানুষদের কাছ থেকে তাদের ভূমি কেড়ে নিয়ে নেওয়া। বেশি ভালোভাবে তাকালে জিনিসটাকে আর আদুরে মনে হয় না।'[৩৫৭] রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে নিউ ইয়র্কে একদল পশ্চিমা শ্রোতার উদ্দেশে ভদ্র ভাষায় বলেছেন, 'পৃথিবীর এক বিশাল অংশ আজ আপনাদের সভ্যতার ভুক্তভোগী।' মহাত্মা গান্ধির ভাষা ছিল আরও মারকুটে। পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে তিনি কী মনে করেন, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আইডিয়া হিসেবে ব্যাপারটা ভালোই।'

সাম্রাজ্যের সাফাই লিখতে গিয়ে নায়াল ফারগুসন বলেন, 'প্রশ্ন এটা নয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিষ্কলঙ্ক ছিল কি না। ওটা নিষ্কলঙ্ক নয়। প্রশ্ন হলো, এরচেয়ে কম রক্তপাত করে আধুনিকতা অর্জন করা সম্ভব ছিল কি না।'[৩৫৮] আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা ব্রিটিশ রাজের গণহত্যা ও পাশবিকতার খুন-জবজবে ইতিহাস আলোচনা করেছি। তাই উক্ত প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গুরচরণ দাস ব্রিটিশদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে ইচ্ছুক। তার ধারণা, ব্রিটিশদের নীতিমালায় ইচ্ছাকৃত কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়। ব্রিটিশ ভারতের শিল্প খাত কেন ব্যর্থ হয়েছে, এর কারণগুলো পর্যালোচনা করেছেন তিনি। তাতেই বোঝা যায়, অর্থনীতির কী মারাত্মক সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন:

শিল্পবিপ্লব না হওয়ার কারণ [প্রথমত], ভারতীয় কৃষি খাত স্থবির হয়ে ছিল। কৃষিজ উদ্‌বৃত্ত বা ক্রমবর্ধমান শহুরে জনগোষ্ঠীর খাবারের যথেষ্ট জোগান না থাকলে শিল্পবিপ্লব দুরাশা। দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্দার পর যে প্রোটেকশানিজম [বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর বিধিনিষেধ] আরোপ

---

[৩৫৭] জোসেফ কনরাড, হার্ট অব ডার্কনেস, লন্ডন: ডোভার থ্রিফট এডিশানস, ১৯৯০, প্রথম প্রকাশ ইউথ: আ ন্যারেটিভ, অ্যান্ড টু আদার স্টোরিজ, এডিনব্রা ও লন্ডন: উইলিয়াম ব্ল্যাকউড অ্যান্ড সনস, ১৯০২।

[৩৫৮] ফারগুসন, এম্পায়ার, পৃ. ২৯।

করা হয়, তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবেশ একেবারেই প্রতিকূল হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, জাপানি রাষ্ট্রের মতো ঔপনিবেশিক সরকার কিন্তু আমজনতাকে শিক্ষিত করে তোলেনি। পরিশেষে, ভারতীয় মধ্যবিত্তের মাঝে একটা ঔপনিবেশিক মনমানসিকতা বিরাজ করত, এমনকি সবচেয়ে উদ্যমী উদ্যোক্তাটাও যদি রাজনৈতিকভাবে দাস হয়ে থাকে, তাহলে সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।[৩৫৯]

অর্থাৎ, গুরুচরণ দাসের মতে যে চারটে কারণে ভারত পশ্চাৎপদ হয়ে গিয়েছিল, এর তিনটিই উপনিবেশবাদের দোষ। কারণ তিনটি হলো ব্রিটিশদের কৃষিনীতি, শিক্ষানীতি এবং বর্ণবাদী আধিপত্যবাদ। আরেকটি কারণ হলো বিশ্বযুদ্ধ এবং এর বিভিন্ন পরিণাম। এর মাধ্যমেও ভারত আক্রান্ত হয়েছে ব্রিটিশদের মালিকানাধীন সম্পত্তি হয়ে থাকার কারণেই।

কথা উঠতে পারে, ব্রিটিশদের এই মহা-অপরাধকে আরেকটু নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব। যুক্তিটা এরকম যে, সমালোচকরা ঔপনিবেশিক যুগের পশ্চিমা বিশ্বকে বুঝতে গিয়ে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়কে গুলিয়ে ফেলে। একটা হলো আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র (সেনাবাহিনী, সরকারি নথি-পরিসংখ্যান, আমলাতন্ত্র, রেলপথ, হাসপাতাল, টেলিগ্রাফ সংযোগ, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি), আরেকটা হলো উদারনৈতিক ধ্যানধারণা (ব্যক্তিগত অধিকার; চিন্তা, বাক্, শিল্প ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা; আইনের চোখে সমতা; এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্র)।

একটা মানেই আরেকটা না। (আজকের চীনকেই দেখুন না। দ্বিতীয়টা ছাড়াই প্রথমটায় তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।) তাই প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় শাসকদের সাথে ব্রিটিশদের পার্থক্যটা লোভ কিংবা অনৈতিকতায় নয়, বরং এতটুকুই যে, রাষ্ট্র গঠনের দক্ষতা ব্রিটিশদের বেশি ছিল। উদারনৈতিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তারা ছিল হয় নির্বিকার, আর নয়তো নিষ্ঠাহীন। কিন্তু ব্রিটেন যেহেতু উদারতাবাদী এনলাইটেনমেন্ট ঐতিহ্যেরও মূর্তরূপ, সেহেতু আমরা তাদের সৃষ্ট 'রাষ্ট্র'কেও ওই বিচারে কর্কশভাবে সমালোচনা করি। এখন কথা হলো—ব্রিটিশরা এসে যে মারাঠা রাষ্ট্র, বিভিন্ন ভারতীয় শাসনাঞ্চল বা পতনোন্মুখ মুঘল রাষ্ট্রকে পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এই মানদণ্ড খাটে না? মারাঠা পেশওয়াদের যে স্টুয়ার্ট মিল বা টমাস পিটের মানদণ্ড মেনে চলতে হবে, এ কথা কে বলেছে? তাহলে এই যুক্তি কি আদৌ খাটে?

---

[৩৫৯] দাস, 'ইন্ডিয়া: হাউ আ রিচ নেশান'; আরও দ্রষ্টব্য দাস, ইন্ডিয়া আনবাউন্ড, পৃ. ২২৮–২৪৩।

যুক্তিটা মজার হলেও শেষমেশ মনঃপূত হওয়ার মতো নয়। কারণ, আমি আগেই দেখিয়েছি যে, ভারতের ব্রিটিশ রাষ্ট্র আসলেই একটি সম্পূর্ণ অনৈতিক ও লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্র ছিল। মুনাফার আশায় ভারতীয় জনগণকে পদানত করে রাখাটাই ছিল এর ধ্যানজ্ঞান। একে 'একটি নিরপেক্ষ দক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা মানবাধিকারের প্রতি নিতান্ত নির্বিকার' বলে দাবি করা একেবারেই ভুল। আর এই পদানতকরণের ফলেই ভারতের সব ধন ব্রিটেনে পাচার হয়ে গেছে। সমাজে যে সম্পদগুলো থাকলে এমনিতেই সেগুলোর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে, সেগুলো বেরিয়ে গেছে স্রোতের বেগে। হ্যাঁ, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতেও দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা সেগুলোকে আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করার উপায় বের করে নিচ্ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সেটা আর সম্ভব হয়নি। কারণ, ব্রিটিশরা তাদের ফকির বানিয়ে ফেলে। জীবন ও জীবিকা ধারণের উৎসগুলো ধ্বংস করে দেয় তারা। শুধু জমির ওপর ভিত্তি করে এমনভাবে টিকে থাকতে হয়, যা টেকসই নয়। এর সাথে যোগ হয় ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনের আদর্শিক অবস্থান, যেখানে 'নির্বিচারে' দান-সাদাকা করা মহাপাপ। ফলে যে ত্রাণ দিয়ে লাখো কোটি ভারতীয়ের প্রাণ বাঁচানো যেত, সেগুলো আটকে দেওয়া হয়।

শুধু ক্রিকেট, চা আর ইংরেজি ভাষাকেই ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসনীয় অবদান মনে করাটা অসমীচীন। অন্যান্য অর্জনকে আমি নাকচ করে দিচ্ছি না। ব্রিটিশদের ব্যাবসায়িক স্বার্থে ভারতে কীভাবে লুটপাট হয়েছে, সে আলোচনা চলবে। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে, একই সূত্র ধরেই ব্রিটিশরা ভারতকে দিয়েছে যৌথ পুঁজির কারবারি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা ভারতকে উপকৃত করেছে। এশিয়ার প্রাচীনতম পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুম্বাইয়ে ১৮৭৫ সালে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পুঁজিবাজারের সাথে পরিচিত হয়ে ভারতীয়রা বিশ্ববাজারে দারুণভাবে এগিয়ে যেতে পেরেছে। আজকের উন্নত পশ্চিমা বিশ্বে যেসব জটিল অর্থবাজার রয়েছে, ভারতীয়রা এখন সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করতে বেশ সক্ষম। টাটা কোম্পানি সেই যোগ্যতা দেখিয়েছে জাগুয়ারকে ব্রিটেনে প্রথমবারের মতো লাভজনক পণ্যে পরিণত করার মাধ্যমে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ব্যবস্থাপকরা এখন এমনসব প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত, যেগুলো একবিংশ শতাব্দীর মুক্ত ও বৈশ্বিক বাজার পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। ভারত আজকে তার দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং ইংরেজি-বলা ব্যবসায়ীদের দিয়ে পুরো গ্রহকে পরিচালনা করতে তুমুল ব্যস্ত। এ তো ব্রিটিশ উপনিবেশবাদেরই অবদান, তাই না?

আসলে এই ফুলেল ধারণাটিকেও যাচাই করে দেখা চাই। বাস্তবতা হলো,

এই ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক শোষণের প্রতি ভারতীয়দের প্রথম প্রতিক্রিয়াটা ছিল একদমই বিপরীত: অনুকরণ নয়, প্রত্যাখ্যান। সেটাই স্বাভাবিক। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার যুদ্ধে শুধু বিদেশি শাসকদের নয়, বিদেশি পুঁজিবাদীদেরও উৎখাত করার বিষয় ছিল (যদিও জাতীয়তাবাদীরা বেশিরভাগই এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে অক্ষম)। উপনিবেশবাদের কল্যাণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বড় বড় নেতা পুঁজিবাদকে দাসপ্রথার সাথে মিলিয়ে ফেলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাবসা করতে এসে শাসন করার জন্য রয়ে গেছে। তাই জাতীয়তাবাদী শাসকরা ব্রিফকেসধারী প্রতিটা বিদেশিকেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন এবং নব্য-সাম্রাজ্যবাদী পেরেকের তীক্ষ্ণ আগা বলে ধরে নেন তাদের।

সিঙ্গাপুরের মতো কিছু দেশ উপনিবেশবাদ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে বেশ দারুণভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের নেতারা তা করতে চাননি। যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তারা এত সংগ্রাম করেছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সেটা অর্জন করা যাবে না বলেই বিশ্বাস করতেন তারা। তাই স্বনির্ভরতা হয়ে ওঠে প্রধান স্লোগান। বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ব্যবসায়ীদের বদলে আমলাদের সাথে ৪৫টি বছর কাটায় ভারত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সাড়ে চার দশকের বড় একটা অংশ ব্যয় করে অনুৎপাদনশীলতা প্রশমনে, স্থবিরতা দূরীকরণে এবং দারিদ্র্যের বোঝা সমবণ্টন করার কাজে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয়রা যে এসব হঠকারি সিদ্ধান্ত নিল, তার জন্য আসলে ব্রিটিশদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ইতিহাসের এক চিরন্তন শিক্ষা এখান থেকে পাওয়া গেল। তা হলো, ইতিহাস মাঝে মাঝে ভুল শিক্ষা দিয়ে যায়। বর্তমানে আমরা যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী সুনাম উপভোগ করছি, তা কতগুলো নতুন সিদ্ধান্তের ফল। স্বাধীনতার পরপর ব্রিটিশ ধ্যানধারণার ঢালাও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে যেসব ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর ফল নয়।

ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে ভারতে যেসব ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনা করেছে, সেগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতীয়দের কোনো উপকার হলে আমি তা সানন্দে স্বীকার করতে রাজি, কিন্তু সেটাও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ভারতীয়দের উপকার করাটা সেগুলোর আসল উদ্দেশ্য ছিল না। রেলপথ বানানো হয়েছিল একেবারেই ব্রিটিশদের লাভের জন্য। এর নির্মাণকাজ থেকে পরিচালনা পর্যন্ত প্রতিটা পর্যায়ে এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয়রা রেলপথ ছাড়া বাঁচতেই পারবে না। ভারত সরকার ব্রিটিশ নীতির

উলটোপথে হেঁটেছে। রেলগাড়িকে বানিয়েছে মূলত গণপরিবহণের মাধ্যম। মালামাল পরিবহণের ওপর উচ্চ ভাড়া আরোপ করে যাত্রীবহনে প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে (ব্রিটিশরা করত ঠিক তার বিপরীত)। একইভাবে ব্রিটিশদের সেচ কার্যক্রমেরও সমালোচনা করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা। কারণ, সেখানে খরচ করা হয়েছে রেলপথের মাত্র এক-নবমাংশ। আমেরিকান রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়াম জেনিংস দেখিয়েছেন, 'সেনাবাহিনীর পেছনে যে খরচ করা হতো, তার এক-দশমাংশ করলেও পাঁচ বছরের মধ্যে পুরো সেচব্যবস্থা দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সামরিক ব্যয় কমানো তো দূরের কথা, উলটো বাড়িয়ে দেওয়া হয়।'[৩৬০] তবুও সেচব্যবস্থার ফলে দেশের আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় দুই কোটি একর বেড়ে গেছে, যা পুরো ফ্রান্সের সমান (হায়, এর বেশিরভাগই বর্তমানে পাকিস্তানের সীমানায়)। এসব থেকে কোনো উপকারই আসেনি দাবি করাটা বোকামি। কিন্তু হিসাবের খাতা যখন খোলা হয়, শেষমেশ পুরো হিসাবই ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মাঝে মাঝে ব্রিটিশ উত্তরাধিকার হিসেবে দাবি করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী বন্ধুত্ব ও বীরত্বের মজবুত ঐতিহ্যে ঐক্যবদ্ধ এক পেশাদার লড়াকু বাহিনী। আজ পর্যন্ত এখানে মেধাতন্ত্রের জয়জয়কার এবং তা রাজনীতিমুক্ত। এই শেষের অর্জনটায় ব্রিটিশদের কৃতিত্ব কতটুকু, তা তর্কসাপেক্ষ। হাজার হোক, পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তো ওই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারই। কিন্তু একদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তিন তিনটে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলেছে, আবার ঘোড়ার পিঠে যখন নির্বাচিত সরকার থাকে, তখনো এর রাশ শক্ত করে ধরে রাখে তারাই। মূল কথা হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতের স্বার্থে নয়, বরং ব্রিটেনের স্বার্থে সৃষ্টি করা হয়েছিল—দেশে যেমন, তেমনই বিদেশেও। ভারতীয় সৈনিক ছিল স্রেফ এক অনুগত যন্ত্র। জনৈক সামসময়িক ব্যক্তির ভাষ্যে ভারতীয় সিপাহিরা 'শান্ত, শ্রদ্ধাশীল, ধৈর্যশীল, অনুগত, ও বিশ্বস্ত'।[৩৬১] এই শান্ত অবস্থার সমাপ্তি ঘটে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মাধ্যমে। কিন্তু ব্রিটিশরা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। পুনর্গঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি। পরবর্তী ৯০ বছর যাবৎ তারা আনুগত্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে টিকে থাকে।

এরপর ব্রিটিশরা একে টুকরো করে ফেলে দেশভাগের মাধ্যমে। এক মর্মস্পর্শী ঘটনা আছে এ নিয়ে। মুসলিম অফিসাররা পাকিস্তান নামক নতুন দেশে চলে যাবে। দিল্লির এক আর্মি মেসে আয়োজিত হয় বিদায়ি ভোজ।

[৩৬০] উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, পৃ. ১২।
[৩৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

হিন্দু ও মুসলিম অফিসাররা মিলে গান গায় 'ঔল্ড ল্যাং সাইন' (পুরোনো সে দিনের কথা)। তাদের মধ্যে বহু বছর ধরে সতীর্থতা গড়ে উঠেছিল। সেটা এখন ভেঙে যায় এমন এক ধর্মের কারণে, যা স্রেফ জন্মসূত্রে-পাওয়া। এমন রাজনৈতিক কারণে, যা তারা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি।

ফিলিপ ম্যাসন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সমালোচনাপূর্ণ তো নয়ই, বরং স্তবগীতি। মাত্র কয়েক হাজার ব্রিটিশ সেনা কীভাবে ২০ কোটি মানুষের একটা উপমহাদেশকে বাগে রেখেছে, তারই গুণগান করেছেন তিনি। জনৈক ভিক্টোরিয়ান প্রশাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আমাদের বাহিনী সত্যিকারের শক্তি দিয়ে যতটা না কাজ করে, তারচেয়ে বেশি করে শক্তির ভাব দেখানোর মাধ্যমে।'[৩৬২]

আজকের ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য-সংখ্যা ১০ লাখ। ব্রিটিশ সামরিক ঐতিহ্যের সেরা অংশটুকু তারা ধরে রেখেছে। তাদের পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি সতীর্থরা যে লোভের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে, তা থেকে নিজেদের সংবরণ করে রেখেছে খুব সাবধানে। এর কৃতিত্ব যেমন ভারতীয় কর্মকর্তা ও সৈনিকদের, তেমনই ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী চেতনারও।

এবার ব্রিটিশদের এমন কিছু অবদান নিয়ে কথা বলা যাক, যেগুলো দৃশ্যমান—দালান, বন্দর, রেলগাড়ি ও প্রতিষ্ঠান। আসল ঘটনা এই যে, ব্রিটিশরা ভারতীয় সম্পদের ওপর নিজেদের শোষণ জারি রাখতে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন বিনিয়োগটুকু করেই খালাস হয়ে যেত, আর স্থানীয় জনগণকে বিরত রাখত বিদ্রোহ করা থেকে। এরকম কিছু জিনিস যে-কোনো সমাজেরই মৌলিক প্রয়োজন। বেশিরভাগই তৈরি করা হয়েছে ব্রিটিশদের উপকারার্থে, চাই সেটা ভারতে হোক বা যুক্তরাজ্যে। নায়াল ফারগুসনের মতে, ব্রিটিশরা 'দরকারি' সব জিনিস তৈরি করে দিয়ে গেছে। বিপরীতে 'দৃষ্টিকটু ভোগে'র মাধ্যমে ভারতীয়রা করেছে নিজেদের সম্পদের অপব্যয়। ব্রিটিশদের বানানো 'দরকারি' জিনিসের উদাহরণ নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের থাকার জন্য বানানো আলিশান প্রাসাদ এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক পরিবহণের জন্য নির্মিত জাহাজ। আর ভারতীয়দের অপব্যয়ের উদাহরণ কী? রপ্তানিযোগ্য মসলিন সেলানো? উট্‌জ ইস্পাত দিয়ে বিশ্বে ধাতব শিল্পের আদর্শে পরিণত হওয়া? নজরকাড়া সব শহর আর মন্দির নির্মাণ? আচ্ছা, ফারগুসনের চোখে তাজ মহল কি একখানা প্রকাণ্ড ও দৃষ্টিকটু অপব্যয়?

একটা কাহিনি প্রচলিত আছে, এর উৎসটা আমি ঠিক জানি না। ওয়েলসের

---

[৩৬২] ম্যাসন, আ ম্যাটার অব অনার।

রাজকুমার এবং ভবিষ্যৎ অষ্টম এডওয়ার্ড ভারত ঘুরে যান ১৯২১ সালে। তিনি কয়েকটা নজরকাড়া দালান, গাড়ি আর বৈদ্যুতিক স্থাপনা দেখিয়ে সাথের এক ভারতীয়কে বলেন, 'ইন্ডিয়ায় আমরা তোমাদের সবকিছু দিয়েছি! কী নেই তোমাদের?' গোবেচারা ভারতীয়টি ভদ্রভাবে জবাব দিলেন, 'আত্মসম্মান, স্যার।'

সেটাও ছিনিয়ে নিয়েছে উপনিবেশবাদ। আত্মসম্মান আসে যখন আপনি জানবেন আপনিই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা, আপনার সমস্যাগুলো আপনারই দোষ এবং এসবের সমাধানও মূলত আপনার ওপরই নির্ভরশীল, দূরদেশে বসবাসরত কোনো বিদেশির ওপর নয়। স্বাধীনতা যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা গড়ে দিয়েছে, তা এখানেই। গণতান্ত্রিক অধিকার এবং শক্তিশালী নাগরিকত্বের এক সর্বজনীন ধারণার প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক বা উপজাতীয় গোষ্ঠী নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে, নিজেদের কণ্ঠস্বর শোনাতে পারে। ঔপনিবেশিক প্রজা থাকাকালে এই সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ভারতীয়দের। প্রজাত্ব ছাড়া ব্রিটিশরা তাদের আর কিছুই দান করতে চায়নি।

নৈতিক বাধা

জওহরলাল নেহরু একবার ব্রিটিশ ভারতকে তুলনা করেছিলেন প্রকাণ্ড এক বাগানবাড়ির সাথে। ব্রিটিশরা তার সেরা কক্ষগুলোয় বসবাসকারী ভদ্রসমাজ, আর ভারতীয়দের বাস চাকর-ঘরে। 'প্রতিটা আদর্শ বাগানবাড়ির নিচু লোকদের মাঝে একটা ক্রম থাকে—প্রধান চাকর, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পাচক, পরিচারক, পরিচারিকা, অতিথি-সেবক, ইত্যাদি। তাদের মাঝে কঠোরভাবে ক্রম বজায় রাখা হয়। কিন্তু বাড়ির উঁচু আর নিচু শ্রেণির মাঝে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধার দেওয়াল, তা একেবারেই অনতিক্রম্য।'

এই বাধা নিতান্ত সামাজিক বা বর্ণগত নয়; এ বাধা নৈতিকতার, উদ্দেশ্যের ও স্বার্থের। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কস্মিনকালেও ভারতীয় জনগণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছে—এই একটা দাবি কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। যে বাণিজ্যিক মুনাফালোভী কর্মকাণ্ড কোনো ভারতীয় নারীর কষ্টের কারণ হয়েছে, ব্রিটিশরা কখনোই সেই নারীর চাহিদাকে নিজেদের মুনাফার চেয়ে বড় করে দেখেনি। একটা উদাহরণও নেই। বরং এর বিপরীত ঘটনার নমুনাই ভূরিভূরি বিদ্যমান, যেমন ধরুন আফিম চাষ ও বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতিমালা। চীনেও ব্রিটিশরা চেয়েছিল যেন সেখানকার জনগণ আফিমখোর মাতালে পরিণত হয়। কারণ, এতে ব্রিটিশদের আর্থিক স্বার্থ নিহিত। এই

করতে গিয়ে সেখানে একজোড়া আফিম যুদ্ধও বাধিয়েছে তারা। ভারতে এটা হয়ে ওঠে জনগণকে শোষণ করার আরেকটি উপায়মাত্র।

আফিম উৎপাদন ও বিক্রয় উভয়টিই যেন ব্রিটিশ সরকারের একচেটিয়া কারবার হয়ে থাকে, তা নিশ্চিত করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই ব্যাপারগুলো জানা যায় উইলিয়াম হাউইটের ১৮৩৮ সালের এক বর্ণনা থেকে :

কোম্পানির শাসনাধীনে থাকা পুরো এলাকাজুড়ে পপি চাষ, মাদক তৈরি, এবং এর চালান, [...] খুব কঠোরভাবে একচেটিয়া মালিকানাধীন... রায়তদের জন্য আফিম চাষ বাধ্যতামূলক। দেশীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে সরকার অগ্রিম মজুরি পরিশোধ করে। কোনো রায়ত যদি অগ্রিম টাকা নিতে না চায়, 'তাহলে রুপিগুলো স্রেফ তার ঘরের ভেতর ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসা হয়। রায়ত যদি পালানোর চেষ্টা করে, পিয়ন তাকে ধরে অগ্রিম টাকা তার কাপড়ে বেঁধে দেয়। তারপর ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেয় তার ঘরে। চুক্তি যেহেতু হয়েই গেছে, সেহেতু রায়তের এবার তা পূরণ করা ছাড়া আর গতি নেই...।'[৩৬৩] ভারতে আমাদের প্রজা বন্ধুদের ওপর আফিম চাষের মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়েছে। পাটনা ও বেনারসের রায়তরা তাদের জমির একটা অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য, যেন সেখানে পপি চাষ করা যায়।

চাইনিজরা আফিমের জোয়াল ভেঙে ফেলার পরও ভারতে পুরোদমে এই জিনিস চলমান থাকে। গণ-অসন্তোষের জবাবে ১৮৯৫ সালে গঠন করা হয় রয়াল কমিশন। তারা আফিম বিভীষিকাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দাবি করে যে, জনগণের ভীতি ও আশঙ্কা অতিরঞ্জিত। (দুর্ভিক্ষের জন্য বিখ্যাত স্যার রিচার্ড টেম্পল এই কমিশন গঠনেরও আগে আফিম নীতির সাফাই গেয়েছেন। ততদিনে তিনি অবশ্য অবসরে।) ডুরান্ট ১৯৩০ সালে ভারতে ৭,০০০ আফিমের দোকান দেখতে পান। এর প্রত্যেকটার মালিক ব্রিটিশ সরকার। প্রত্যেকটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংস্থা এবং সমাজসেবামূলক গোষ্ঠীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা এই ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৪,০০,০০০ একর উর্বর জমিতে চাষ করা হচ্ছে আফিম। অথচ অপুষ্টি-আক্রান্ত ভারতীয়দের জন্য এগুলোতে খাবার উৎপাদন করা যেত। নখদন্তহীন কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যরা ১৯২১ সালে তাদের সহকর্মীদের কাছে যান একটা বিল পাশ করাতে। ভারতে আফিম উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করার দাবি করেন তারা। সরকার তাতে ভিটো দিয়ে দেয় স্রেফ এই যুক্তিতে যে, তারা এটা

---

[৩৬৩] হাউইট বলেছেন, তিনি এই উদ্ধৃতিটি নিয়েছেন 'পপি চাষ'-এর ওপর লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে, যা ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাইনিজ রিপোজিটোরিতে প্রকাশিত হয়।

মানতে অনিচ্ছুক। যত যা-ই হোক, সরকারের বার্ষিক রাজস্বের এক-নবমাংশই আসে ড্রাগ থেকে। মহাত্মা গান্ধি আসামে আফিমের বিরুদ্ধে রীতিমতো প্রচারযুদ্ধ শুরু করে এর সেবনের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনেন। ব্রিটিশরা এর জবাবে তাকে এবং আরও ৪৪ জন সত্যাগ্রহীকে জেলে পুরে দেয়।

বহু জায়গায় বিশ্ব আফিম সম্মেলন আয়োজিত করে এই ক্ষতিকর ড্রাগ বিলুপ্ত করার দাবি জানানো হয়। কিন্তু ব্রিটিশরা এসব দাবির প্রতি কর্ণপাতই করেনি। বৈশ্বিক অসন্তোষকে শান্ত করার জন্য আফিমের বার্ষিক রপ্তানি ১০ শতাংশ কমিয়ে আনতে রাজি হয় তারা, কিন্তু ভারতে তারা এর উৎপাদন ও বিপণন কিছুতেই কমাবে না বা বন্ধ করবে না। (একটি সরকারি ব্যয়সংকোচন কমিশন আর্থিক হিসাব কষে যথার্থই বুঝতে পারে, 'রাজস্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই আফিম। তাই এর বিক্রয়কে সুরক্ষিত রাখার গুরুত্ব' অনেক বেশি। রায় দেয়, 'এরচেয়ে আর কমানো যাবে না'।) ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আফিম হয়ে ওঠে স্বেচ্ছায় সেবনীয় ড্রাগ। যাদের জ্ঞানবুঝ কম, তারা এর যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে। বাচ্চাদের চুপ করিয়ে রাখতে মায়েরা তাদের বাচ্চাদের আফিম গিলিয়ে দেয়, আর নিজেদের দুর্বল শরীর টেনে টেনে নির্মাণশ্রম করতে চলে যায় দুমুঠো খাবার উপার্জনের জন্য।

ব্রিটিশদের আফিম নীতিকে কি ওই যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মাফ করে দেওয়া যায়? আজকের জামানার মানদণ্ডে একে বিচার করতে যাওয়া কি ভুল? না। ব্রিটিশদের এই কাজের আপাদমস্তক সমালোচনা করেছেন তৎকালের সকল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ডজন ডজন বিদেশি প্রতিনিধি, এবং ক্ষুব্ধ উইল ডুরান্টের মতো বহু চিন্তাশীল বিদেশি পর্যবেক্ষক ও প্রতিবেদকগণ। পরিহাসের ব্যাপার, আফিমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিধ্বংসী কামানটা দাগিয়েছেন আর কেউ নন, স্বয়ং ম্যাকাউলি। তিনি ১৮৩৩ সালে হাউজ অব কমন্সে এক বক্তৃতায় বলেন :

ভারতে গিয়ে আমরা যেসব নচ্ছার স্বৈরশাসকের দেখা পেয়েছি, [এটা ছিল] তাদের অভ্যাস। তারা যখন কোনো বিশিষ্ট প্রজার যোগ্যতা ও শক্তিমত্তা নিয়ে শঙ্কায় পড়ে যেত... তখন তাদের দৈনিক কিছু মাত্রায় আফিম সেবন করানোর ব্যবস্থা করত। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত বেচারার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা। সে হয়ে পড়ত এক অথর্ব বেকুব। এই জঘন্য কাজটি হত্যাকাণ্ডের চেয়েও নিকৃষ্ট। এহেন কূটকৌশল তাদের মানায়...। ইংরেজ জাতির জন্য এটি মোটেও কোনো আদর্শ নয়। পুরো একটা জনগোষ্ঠীকে [আফিম] সেবন করানো, মহৎ এক জাতিকে অচল ও অক্ষম করে দেওয়াকে

আমরা কখনোই অনুমোদন দেবো না।[৩৬৪]

তিনি কি আর জানতেন যে, তার এই কথার এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে গিয়ে তার নিজের ব্রিটিশ সরকারই এর উলটোটা করে বসবে? তিনি যেটার ওপর বাক্যবাণ হানলেন, সেটাকেই আপন করে নেয় তারা।

ব্রিটিশ সরকার আফিম বিক্রি থামাতে ক্রমাগত অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে। এর কারণটা অবশ্য জানা। ভারতীয় সমাজকে সংস্কার করতে তাদের যে ব্যাপক অনীহা, এটাও সেই অনীহারই অংশ। উলটো নিজেদের নীতিমালা দিয়ে তারা সমাজটির অপূরণীয় ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। অজুহাত হিসেবে বলত, দেশীয় রীতি-প্রথার প্রতি সম্মানবশতই নাকি তারা সমাজে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু আসল কারণ সেটা নয়। সংস্কার করতে গেলে টাকা খরচ হয় আর ঝামেলা সামাল দিতে হয়। ওই ঝামেলা সামাল দিতে খরচ হবে আরও কিছু টাকা ও সময়। তাই তো ব্রিটিশ শাসনামলে বর্ণপ্রথাকে আরও জোরদার করা হয়, রক্ষণশীল ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের দিয়ে মুসলিম সমাজকে দাবিয়ে রাখা হয়, বাল্যবিবাহ ও অস্পৃশ্যবাদ জিইয়ে রাখা হয়। ভারতীয় সমাজের এরকম বহু প্রথা থেকে ব্রিটিশরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। সেগুলোতে বাগড়া দেওয়ার মতো ঝুঁকি নিতে তারা নারাজ। কিন্তু যখন নিজেদের স্বার্থ ঠিক রাখার বিষয় থাকে, তখন ঠিকই নাক গলায় সামাজিক রীতির ভেতরে।[৩৬৫] সর্বজনীন উদারতাবাদের তত্ত্ব এবং বাস্তব ঔপনিবেশিক প্রয়োগের মাঝে আকাশপাতাল ফারাক।

সমাজ-সংস্কার যা হয়েছে, সেগুলোর কারিগর ভারতীয় সংস্কারকগণ। ব্রিটিশরা তাদের কাজে সঙ্গ দিয়েছে মাত্র, নিজেরা শুরু করেনি (ঠগিদের দমন করার কাজটা অবশ্য ব্যতিক্রম, কারণ ব্রিটিশদের চোখে সেটা ধর্মীয় নয়, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা)। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করার দাবি তোলেন রাজা রামমোহন রায়। সঠিক চিন্তাধারার ভারতীয়রা তার পক্ষে আছেন জেনে দাবিটি কার্যকর করেন বেন্টিংক। বর্বর নেটিভদের ওপর বিবেকবান ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের কোনো বিষয়ই এখানে ছিল না। ব্রিটিশ রাজের অধীনে বিয়ের

---

[৩৬৪] টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকাউলি, মিসেলানিয়াস রাইটিংস অ্যান্ড স্পিচেস—খণ্ড ৪, প্রজেক্ট গুটেনবার্গ, ২০০৮। www.gutenberg.org/files/2170/2170-h/2107-h.htm.

[৩৬৫] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য দাসত্বের কিছু বিশেষ প্রাচীন প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দাসপ্রথা-বিরোধী প্রচারণাকারীদের আকুল আবেদন, যেটা কোম্পানির কর্মকর্তৃগণ যথারীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন: উইলসন অ্যান্টি-স্লেইভারি কালেকশান: আ ব্রিফ ভিউ অব স্লেইভারি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮৪১, ম্যানচেস্টার: দ্য ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার, জন রাইল্যান্ডস ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি। ইউআরএল: www.jstor.org/stable/60228274.

সর্বনিম্ন বয়স যে একটুখানি বেড়েছে (নারীদের ১৪ এবং পুরুষদের ১৮), সেটার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন আইনসভার ভারতীয় সদস্যারা। পক্ষান্তরে ব্রিটিশরা প্রথমে এর বিরোধিতা করেন এবং পরবর্তীকালে নিতান্ত অনিচ্ছায় মেনে নেন। বিধবা হত্যা, অস্পৃশ্যতা এবং নরবলির মতো ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধেও প্রথমবার আওয়াজ তোলেন ভারতীয় সংস্কারকগণ, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজ। ব্রিটিশদের নির্লিপ্ত দৃষ্টির সামনে এসব ব্যাধি আপন গতিতেই চলে আসছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তিন তিনজন নারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারটাও ছিল চমকপ্রদ। অথচ ব্রিটিশদের গভর্নর, সেক্রেটারি বা অন্য কোনো উচ্চ পদে তখন পর্যন্ত একজনও নারীর দেখা মেলেনি। নারী ভাইসরয় তো দূরের কথা, কর্তৃপক্ষের আসনে নারীর অবস্থানটাই ব্রিটিশদের কাছে তখনো অতিকল্পনা। তৎকালীন সরকার হিসেবে ব্রিটিশদের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল যে-কোনো পরিবর্তনের অনুমোদন দেওয়ার ও কার্যকর করার। কিন্তু তাদের নিজে থেকে এসব সংস্কার শুরু করার ঘটনা একেবারেই বিরল।

লরেন্স জেইমস দম্ভ করে বলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সর্বদাই ছিল এক উন্মুক্ত সমাজ। স্ট্যালিনের রাশিয়ার মতো নয়।'[৩৬৬] তুলনাকারী ব্রিটিশ রাজের গোঁয়ার সাফাই-গায়ক হিসেবে বড়ই মজাদার। কিন্তু ওটা নিয়ে আপাতত আর টানাহ্যাঁচড়া করলাম না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাদের জন্য উন্মুক্ত সমাজ? অশ্বেতাঙ্গদের জন্য তো নয়-ই, যেমনটা আমরা দেখলাম; কোনো বর্ণের নারীদের জন্যও নয়; আর ভারতীয়দের জন্য তো তা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।[৩৬৭]

কারণ, আমি বারবার দেখিয়েছি, প্রতিটা জিনিসের পেছনেই ছিল একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এর আগের সকল ভারত-বিজেতা, সকল বিদেশি অধিপতি এ দেশে থেকে গেছেন (মাহমুদ গজনবি, তৈমুর লং ও নাদির শাহের মতো ঝটিকা হানাদারদের কথা বাদ দিলে)। কিন্তু ব্রিটিশদের কোনো ইচ্ছাই ছিল না এ মাটির সাথে এক হয়ে যাওয়ার। ফরাসিরা বিদেশি অঞ্চল শাসন করে সেগুলোকে ফরাসি বানিয়ে ফেলেছে, ফরাসি বয়ানে আত্তীকৃত করে নিয়েছে তাদের। পর্তুগিজরা তাদের সব উপনিবেশে স্থায়ী বসতি গড়ে স্থানীয়দের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা সবসময়ই থেকেছে আলগোছে এবং

---

[৩৬৬] লরেন্স জেইমস, দ্য মেইকিং অ্যান্ড আনমেইকিং অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক: সেন্ট মার্টিন'স প্রেস, ২০০০; বিকল্প শিরোনাম রাজ: দ্য মেইকিং অ্যান্ড আনমেইকিং অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, লন্ডন: লিট্‌ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং, ১৯৯৭।

[৩৬৭] দ্রষ্টব্য ফিলিপা লেভাইন, সম্পা. জেন্ডার অ্যান্ড এম্পায়ার-এর প্রবন্ধসমূহ, অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার কম্প্যানিয়ন সিরিজ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪।

অন্যমনস্ক হয়ে। তারা এক পরদেশি মূর্তি, যার স্বার্থ পরদেশি এবং আনুগত্যও পরদেশের প্রতি।

দিল্লির সুলতানবৃন্দ ও মুঘলরাও বিদেশ থেকে আগত। তাদের পূর্বপুরুষদের মন হয়তো প্রায়ই ছুটে যেত ফারগানা উপত্যকার মতো সুদূরের শহরগুলোতে। স্মৃতিতে সেটাই তাদের 'বাড়ি', কিন্তু তারা ভারতেই স্থায়ী হয়েছেন, কোনো বিভুঁইয়ের প্রতি আনুগত্য রাখেননি। সুলতান ও মুঘলরা বিয়ে করেছেন ভারতীয় নারীদের। নিজেদের বিদেশি রক্তকে তারা এমনভাবে গুলিয়ে দিয়েছেন যে, কয়েক প্রজন্ম পর তাদের বিদেশি জাতীয়তার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর ছিলেন আধা-রাজপুত। জাহাঙ্গীরের ছেলে শাহ জাহানেরও জন্ম ভারতীয় বধূর গর্ভ থেকে। আওরঙ্গজেব যতদিনে জন্মালেন, ততদিনে তার রক্তে অ-ভারতীয় উপাদান মোটে আট ভাগের এক ভাগ। হ্যাঁ, মুঘল সম্রাটরা সবাই ফারগানার সাথে নিজেদের বন্ধন গভীরভাবে অনুভব করতেন। সেখান থেকে প্রতিনিধি দল এলে তারা খোঁজখবর নিতেন যে, পূর্বপুরুষদের চেঙ্গিসি সমাধিগুলোর কী হাল-অবস্থা। তারা টাকাপয়সা দিতেন সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। অতীত তো মুঘলদের পরিচয়েরই অংশ। কিন্তু নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে মুঘলদের চিন্তাভাবনা ভারতের মাটিতেই প্রোথিত। পক্ষান্তরে ব্রিটিশরা জাতিগতভাবে আলাদা হয়ে থাকে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে এবং আন্তর্বিবাহকে ছি ছি করে।

হ্যাঁ, মুঘল সম্রাটরাও ভারতের নাগরিকদের থেকে খাজনা নিতেন, পদানত শাসকদের থেকে কর তুলতেন, যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের কোষাগার লুট করতেন—ঠিক ব্রিটিশদের মতোই, কিন্তু এই উপার্জন তারা ব্যয় বা সঞ্চয় করতেন ভারতেই। ব্রিটিশরা যেভাবে ভারতের রাজস্ব লন্ডনে পাঠিয়ে দিত, মুঘল সম্রাটরা সেভাবে সমরকন্দ বা বুখারায় চালান করে দিতেন না। ভারতের সম্পদ চাষ করে তারা ভারতেরই উন্নয়ন করেছেন, প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নানা শিল্প খাত ও হস্তশিল্পকে। বিদেশ থেকে তারা চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতিদের আনাতেন; কিন্তু এনে মিশিয়ে ফেলতেন নিজেদের দরবারে, উৎসাহ দিতেন তাদের এই নতুন ঠিকানার শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রাঙিয়ে তুলতে।

ব্রিটিশরা এরকম কাজ করেছে কম, খুবই কম। তারা ভারতে রৌদ্রস্নান করে হা-হুতাশ করত তাদের শীতল ও কুয়াশা-ঢাকা স্বদেশের জন্য। ভারতীয় শ্রমিকের ঘর্মাক্ত ভ্রু থেকে ঝরে পড়া টাকা পাঠিয়ে দিত ইংল্যান্ডে। ভারতের

জন্য যৎসামান্য যা করেছে, তার মাত্রাতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে ছেড়েছে ভারতেরই কাছ থেকে। শেষমেশ অবসর জীবন যাপনের জন্য ফিরে গেছে ভারতীয় নামসংবলিত স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট কটেজে। তাদের হেলান দেওয়ার বালিশ নরম হয়েছে ভারতীয় করদাতাদের থেকে আসা অঢেল অবসরভাতার কল্যাণে।

সাম্রাজ্যের সাফাই-গায়করা কখনোই সদ্‌ভাবে যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারবে না, সেটা হচ্ছে 'কে বড় লাভবান?' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে আখেরে কার উপকার হলো? উত্তরটা স্পষ্টতই স্বয়ং ব্রিটেন।[৩৬৮] শেষবারের মতো হিসাবের দিকে তাকাই, দৃষ্টিসীমাটা আরেকটু বড় করে। ইতিহাসজুড়ে বৈশ্বিক জিডিপিতে দেশটির অবদান কেমন ছিল, তার তুলনামূলক ছকটা এক্ষেত্রে বেশ কাজের। পয়লা খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম যখন আক্ষরিক অর্থেই নেংটি পরে ঘুরছে, ভারত তখন বৈশ্বিক জিডিপির ৩৩ শতাংশের জোগানদাতা।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির সম্মিলিত অবদান মাত্র ৩ শতাংশ। ১৭০০ সাল আসতে আসতে হিসাব যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১১ শতাংশ; ১৮৭০ সালে সাম্রাজ্য যখন মধ্যগগণে, তখন ভারতের ১২.৫ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ত্রয়ীর ২২ শতাংশ; ১৯১৩ সালে ভারত আরও গরীব হয়ে যাওয়ার পর যথাক্রমে ৯ বনাম ২২.৫ শতাংশ। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার কিছু পরে ১৯৫০ সালে ভারত দাঁড়িয়ে ছিল ৪ শতাংশের ওপর; ২০০৮ সালে তা ৭ শতাংশের চেয়ে বেশি এবং ক্রমবর্ধমান। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি মিলে ১৯৫০ সালে ১৬ শতাংশে নেমে গিয়েছিল, বর্তমানে ৯ শতাংশের ওপর ভাসছে।[৩৬৯] ২৫ বছর আগে বৈশ্বিক জিডিপিতে ব্রিটেনের হিস্‌সা যেখানে ছিল ৬ শতাংশ, ২০১৪ সালে সেটা ২.৪-এ নেমে এসেছে। ইতিহাস নিজেই কথা বলছে।[৩৭০]

এটাই সেই বাস্তবতা, যার ওপর ব্রিটিশ রাজপন্থিরা লিপস্টিক সাঁটাতে চায়। ফারগুসনের সাম্রাজ্যবাদী বকবকানির জনৈক পর্যালোচক যথার্থই বলেছেন: 'ফারগুসনের "ইতিহাস" আসলে এক আধুনিক রূপকথা, যেখানে ঘাড়ের বোঝাবাহী শ্বেতমানব হলো কেন্দ্রীয় নায়ক। যে উপনিবেশবাদ আদতে দাসপ্রথা, লুটতরাজ, যুদ্ধ, দুর্নীতি, ভূমিগ্রাস, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রম,

---

[৩৬৮] এই বই যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে, ঠিক তখনই প্রায় একই বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি বই: জন উইলসন, ব্রিটেন'স রাজ অ্যান্ড দ্য কেওস অব এম্পায়ার, লন্ডন: সিমোন অ্যান্ড শুস্টার, ২০১৬।

[৩৬৯] দ্রষ্টব্য https://infogr.am/Share-of-world-GDP-throughout-history.

[৩৭০] www.quandl.com/collections/economics/gdp-as-share-of-world-gdp-at-pp-by-country.

দারিদ্র্য, গণহত্যা, খুনোখুনি এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির গল্প, সেটাকে নতুন করে লেখা হয়েছে উদার উন্নয়ন অভিযানের কাহিনি হিসেবে, যেখানে অল্প কয়েকটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা ও বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আরকি।'[৩৭১]

আগেও বলেছি, কিপলিং যখন তার বর্ণবাদী কবিতা "দ্য ওয়াইট ম্যান'স বার্ডেন" প্রকাশ করেন, সামসময়িক হেনরি লাবুশিয়ার সাথে সাথেই তার প্রত্যুত্তর হিসেবে লিখে ফেলেন "দ্য ব্রাউন ম্যান'স বার্ডেন"।[৩৭২] সাম্রাজ্যবাদের কুফলগুলো খুব ভালোভাবে উঠে এসেছে তাতে—তা সেই সাম্রাজ্য ব্রিটিশদের হোক বা অন্য কারও (আমেরিকানরা তখন মাত্রই ফিলিপাইনস জয় করতে বেরুচ্ছিল)। কবিতার পুরোটা না হলেও বড় অংশ এখানে উদ্ধৃত করাটা বাঞ্ছনীয় :

Pile on the brown man's burden
To gratify your greed;
Go, clear away the 'niggers'
Who progress would impede;
Be very stern, for truly

'Tis useless to be mild
With new-caught, sullen peoples,
Half devil and half child.

Pile on the brown man's burden;
And, if ye rouse his hate,
Meet his old-fashioned reasons
With Maxims up to date.
With shells and dumdum bullets
A hundred times made plain
The brown man's loss must ever

---

[৩৭১] প্রিয়ংবদা গোপাল, 'দ্য স্টোরি পেড়লড বাই ইম্পেরিয়াল অ্যাপোলোজিস্টস ইজ আ পয়জোনাস ফেইরিটেইল', দ্য গার্ডিয়ান, ২৮ জুন ২০০৬।

[৩৭২] হেনরি লাবুশিয়ার, 'দ্য ব্রাউন ম্যান'স বার্ডেন' প্রথমবার প্রকাশিত হয় লন্ডনভিত্তিক ম্যাগাজিন ট্রুথ-এ ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ম্যাগাজিনটির সম্পাদক লাবুশিয়ার নিজেই।

Imply the white man's gain.

Pile on the brown man's burden,
compel him to be free;
Let all your manifestoes
Reek with philanthropy.
And if with heathen folly
He dares your will dispute,
Then, in the name of freedom,
Don't hesitate to shoot.

Pile on the brown man's burden,
Nor do not deem it hard
If you should earn the rancour
Of those ye yearn to guard.
The screaming of your
Eagle Will drown the victim's sob—
Go on through fire and slaughter.
There's dollars in the job.

Pile on the brown man's burden,
And through the world proclaim
That ye Freedom's agent—
There's no more paying game!
And, should your own past history
Straight in your teeth be thrown,
Retort that independence
Is good for whites alone.

Pile on the brown man's burden,

With equity have done;
Weak, antiquated scruples
Their squeamish course have run,
And, though 'tis freedom's banner
You're waving in the van,
Reserve for home consumption
The sacred 'rights of man'!

And if by chance ye falter,
Or lag along the course,
If, as the blood flows freely,
Ye feel some slight remorse,
Hie ye to Rudyard Kipling,
Imperialism's prop,

And bid him, for your comfort,
Turn on his jingo stop.

এতসব অবিচার ও অত্যাচার সত্ত্বেও ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ভারতীয়রা তাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেয়। ভারতীয়রা তাদের সাথে একটা 'বিশেষ সম্পর্ক' বজায় রাখে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে উষ্ণতা ও আবেগের মাধ্যমে। এটা ব্রিটিশ রাজের কোনো কথিত উপকারের ফল নয়, বরং স্বয়ং ভারতীয়দেরই সদিচ্ছা।

জওহরলাল নেহরুকে নিয়ে একটা কাহিনি প্রচলিত আছে, হয়তো-বা বানোয়াটই হয়ে থাকবে। তিনি ১৯২২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আট মেয়াদে মোট ৩,২৬২ দিন (তার জীবনের প্রায় ১০ বছর) ব্রিটিশ কারাগারে কাটিয়েছেন। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী উইন্সটন চার্চিল তার কাছে জানতে চান, বন্দিকারী ও নিপীড়নকারীদের প্রতি তার বিদ্বেষ এত কম কেন। সম্প্রতি হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মহাত্মা গান্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে নেহরু নাকি জবাব দিয়েছেন, 'এক মহৎ মানুষ আমাকে শিখিয়েছেন, যেন কাউকে ঘৃণা না করি—কাউকে ভয় না পাই।'

০৮

উপনিবেশবাদের হযবরল পরকাল

শেষবারের মতো বলে নিই, আমি ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সমালোচনা করছি মাত্র। তাই বলে আমার দেশে যতগুলো খারাবি আছে, সবগুলোর জন্য মোটেও ব্রিটিশদের দুষছি না। এখনো ভারতে যেসব ব্যর্থতা ও ঘাটতি বিরাজমান, সেগুলোকেও বৈধতা দেওয়ার কিছু নেই। ঔপনিবেশিক অত্যাচার একটা সময় শেষ হয়, কিন্তু মানবস্মৃতির কোনো মেয়াদ নেই, বিশেষত জীবন্ত স্মৃতির। আগেই বলেছি, এখনো এমন লাখো-কোটি জীবিত ভারতীয় আছে, যাদের এখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনাচারের স্মৃতি মনে আছে। ইতিহাস অতীতের বিষয়, কিন্তু সেটাকে বোঝা বর্তমানের দায়িত্ব।

সাম্রাজ্যবাদী স্মৃতিভ্রংশ

সৌভাগ্যবশত, দেশের প্রত্যেকটা সমস্যার জন্য উপনিবেশবাদকে বকাঝকা করার চল এখন উঠে গেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের বেশিরভাগ অংশের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। আন্তর্জতিক পর্যায়েও উপনিবেশবাদের আলাপটা বেশ সেকেলে হয়ে গেছে। বি-উপনিবেশায়ন যে জরুরি, তা নিয়ে এখন আর তেমন বিতর্ক নেই। উপনিবেশবাদ বিষয়টাই আর তেমন মতভেদের জন্ম দেয় না। (যত যা-ই হোক, বর্তমানে আর সেরকম কোনো সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই নেই, যেটাকে টিকিয়ে রাখা বা হটিয়ে দেওয়ার জন্য বড়সড় কোনো যুদ্ধ লাগবে।) তারপরও একটা ব্যাপার একদম অবাক করে দেয় যে, স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগরিকরাই কত তাড়াতাড়ি স্মৃতিবিলোপে আক্রান্ত হয়ে গেল। ব্রিটেনে ১৯৯৭ সালে গ্যালাপের পরিচালিত একটি জরিপ থেকে জানা যায়: ৬৫ শতাংশ মানুষই জানে না রবার্ট ক্লাইভ বা জেইমস উলফের সাথে কোন দেশের নাম জড়িয়ে আছে, ৭৭ শতাংশ সেসিল রোডসকে চেনে না, ৭৯ শতাংশ রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা চিনতে পারেনি, এবং ৪৭ শতাংশের ধারণা অস্ট্রেলিয়া এখনো উপনিবেশ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে একসময় ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, এই কথাটা জানে না ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ।[৩৭৩]

তবুও যারা বিশ্ব পরিক্রমার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল, তারা উপনিবেশবাদকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলে কাজটা ঠিক হবে না। বিস্ময়কর হলেও সত্য, আমাদের আজকের পৃথিবীর সমস্যা ও বিপদগুলোকে বোঝার জন্য এটা বেশ প্রাসঙ্গিক এক উপাদান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং এর ইউরোপীয় সঙ্গীরাই 'মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পুরো বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতার একটা ক্রম সৃষ্টি করে'।[৩৭৪] এজন্যই তাদের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত টিকে আছে। এক পর্যালোচক যথার্থই বলেছেন, 'ক্যাসাব্লাংকা থেকে জাকার্তা পর্যন্ত সবখানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এখনো একটি সজীব রাজনৈতিক প্রভাবক। সামসময়িক কূটনীতি যদি এই বিষয়টাকে বিবেচনায় না নেয়, তাহলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। হোক তা তেহরানের সাথে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে সংলাপ কিংবা রেনমিনবির[৩৭৫] ভবিষ্যৎ নিয়ে চীনাদের সাথে আলোচনা।'[৩৭৬]

নায়াল ফারগুসন অবশ্য ঠিক এই কাজটাই করেন। বিশ্বের বহু কল্যাণকে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অবদান মনে করেন, বিশেষ করে পণ্য, পুঁজি ও শ্রমের মুক্ত চলাচল এবং পশ্চিমা আইনকানুন ও সরকারব্যবস্থা আরোপ।[৩৭৭] তার যুক্তি, সারা গ্রহে ব্রিটিশ শাসন ছড়িয়ে না পড়লে আজকের অনেক দেশেই উদার পুঁজিবাদ সফল হতে পারত না।[৩৭৮]

এই বক্তব্য যদি যুক্তিযুক্ত হতোও, তবুও সেটা ফারগুসনের কথামতো কোনো 'ভালো জিনিস' নয়। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে তিনি এতটা ধন্য ধন্য করেন, সেটা আজও টিকে আছে। এর সবচেয়ে লক্ষণীয় উদাহরণ হলো সাবেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ওপর এখনো বহু দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান রয়েছে। উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত হলেও

---

[৩৭৩] স্টুয়ার্ট ওয়ার্ড, সম্পা., ব্রিটিশ কালচার অ্যান্ড দি এন্ড অব এম্পায়ার (ম্যানচেস্টার, ২০০১), ২৮,১২৮, উদ্ধৃত করেছেন রিচার্ড প্রাইস, 'ওয়ান বিগ থিং: ব্রিটেন, ইটস এম্পায়ার, অ্যান্ড দেয়ার ইম্পেরিয়াল কালচার', জার্নাল অব ব্রিটিশ স্টাডিজ, খণ্ড ৪৫, সংখ্যা ৩, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৬০২–৬০৭। প্রকাশক: দ্য নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন ব্রিটিশ স্টাডিজের পক্ষ থেকে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস www.jstor.org/stable/10.1086/503593.

[৩৭৪] পঙ্কজ মিশ্র, ফ্রম দ্য রুইনস অব এম্পায়ার: দ্য রিভল্ট এগেনস্ট দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড দ্য রিমেইকিং অব এশিয়া, লন্ডন: অ্যালেন লেইন, ২০১২, পৃ. ৪২।

[৩৭৫] চীনের মুদ্রা, যার অপর নাম ইউয়ান।—অনুবাদক।

[৩৭৬] মার্ক মাযোয়ার, 'ফ্রম দ্য রুইনস অব এম্পায়ার', ফিনানশিয়াল টাইমস, ২৭ জুলাই ২০১২।

[৩৭৭] ফারগুসন, এম্পায়ার, পৃ. ২৫।

[৩৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।

অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারেনি তারা। এটা নিশ্চয়ই উপনিবেশবাদীদের জন্য কোনো কৃতিত্বের বিষয় নয়। সাম্রাজ্য হয়তো গত হয়ে গেছে, কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে তারা রেখে গেছে একটি অনুকরণপ্রিয় অভিজাত গোষ্ঠীকে। তাদের মাধ্যমেই এখনো টিকে আছে সাম্রাজ্যবাদ। ভি. এস. নইপলের ভাষ্যে, এরা হলো 'নকলবাজ ভাঁড়'। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের যেটা হতে দেয়নি, এখন সেটাই হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এই করতে গিয়ে তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের সমাজকে এমনসব কর্পোরেশানের কাছে পদানত করে রাখছে, যেগুলোর মূল ঘাঁটি ওই মেট্রোপোলেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সাবেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এর আধুনিক উত্তরসূরিরা যেন পুঁজিবাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে টিকে থাকে, সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে বিশ্বায়নের মাধ্যমে।[৩৭৯]

ভারত অবশ্য তার কয়েক দশকের আর্থিক স্বনির্ভরতার বদৌলতে এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। কিন্তু পঙ্কজ মিশ্র এখানে আশঙ্কার একটা ব্যাপার দেখিয়েছেন। উদার পুঁজিবাদী মানদণ্ডে যেভাবে 'এশিয়ার উত্থান' ঘটেছে, ভারত বর্তমানে সেটার উন্নততম নমুনা। কিন্তু এটা একইসাথে 'পশ্চিমা আধুনিকতার বিশ্বব্যাপী বিজয়েরই ফলাফল। এতে করে প্রাচ্যের প্রতিশোধটা আশঙ্কাজনকভাবে দ্ব্যর্থবোধক হয়ে গেল'।[৩৮০] মিশ্র এবং অন্য বামঘেঁষা সমালোচকদের মতে, এতে করে এশিয়ান আধ্যাত্মবাদের নয়, বরং বস্তুবাদী পুঁজিবাদেরই জয় হয়েছে। ভারতীয় শয়তানও এখন প্রাডা পরে।[৩৮১] বামপন্থি ব্রিটিশ সাংবাদিক রিচার্ড গট তার নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমাহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন: 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আদতে হিটলারীয় প্রকল্পেরই এক বিশাল রূপ। এর মধ্যে ছিল সামরিক আক্রমণ ও স্বৈরতন্ত্র, বিনাশ ও গণহত্যা, সামরিক আইন ও "বিশেষ আদালত", দাসপ্রথা ও বলপূর্বক শ্রম, এবং যথারীতি, কনসেনট্রেশান ক্যাম্প এবং মানুষকে উৎখাত করে মহাসাগরের অপর পাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া।'[৩৮২] তার কথা ভুল না হলেও আরেকটু সূক্ষ্ম মূল্যায়ন করা দরকার। ব্রিটিশ রাজের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারকে বুঝতে হলে সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের প্রভাবগুলোও

---

[৩৭৯] ফিলিপ পম্পার, 'দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি অব এম্পায়ারস', হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি, খণ্ড ৪৪, সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১–২৭, প্রকাশক ওয়াইলি ফর উইজলিয়ান ইউনিভার্সিটি। www.jstor.org/stable/3590855.

[৩৮০] মিশ্র, ফ্রম দ্য রুইনস অব এম্পায়ার, পৃ. ৪২ থেকে।

[৩৮১] ইংরেজি উপন্যাস The Devil Wears Prada-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।—অনুবাদক।

[৩৮২] রিচার্ড গট, 'হোয়াইট ওয়াশ' (ডেভিড ক্যানাডাইনের বই অরনামেন্টালিজম: হাউ দ্য ব্রিটিশ স দেয়ার এম্পায়ার বইয়ের পর্যালোচনা), দ্য গার্ডিয়ান, ৫ মে ২০০১।

বুঝতে হবে। এসব প্রভাব পড়েছে ওইসব সমাজের ওপর, যেগুলোকে তারা ভগ্ন ও রূপান্তরিত করে দিয়েছে, এবং প্রভাব পড়েছে সেসব মানুষের ওপর, যাদের তারা পালটে দিয়েছে, নির্বাসিত করেছে, গড়েছে, ধ্বংস করেছে এবং নতুন করে বানিয়েছে। বুঝতে হবে বাণিজ্যের সমৃদ্ধ মিথস্ক্রিয়া এবং শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ বিবাহকে। কারণ, ব্রিটিশ পুঁজিবাদীরা যত জায়গা থেকে সম্ভব, মুনাফা হাতিয়ে নিত। আরও বুঝতে হবে বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মাঝে ঢুকে পড়াকে, যেখানে যুগ-যুগান্তরের পুরোনো অনেক জাতিগত বাধা চূর্ণ হয়ে গেছে এবং গড়ে উঠেছে নতুন সব বাধা। সেটা ভারতের অভ্যন্তরে যেমন, তেমনই ভারতীয়দের দেশত্যাগের মাধ্যমে অন্যান্য জায়গাতেও। এর ফলে সংকরায়িত হয়েছে ভাষা ও সংস্কৃতি। পরিবার, জাত, ধর্ম, দেশ ও সাম্রাজ্যের প্রতি পরস্পরবিরোধী আনুগত্যের মাঝে লেগে গেছে গিঁট্টু। সর্বোপরি ছিল অর্থযোগের অপ্রতিরোধ্য হাতছানি, যা কিনা ঔপনিবেশিক প্রকল্পের প্রধানতম চেতনা। এ এক বিশাল প্রকল্প, এই বইয়ের কলেবরের একদমই বাইরে।

ফারগুসনের বইয়ের পেছনে অবশ্য আরেকটি দুঃখজনক মতলব ছিল : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে ব্যবহার করে নতুন আমেরিকান সাম্রাজ্যের মঞ্চ তৈরি করা, যেটা খুব শীঘ্রই চলে আসবে বলে তিনি মনে মনে চাইছিলেন। তখন ২০০৩ সাল। যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পালটে দেওয়ার মানসে ইরাকে তাদের চূড়ান্ত ব্যর্থ অভিযান শুরু করতে চলেছে। এমনই সময়ে ফারগুসন বলেন, 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটেনের বৈশ্বিক ক্ষমতার চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী হবে প্রাচ্যের কোনো শয়তানি সাম্রাজ্য নয়, বরং ব্রিটেনের সফলতম সাবেক উপনিবেশটিই।' ফারগুসন ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী অতীতের মাঝে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ভবিষ্যৎকে দেখতে পান। কোনো রাখঢাক ছাড়াই সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে বৈধতা দিতে চেয়েছেন তিনি। প্যাক্স ব্রিটানিকা যেভাবে এক কথিত অভূতপূর্ব বৈশ্বিক শান্তির সূচনা করেছিল, প্যাক্স আমেরিকানাও নাকি সেভাবেই পুনর্জীবিত করে তুলবে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে। এহেন চটকদার ব্যাখ্যা ইতিহাসের প্রতি অবিচার। ফারগুসনের বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে ইরাকে (এবং তারপর লিবিয়া ও সিরিয়ায়) বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, মৃত্যু ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের যে মহোৎসব শুরু হয়েছে, তাতে ফারগুসনের যুক্তি নিমেষেই ধসে পড়ে।

এদিক দিয়ে ফারগুসন অন্তত ঔপনিবেশিক নীতি-নৈতিকতার প্রতি সৎ থাকছেন। এই প্রকল্পের ফলে বস্তুগত, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে লাভবান হয়েছে মূলত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবেই আজকে বিশ্বব্যাপী মানবতার ইউরোপীয় ধারণাটাকে আদর্শ মনে করা হয়; শ্বেতাঙ্গ

পুরুষকে ধরা হয় আলোকায়নের দেবতা। আর সাম্রাজ্যবাদ এই কাজটা করেছে হুকুমি ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে। এরই মাঝে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সব পরিভাষা ব্যবহার করে তাদের প্রজা জাতিদের 'ইতিহাস' লিখেছেন, নিজেদের আধিপত্যবাদের ব্যাখ্যা ও বৈধতা দিয়েছেন এর মাধ্যমে। ফারগুসন সেই ইতিহাস-লেখকদের সুদীর্ঘ ধারারই অংশমাত্র। তারা নিজেদের জাতি ও স্বার্থকে অলঙ্ঘনীয়, প্রথম ও চূড়ান্ত উপজীব্য ধরে নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেন।[৩৮৩] তাই ফারগুসনের লেখাকে সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের আচমকা খিঁচুনি হিসেবে দেখাটাই সমীচীন, যা একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ক্ষণিকের জন্য ঝলকানি মেরে গেছে। বিশ্বগোলকের কোটি কোটি মানুষ শত শত বছর ধরে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদকে সহ্য করেছে, সেটার বাস্তব প্রতিফলন এখানে পাওয়া যাবে না।

শিরোমণি ফেরত প্রদান

তো এখন উপনিবেশবাদকে বোঝা ছাড়া আর কী কী করার আছে? ভূমিকাতেই দেখিয়েছি, জরিমানার ব্যাপারটা মান্ধাতা আমলের হয়ে গেছে। সঠিক পরিমাণটা পরিশোধযোগ্য নয়, এবং পরিশোধযোগ্য পরিমাণটা সঠিক নয়। আমি যে প্রতিবছর প্রতীকী এক পাউন্ড পরিশোধের পরামর্শ দিয়েছি, সেটা হয়তো দায়িত্বশীল অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে অবাস্তবও ঠেকবে। জালিয়ানওয়ালা বাগে গিয়ে আকুলভাবে অনুতাপ প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা হয়তো সত্যিকারের তাৎপর্যময় একটা ঘটনা হতে পারে, ট্রুডো যেমনটা করেছেন কোমাগাতা মারুতে। সেইসাথে মেট্রোপোলিটান দেশে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি হওয়া চাই সাম্রাজ্যবাদ থেকে-পাওয়া শিক্ষাকে শেখার ব্যাপারে। ব্রিটিশ স্কুলশিশুদের শেখানো হবে কীভাবে তাদের স্বদেশ গড়ে উঠেছে, ঠিক যেভাবে জার্মান শিশুদের পাল বেঁধে ঘুরিয়ে আনা হয় কনসেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে। পূর্বপুরুষদের

---

[৩৮৩] কিছু লেখক অবশ্য এই দাপুটে সাম্রাজ্যবাদী জাল ছিঁড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছেন: এই চিন্তকরা জীবনের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন, যা আধুনিক নয়, আধুনিকতাবিদ্বেষীও নয়, মার্ক্সবাদী নয়, বিপ্লবীও নয়, উপনিবেশবাদী নয়, আবার ওই অর্থে ঠিক উপনিবেশবিদ্বেষীও নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমা আধিপত্যের প্রতি এরকমই বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিয়ে গেছেন তারা। পঙ্কজ মিশ্র তার ফ্রম দ্য রুইনস অব এম্পায়ার: দ্য রিভল্ট এগেইন্সট দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড দ্য রিমেইকিং অব এশিয়া (লন্ডন: অ্যালেন লেইন, ২০১২) বইয়ে এরকম কিছু অবমূল্যায়িত লেখকের অবদান তুলে ধরেছেন। পঙ্কজ মিশ্র দুঃখভরে স্বীকার করেছেন যে, প্রাচ্য 'পশ্চিমের এমন কিছু জাতির হাতে পদানত হয়েছে, যাদের তারা বর্বর না হলেও অন্তত ভুঁইফোঁড় জাতি বলে জানত বহু আগে থেকেই' (পৃ ৩)।

কৃতকর্মের ভয়ানক বাস্তবতাকে চাক্ষুস দেখে আসে তারা।

আরেকটি হলো উপনিবেশ আমলে ভারত থেকে লুটকৃত কিছু সম্পদ অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া। কর আর শোষণের মাধ্যমে যে টাকা আদায় করা হয়েছিল, তা ইতোমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। বাস্তবে এগুলো আর ফেরত চেয়ে লাভ নেই। কিন্তু ব্রিটিশ জাদুঘরে যেসব জিনিস অলস বসে আছে, সেগুলো চাওয়া সম্ভব, অন্তত তাদের প্রতীকী মূল্যের জন্য হলেও। নাৎসি-যুগের লুটকৃত শিল্পকর্ম যদি সেগুলোর বৈধ প্রাপক পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায় (এবং বর্তমানে তা দেওয়া হচ্ছেও), তাহলে লুটকৃত ঔপনিবেশিক সম্পদের ক্ষেত্রে কেন আলাদা নিয়ম হবে?[৩৮৪] স্বভাবতই আলোচনা এসে ঠেকে রানির মুকুটের বহুল বিতর্কিত কোহিনূর প্রসঙ্গে।

কোহিনূর একসময় ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাকতীয়া রাজবংশ যখন গুন্তুরের খনি থেকে একে প্রথম আহরণ করে, তখন এর ওজন ৭৯৩ ক্যারাট তথা ১৫৮.৬ গ্রাম। জায়গাটি বর্তমান ভারতের দক্ষিণের রাষ্ট্র অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থিত। (গত কয়েক শতকে একে কেটেছেঁটে ১০০ ক্যারাটের কিছু বেশিতে নামিয়ে আনা হয়েছে।) কাকতীয়া রাজারা একে একটি মন্দিরে স্থাপন করেন। সেই মন্দিরে হামলা করেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি। অন্যান্য লুটের মালের সাথে হীরাটি তিনি নিজের রাজধানীতে নিয়ে যান। ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লিতে যে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা এই হীরার মালিক হয় উত্তরাধিকারসূত্রে। এরপর ১৭৩৯ সালে এটি ফারসি হানাদার নাদির শাহের হাতে পড়ে। দিল্লি জয় (এবং সেখানকার অধিবাসীদের গণহত্যা) করে তিনি যেসব সম্পদ লুটে নেন, তার মাঝে ছিল অমূল্য ময়ূর সিংহাসন এবং স্বয়ং কোহিনূর।

প্রচলিত কিংবদন্তি বলে, এই নাদির শাহই হীরকটির আকীকা দিয়েছেন কোহিনূর তথা 'আলোর পাহাড়' হিসেবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক আফগান রানি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় স্মরণীয় উক্তি করেছেন, 'এক প্রবল শক্তিশালী পুরুষ যদি উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকে চারটি এবং ওপরের দিকে আরও একটি পাথর ছুড়ে দেয়, এবং মাঝখানের পুরো অংশটা স্বর্ণ দিয়ে ভরে দেওয়া হয়, তবুও সেগুলোর মূল্য কোহিনূরের সমান হবে না।'[৩৮৫] নাদির শাহের

---

[৩৮৪] আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য এরিন জনসন, 'ইফ উই রিটার্ন নাৎসি-লুটেড আর্ট, দ্য সেইম গোজ ফর এম্পায়ার-লুটেড,' ইয়ন। www.aeon.co/ideas/if-we-return-nazi-looted-art-the-same-goes-for-empire-looted

[৩৮৫] 'দ্য কোহ-ই-নূর ডায়মন্ড ইজ ইন ব্রিটেন ইলিগ্যালি। বাট ইট শুড স্টে দেয়ার', দ্য গার্ডিয়ান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

মৃত্যুর পর হীরকখণ্ডটি তার এক সেনাপতি আহমাদ শাহ দুররানির হস্তগত হয়। তিনিই হন আফগানিস্তানের আমীর। কালক্রমে দুররানির এক বংশধর ১৮০৯ সালে পাঞ্জাবের শক্তিশালী শিখ মহারাজা রঞ্জিত সিংহের কাছে এটি সমর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু রঞ্জিত সিংহের বংশধর তার রাজ্যকে ধরে রাখতে পারেননি। ব্রিটিশদের কাছে দুটি যুদ্ধে পরাজিত হয় শিখরা। ফলে শিখ রাজ্যগুলো ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন কোহিনূর চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে।

ভারত সরকারের প্রধান আইনজীবী ২০১৬ সালের শুরুর দিকে একটা চমকে দেওয়া বক্তব্যে বলেন যে, কোহিনূর হীরা ব্রিটিশদের উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাই ভারত সেটা ফেরত চাইবে না। দেশে এক তুমুল বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে এই বক্তব্যের ফলে। অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোশাল জাস্টিস ফ্রন্ট নামক এক বেসরকারি সংস্থা মামলা দায়ের করেছিল যে, সরকারের উচিত এই বিখ্যাত হীরাটি ফিরিয়ে আনা। জবাবে রাষ্ট্রপক্ষ বলে, পাঞ্জাবের তৎকালীন শিখ রাজ্য ১৮৪০-এর দশকে অ্যাংলো-শিখ যুদ্ধের খরচের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে ব্রিটিশদের কোহিনূর প্রদান করেছিল।

প্রধান আইনজীবী ঘোষণা করেন, ব্রিটিশরা 'এটা চুরি করেনি, ছিনিয়েও নেয়নি', তাই ভারত সরকারের এটি ফেরত চাওয়ার কোনো কারণই নেই।

এর প্রতিক্রিয়ায় জনগণ যেভাবে গর্জে ওঠে, তাতে ত্রস্ত পায়ে পিছু হটেন সরকারি মুখপাত্র। দাবি করা হয়, প্রধান আইনজীবীর বক্তব্যই চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক নয় এবং মামলার সুযোগও শেষ হয়ে যায়নি। ভারতীয়রা কিছুতেই বিশ্বের কিংবদন্তিতুল্য রত্নের ওপর তাদের নৈতিক দাবি ছেড়ে দিতে পারে না। ভারত সরকার যে দাবি করেছে, শিখদের পরাজিত করার খরচের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে শিখরাই ব্রিটিশদের কোহিনূর দিয়েছে, তা হাস্যকর। কারণ, যুদ্ধের পরাজিত পক্ষ বিজয়ী পক্ষকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়, সেটা সাধারণত অনিচ্ছাকৃত জরিমানা। হীরকখণ্ডটি আনুষ্ঠানিকভাবে রানি ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেন শিখ রাজ্যের অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরসূরি মহারাজা দুলীপ সিংহ। ওই পরিস্থিতিতে তার আর কোনো উপায়ও ছিল না। এ-বিষয়ক রাজনৈতিক বিতর্কে আমি আগেও বলেছি, আপনি আমার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে রাখলে হয়তো আমি আমার ওয়ালেট আপনাকে 'উপহার' দিয়ে দেবো; কিন্তু এর মানে তো এই নয় যে, বন্দুক সরিয়ে নিলে আমি ওটা ফেরত চাইব না।

বহু সাবেক উপনিবেশই মনে করে যে, তাদের ভূমিতে শত বৎসরের লুটতরাজের জন্য ব্রিটেন তাদের জরিমানা দিতে বাধ্য। সাম্রাজ্যের জমজমাট

যুগে অপহৃত অমূল্য শিল্পকর্মগুলো থেকে এই কাজ শুরু করা যায়। কিন্তু টাওয়ার অব লন্ডনে মুকুট-রত্নের অংশ হিসেবে যে কোহিনূর প্রদর্শন করা হয়, তা একটা বিশেষ সমস্যার জন্ম দেয়। ভারতীয়দের মতে এটার ওপর তাদের দাবি অবিসংবাদিত। যত যা-ই হোক, হীরকটি তার অস্তিত্বের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে ভারতের মাটির ওপরে বা নিচে। কিন্তু অন্যদের দাবিও আছে এর ওপর। ইরানিরা বলে, নাদির শাহ এটি চূড়ান্তভাবে ছিনিয়ে এনেছিলেন। আফগানদের দাবি, শিখদের কাছে বলপূর্বক সমর্পণের আগ পর্যন্ত এটি তাদের হাতে ছিল। মালিকানা কাড়াকাড়ির এই জুয়ায় সর্বশেষ আগন্তুক পাকিস্তান। তাদের দাবির ভিত্তি কিছুটা নড়বড়ে। শিখ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল লাহোরে, যা এখন পাকিস্তানে অবস্থিত। আর এই শিখরাই ব্রিটিশদের আগ পর্যন্ত কোহিনূরের সর্বশেষ অবিসংবাদিত মালিক। (এই দাবি মানতে হলে অবশ্য একটা বাস্তবতাকে একদম চোখ বুজে অস্বীকার করতে হবে। দশকের পর দশক ধরে সংখ্যালঘুদের জাতিগতভাবে নিধন করার পর পাকিস্তানে শিখদের অস্তিত্ব এখন প্রায় বিলীন।)

মালিকানা নিয়ে এই বিতর্কের কারণে ব্রিটিশরা বেশ হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। কারণ, দূরদূরান্তের অনেক দেশেই তারা দুই শতাব্দী বা আরও বেশি সময় যাবৎ ঔপনিবেশিক শোষণ করেছে, ঘটিয়েছে কয়েক পরতের অবিচার। এখন সেসব জায়গা থেকে ছুটে আসছে হাজারো অভিযোগের তুফান। বিতর্ক লাগলে তুফানের তোড় কিছুটা কমে। পার্থিনোনের শ্বেতপাথর থেকে কোহিনূর পর্যন্ত বহু দেশের এতগুলো ঐতিহ্যবাহী রত্ন মেরে দেওয়াটা এখন ব্রিটিশদের বিশেষ মাথাব্যথার কারণ। তাদের আশঙ্কা, একটা দাবি মেনে নিলেই তুঘলকি কাণ্ড বেধে যাবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ২০১০ সালের জুলাইয়ে ভারত সফরে এসে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, 'একটাতে হ্যাঁ বলে দিলেই দেখবেন পরদিন পুরো ব্রিটিশ জাদুঘর খালি হয়ে গেছে। অস্বস্তি নিয়ে বলছি, ওটা [কোহিনূর] রেখেই দেওয়া লাগবে।'

তারপর আসে আইনগত ঝামেলা। প্রধান আইনজীবী দাবি করেছেন, ১৯৭২ সালের পুরাকীর্তি ও শিল্প সম্পদ আইন এখানে বাধা হয়ে আছে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগপর্যন্ত যেসব প্রাচীন সম্পদ রপ্তানি হয়ে গেছে, সরকার সেগুলো ফেরত চাইতে পারে না। কোহিনূর যেহেতু ওই তারিখের এক শতাব্দী আগে খোয়া গেছে, সেহেতু স্বাধীন ভারত সরকারেরও এখন সেটা পুনরায় দাবি করার উপায় নেই। (অথচ এই আইন কিন্তু সংশোধন করা যেত। বিশেষ করে এমন এক সংসদের মাধ্যমে, যারা সম্ভবত এরকম একটা পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিত। কিন্তু ওটা সরকারের মাথাতেই আসেনি।

বোধহয় তারা দ্বিপক্ষীয় নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভীত। জাতিসংঘের যে অঙ্গসংস্থাটি তাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত, সেটির কাছেও তারা ধরনা দেয়নি একই কারণে। অঙ্গসংস্থাটির নাম ইন্টারগভর্নমেন্টাল কমিটি ফর প্রোমোটিং দ্য রিটার্ন অব কালচারাল প্রপার্টি টু ইটস কান্ট্রিজ অব ওরিজিন।) ভারতীয় প্রধান আইনজীবী যে অবস্থান নিলেন, তাতে করে আমার মতো জাতীয়তাবাদীদের হাল থেকে পানি সরে যায়। ভেবেছিলাম ব্রিটিশদের বলব সাংস্কৃতিক তাৎপর্যময় জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের অনুশোচনা প্রকাশ করতে, প্রধান আইনজীবীর অনড় অবস্থানের কারণে আর সম্ভব হলো না সেটা।

তবুও টাওয়ার অব লন্ডনে রানিমাতার মুকুটে কোহিনূর দেখিয়ে বেড়ানোটা অশোভন। তাদের অতীত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেসব স্থায়ী অবিচার করে গেছে, সেগুলোই যেন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এর মাধ্যমে। অন্তত প্রায়শ্চিত্তের প্রতীকী নিদর্শন হিসেবেও যতদিন তা ফিরিয়ে দেওয়া না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তা লুটপাট, ডাকাতি ও অপহরণের প্রমাণ হয়েই টিকে থাকবে। আর উপনিবেশবাদ ঠিক এই ব্যাপারগুলোরই সমষ্টি। ব্রিটিশদের হাতে যে কোহিনূর থাকাটা সাজে না, এই বক্তব্যের পক্ষে এটাই হয়তো সবচেয়ে শক্ত যুক্তি।

উপনিবেশবাদ প্রতিহতকরণ : গান্ধিবাদের আবেদন

উপনিবেশবাদ রুখতে যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর বিশ্বব্যাপী প্রভাবও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারেরই অংশ।[৩৮৬] ব্রিটিশদের ভারত-ত্যাগের পরও মহাত্মা গান্ধি দুনিয়াজুড়ে প্রাসঙ্গিক। এটার প্রধান কারণ তার অহিংসা নীতি এবং এতে অনুপ্রাণিত অনুসারীবৃন্দ। এর এক বড়সড় উদাহরণ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। তিনি গান্ধির একটি বক্তৃতায় উপস্থিত হন, তার ওপরে লেখা ছয়খানা বই খরিদ করেন এবং সত্যাগ্রহকে নিজের ঈমান ও আমল বানিয়ে নেন। ভারতের বাইরে অহিংস পদ্ধতি ব্যবহারের সবচেয়ে সফল উদাহরণ মার্টিন লুথার। এটি ব্যবহার করে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকের রাষ্ট্রগুলোয় বর্ণবৈষম্য ভেঙে দিয়েছেন। গান্ধির প্রতিধ্বনি করে তিনি স্মরণীয় উক্তি করে গেছেন : 'ঘৃণায় ঘৃণা আসে, সহিংসতায় আসে সহিংসতা। ঘৃণার শক্তিকে মোকাবিলা করতে হবে আত্মার শক্তি দিয়ে।' মার্টিন লুথার

---

[৩৮৬] ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং এর চলমান প্রভাবের এক অনুসন্ধানী রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য জন ডারউইনের দুটি বই, দি এম্পায়ার প্রজেক্ট, লন্ডন: পেঙ্গুইন, ২০১০; এবং আনফিনিশড এম্পায়ার: দ্য গ্লোবাল এক্সপ্যানশান অব ব্রিটেন, লন্ডন: অ্যালেন লেইন, ২০১৩।

পরবর্তীকালে জানিয়েছেন, 'গান্ধিবাদী অহিংস অসহযোগ... ছিল আমাদের আন্দোলনের আলোকবর্তিকা। খ্রিষ্ট দিয়ে গেছেন এর চেতনা ও প্রেরণা এবং গান্ধি একে কর্মে রূপ দিয়েছেন।'

তাই বলা চলে, গান্ধিবাদই আমেরিকার দূরবর্তী দক্ষিণকে চিরতরে পালটে দিয়েছে। একদল স্বঘোষিত গান্ধিবাদী ব্যক্তি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন বটে। গুয়াতেমালার রিগোবের্টা মেঞ্চু থেকে আর্জেন্টিনার আডোলফো পেরেয এসকিভেল পর্যন্ত অনেকেই এই তালিকায় আছেন। (গান্ধি নিজে অবশ্য শান্তি পুরস্কার পাননি।) তবুও গান্ধিবাদের কার্যকারিতার চোখে পড়ার মতো আর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভারতের স্বাধীনতার মাধ্যমে বি-উপনিবেশায়ন যুগের সূর্য উদিত হতে শুরু করে। কিন্তু এর পরও বহু জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে রক্তক্ষয়ী ও সহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আরও বহু জাতি হানাদার সেনাদলের বুটের তলে পিষে গেছে, ভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে এবং সভয়ে পালিয়ে গেছে স্বদেশভূমি থেকে। অহিংসা তাদের কোনো সমাধান দিতে পারেনি। প্রতিপক্ষ যদি নৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলার ভয়ে থাকে, তাহলেই কেবল কাজে লাগে অহিংসা। যেসব সরকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনমতের প্রতি সংবেদনশীল, যাদের লজ্জা দিতে দিতে পরাজিত করে ফেলা যায়, তাদের বিরুদ্ধে অহিংসা দিয়ে পারা যায়। ব্রিটিশরা ছিল স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অধিকারী গণতান্ত্রিক সরকার, আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ব্যাপারে সচেতন, তাই তাদের লজ্জা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি জীবিত থাকাকালেই হিটলারের জার্মানির ইহুদিদের জন্য অহিংসা কোনো সমাধান ছিল না। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ঝলকানি যখন যুদ্ধের ছবি তুলতে ব্যস্ত, তখন তারা এ থেকে বহু দূরে গ্যাস চেম্বারের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধির মতো একজন প্রতিপক্ষ পাওয়া এবং তাকে সফল হতে দেওয়াটা যেন ঘুরেফিরে ব্রিটিশ রাজেরই কৃতিত্ব।

অহিংসার শক্তিটা এতটুকুতেই যে, 'তুমি যে ভুল, সেটা দেখাতে আমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি', কিন্তু নিজের ভুল নিয়ে যারা চিন্তিত নয় এবং প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে আগে থেকেই বদ্ধপরিকর, তাদের ওপর এসব কথা নিষ্ফল। আপনি যে কষ্ট সহ্য করতে চাইছেন, এটাই তাদের বিজয়ের সবচেয়ে আরামদায়ক পথ। নেলসন ম্যান্ডেলার অবস্থান তাই বোধগম্য। তিনি লিখেছেন, গান্ধি 'চিরকালই' তার 'প্রেরণার এক অসাধারণ উৎস'; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার নির্দয় বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যে অহিংসা অকেজো, তাও স্বীকার করেছেন তিনি নিজেই।

এই ব্যাপারে গান্ধির বক্তব্য ভয়ংকর রকমের অবাস্তব শোনায়: 'দেব-

মানব নির্বিশেষে এখন পর্যন্ত যত অশিষ্ট অনাচার দেখতে পাওয়া গেছে, তার সবচেয়ে শক্তিশালী জবাব হলো নিরপরাধের বলিদান। অসহযোগ "সভ্য" হতে হলে তাকে হওয়া চাই একনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাশীল, সংযমী, অবাধ্য নয়, এবং এর পেছনে কখনোই কোনো অসদিচ্ছা বা ঘৃণা থাকতে পারবে না; অসহযোগে উত্তেজনাও থাকতে পারবে না। এ কেবল নীরব কষ্টভোগের প্রস্তুতি।'

বিশ্বে যারা অনাচারের অধীনে পিষ্ট হচ্ছে, তাদের অনেকের কাছেই এই ব্যবস্থাপত্রকে মনে হবে সাধুগিরি বা অক্ষমতার উপদেশ। নীতিকথা হিসেবে নীরব কষ্টভোগ মানা যায়। কিন্তু এতে থোড়াই কোনো অর্থপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। দুঃখজনক সত্যি কথা হলো, সুসংগঠিত সহিংসতার টিকে থাকার ক্ষমতা সর্বদাই অহিংসার চেয়ে বেশি। গান্ধির পক্ষে ব্রিটিশদের বিব্রত করা সম্ভব হলেও উৎখাত করা সম্ভব ছিল না, এই কথার পক্ষে সমর্থন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ব্রিটিশ রাজকর্তৃপক্ষের অনুগত সৈন্যরা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্রোহ করে ওঠে, রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির নাবিকরা যখন ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ বন্দর স্থাপনায় কামান দাগাতে শুরু করে, তখনই গিয়ে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে খেলা শেষ। তারা একটা বুড়োকে জেলে পুরতে পারে, তাকে অনশন করতে দিতে পারে, কিন্তু ৩২ কোটি মানুষের সমর্থনবিশিষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহকে অনন্তকাল ধরে দাবিয়ে রাখতে পারবে না তারা। গান্ধি নৈতিক দ্বন্দ্বে বিজয়ী, আজকের পরিভাষায় যেটাকে বলা হবে 'সফট পাওয়ারে'র যুদ্ধ। কিন্তু উর্দিধারী বিদ্রোহীরা যদি সামরিক বিজয় নাও পেয়ে থাকে, 'হার্ড পাওয়ারে'র যুদ্ধটা তারাই জিতে এনে দিয়েছে।

ঠিক-বেঠিক যখন অতটা স্পষ্ট থাকে না, গান্ধিবাদ তখন আঁধারে হাতড়ায়। মহাত্মা তার প্রভাবশালিতার তুঙ্গে থাকাকালেও ভারত-বিভাজন রোধ করতে পারেননি, অথচ তার মতে এটি নৈতিকভাবে 'ভুল'। তিনি বিশ্বাস করেন 'ধৈর্য, সমবেদনা ও আত্মবেদনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ভুল থেকে ফিরিয়ে আনা' সম্ভব। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি নিজের অবস্থানকেও সমভাবে ন্যায়ানুগ মনে করে, তা অন্যায় জেনেও সেটা নিয়ে মাথা না ঘামায়, তাহলে সে তো নিজের 'ভুল' স্বীকারই করবে না। গান্ধিবাদ তার সরলতম রূপটায় সবচেয়ে কার্যকর। বিদেশি শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের মতো সর্বজনীন নীতির ক্ষেত্রে এটা গভীরভাবে কাজে লাগে। কিন্তু জটিলতর পরিস্থিতিতে এটি অত ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, বা আসলে করে না।

নতুন ভারতের স্থপতিদের ওপর মহাত্মার আদর্শের ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব ছিল। গান্ধির বহু বিশ্বাসকে তারা রাষ্ট্রীয় নীতিতে সংযোজন করেছেন। কিন্তু যেসব সমস্যা নিয়ে তিনি দুঃখিত ছিলেন, তার অনেকগুলোরই কোনো

গান্ধিবাদী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক (বা 'জাতিগত') দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে দলিতদের নিপীড়ন পর্যন্ত অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তার পদ্ধতিগুলো (বিশেষ করে অনশন, হরতাল, দোকানপাট বন্ধকরণ এবং স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হওয়া) বহু হীনতর লোকের হাতে অপব্যবহারের শিকার হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ফায়দা লোটা। ভারতের বাইরেও সন্ত্রাসী ও বোমাবাজরা গান্ধিবাদী কৌশলকে বিকৃত করেছে। নিজেদের কৃত অপরাধের শাস্তি পেলেই অনশন শুরু করে দেয় তারা। নৈতিক নজরদারিবিহীন গান্ধিবাদ যেন প্রোলেতারিয়েতবিহীন মার্ক্সবাদ, অথচ যারা তার পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের বেশিরভাগই গান্ধির মতো নৈতিক উচ্চতায় পৌঁছাতে অক্ষম।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মহাত্মা যেসব আদর্শ পেশ করেছেন, তা সাধারণত কেউই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। জাতিসংঘের সনদটাও হয়তো তিনি লিখলে প্রায় একই রকমই হতো, শুধু অধ্যায় ৭ বাদে, যেখানে বলপ্রয়োগের কথা বলা আছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরের কয়েক দশকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সার্বভৌমত্ব নিয়ে একাধিক রাষ্ট্রের মাঝে ঠোকাঠুকি হওয়া অনিবার্য। তিনি পরলোকগত হওয়ার পর যত যুদ্ধ ও বিপ্লব হয়েছে, তাতে ঝরে গেছে প্রায় ৩ কোটি প্রাণ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত মিলিয়ে যত বরাদ্দ, একা সামরিক খাতে তারচেয়েও বেশি বরাদ্দকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা দেখে মন ভেঙে যায়। গান্ধির নিজের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। হিরোশিমায় যে আণবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ দেখে গান্ধি এত দুঃখ পেলেন, আজকের পৃথিবীতে স্তূপীকৃত পারমাণবিক বোমার সম্মিলিত বিস্ফোরণক্ষমতা তারচেয়ে কোটি গুণ বেশি। যে বিশ্বশান্তিকে গান্ধি ভাবতেন সত্যের কেন্দ্রীয় বিষয়, সেটাকে আজও মনে হয় দূরতম স্বপ্ন।

রাষ্ট্র যেমন প্রতিযোগিতা করছে, তেমনই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ধর্মও। সর্বধর্মের সহযোগিতায় বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি খ্রিষ্টান, আমি জরথ্রুস্টবাদী, আমি ইহুদি।' অথচ আজ বিশ্বজুড়ে বহু ধর্ম ও বিশ্বাসে এমন পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে, যার মূল কথা 'আমরা বাদে সকলে ভুল'। এদের সংখ্যা দেখলে গান্ধি হজমই করতে পারতেন না। আসলে তার কর্মপদ্ধতিটা হয়তো বাকি বিশ্বের জন্য কখনোই উপযুক্ত ছিল না। গান্ধির সর্বধর্মবাদী উক্তির জবাবে তার মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বী মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ বক্রোক্তি করেছেন—'একটা হিন্দুর পক্ষেই ওটা বলা সম্ভব।'

পরিশেষে, মহাত্মা হিন্দ স্বরাজ-এ যে জগতের কথা তুলে ধরেছেন, আজকের বিশ্ব তা থেকে অনেক দূরে। চরকা কাটার পৃথিবী, গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রে

বসবাসরত স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবারের দুনিয়া আজ সুদূর অতীতের বিষয়। মধ্যবর্তী প্রযুক্তি খুব অল্প সময়ের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সামান্য সময়ের জন্য মনে হয়েছিল 'স্বল্পই সুন্দর', কিন্তু আজকের পরস্পর নির্ভরশীল পৃথিবীতে এসব ধ্যানধারণার তেমন জায়গা নেই। স্বনির্ভরতা কথাটিকে প্রায়ই ব্যবহার করা হয় প্রোটেকশানিজমকে আড়াল করার জন্য। উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের অদক্ষতা ঢাকতে এই শব্দের আশ্রয় নেয়। সফল ও সমৃদ্ধ দেশ তো সেগুলোই, যারা চরকাকে ছাড়িয়ে সিলিকন চিপসের দিকে দৃষ্টি দিতে সক্ষম, এবং যারা তাদের জনগণকে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের আশীর্বাদ ভোগ করতে দেয়, শ্রমসাধ্য ও একঘেয়ে কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে প্রসারিত করে দেয় তাদের জীবনের দিগন্তকে। যে কাল্পনিক ও স্বনির্ভর গ্রাম প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, আজকের নগরায়ণময় ভারত তা থেকে অনেক দূরে। ভারত যেভাবে সাগ্রহে প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করেছে, গান্ধির কাছে সেটা মনে হতো নিজের আত্মা বিকিয়ে দেওয়া।

কিন্তু গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী বছরগুলোতে গান্ধিবাদের সীমাবদ্ধতা যতই নগ্ন হয়ে ধরা পড়ুক না কেন, স্বয়ং মহাত্মার মাহাত্ম্য অস্বীকার করা অসম্ভব। পৃথিবী যখন ফ্যাসিবাদ, সহিংসতা আর যুদ্ধের সামনে ভেঙে পড়ছে, তিনি তখন শিখিয়েছেন সত্য, অহিংসা ও শান্তির অটলতা। বিশ্বাস ও সাহসের এমন উঁচু মানদণ্ড তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, যেখানে খুব কম মানুষই পৌঁছাতে সক্ষম। তিনি সেই বিরল প্রজাতির নেতাদের একজন, যারা তাদের অনুসারীদের অক্ষমতার ভেতরে বন্দি নন।

তাই মহাত্মা গান্ধি উপনিবেশবিরোধিতার এক কালজয়ী প্রতিমূর্তি হিসেবে সগৌরবে বিরাজমান। ব্রিটিশ রাজের চূড়ান্ত সম্মানটা এখানেই যে, এক 'মহান আত্মা' তার বিরোধিতা করেছিলেন।

দীর্ঘ ছায়া : উপনিবেশবাদের অবশিষ্ট সমস্যাবলি

ঔপনিবেশিক যুগ শেষ, তবুও তাদের ফেলে যাওয়া গুঁড়ো এখনো পড়ে আছে, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তি চলে যাওয়ার সময় যে ছন্নছাড়া অবস্থায় দেশকে রেখে গেছে, সেটা। বিপজ্জনকভাবে স্থবির হয়ে আছে সেসব সমস্যা। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে অনিঃশেষ শত্রুতা। নিয়মিত বিরতিতে চারটি যুদ্ধ যেমন হয়েছে, তেমনই ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বারবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে এসে। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাও আছে। পূর্ব তিমুরে ১৯৯৯ সালে কিছু

নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ হয়ে গেল। তাতে করে আরও একবার বড়সড় ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকারীদের হাতে। তবুও সেখানে একটা উপসংহার তো হয়েছে। পক্ষান্তরে পশ্চিম সাহারা কিংবা সাইপ্রাস বা ফিলিস্তিনে কিন্তু তা হয়নি। এগুলো সবই ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের রেখে যাওয়া হযবরল কর্মফল। ঔপনিবেশিক যুগের রেখে-যাওয়া সলতে যে-কোনো সময়ে আবারও জ্বলে উঠতে পারে। সবাইকে বেশ অবাক করে দিয়ে সে ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকার শৃঙ্গে। ইথিওপিয়া ও এরিত্রিয়ার মাঝে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঔপনিবেশিক আমলের সীমান্তকে ঘিরে। কারণ, আগেকার ইতালীয় দখলদাররা যথাযথভাবে সীমারেখাটা চিহ্নিত করে দিয়ে যায়নি। সারাক্ষণ টানটান অনিশ্চয়তা ঘিরে রাখে এই এলাকাটাকে। ব্রিটিশ ও ফরাসিরা ১৯১৬ সালে সাইকস-পিকো চুক্তি করে। সাবেক উসমানীয় অঞ্চলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে রাজি হয় তারা। এভাবেই নির্ধারিত হয়েছে স্বাধীন সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যকার সীমানা। এই চুক্তি ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আরও এক পুরাকীর্তি, যা আজও আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। কারণ, আইসিস ('দায়েশ') যখন নির্দয়ভাবে ওই অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তখন তারা এই অন্যায় অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ চুক্তির বিরুদ্ধেই স্লোগান তুলেছে। সাইকস-পিকোর পরিণামকে উলটো ঘুরিয়ে দেওয়ার পাক্কা শপথ ব্যক্ত করে তারা। সাম্রাজ্যবাদী যুগ তুমুলভাবে বর্তমান হয়ে ওঠে আবারও।

তবে উপনিবেশবাদের কিছু পরোক্ষ পরিণাম এখনো প্রাসঙ্গিক। উপনিবেশবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস এমনসব উপাদানে ভরতি, যেগুলো নিতান্ত খামখেয়ালে সাম্প্রতিক অনেক দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছে। সোজা কথায়, এরকম একটা উপাদান হলো ভুলভাল নৃবিজ্ঞান। বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির হুটু ও টুটসিদের মাঝে বিভেদের রেখা টেনে দেয়। এমন এক পার্থক্যকে তারা বিধিবদ্ধ করে ফেলে, যেটার অস্তিত্ব এর আগে ছিলই না। এই বিভাজন এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় আফ্রিকান হ্রদঘেরা এলাকাকে। কাছাকাছি আরেকটি সমস্যা হলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমাজবিজ্ঞান। যেমন—ব্রিটিশরা ভারতে 'যুদ্ধবাজ জাতি' নামক একটা শ্রেণির উদ্ভাবন করেছে। কত রক্তপাতের জন্য যে এই ব্যাপারটা দায়ী, তার ইয়ত্তা নেই। এর ফলে একদিকে সশস্ত্র বাহিনীতে নাম লেখানোর সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসে, আরেক দিকে কিছু সম্প্রদায়ের ওপর যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠিন বোঝা চেপে বসে। উপনিবেশবাদীদের যে চিরাচরিত প্রশাসনিক অভ্যাস 'ভাঙো আর শাসো', সেটার কথা তো বলাই বাহুল্য। এর আরও একটি উদাহরণ ১৮৫৭ সালের পর থেকে নিয়ে উপমহাদেশে ব্রিটিশদের শাসননীতি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে রাজনৈতিক বিভাজন

উসকে দিয়েছে তারা। দেশভাগের অমোঘ পরিণতির পেছনে মূলত এটাই দায়ী।

'যুদ্ধবাজ জাতি' তত্ত্ব এবং ডিভাইড এট ইম্পেরার রাজনীতির আরেকটি অদ্ভুত সম্মিলিত ফল হলো পাকিস্তানের সামরিকায়ন।[৩৮৭] ব্রিটিশরা এই 'যুদ্ধবাজ জাতি' তত্ত্বের খুব একপেশে প্রয়োগ করেছে। তাই দেশভাগের সময় অবিভক্ত ভারতের সামরিক বাহিনীর বড় অংশটাই পেয়েছে পাকিস্তান। এটা তাদের জনসংখ্যা ও আয়তনের সাপেক্ষে অনেক বেশি। পাকিস্তানের জনসংখ্যা অবিভক্ত ভারতের ২১ শতাংশ এবং রাজস্ব আয় ১৭ শতাংশ। কিন্তু বাহিনীর হিসেবে তারা পেয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মির ৩০ শতাংশ, ইন্ডিয়ান নেভির ৪০ শতাংশ এবং ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ৪০ শতাংশ। এহেন ঢাউস আকৃতির বাহিনীর খরচ জোগাতে পাকিস্তান সরকার তাদের প্রথম বাজেটের ৭৫ শতাংশই সামরিক খাতে বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামরিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুযোগ-সুবিধা টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী। তাই তাদের এমন একটা শত্রু আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যাতে তাদের পেছনে এই বিশাল খরচকে বৈধতা দেওয়া যায়। আর এজন্যই তারা এমন গোঁয়ারের মতো শত্রুতা করে ভারতের সাথে। দুঃখের ব্যাপার হলো, পাকিস্তান সরকার এই পথ থেকে ফিরে আসার বদলে উলটো আরও পুষ্টি জোগাতে থাকে এই রাক্ষসকে। ফলে রাক্ষসটি একসময় নিজের দেশকেই গ্রাস করে ফেলে। পাকিস্তান নিজেদের অর্ধেক ভূখণ্ড হারিয়ে ফেলে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধে; এমনকি এই বিপর্যয়ের পরও ক্রমেই বেড়ে চলেছে তাদের সামরিক বাহিনীর আকৃতি।

ঔপনিবেশিক যুগের এহেন 'যুদ্ধবাজ জাতি'র তকমা এবং ধর্মীয় বিভাজনের ক্ষতি কেবল এক জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এগুলোর ফলে প্রায়ই রাষ্ট্রীয় সম্পদের অসম বণ্টন ঘটত ঔপনিবেশিক সমাজে। বেলজিয়ান ঔপনিবেশিকদের পছন্দের জাতি ছিল টুটসিরা, ফলে হুটুরা তাদের বিদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। ঔপনিবেশিক যুগে তামিলরা বেশি সুযোগ-সুবিধা পেত, তাই শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতার পর সিংহলীয়রা বৈষম্যমূলক নিয়ম করে তাদের বিরুদ্ধে। এটাই তেল ঢেলেছে তামিল বিদ্রোহের আগুনে। ভারতকে এখনো দেশের ভেতর ভাঙো ও শাসো নীতির উত্তরাধিকার ভোগ করতে হচ্ছে। এর মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রায় পাকিস্তানের সমান। নিজেদের এই পরিচয়ের ব্যাপারে তারা বেশ সচেতন যে, তারা ভারতীয় সূর্যের নিচে নিজস্ব জায়গা খুঁজে নিতে ব্যস্ত সংখ্যালঘু।

[৩৮৭] হুসাইন হাক্কানি, ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান: হোয়াই ক্যান'ট উই জাস্ট বি ফ্রেন্ডস? (নয়াদিল্লি: জাগারনট বুকস, ২০১৬)।

একই আধুনিক রাষ্ট্রের ভেতর 'মিশ্র' ঔপনিবেশিক ইতিহাস থাকাটা আরেকটা সম্ভাব্য বিপদের উৎস। কোনো রাষ্ট্রের যখন একাধিক ঔপনিবেশিক অতীত থাকে, তখন তার ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। বেশকিছু অনুঘটক এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ উসকে দিতে পারে, যেমন : ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং 'জাতিগত'। ইথিওপিয়া থেকে এরিত্রিয়া এবং সোমালিয়া থেকে 'রিপাবলিক অব সোমালিল্যান্ডে'র আলাদা হয়ে আসার মাঝে জাতিসত্তা বা ভাষার তেমন ভূমিকা ছিল না, বরং তাদের পৃথক করে দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ঔপনিবেশিক অতীত (এরিত্রিয়া শাসন করেছে ইতালীয়রা এবং সোমালিল্যান্ডকে ব্রিটিশরা)। বাস্তবতা যা-ই হোক, অন্তত তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে তাদের অতীত তাদের স্বজাতীয়দের চেয়ে ভিন্ন। একই কথা বলা যায় সাবেক ইয়ুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রেও। দেশটির কিছু অংশ প্রায় ৮০০ বছর ধরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান শাসনাধীনে ছিল, আর বাকি অংশ প্রায় একই সময়জুড়ে ছিল উসমানীয় আধিরাজ্য। ১৯৯১ সালে যে যুদ্ধ বেধে যায়, তা কোনো যেনতেন যুদ্ধ ছিল না। ইয়ুগোস্লাভিয়ার যে অংশটি জার্মানভাষীদের শাসনে ছিল, তারা তখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে অপর অংশটির সাথে (বা যারা এ ধরনের উপনিবেশায়নের বিরোধী ছিল, তাদের সাথে)।

ঔপনিবেশিক যুগে অঙ্কিত সীমা যদি স্বাধীনতার পর অপরিবর্তিতও থাকে, তবুও তা জাতীয় ঐক্যে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারটা চোখে পড়ে ইরাকে। উসমানীয় ধ্বংসস্তূপ থেকে একে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে করে একক রাষ্ট্র হওয়ার ব্যাপারে নানান ঝামেলা দেখা দেয় তাতে। আফ্রিকায় এই সমস্যা আরও প্রকট। ঔপনিবেশিকদের আঁকা সীমানা দিয়ে যখন আর কিছুতেই জাতি গঠনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায় না, তখনই দাঙ্গা বেধে যায় জাতিগত বা আঞ্চলিক সীমানা ঘিরে। ঔপনিবেশিকের কলমের আঁচড় কয়েকটা বিসদৃশ জাতিকে একসাথে আঠা মেরে দেয়। জাতীয়তা হয়ে পড়ে এক অলীক ধারণা। আফ্রিকায় যে সুপ্রাচীন জাতিগত ও গোত্রীয় বন্ধন ছিল, সেগুলোকে নতুন করে সাজায় সুদূর বার্লিনে বসা মানচিত্রকর, তৈরি করে নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। ফলে স্বাধীনতাপরবর্তী নেতাদের নতুন নতুন ঐতিহ্য আর জাতীয় পরিচয় সেলাই করে নিতে হয়। এর ফলে এমনসব রাজনৈতিক উপকথা নির্মিত হয়, যা অনুসারীদের মনঃপূত হয় না। তাদের দেশটা যেমন কৃত্রিম, নেতাদের বানানো ইতিহাসও ততটাই কৃত্রিম ঠেকে। যে নাগরিক গোষ্ঠীকে তারা ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, তাদের মধ্যে সত্যিকারের দেশপ্রেমী আনুগত্য গড়ে ওঠে না। 'জাতীয়' নেতার জাতীয়তাবাদ যখন পুরো দেশকে অনুরণিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন গৃহযুদ্ধ বাধানো একেবারে সহজ হয়ে যায়

স্থানীয় নেতাদের পক্ষে। যত যা-ই হোক, এই বিদ্রোহ তো 'his' story-কে হটিয়ে history-কে পুনর্জীবিত করার সংগ্রাম।

উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতাও দ্বন্দ্বের এক অন্যতম উৎস। নব্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের অপ্রস্তুত সরকার ঠিকমতো হাল ধরতে না পারায় এই ঘটনা ঘটে। বহু আফ্রিকান দেশে প্রশাসনের বিপর্যয় বর্তমানে বিশ্ব পরিসরে এক সত্যিকার মাথাব্যথার কারণ। বেশ কয়েকটি দেশে ধসে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার : আজকে দারফুর, দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব কঙ্গোতে, এবং গতকাল সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া ও সোমালিয়াতে। (আগামীকাল কী হবে কে জানে?) এতে করে কিছু বিপজ্জনক সম্ভাবনার তুফান শুরু হয়ে যেতে পারে : সংঘর্ষের জেরে হয়তো ধসে পড়বে আরও কয়েকটি 'দুর্বল রাষ্ট্রে'র সরকারও, বিশেষ করে আফ্রিকায়।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে অনুন্নয়ন স্বয়ং এক দ্বন্দ্বের কারণ। ঔপনিবেশিকদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন খাতে অসমভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ফলে গরীব দেশে সম্পদ বণ্টন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নও হয় অসমভাবে। কিছু থাকে 'অবহেলিত এলাকা', আর কিছু এলাকা টইটম্বুর হয়ে ওঠে রেলপথ, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ, সেতু ও খাল দিয়ে। ফলে দুই অংশের মাঝে ঠোকাঠুকি লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। দক্ষিণের এমন বহু দেশে অনুন্নয়ন ধেয়ে আসছে, যারা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের খেলায় টিকে থাকার প্রাণপণ সংগ্রাম করেও সুবিধা করতে পারছে না। দারিদ্র্য, পরিবেশ বিপর্যয় এবং শেকড়হীন বেকার জনগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠছে। ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না তাদের। রবার্ট কাপলান তার দ্য কামিং অ্যানার্কি বইয়ে এই বাস্তবতার মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন। বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বগ্রামের প্রান্তীয় এলাকাগুলোর মাথার ওপর ঝুলছে অনাগত সহিংসতার বিপদ।

আগামীর নৈরাজ্যের জন্য যে গতকালের ঔপনিবেশিক শাসন বহুলাংশে দায়ী, তা এই একবিংশ শতকে দুঃখজনকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমানের ব্যর্থ শাসকরা যদি ঔপনিবেশিক অতীতকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চান, আমি তাতে মোটেও সায় দেবো না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, কোন প্রভাবক শক্তিগুলো আমাদের এভাবে গড়ল আর প্রায় ভেঙে দিলো। বুঝতে হবে, নবাগত সহস্রাব্দে কোন কোন সংঘাত অত্যাসন্ন। বুঝতে হবে, কখনো অতীত ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্‌বাণী।